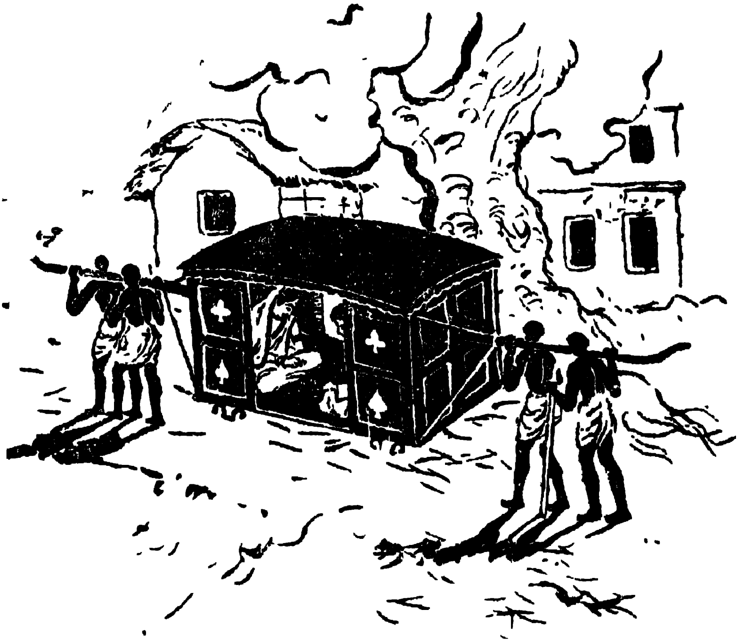


উপকণ্ঠে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৩৭১

উ প ক ণ্ঠে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১

এবার আশ্বিনের প্রথম থেকেই মহাশ্বেতার শরীরে একটা কি গণ্ডগোল দেখা দিল। দিনরাতই গা-বমি-বমি করে, কেমন যেন টিশ্-টিশ্ করে শরীর—কিছুই ভাল লাগে না। কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। দিনকতক এইভাবে যেতে যেতেই সত্যিকার বমি শুরু হল। যা খায় কিচ্ছু পেটে তলায় না। মহাশ্বেতার স্থির বিশ্বাস হল এবার সে মারা যাবে।

স্বামীকে ডেকে এক দিন বললেও, 'হ্যাঁ গো, তোমরা কি ডাক্তার-বদ্যি দেখাবে না, আমি এমনি বেঘোরে মারা যাব?'

ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে-জড়িয়েই অভয়পদ সাড়া দেয়, 'ও, তুমি মরছ নাকি? তা তো জানতুম না।'

'তা জানবে কেন। তোমার আর কি, আমি মলেই তো তোমার সুবিধে। আমি কালো পেঁচী—আমাকে তোমার মনে ধরে নি, তা কি আর আমি জানি না। সেইজন্যেই বুঝি আমার চিকিচ্ছে করাচ্ছ না? মরতে তর্ সইবে না—আর একটা বিয়ে করে আনবে!'

'তা তো সত্যিই—নইলে আমার চলবে কি করে বল!'

পরক্ষণেই অভয়পদ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নিঃশ্বাসের শব্দ গভীর হয়ে আসে।

মহাশ্বেতা যেন কিছু বুঝতে পারে না। লোকটা তো সত্যি এত খারাপ নয় যা করা উচিত বলে মনে করে—তা তো কোনটা পড়ে থাকে না। তবে ওর এমন অসুখ দেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে কি করে?

শাশুড়ীও তেমনি নির্বিকার। তিনিও তো দেখছেন—কৈ কখনও তো বলেন না—যে একটা ডাক্তার ডাক্, কি হাসপাতাল থেকে এক মোড়া ওষুধ এনে খাওয়া। বরং আজকাল যেন একটু বেশী টিক্‌টিক্ করেন,—চলাফেরা সবেতেই টিক্‌টিক্। সন্ধ্যের পর বড়-একটা ঘরের বার হতে দেন না, ঘাটে যাওয়া তো একেবারে বারণ হয়ে গেছে, বাইরের কারুর সামনে পর্যন্ত যেতে না—তাতে নাকি নজর লাগবে। আর এক নতুন উপসর্গ হয়েছে, সন্ধ্যার

আগেই খোঁপাতে একটা খড়কে কাটি গুঁজে দেন। এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার বোঝে না মহাশ্বেতা। দু-এক দিন জিজ্ঞাসাও করেছে শাশুড়ীকে, জবাব পায় নি, মুখ টিপে হেসেছেন ক্ষীরোদা।

অবশেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সে শাশুড়ীর মুখের ওপরই বলে বসল, 'মা আমাকে একবার বাপের বাড়ি পাঠাবেন ?'

'তা কেন পাঠাব না বৌমা ? কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল কেন গা বাছা !'

'মনে হচ্ছে আর তো বেশী দিন বাঁচব না। শেষ দেখা দেখে আসি মুখখানাকে যতটা সম্ভব গিন্নীবান্নীর মত গম্ভীর করে বলে মহাশ্বেতা।

'ষাট্ ! ষাট ! ওমা ও কি অলুক্ষুণে কথা গা বৌমা। ষাট্ - তুমি মরতে যাবে কি দুঃখে মা ? ষাট ! ষাট্ ! অ মেজবৌমা পাগলীর কথা শুনে যাও মা

প্রমীলা এসে দাঁড়ায় কিন্তু কোন কথা কয় না। মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে হাসে। মহার হাড় জ্বালা করে ঐ হাসি দেখলে !

সে বলে, 'আপনাদের আর কি মা—একটা বৌ যাবে আর একটা আসবে। আমি তো আমার শরীর বুঝি ! কিছুই পেটে তলাচ্ছে না - এমন করে ক দিন বাঁচব ? মার কাছে গিয়ে পড়লে মা যেমন করেই হোক—ধার দেনা করে, ভিক্ষে করেও ডাক্তার দেখাবে ! তার তো আমি বড় মেয়ে !'

শাশুড়ী রাগ করেন, 'সে দরকার বুঝলে আমরাও দেখাব বৌমা। কিন্তু ডাক্তার দেখাবার মত হয়েছেই বা কি ? এ অবস্থায় বমি হবে না ? এ আবার কি ছিষ্টিছাড়া কথা বাছা ?'

মাথাটা আরও গুলিয়ে যায় মহাশ্বেতার। সে কিছুই বুঝতে পারে না— ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে থাকে। হয়তো আরও কিছুই বলত কিন্তু প্রমীলা ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। তার পর গলায় আঁচল দিয়ে ওকে বার বার নমস্কার করে, 'ধন্যি বাবা ধন্যি ! এই গড় করি তোমার পায়ে। সত্যি দিদি, তোর জন্যে আমি কোন্‌দিন হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাব !'

আরও রেগে যায় মহাশ্বেতা।

কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষ মাস—এদের হয়েছে তাই। তার এত বড় একটা অসুখ হয়েছে—অন্য কারুর হলে তো ছুটোছুটি পড়ে যেত—এরা সবাই মিলে এমন করছে যেন কি একটা হাসির ব্যাপার।

'আ মর্। অমন করিস্ কেন ? আমার যা হয়েছে তা আমিই বুঝি ! আমি মরব বলে তোদের সবাইকার ফুর্তি পড়ে গেছে খুব—না ?'

'তোর কি হয়েছে তাই বল্ তো দিদি?' কোনমতে জিজ্ঞেস করে মুখে কাপড় গুঁজে দেয় প্রমীলা। ছুটির দিন, ভাসুর বাড়িতে আছেন, বাগানে খুট্ খুট্ করে কি কাজ করছেন। ভাদ্র-বৌয়ের চটুল হাসির শব্দ ভাসুরের কানে যাওয়া বড় নিন্দের কথা।

'কী হয়েছে তাই যদি জানব তো আর ভাবনা কি। তবে মরতে চলেছি এটা তো বুঝি! যা খাচ্ছি উঠে যাচ্ছে, কী খেয়ে বাঁচব বল্। ছেলেবেলা শুনেছি পিঁট্কীব অমনি হয়েছিল। কোন্ দরগা থেকে জলপড়া এনে খাইয়ে দিতে পেট থেকে দুটো এত বড় বড় কিরমি বেবিয়ে গেল—তবে ভাল হল। আমারও বোধ হয় তাই হয়েছে।·· এরা তো কথাটা গেরাহ্যি করে না, হেসেই উড়িয়ে দেয়। নইলে না হয় আনারসের গর্ভপাতা রস করে খেতুম—শুনেছি ওতে কিরমি বেরিয়ে যায়। খাব নাকি, হ্যাঁলা মেজ বৌ?'

'হ্যাঁ, তা খাবে না! নইলে আর চলবে কেন! তা হলে শাশুড়ীতে আর তোমার মায়েতে মিলে জ্যান্ত পুঁতবে উঠোনে।'

কথাটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার কাছে। সে ক্যাস্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

অকস্মাৎ প্রমীলা উনুনের পাড় থেকে ছোট একটা মাটির ডেলা ভেঙে ওর হাতে দিয়ে বলে, 'খাবে দিদি?'

'মাটি খাব কি লো?'

'খেয়ে ছাখ না। আচ্ছা, গন্ধটা শুঁকে ছাখ—খেতে ইচ্ছে করবে।'

আস্তে আস্তে নাকের কাছে ধরে মহাশ্বেতা। বেশ লাগে গন্ধটা।

'সত্যিই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে যে লো!'

'খেয়ে ছাখ না। ভাল লাগবে।'

একটু ভেঙে মুখে দেয় সে। বেশ লাগে। ক্রমে ক্রমে সবটাই খেয়ে ফেলে। ছেলেমানুষের মত সকৌতুক ঔৎসুক্যে চেয়ে থাকে প্রমীলার মুখের দিকে।

আর এক বার হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে প্রমীলা।, তার পর হাসির ধমক থামলে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পার না?'

মহাশ্বেতার এবার যেন কি একটা সন্দেহ হয়। এরা সবাই এমন করছে তার মানেটা কি? তবে কি তার আচরণ সত্যিই হাস্যকর হয়ে উঠেছে? সে কি আবারও কিছু বোকামি করছে?

প্রমীলা ইতিমধ্যে বেশ ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে। দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী, স্বরূপা না হলেও সুশ্রী। বেশ চটক আছে ওর চেহারায়। মহাশ্বেতা বেঁটে। প্রমীলার চেয়ে অনেকখানি মাথায় নিচু। প্রমীলা হঠাৎ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে, 'ওগো নেকী, তোমার ছেলে হবে —ছেলে! বুঝেছ?'

অকস্মাৎ চোখের ওপর থেকে কালো পর্দাটা সরে যায় মহাশ্বেতার। এক ঝলক আলো—আশারও বটে, সুখেরও বটে। এক সঙ্গে যেন কানের কাছে অনেকগুলো বাজনা বেজে ওঠে—আনন্দের একটা দম্‌কা বাতাস বয়ে যায় মনের ওপর দিয়ে।

ছেলে হবে ওর? ছেলে?

কিন্তু এ কি সত্যি। এবার ওর শাশুড়ীর আচরণ, স্বামীর নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য, প্রমীলার হাসি—সবেরই একটা অর্থ খুঁজে পায় সে।

তবু সংশয়ও ঘোচে না। সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, 'তুই কি করে জানলি? তোর তো হয় নি!'

'আ মর্! আর কারুর দেখি নি বুঝি? আমার ভাই বোন নেই? কাকী জেঠি পিসী—আমাদের তো রাবণের গুষ্টি।·· তোমারও তো মায়ের অনেকগুলো হয়েছে। তাঁর অরুচি হয় না? গ্যাখ নি কখনও?'

'অ—মানে ঐ বমি?' একটু থম্‌কে ভেবে নেয় মহাশ্বেতা, 'না, মা দুটো-একটা দিন বমি করে বটে দেখেছি। কিন্তু সে কি এই জন্যে? কে জানে! কৈ, বেশী বমি-টমি করে না তো আম্মার মত!'

'সকলের কি হয়? এই আমার ছোট পিসী—মোটে কিচ্ছু হয় না। আমরা টেরই পাই না।'···

প্রমীলা আরও বহু গল্প করে। মহাশ্বেতা হাঁ করে শোনে—যেন গেলে কথাগুলো।

যাই বল বাপু, মেজ বৌ জানে ঢের। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে।···

সেদিন রাত্রে কি ভাগ্যি মহাশ্বেতা যখন শুতে গেল অভয়পদ তখনও জেগে। পিদিমের আলোতেই কী একটা করছিল খুট্‌খাট করে। দুজনে প্রায় একসঙ্গেই শুল।

এমন দুর্লভ সুযোগ কদাচিৎ আসে। স্বামীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে

একথা সেকথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ গো, একটা কথা বলব রাগ করবে না? আচ্ছা মেজ বৌ যা বলছিল তা কি সত্যি?'

'কী বলছিল মেজ বৌমা?'

তবু কথাটা বলতে পারে না চট্ করে মহাশ্বেতা। স্বামীর দাড়ির একটা প্রান্ত ধরে টানাটানি করে।

'কি গো—বললে না?' অভয়পদই তাগাদা দেয়।

'মেজ বৌ বলছিল, আমার—আমার নাকি ছেলেপুলে হবে?'

'ও, বলছিল বুঝি? তোমার কি মনে হয়?' অভয়পদ মুখ টিপে হেসে প্রশ্ন করে।

'জানি না, যাও।···আমি বোকা বলে তোমরা সব বুঝি মজা ছাখ, না? কেন, তুমি বলে দিতে পার নি?'

'আমি কি করে জানব, বা রে! এ বুঝি পুরুষের বলবার কথা?'

'তুমি সব জান। কেবল আমার সঙ্গে বদমাইশি কর।'

সে অভ্যাসমত স্বামীর দেহের খাঁজে মুখটা লুকোয়।

অভয়পদ সস্নেহে তার গায়ে একটা হাত রাখে শুধু—কিছু বলে না।

খানিক পরে আবার মুখ তুলে বলে মহাশ্বেতা, 'আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে বাপু, যাই বল!'

'ভয় কিসের। ছেলেপুলে তো লোকের হামেশাই হয়।'

তারপর হঠাৎ বলে বসে অভয়পদ, 'কিছু যদি খেতে-টেতে ইচ্ছে করে তো মাকে বলো।'

'হ্যাঁ বয়ে গেছে। মাকে বুঝি বলতে পারি? আমার লজ্জা-ঘেন্না নেই?'

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হ্যাঁ গো, কী হবে—ছেলে না মেয়ে?'

'তা কি জানি।'

'ছেলে হয় তো বেশ হয় ···কিন্তু মেয়েই বা মন্দ কি? সকাল করে কুটুম হয়—কি বল?'

কিন্তু ততক্ষণে অভয়পদ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। ওর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দেই বুঝতে পারে মহাশ্বেতা। সেও একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফেরে। এ দুঃখের নিঃশ্বাস নয়—বরং বলা যেতে পারে, তৃপ্তির, ভরসার নিঃশ্বাস। স্বামীর ওপর আজকাল ওর একটা ভারী ভরসা এসেছে। সবেতেই, সব অবস্থাতেই লোকটার ওপর ভরসা রাখা যায়, এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হয়েছে।

মহাশ্বেতা দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না। ওর সন্তান হবে, ও হবে মা—এ কথাটা এত দিন যেন কল্পনাই করে নি। আজ সব কথাটাই তার নতুন বোধ হচ্ছে, আশ্চর্য মনে হচ্ছে। মনে মনে যতই আলোচনা করে, ভবিষ্যতের যত ছবিই আঁকে—অবাক লাগে ওর। আনন্দে—? সবই কি আনন্দ? ওর যেন সত্যিই একটু ভয়-ভয়ও করে।

॥ ২ ॥

সাত বছরের মেয়ে মহাশ্বেতা এ-বাড়িতে এসেছে। ওর স্বামী অভয়পদর তখনই বাইশ বছর বয়স।

এ রকম অ-সম বিবাহ না দিয়ে ওর মা শ্যামার উপায় ছিল না। শ্যামার স্বামী নরেন একেবারেই অমানুষ। কতকগুলি সন্তান ছাড়া সে ইহজীবনে স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারে নি কিন্তু নিয়েছে ঢের। এখনও—দৈবাৎ যখন সে এসে পড়ে,—বলতে গেলে শ্যামার ভিক্ষান্নের সঞ্চয় থেকেও—চুরি বা জুচ্চুরি করে কিছু নিয়ে সরে পড়তে তার এতটুকু বাধে না। তাই তার আশ্রয়দাতা সরকারদের গিন্নী মঙ্গলা যখন এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, সে আর 'না' বলতে পারে নি। ভিখারীর আবাব বাছ-বিচার কি? একটা মেয়ে কোনমতে পার হয়ে যাচ্ছে—এই ঢের। শ্যামার ভয় ছিল—তবে সে অন্য কারণে—বয়স বেশী-কম নিয়ে মাথা ঘামানো তাব পক্ষে অকারণ বিলাস। সে শুধু ভেবেছিল নিজের অদৃষ্টের কথা, মা কালীর কাছে, সত্যনারায়ণের কাছে শুধু এই কথা বলেই মাথা খুঁড়েছিল—জামাই না অমানুষ হয়। মা কালী ঐটুকু মুখ তুলে চেয়েছেন—অমানুষ সে হয় নি। বরং বুদ্ধি বিবেচনা ঔদার্য প্রভৃতি বহু গুণ তার মধ্যে আছে। অমন জামাই পাওয়া সৌভাগ্য। বড় জামাইয়ের জন্যেই আজ সে খেতে পাচ্ছে—ছেলে হেমকে অভয়পদই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারই ভরসাতে মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার সুদ্ধ বিয়ে দিতে পেরেছে শ্যামা।

কিন্তু বয়স যা—সে তুলনাতে ঢের বেশী গম্ভীর, বেশী ভারিক্কী অভয়পদ। সুতরাং বাড়িতে এসে পর্যন্ত স্বামীকে ঠিক স্বামী বলে ভালবাসতে পারে নি মহাশ্বেতা। ভয়? হয়তো ঠিক ভয় নয়—গুরুজনের মত সমীহ করেছে। বিপদে ভয়ে ভরসা করেছে তার ওপর, জড়িয়ে ধরেছে পরম ও নিরাপদ আশ্রয় জেনে।

কিন্তু প্রেম-বিহ্বল আকুলতাতে স্বামীকে আলিঙ্গন করা যে কি তা মহাশ্বেতা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না।

স্বামী শাশুড়ী সবাইকেই সে সমীহ করে এসেছে। বাপের বাড়িতে মা, সরকারগিন্নী বার বার এই উপদেশই দিয়েছেন, 'সকলকার কথা শুনবি, কাজকর্ম করবি, শাশুড়ীর সেবাযত্ন করবি—যেন শ্বশুরবাড়িতে দুর্নাম না হয়। আমরা তা হলে মুখ দেখাতে পারব না। শ্বশুরবাড়ি নিন্দে হলে আগে বাপ-মার ওপর টান পড়ে। বলবে মা-মাগী কিছু শেখায় নি, মেয়েটাকে ধিঙ্গি বেহায়া ট্যাঁটা করেছে!'

সে-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে। বালিকা বধূ তাই কোনদিনই গৃহিণী হবার সুযোগ পায় নি। বয়স বেড়েছে, যৌবন যথাসময়ে তার কাজ করে চলে গিয়েছে—কিন্তু সে শুধু দেহেরই ওপর। মন আজও বালিকা আছে। আজও আছে তার চোখে সেই প্রথম দিনের অসীম কৌতূহল এবং অগাধ বিস্ময়। আজও ঘোচে নি তার পরনির্ভরতা এবং ভয়ের ভাব। এমন কি তারই চোখের সামনে—তার অনেক পরে মেজ জা প্রমীলা এসে কেমন সহজভাবে তাকে ডিঙিয়ে অনায়াসে, জ্যেষ্ঠার মর্যাদা—প্রায় গৃহিণীর মর্যাদাতেই কখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা জানতেও পারে নি মহাশ্বেতা। অথচ সেটা যে খুব প্রীতির সঙ্গে বা অনায়াসে মেনে নিয়েছে সে তাও তো নয়। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে নি, প্রতিকারও করতে পারে নি —ছেলেমানুষের মত আড়ালে আমড়াগাছ বা পুকুর পারের সুষুনি লতাগুলোকে শুনিয়ে মনের নিষ্ফল ও নিরুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করেছে মাত্র—আর কিছুই করতে পারে নি।

সুতরাং আজ যদি তার সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদটা তাকে পরের মুখ থেকে সংগ্রহ করতে হয় তো দোষ দেওয়া যায় কি?

এর পরেও কয়েকদিন ধরে যেন বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে না মহাশ্বেতার। বরং বলা চলে সে-ই কাটতে দিতে চায় না। সংবাদটার অভাবনীয়তাটুকু যেন চেখে চেখে একটু একটু করে অনুভব করতে চায় সে।

এমনভাবে অনুভব করার আর একটা কারণও আছে। সে যেন এর ভেতর—কতকটা নিজের অবচেতনেই—একটা প্রতিহিংসার আনন্দও টের পায়।

প্রমীলা সবেতেই তাকে ডিঙিয়ে গেছে—এটা ঠিক। কিন্তু এই একটা দিকে তো পারল না। তার পেটেই প্রথম সন্তান এল, বংশের প্রথম সন্তান। আর, আর যদি—ভাবতেও যেন ভরসায় কুলোয় না, এত সৌভাগ্য কি সত্যিই কোন দিন হবে তার?—যদি ছেলে হয় তা হলে তো কথাই নেই—ভবিষ্যৎ-কালে সে-ই হবে বাড়ির কর্তা। উত্তরপুরুষের সে-ই হবে জ্যেষ্ঠ!

আর সেই জ্যেষ্ঠের, সেই বাড়ির কর্তার—মহাশ্বেতাই হবে মা। প্রমীলা নয়।

মহাশ্বেতা আজকাল সন্ধ্যাব সময় ঠাকুরঘরের বন্ধদ্বারের (এ বছর ওদের পালা নয়, জ্ঞাতি ভাসুরদের পালা—তাই ওদের দিকের দরজা এখন বন্ধই থাকে) সামনে পিদিম রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে, ঠাকুরকে ডাকে—ঠাকুর আমার একটা ছেলে দাও, যেমন করে হোক ছেলে দাও। মেজ বৌ-এর থোঁতা মুখ ভোঁতা হোক্!

বিধিনিষেধগুলো বেশী করে মানে সে। সন্ধ্যাবেলা উঠোনে পর্যন্ত নামতে চায় না। যদি কিছু ভালমন্দ একটা হয়? বাপ্ রে!

॥ ৩ ॥

শাশুড়ী পাড়ার একটি বয়স্কা স্যাকরাদের বৌকে দিয়ে খবর পাঠালেন। বোধ হয় বেয়ানকে অপ্রস্তুত করার একটা গোপন অভিসন্ধি ছিল তাঁর। নইলে অম্বিকা এমন কি দুর্গাপদকে দিয়েও খবর পাঠাতে পারতেন। কিন্তু শ্যামা এ ইঙ্গিত বোঝে, সেও ঠক্‌বার মেয়ে নয়। স্যাকরা-বৌকে দাওয়ায় বসিয়ে ছুটে গিয়ে মঙ্গলাকে খবরটা দিয়ে আট আনা পয়সা ধার করে আনে। সরকার গিন্নীও বিনা ওজরে আধুলি একটা বার করে দেন। একে তো আনন্দের খবর—খুবই আনন্দের, মঙ্গলাই ঘটকালি করেছিলেন এ বিয়ের—সে জন্য তিনি একটু গৌরবও অনুভব করেন এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝেন যে কুটুমের কাছে কোনমতেই ছোট হওয়া চলবে না,—তার ওপর আজকাল আর শ্যামা ঠিক সেই আগের নিঃস্ব পুজুরী বামুনের বৌ নেই। ওঁদের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকে, ওঁদের বিগ্রহের পূজা করে ঠিকই—এখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে বাগানের ফলপাকুড় ঝ্যাটাকাটি বেচে খায় এও ঠিক—তবু হেম রোজগার করে এখন, ধার দিলে পয়সা তাড়াতাড়ি আদায় হবে—এ বিষয়ে ও

তিনি নিশ্চিন্ত। 'এই একটা গুণ আছে বামনীর—তাগাদা করতে হয় না—মনে করে শোধ দিয়ে যায়।' মেয়েকে শুনিয়ে আজও একবার কথাটা বললেন মঙ্গলা।

পয়সা আট আনা চেয়ে এনে সবটাই স্যাক্‌রা-বৌয়ের হাতে দেয় শ্যামা।

'এ আবার কেন আবুই মা, এ আবার কেন?' বার দুই বলে স্যাক্‌রা-বৌ।

'ওমা সে কি কথা। আনন্দের খবর দিলে, সুখবর! এ তো তোমার পাওনা বাছা। ছেলেপুলেদের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও।'

তাই বলে তাকেও অমনি ছাড়ে না শ্যামা। আগের দিনই কারা যেন মানসিকের পূজো দিয়ে গেছে ঠাকুর-ঘরে, সেই দুটি মোণ্ডা তোলা ছিল সযত্নে। দুই জামাই হবার পর এই ধরনের মূল্যবান মিষ্টি কিছু এসে পড়লে প্রাণে ধরে শ্যামা তা ছেলেমেয়েদের তখনই খেতে দিতে পারত না। যদি কেউ এসে পড়ে তো মানরক্ষা হবে। একেবারে গন্ধ হয়ে গেলে বা ছাতা ধরে গেলে তবেই তা ছেলেদের ভাগ্যে জুটত। আজও সে দুটি কাজে লেগে গেল। দুটি মোণ্ডার সঙ্গে খানকতক বাতাসা একটা কলাপাতায় সাজিয়ে স্যাক্‌রা-বৌয়ের সামনে ধরে দেয় শ্যামা। সন্ধ্যা অবধি থেকে ভাত খেয়ে যেতেও অনুরোধ করে—কিন্তু স্যাক্‌রা-বৌ রাজী হয় না কিছুতেই।

'ওমা না না। সন্ধ্যের পর একা কখনও এতটা পথ যেতে পারি? আমাকে এখুনি উঠতে হবে মা, একটু পরেই চাক্‌রে বাবুরা ফিরতে থাকবে—তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া—সে বড় লজ্জার কথা মা! হাজার হোক এখনও তো বুড়ো-হাবড়া হই নি!'

শ্যামা মনে মনে হাসে। স্যাক্‌রা-বৌয়ের বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

'তবে যাও মা—কি আর বলব!'

একটা পানও সেজে দেয় শ্যামা। পানটা হাতে দিয়ে বিদায় দেবার সময় কুট্ করে একটা কামড় দিতে ছাড়ে না কিন্তু। মুচকি হেসে বলে, 'বেয়ানকে বলো মেয়ে—এমন সুখবরটা দিয়ে পাঠালেন তোমাকে শুধু-হাতে। তাঁর তো ছেলের ছেলে, আসল নাতি, বংশরক্ষের কথা—আমাদের জন্যে দুখানা বাতাসাও পাঠালেন না। পাড়ার লোককে কি বলব?'

অপ্রতিভ স্যাক্‌রা-বৌ ঢেকে নেয়, 'সে এখন কি গা আবুই মা—একেবারে ছেলে হবার খবর যখন আনব—তখন হাঁড়ি ভরে মিষ্টি আনব!'

ভাল দিন দেখে শ্যামা মেয়েকে আনতে পাঠায় হেমকে দিয়ে।

অনেক মতলব করেই পাঠায় সে। এখন না আনালে পরে আনাতে হবে অর্থাৎ আঁতুড় তোলার কাজটা তাকে সারতে হবে—এক রাশ খরচ। তার চেয়ে এখন দু মাস এনে রাখাই সুবিধা।

কিন্তু দেখা গেল ক্ষীরোদাও তার চেয়ে কম বোঝেন না, তিনি বললেন, 'এখন আর কেন—আবার দু-চার দিনের জন্যে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা। এখন এই অবস্থায় তো হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। পালকি করতে হবে, অন্তত আট গণ্ডা দশ গণ্ডা পয়সা খরচা। 'এখন পাঠালে আবার এই মাসেই আনতে হবে। সামনের মাস জোড়া মাস, তার পরই পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ, ভাজাসাধ —সব পর পর আসছে। আমি বলি কি, একেবারে ন-মাসে সাধ দিয়ে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। প্রথম পোয়াতি, মা'র কাছে গিয়ে বিয়োনোই ভাল। ছেলেমানুষ ভয়-টয় পাবে! আর সে তোমার মা'র মনও মানবে না নইলে…কেমন? মাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলো!'

অগত্যা হেম ফিরে আসে। শ্যামা সব শুনে গজ্ গজ্ করতে থাকে, 'মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্কোস! মাগী কম ফন্দবাজ!…দিলে বিয়েন-তোলার খরচাটি আমার ওপর চাপিয়ে!'

মঙ্গলা সব শুনে হা-হা করে হেসে ওঠেন।

'তা রাগ করিস কেন বামনী। তুইও তো সেই চাল চালতে গিয়েছিলি! সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি যে—অমনিই হয়।… নে মন খারাপ করিস নি। যা-হয় করে হয়েই যাবে। এখন সাধের কাপড়খানার যোগাড় দ্যাখ্। ওইখানেই সাধ দিক আর যাই করুক—তোকেও তো দিতে হবে একটা। সে শাশুড়ী মাগী ঠিক বুঝে নেবে এখন্। গিয়ে দাঁড়ালেই আগে প্যাড়া খুলবে—দেখি তোমার মা কি কাপড় দিলে বৌমা!'

তিনি আর এক দলা দোক্তা তাঁর মসীকৃষ্ণ মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করেন।

শ্যামার অঙ্গ হিম হয়ে যায় কথাটা শুনে। একখানা ভাল কাপড়—যেমন-তেমন করে হোক্—আড়াইটে টাকা দাম। তার ওপর পাঁচ ব্যান্নন করে খাওয়ানো আছে। আবার আঁতুড় তোলার খরচ।

মনে মনে একটা হিসাব করতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে শ্যামা।

॥ ৪ ॥

এ সংসারে কোন দুই পক্ষ যখন একই সুবিধার জন্য বিধাতার শরণাপন্ন হয়—তখন সাধারণত দেখা যায় বিধাতা এক পক্ষের প্রতিই প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন—অপর পক্ষ হতাশ হল। কিন্তু দৈবাৎ এর ব্যতিক্রমও হয় বৈকি! সেক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই মনস্কামনা পূর্ণ হয়—বঞ্চিত হয় কোন বেচারী তৃতীয় পক্ষ।

শ্যামা ও ক্ষীরোদার বেলাও তাই হল।

বিধাতা এক বিচিত্র কৌশলে দুই পক্ষকেই খুশী করলেন।

মহাশ্বেতার সেটা আট মাস—সবে আট মাসে পড়েছে সে। হঠাৎ এক দিন খবর এল ওর বড় ননদের খুব অসুখ—বাড়াবাড়ি চলছে। অফিস থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ, রাত্রে ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। অথবা ফেরবার মত অবস্থা থাকবে কিনা তা-ই বা কে জানে? সুতরাং অভয়পদ বলে গেল, 'আমাদের জন্যে বসে থেকো না মা—আজ রাতে খুব সম্ভবই ফেরা হবে না। মাকড়দার ওদিকে পথঘাটও ভাল নয়। বেশী রাত্তিরে না ফেরাই ভাল। সেই কাল ভোরে—অফিস যাবার সময়ে ফিরব। যদি খুব দেরি হয়ে যায় তো আমি সোজা অফিস চলে যাব, খোকা ফিরবে—ওর মুখেই খবর পাবে।'

অম্বিকাপদর অফিসের কাজ—সাড়ে নটায় ওর হাজরে। সে দাদার বেশ খানিকটা পরে অফিসে রওনা হয়। তা ছাড়া এখন গাড়ি হয়েছে—সে উনশানি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে। অভয়পদ চিরদিনই হেঁটে যায়—এখনও সে হাঁটা বজায় রেখেছে।

সে যাই হোক—বাড়িতে রইল এরা ক-টি প্রাণী। ক্ষীরোদা, মহাশ্বেতা এবং দুর্গাপদ। মহাশ্বেতা প্রসব হতে বাপের বাড়ি গেলে অন্তত চার-পাঁচ মাস আটকে পড়বে, এই অজুহাতে প্রমীলা একরকম ঝগড়াঝাঁটি করেই বাপের বাড়ি চলে গেছে। তাকে কোনমতে আটকাতে না পেরে প্রতিশোধস্বরূপ অম্বিকাপদ সুকৌশলে বোন বুড়ীকে ওর সঙ্গে দিয়েছে—অর্থাৎ বাপের বাড়ি যাতে বিষময় হয়ে ওঠে। গোপনে মাকে বলেছে, 'বুড়ীটার শরীর তো মোটে ভাল থাকছে না—ওকে মেজ বৌয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও না, একটু ঠাঁইনাড়া হয়ে আসুক?'

'ওমা—সে আবার বেয়াইরা কি মনে করবে! আচ্ছা, মেজ বৌকে বলে দেখি—'

তিনিও প্রকাশ্যে না বলে মেয়ে বুড়ীকে টিপে দিলেন। সে সোজা বায়না ধরল, 'আমি মেঁজবৌদির সঙ্গে যাঁব—মাঁ।'

'ওমা, ওমা, ও কি কথা রে। ও যাচ্ছে দুটো মাস জুড়োতে—তুই যাবি কি?'

অম্বিকাপদ ভেতর থেকে বললে, 'তা যাক না—ছেলেমানুষ বায়না নিচ্ছে। পরের বাড়িতে পাঠাতেই তো হবে দু বছর পরে। তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি ভাল-মন্দ খেয়ে শরীরটা সেরেই আসুক না। ও আর এত কি জ্বালাবে সেখানে?'

এই বলেই অম্বিকাপদ বেরিয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীর অগ্নি-দৃষ্টি অনুভব করলেও চোখ দিয়ে দেখে নি। এখন মাস-দুই দেখতে হবেও না,—সে নিশ্চিন্ত হয়েই কথাটা বলেছিল।

অগত্যা প্রমীলাকে বলতে হয়েছিল, 'তা চলুক না মা।…আমাদের অবিশ্যি গরীবের সংসার—সবাই তা জানে, তাই বলে অমন খোঁটা দিয়ে কথা বলবার কি আছে তাও জানি না। তবে হ্যাঁ—ভাল ভাত আমাদের সংসারেও খেতে পাবে। বাগানে ডুমুর-থোড়-মোচা-কাঁচকলারও অভাব নেই। বুড়ী চলুক না।'

'ওমা—সত্যিই যাবে নাকি?' যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন ক্ষীরোদা, 'তা যাক তা হলে। খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবি কিন্তু, সেখানে যেন চাট্টি নিন্দে কুড়োস নি!'

সুতরাং প্রমীলা বুড়ী কেউ নেই।

শাশুড়ী অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, 'যে দিনকাল, ঘরগুলো এমনি ফেলে রাখা ঠিক নয় বৌমা--কি বল? দুগ্‌গো না হয় মেজ বৌয়ের ঘরে শুক, তুমি তোমার ঘরে থাক—আমি এ ঘর চৌকি দিই!'

মহাশ্বেতার মুখ শুকিয়ে উঠল, 'আমার যদি ভয় করে মা—আমাশা মত হয়েছে—'

'ওমা, ভয়ের কি আছে মা?…এই তো গায়ে-গায়ে ঘর। ডাক দিলেই উঠে পড়ব। তুমি কিচ্ছু ভয় করো না বড় বৌমা, তুমি ঘর থেকেই ডেকো, আমি ঠিক উঠে যাব। আমার সজাগ ঘুম—।'

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে দোর দিয়ে শুয়েছিলেন।

মহাশ্বেতার ঘুম আসে নি। এতখানি বয়স পর্যন্ত কোন দিন তাকে একা শুতে হয় নি—না বাপের বাড়ি, না শ্বশুরবাড়ি। আজ একা শোবার প্রস্তাব থেকেই গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। বাইরে গাছের পাতা নড়লে মনে হয় কে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'আর তেমনি কি নানা রকম শব্দ এ পোড়ার দেশে!' আপন মনেই গজ্ গজ্ করে মহাশ্বেতা, 'ভাম আছে, ভোঁদড় আছে, কাঠবেড়াল আছে—ইঁদুর বেড়াল—নেই কি? জাজ্বল্যিমান সংসার! মুখে আগুন তোদের, কেবল সব শব্দ করে বেড়াবে!'

অবশেষে আর থাকতে না পেরে উঠে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠনটা জ্বালল—এটা নতুন সম্পদ ওদের ঘরে, পিদিম ঘুচেছে। অভয়পদ অফিস থেকে এনেছে গোটা-তিনেক, কেরোসিন তেলে জ্বলে। কিন্তু আলো জ্বালতে যেন আরও ভয় বাড়ে। মনে হয় জানলার পাশে বাইরে কারা সব দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চেয়ে, তারা দেখছে অথচ সে দেখতে পাচ্ছে না। মরীয়া হয়ে উঠে গিয়ে এক সময় জানলাটা বন্ধ করে দিলে। অসহ্য গরম, তা হোক—গরমে কিছু মানুষ মরে যায় না।···

কিন্তু জানলা বন্ধ করেও স্বস্তি পায় না। ঘরের মধ্যেই যেন কারা সব ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে মনে হয়। হেঁট হয়ে তক্তপোশের তলা দেখে। তাই কি ছাই—দেখবার জো আছে? যত রাজ্যের ডেয়ো-ঢাক্‌না, যার যা আছে আপদবালাই - সব এই ঘরে রাখবার জায়গা হয়েছে।···লাঠি দিয়ে এটা ওটা সরিয়ে দেখে। না, কেউ তো নেই বলেই মনে হচ্ছে।···

এরই মধ্যে একসময় পেটটা মুচড়ে ওঠে।

ওর যেন কান্না পেয়ে যায়।

বন্ধ দোরের ভেতর থেকে ডাকে, 'মা, ওমা—মা শুনছেন?'

ক্ষীরোদার 'সজাগ' ঘুম ভাঙে না।

তখন নিজের দোরেই গুম্ গুম্ করে ঘুঁষি মারে। এইবার শুনতে পান ক্ষীরোদা—তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে বাইরে আসেন, 'কি হয়েছে বৌমা, বাগানে যাবে?···চল না মা। দোরটা খোল।'

দোর খুলে যেন বাঁচে। কিন্তু বাগান থেকে ফিরে এসে আবার সেই সমস্যা।

ভয়ে ভয়ে বলে, 'এ ঘরে তো বিশেষ কিছু নেই মা। চাবি দিয়ে আমি আপনার কাছেই যাই না?'

'ওমা কিছু নেই—বল কি ?' শাশুড়ী অবাক্ হয়ে গালে হাত দেন, 'ছিষ্টির জিনিস রয়েছে যে! তা ছাড়া এই তো ডাকলে আর উঠে এলুম। এত ভয়েরই বা কি হয়েছে তাও তো বুঝি না। বেশ তো, লণ্ঠনটা না-হয় জ্বালাই থাক।··· তবে কমিয়ে দিও বৌমা, মিছিমিছি তেল নষ্ট।'

অগত্যা দোর বন্ধ করে এসে আবার শুয়ে পড়তে হয়।

প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করে চোখ বুজে ; না, ভয় কি ? সে ঘুমোবেই। রাম-রাম-রাম—দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা—রাম-রাম—

বোধ হয় শেষ অবধি ঘুমিয়েই পড়েছিল, অকস্মাৎ কি একটা বিকট আওয়াজে চমকে ঘুম ভেঙে গেল ওর—চিৎকার করে উঠে বসল।

চালটা কাঁপছে—। দরজা জানলার পাল্লাগুলোয় কে অমন করে লাথি মারছে— ?

ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যাবে নাকি মহাশ্বেতার ? প্রথম চিৎকারের পর ভয়ে গলা দিয়ে আওয়াজও বেরোয় নি আর। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে কাঠ হয়ে বসে ছিল।

ও, ঝড় উঠেছে। তাই বল !

মহাশ্বেতা হাঁপ ছাড়ে। দোর-জানলায় তারই আওয়াজ। গোঁ গোঁ করছে বাতাস চালের বাতা আর কপাটের খাঁজে খাঁজে। বাঁশ-বনে কট্‌কট্ করে উঠছে বাঁশগুলো—ভীষণ দুর্যোগ।

প্রথমকার ভয়টা কমলেও দুর্যোগের ভয়টা একটু একটু করে পেয়ে বসে ওকে। অভয়পদ যদি থাকত, তার বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে আরামে ঘুমোতে পারত সে। মুখে আগুন মুখপোড়ার, বোনের ওপর দরদ উথলে উঠল একেবারে !

ঝড় যেন বাড়তেই থাকে। গোঁ-ও-ও করে হাওয়ার দমক যখন আসে— মনে হয় ঘরটা কাঁপছে। চালাটা উড়িয়ে নিয়ে যায় যদি ? শাশুড়ী মাগী তো বেশ ঘুমোচ্ছে, ওর আর কি—পাকা ঘর, ছেলে আবার সেদিন সারিয়ে দিয়েছে—

ইস্ ! পেট্‌টা আবার মুচড়ে ওঠে দারুণ।

বাইরে এ কী কাণ্ড চলছে, যেন অনেকগুলো বুনো মোষ ক্ষেপে উঠেছে। বাগানে যাবে কি করে ? নারকেলের পাতাগুলো খসে পড়ছে—গাছই হয়তো কত উপড়ে ফেলবে—

কিন্তু আর থাকতেও পারে না সে। পেটটা বড্ড ব্যথা করছে। এবার হয়তো সে মরেই যাবে, ইস্—পেট কেটে কেটে দিচ্ছে যেন কে -

'মা ওমা. মা আমি মবে গেলুম যে—'

দুম-দাম কিল মারতে থাকে সে।

কিন্তু ঘুম ভাঙে না ক্ষীবোদাব। অথবা ঝড়েব আওয়াজে শুনতে পান না।

'মা আমি মরে যাব যে—কেউ জানতেও পারবে না। ওমা—'

মরীয়া হয়ে, যন্ত্রণায় থাকতে না পেবে দোব খুলে বেরিয়ে আসে সে। পাগলের মত শাশুডীব দোবে ঘা মারতে থাকে।

দেখতে দেখতে জলেব ছাটে ওর গা মাথা ভিজে ওঠে। বাইরে প্রলয় কাণ্ড চলছে। লক্ষ লক্ষ অগ্নিময় সর্পশিশু ছুটোছুটি করছে আকাশে—নীচে মত্ত মাতালেব মত বাতাসেব চলছে দাপাদাপি।

'মা, ওমা—'

ক্ষীরোদা শশব্যস্তে দোর খোলেন।

'ওমা, এ কি মা। এসো এসো। ইস্ ভিজে গেলে যে মা। আলোটা—তাই তো, দেশলাইটা আবার কোথায় ফেললুম দ্যাখ। অ দুগ্‌গো—এ আবার কি বিপদ হল—'

'মা, বড্ড—বড্ড পেট ব্যথা কবছে, আমি আর দাঁডাতে পারছি না। উ—মাগো মরে গেলুম –'

ধনুকের মত বেঁকে ঝুঁকে পড়ে সে সামনে—

'তুমি ভেতবে এসো বৌমা, নইলে এখানেই বরঞ্চ বসে পড় মা, আমি মোক্ত করব এখন—এই ঝড়ে মাঠে আর যায় না—'

কিন্তু কোথাও বসবার আগেই এক বিপর্যয় ঘটে যায়।

কি যে হয় তা বুঝতে পারে না মহাশ্বেতা। ওটা কি পড়ল!

'মা –গো!'

অসহ আর্তনাদ করে ওঠে মহাশ্বেতা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা বিদ্যুৎ স্ফুরণে ক্ষীরোদাও দেখতে পান।

'ওমা, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল মা! তোমার যে ছেলে পড়ে গেছে। অ দুগ্‌গো!'

সে চিৎকারে দুর্গাপদরও ঘুম ভাঙে। সে ছুটে বেরিয়ে আসে।

'ওরে শিগ্‌গির, ঐ তোর বড়দার ঘরে আলোটা আছে—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।'

মহাশ্বেতার সব চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তখন। কি এক মহা শান্তি ও শ্রান্তিতে হাত-পা অবশ হয়ে এলিয়ে আসছে। সে টলে পড়ে যাচ্ছিল, অন্ধকারেই কেমন করে বুঝতে পেরে ক্ষীরোদা বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাড়াতাড়ি।

'আহা তাই তো মা। তুমি এখানে এই খানটায়—এই মেঝেতেই শুয়ে পড়।'

কোনমতে ওকে শুইয়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে শিশুটাকে তুলে নেন কোলে। ততক্ষণে দুর্গাপদ আলো নিয়ে এসেছে। আটমাসের অপুষ্ট শিশু, তার ওপর মাথায় চোট্‌ লেগেছে পড়বার সময়। তবু কিন্তু প্রাণ আছে মনে হচ্ছে।

'ওরে অ দুগ্‌গো—দাইকে ডাকার কি হবে বাবা?'

'সে আমি পারব না। এই ঝড়জলে! আর সে-ই বা আসবে কেন?'

তাও তো বটে।...

সেই ভাবেই কাটল বাকী রাতটুকু। মহাশ্বেতা মেঝেতে পড়েই অঘোরে ঘুমোতে লাগল আর ক্ষীরোদা শিশুটাকে বুকে করে বসে রইলেন। মহাশ্বেতাকে একটা শুকনো কাপড় পরাবার কথাও তাঁর মনে পড়ল না।

শেষরাত্রে ঝড় থামতে দুর্গাপদ গিয়ে দাই ডেকে আনল। তখন ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে গরম জল চাপালেন। আঁতুড় ঘরেরও ব্যবস্থা হল—ছেঁড়া মাদুরের ওপর একটা ছেঁড়া কাঁথা পেতে।

দুর্গাপদ তারই ফাঁকে দাইকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে শশীর মা, খোকা না খুকী?'

'খোকা হয়েছে গো ছোড়দা, খোকা।' এক রাশ পান-দোক্তার মধ্যে থেকে কোনমতে উত্তর দেয় শশীর মা।

'বেঁচে যাবে তো?'

'কেন যাবে না! ষাট্‌ ষাট্‌—ও কি অলুক্ষুণে কথা? তবে শশীর মা আছে কী করতে! বলি তোমরাও তো ক-ভাইবোন এই শশীর মার হাতেই—'

তা সত্যিই শশীর মা তার হাতযশ দেখালে। ভোরবেলা অভয়পদ যখন এসে পৌঁছল তখন ক্ষীণ হলেও—শিশুকণ্ঠের কান্না পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, ওঁয়া-ওঁয়া—ওঁয়া-ওঁয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

মহাশ্বেতার যে এক মামাশ্বশুর আছেন, সেটা বিয়ের দিন থেকেই আকারে-ইঙ্গিতে শুনে আসছে সে। আকারে-ইঙ্গিতে বলাও হয়তো ভুল, স্পষ্ট উল্লেখযোগ্য শুনেছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই দেখেছে যে কথাটা চেপে যায় সবাই। অভয়পদ যদিও কোনও দিনই নাম করে নি—এক বারও না, কিন্তু ক্ষীরোদা করে ফেলেছেন—আর কববার সঙ্গে-সঙ্গেই, মহাশ্বেতা দেখেছে যে তার মুখখানা কেমন হয়ে যায়, কথাটা ঘুরিয়ে নেন তৎক্ষণাৎ। ব্যাপারটা বোঝে না সে—অবশ্য এর ভেতর যে বোঝবার কিছু আছে তাও হয়তো মহাশ্বেতা কোনদিন বুঝত না যদি না প্রমীলা তাকে বুঝিয়ে দিত। সে-ই প্রথম বলে, 'হ্যাঁরে দিদি—কী ব্যাওরাটা বল্ দিকি এদের? মামার নাম করে না কেন? নাম যদি বা মা করে ফেলেন, পুরুষরা কী রকম কট্‌মট্ করে চায় মার দিকে তা দেখেছিস? অম্‌নি যেন মা গুটিয়ে এতটুকু হয়ে যান, কেন্নোর গায়ে হাত লাগার মত অবস্থা হয়। কেন বল্ দেখি!'

মহাশ্বেতা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে। সত্যিই তো—এ কথাটা তো কোনদিন ওর মাথায় যায় নি। মেজবৌটার বুদ্ধি কিন্তু খুব, পুরুষমানুষ হলে লেখাপড়া শিখে 'জজ মেজেস্টার' হত! সে সপ্রশংস মূঢ় দৃষ্টিতে মেজবৌয়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলে, 'তা কি জানি—কেন বল্ না!'

'তাই যদি জানব তা হলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করব কেন? বট্‌ঠাকুরকে শুধিও না এক বার কথাটা। আমাদের এ মিন্‌সেকে বললে চোখ পাকিয়ে বলে—সব তাতেই তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকারটা কি? মামা আছে এক জন এই পর্যন্ত। আমার বাবার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বনত না—যাওয়া-আসা নেই তাই· এই বলে উড়িয়ে দেয়, বোঝ না? যাওয়া-আসা নেই তো—বিয়েতে নেমন্তন্ন করে কেন?'

'নেমন্তন্ন করে বুঝি?' মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কৈ, এসেছিল তোর বিয়েতে?'

'নেকু! বাড়িতে থাক তুমি, খবর রাখ না? আমি তো নতুন বৌ, বৌ সেজে বসে আছি, আমি জানব কেমন করে? তবু আমি খবর রেখেছি। তোমার বিয়েতেও তো কবা হয়েছিল। কখনও আসে না, কে এক জন সরকার না গোমস্তাকে পাঠায়। তা তোমার বিয়েতে নাকি একটা টাকা ঠক্ করে দিয়ে গিয়েছিল—আমার ভাগ্যি ভাল—আমাকে মুখ-দেখানি দিয়েছিল চার টাকা। সেই কথা নিয়ে ভাসুরে আর শাশুড়ীতে কথা হচ্ছিল, ওরা বলছিল, আগের বার হয়তো সে লোকটাই কিছু সরিয়ে থাকবে, তাই তো আমি শুনলুম!'

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই তো! মহাশ্বেতার মনে পড়ে যায় কথাটা। কে এক জন তাকে একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল বটে, তখন অতটা সে খেয়াল করে নি। শুনেছিল কলকাতার কে এক আত্মীয়—এই পর্যন্ত।

'ও, তা হলে সে-ই মামাশ্বশুরের লোক!'

'হ্যাঁ গো সীতে—সে-ই!' প্রমীলা হেসে লুটিয়ে পড়ে, 'তুমি কোন্ জগতের লোক দিদি, তাই ভাবি।'

'নে বাপু, তোর রঙ্গ রাখ। অত-শতয় কী দরকার আমার!' মহাশ্বেতা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন সে করেছিল ঠিকই। এক দিন অভয়পদর জেগে থাকার এক দুর্লভ সুযোগে সে কথাটা বলেই ফেলেছিল, 'আচ্ছা তোমাদের তো এক মামা আছেন, না? তা তোমরা মামার বাড়ী যাও না কেন?'

'কেন বল দেখি—হঠাৎ এ খোঁজ!' অভয়পদর প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে একটুখানি কি কৌতূহল ধরা পড়ে?

পড়লেও মহাশ্বেতার তা টের পাবার কথা নয়, সে পায়ও না। সে বলে, 'না তাই বলছি। শুনি কিনা—এক জন আছেন, অথচ তোমাদের তো কখনও যেতে দেখি না। তাঁরাও তো আসেন না!'

'কথাটা কি তোমার মাথাতেই গেছে বড় বৌ...'

'মাথাতে যাওয়া-যাওয়ির আর আছে কি? সোজা কথা জিজ্ঞেস করছি, পছন্দ হয় উত্তর দিও, না হয় দিও না।'...রাগ করে বলে মহাশ্বেতা, 'মেজবৌও বলছিল বটে—'

'তাই বল!' অভয়পদ হাসে একটু, তার পর বলে, 'যাই না, আসা-যাওয়া নেই। নিজেদের দুঃখের ধান্দায় ঘুরব, না অত দূর উজোন ঠেলে যাব!'

'তা কৈ, তাঁরাও তো আসেন না!'

'বড়লোক আর কবে গরীব আত্মীয়ের খবর নেয় বল!'

'তাঁরা বুঝি খুব বড়লোক?'

'খুব!'

খানিকটা চুপ করে থাকে মহাশ্বেতা। তার পর বলে, 'বড়লোক তো তোমাদের কিছু দেয় না কেন? তোমাদের অভাব তো! আমাদেরও তো গয়নাগাঁটি দিতে পারত!'

'অত দিলে থুলে কি বড়লোক হতে পারে মানুষ? পয়সা জমালেই বড়লোক হয়!'

যুক্তি অকাট্য—অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল।

কিন্তু অত সহজে ভোলে নি প্রমীলা। মহাশ্বেতার মুখে কথাগুলো শুনে বলেছিল, 'উহুঁ। কথাটা অত সোজা নয় ভাই, তা তুই যতই বলিস। এর ভেতর আরও কথা আছে।'

'আবার কি কথা থাকবে?' অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'আছে বাবা, আছে। সে আমি ওদের ঐ ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব দেখেই বুঝতে পারি। আচ্ছা আমিও রইলুম—মামাশ্বশুরও রইল। এক দিন আমি কথাটা বার করবই। আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।'

তবু কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এসব মহাশ্বেতার ছেলে হওয়ার আগেকার কথা। ছেলের অন্নপ্রাশনে ঘটা হয় নি—দেইজিদের বাড়ি আর পাড়া-ঘরে বলা হয়েছিল দু-চার জনকে। অপুষ্ট রুগ্‌ণ ছেলে, বারো মাসই ভোগে। ওর ওপর কারুর আশা-ভরসা নেই। নেহাত নিয়ম-রক্ষা করা তাই। সুতরাং সেক্ষেত্রে মামাশ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্নই ওঠে নি।

তার পরও কথা তোলবার ফুরসুত পায় নি মহাশ্বেতা। কারণ ছেলে হবার পর থেকে স্বামী তার কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সাধ্যমত অভয়পদ সে-ঘরে শোয় না। ওদিকে একটা আধ-চালা মত করে নিয়েছে—গরমের সময় সেইখানে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোয়। বেঞ্চিটাও নিজে তৈরী করেছে—কতকগুলো ভাঙা কাঠ জোড়া দিয়ে। হঠাৎ ঝড় জল হলে

কোনদিন ঘরে আসে—নয়তো বেঞ্চিটা তুলে নিয়ে চলনে এসে শোয়। মহাশ্বেতা অনুযোগ করলে বলে, 'যা তোমার ছেলের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি—খাটখুটি, ঘুমটা ভাল না হলে চলে ?'

মহাশ্বেতার কান্না পায় যেন। এর চেয়ে—ওর মনে হয়—ছেলে না-হওয়া ভাল ছিল। ছেলে তো ভারি—এক-এক সময় হতাশ হয়ে পড়ে সে। এ ছেলে কি বাঁচবে শেষ অবধি, কোনদিন মানুষ হবে ?

এক-এক দিন ছেলেকে নিয়ে সারারাত জেগে বসে থাকতে হত। কিন্তু আশ্চর্য, সে-সব রাতগুলোতে যেন ঘুমের মধ্যেও টের পেত অভয়পদ—ওর অবস্থাটা। না ডাকতেই এসে বলত, 'তুমি একটু গড়িয়ে নাও, আমি বসছি ওর কাছে।' কিংবা কোনদিন ঝড় উঠলে, কি বড় রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে গেলে—ঠিক উঠে এসে নিচু গলায় ডাকত, 'বড় বৌ, ভয় পেও না। আমি জেগে আছি।' ঝড়ের সময় সোজাসুজি ঘরে এসেই শুত। ওর রকম-সকম দেখে মহাশ্বেতার এক-এক সময় সন্দেহ জাগত—লোকটা কি তা হলে জেগেই থাকে সারারাত ? ··

যাই হোক—এর ভেতরেই হঠাৎ এক দিন মামাশ্বশুরের কথাটা উঠল! কারণটাও বড় অদ্ভুত।

রাজা আসবেন, রাজা আসবেন, চারিদিকে রব উঠেছে। কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগবে। বাংলার লড়াই মিটেছে—জয় হয়েছে বাঙালীরই, তাদেরই জেদ বজায় থেকেছে। সেই উপলক্ষে নতুন রাজা—মহারাণীর নাতি —ভারতবর্ষে আসবেন, কলকাতাতেও আসবেন। মহারাণীর বড় নাতি নন —তিনি মারা গেছেন। বিয়ের সব নাকি ঠিক-ঠাক, এমন সময় মারা যান বেচারী, সেই কনের সঙ্গেই এই নতুন রাজার তখন বিয়ে হয়। কনে এসে গিয়েছিল—তখন তো আর তাকে ফেরত দেওয়া যায় না। আরও কত কি গল্প—কেন কনেকে ফেরত দেওয়া গেল না, সে সম্বন্ধে মনগড়া অবাস্তব যত কাহিনী। কত কথাই যে মানুষের উর্বর মাথায় গজিয়ে উঠল। রাজা নাকি বাঙালীদের বড় ভালবাসেন ('ভারতীয়' শব্দের তখন ব্যবহার ছিল না, ব্যাপক অর্থেও বাঙালীকে বোঝাত, আবার হিন্দু শব্দের বদলেও বাঙালী কথার ব্যবহার ছিল), তিনি এখানেই থাকতে চান। কিন্তু তা হলে বিলেতে চলবে না। তাই তারা আসতে দিতে চায় না। অনেক বলে কয়ে এবার রাজা আসতে পেরেছেন। আমাদের ভালবাসেন বলেই সাহেবদের রাগ- তাতে

নাকি তাদের ইজ্জৎ থাকে না। এইসব নানা অবান্তর এবং অসম্ভব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে এই সুদূর পল্লীগ্রামের ডোবার জলেও যেন তরঙ্গ তুলেছে, এখানকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কূপমণ্ডুকের জীবনেও জাগিয়েছে বহির্বিশ্বের কৌতূহল।

রাজাকে দেখতে হবে।

এ দুর্লভ সুযোগ ছাড়া হবে না। আর কি এ সুযোগ মিলবে?

কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থাকেন এই রাজা। দয়াময়ী মহারাণীর নাতি। এর আগে আর কোন রাজা এদেশে আসেন নি। এঁর বাবা এক বার এসেছিলেন, তবে তখনও তিনি রাজা নন—যুবরাজ মাত্র। তাও সে বহুকালের কথা—মহাশ্বেতার জ্ঞানে দেখে নি, হয়তো জন্মেরও আগে। তা ছাড়া শুধু তো রাজা দেখাই নয়—রাজা আসা উপলক্ষে শহর সাজানো হবে—আলো দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের অন্য রাজা-রাজড়ারাও এখানে আসবেন। রাজধানী জায়গা, এখানে এসেই মহারাজারা সেলাম জানাবেন তাঁদের রাজচক্রবর্তীকে। তাঁদেরও দেখা পাওয়া যাবে—সেই বা কম কথা কি? লোকে বলে রাজদর্শনে মহাপুণ্য।

মহাশ্বেতা যে মহাশ্বেতা—সে-ও বায়না ধরে বসল, 'আমাদের বাপু রাজা দেখাতে হবে, তা বলে রাখছি।'

অভয়পদ চমকে ওঠে, 'পাগল নাকি? সেই ভিড়ে তোমরা কোথা থেকে দেখবে? গোটা দেশটা ভেঙে পড়বে ক দিন কলকাতায়। তার মধ্যে আমরা কেমন করে যাব?'

'তা জানি না। যেমন করে হোক্ ব্যবস্থা কর। তুমি সব পার।'

অভয়পদ তখনও উড়িয়ে দেয় কথাটা।

কিন্তু অবিরাম নানা কাহিনী এসে পৌঁচচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশী কারুর মুখেই আর অন্য কথা নেই। পুকুরে বাসন মাজতে কি গা-ধুতে গেলেও এ-ঘাটে ও-ঘাটে ঐ প্রসঙ্গ।

'মহারাণী মরবার আগে পই-পই করে বলে গেছেন, আমার বংশের যে যবে রাজা হোক—বাঙালীদের ভাল করে দেখবে। ওরা আমার বড় প্রিয়!'

'তা তো বলবেনই ন-খুড়ী। আহা এদের যে তাঁর প্রাণ ছিল। যে দিন দেখলেন যে কোম্পানির হাতে ঠিক শাসন হচ্ছে না, সেইদিনই তো ওদের

তাড়ালেন। তিনি তো তাই বলেছিলেন, ওরা সবাই আমার সন্তান শাসন করতে হয় আমি করব—কোম্পানি কে ?'

'তিনি মা সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন। বলে রাজার পুণ্যে রাজ্য। নইলে আর আজ ইংরেজ-রাজত্বের এমন দবদবা—স্থিয্যি কখনও পাটে বসে না এঁদের রাজত্বে।'

'তা ছাড়া তিনি নাকি বলে গিয়েছেন সবাইকে—ওটা হল ধর্ম্মের দেশ। অধর্ম্ম করে শাসন করলে আমাদের রাজত্ব থাকবে না। সাবধান!...সেই জন্যেই তো শুনছি রাজা এসে বাংলা আবার জোড়া দিয়ে যাবে ?'

'হ্যাঁ দিদ্‌মা। রাজা আমাদের মত ভাত খায় ?'

'ওমা তা যায় না! এখানকার যা সরেস চাল সবচেয়ে তাই তো ওখানে যায়। আগে কি খেত--আগে খেত না। শুধু মাংস, তাও শুনেছি ঝল্‌সানো মাংস খেয়ে থাকত! মহারাণীই পেরথম নিয়ম করলেন. আমার প্রেজারা যা খায় আমিও তাই খাব! তার পর থেকেই তো হন্দর হন্দর চাল যাচ্ছে ওদেশে। নইলে বালাম চালের এত দর কেন? সাহেবরা যে আজকাল সবাই ভাত খাচ্ছে!'

দিনরাত এই চলছে।

সে নূতন হাওয়া এসে ক্ষীরোদাকেও লাগে। তাঁর সেই একান্ত স্তিমিত ও সীমিত জীবনেও নাড়া দেয় সে হাওয়া। অতীত জীবনের রোমন্থন-করা চিত্তে স্মৃতির তরঙ্গ তোলে।

তিনি ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে বসে বলেন. 'আমরা তখন সবে হয়েছি কি হই নি--মনে নেই, মার মুখে শোনা—জানো মেজ বৌমা, কথাটা উঠল যে সেপাইরা নাকি সায়েব দেখছে আর কাটছে। ইংরেজ-রাজত্ব আর থাকবে না। আমার মামারা, দাদামশাই সব পশ্চিমে চাকরি করতেন। কথা উঠল যে বাঙালীদেরও কাটছে, ওরা সায়েবদের দিকে বলে। সে এক-এক দিন এক-এক কাণ্ড মা। মা গল্প করত আর হাসত এদান্তে। এক দিন রান্না চড়ানো—এক জন এসে দিদিমাকে বলে গেল, অ বামনি হাঁড়ি নামা, হাঁড়ি নামা। শুনিস নি? বেজাকে আর তোর বেটাদের সব কেটে রেখে গেছে সেপাইরা?...ওমা, তখনই উনুনে জল ঢেলে দেওয়া হল—বাড়িতে মড়া কান্না। আমার মার ঠাকুর্দা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি কোথায় যেন গিছলেন, বাড়ি এসে কান্না দেখে তিনিও প্রথমটা আছড়ে পড়েছিলেন, তার পর খানিক পরে

খেয়াল হল—খবরটা দিলে কে? ঐ যে ওপাড়ার দত্তগিন্নী। দত্তগিন্নী খবর পেল কোথায়? আজ সাত দিন কোন ডাক আসে নি, খবর আসে নি।... খোঁজ খোঁজ—দত্তগিন্নী পালিয়ে বেড়ায়—শেষে সটেপটে ধরতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম। এম্‌নি নিত্যি মা নিত্যি—এক-এক দিন এক-এক ঢেউ।'

তার পর খানিক থেমে ছড়ানো পায়ে নিজেই হাত বুলুতে বুলুতে বলেন, 'তা জানো গা মেজ বৌমা, সেই সব খবর মহারাণীর কানে পৌঁছল। সেপাইরা হেরে যেতে গোরাগুলো বললে, আমাদের যত সায়েব মরেছে এদের পেত্যেকের জন্যে আমবা এক হাজার করে বাঙালী কাটব। কথাটা শুনে মহারাণী বললেন, কথ্‌খনো না। ওরা সব আমার ছেলে, কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়। দাওয়ানকে তখুনি ডেকে হুকুম দিলেন, কোম্পানির কাছ থেকে সব বুঝে পড়ে নাও। আজ থেকে আমার লোক শাসন করবে। সেই জন্যেই তো বৌমা, মহারাণী যখন মারা গেলেন, সব্বাই দেশসুদ্ধ অশৌচ নিলে! গাঁয়ে গাঁযে ছাদ্দ হল। অমন রাণী আর হবে না। সেই সেকালে শুনেছি রাণী ভবানী, একালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া!'

রাণী ভবানীর কথায় মহাশ্বেতাব একটা কথা মনে পড়ে যায়।

সে হি-হি করে হেসে বলে, 'জানেন মা—আমার দিদিমার ওখানে এক বুড়ো আমওলা আম দিতে আসত, সে যা মজার কথা বলত। বলত, রাণী ভবানীরে মুই চিনি নে, ইয়া মোচ, ইয়া দাড়ি, চারদিকে চার গ্যার্দা বালিশ, তার মধ্যে বসে আছেন মা যেন গজেন্দ্রগামিনী। আবার তার দুদিকি চ্যানির হাঁড়ি, ফ্যাচ্ছে ম্যাচ্ছে চ্যানি খাচ্ছে!...হি হি!'

সেই প্রসঙ্গে হঠাৎ বলে বসেন ক্ষীরোদা, 'তোমার মাসী তো কলকাতায় থাকেন বড় বৌমা, সেখানে গিয়ে উঠলে কি হয়—রাজা দেখা যায় না?'

মুখ ম্লান হয়ে আসে মহাশ্বেতার। সে বলে, 'সেদিন কি আর আছে। দিদিমা মারা গিয়ে তাদের এখন হাড়ির হাল। একখানা ঘর ভাড়া করে থাকে তিনটি প্রাণী, সেখানে গিয়ে কি ওঠা ভাল দেখাবে? আর তাদেরই বা কী ব্যবস্থা হবে কে জানে! তারা কি আর আমাদের রাজা দেখাতে পারবে?'

হঠাৎ দুম্ করে প্রমীলাই কথাটা বলে ফেলে, 'আপনার তো ভাই-ই রয়েছেন মা, শুনেছি তিনি খুব বড় মানুষ—সেখানেই চলুন না কেন! আমাদের তো মামা হন—আমাদেরও তো জোর আজে খানিকটা!'

মুখখানা নিমেষে যেন বিবর্ণ হয়ে যায় ক্ষীরোদার, কেমন যেন অপ্রতিভ ভাবে বলেন, 'ওমা, সে কি হয়?'

'কেন হবে না মা। এক দিন ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে ওঠা যায় না? তবে আর আত্মীয়তা কিসের?···বড়লোক, এক বেলা খাওয়াতে কি এত কষ্ট হবে? তা না হয় আমরা চাল-ডাল বেঁধে নিয়ে যাব।'

মহাশ্বেতাও জোর দেয়, 'তাই চলুন মা, সে বেশ হবে।'

বিষম বিব্রত হয়ে পড়েন ক্ষীরোদা। সেটা তাঁর ভাব দেখেই বোঝা যায়। তিনি কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলেন, 'দেখি না অভয়পদ কী ব্যবস্থা করে।'

'ও আপনি কথা চাপা দিচ্ছেন মা।' প্রমীলার দয়া-মায়া নেই।

'কে জানে বাপু। ছেলেরা একথা শুনলে রাগ করবে।' অসহায়ভাবে বলেন ক্ষীরোদা।

'ওমা, এ আবার কি কথা! জন্মে একদিন মামার বাড়ি যাবার কথায় রাগ করবে? আপনি বুঝিয়ে বলবেন, তা হলে আর রাগ করবে না।'

ক্ষীরোদা বিপন্ন মুখে বলেন, 'আমার কি, আমি না-হয় বলব—কিন্তু না মেজ বৌমা, অম্বিকে অভয় সবাই রাগ করবে!'

মহাশ্বেতার পক্ষে এই ক-টি কথাই হয়তো যথেষ্ট হত কিন্তু প্রমীলা সে মেয়েই নয়, সে তার ডাগর ভাসা চোখদুটির দৃষ্টি শাশুড়ীর দৃষ্টিতে স্থির করে বললে, 'কেন বলুন তো মা—বুঝি কোন গোলমাল আছে?'

ক্ষীরোদার মুখ সেই সায়াহ্নবেলার আকাশের মতই রক্তিম হয়ে ওঠে। সেটা, এমন কি মহাশ্বেতার চোখেও, চাপা থাকে না।

তিনি তাড়াতাড়ি বলেন, 'গোলমাল আবার কি থাকবে! তোমার বাপু এক কথা! না—মানে, ওরা পছন্দ করে না তাই। আচ্ছা আজ ছেলেরা আসুক, বলি কথাটা—'

তিনি উঠে যান তাড়াতাড়ি।

রাত্রে রান্না করতে করতে প্রমীলা বলে মহাশ্বেতাকে, 'ঐ মামার বাড়ি গিয়ে তবে ছাড়ব। দেখিস্—নইলে আমি বাপের বেটী নই। মা বেটা সবাইকেই তুরকী নাচন নাচিয়ে ছাড়ব।'

'কে জানে বাপু। তোর খুব সাহস। আমি হলে কিছুতেই ও-কথাটা বলতে পারতুম না।' স-প্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা।

'হুঁ! সাহস! অত ভয়ই বা কিসের?'

উনুনে একটা হাল্‌কা দেখে কাঠ গুঁজে দিয়ে প্রমীলা বলে, 'কাঁদি নামলে তো আর আমরা একটা কলাও চোখে দেখতে পাব না—দুটো পাকা কলা পেড়ে রেখেছি দিদি, একটু কাসুন্দি বার কর্ দিকি, কলা-কাসন খাব।'

'ওমা, রাত্তিরে কাসুন্দির হাঁড়িতে হাত দোব কি লো?'

'রাখ দিকি তোমার শাস্তর। কাচা কাপড়ে বার করলেই তো হল!'

॥ ২ ॥

পরের দিনটা কী একটা ছুটির বার। দুই ভাইকে একসঙ্গে খেতে দিয়ে ক্ষীরোদা কথাটা পাড়লেন, 'বৌমারা ধরে পড়েছে মামার বাড়ি গিয়ে ঐখান থেকে রাজা দেখবে।'…তার পর একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'ওদের বোঝানো যাচ্ছে না, বলে মামার বাড়ি—নিজের মামা—সেখানে যাব না-ই বা কেন! কী এমন হয়েছে তাদের সঙ্গে?'

অভয়পদ ভাতে ডাল মাখতে মাখতে সংক্ষেপে জবাব দিল, 'না, সে হয় না। তুমি বলে দিও, সেখানে যাওয়া আমরা পছন্দ করি না। ব্যস! অত কৈফিয়তে কী দরকার।'

কিন্তু বোঝা গেল যে প্রমীলা শুধু শাশুড়ীর ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকে নি। সে যে 'বাপের বেটী' তা প্রমাণ করার জন্য রাত্রে অন্য ব্যবস্থাও করেছে। অম্বিকাপদ এতক্ষণ হেঁট হয়ে একমনে ভাতের মধ্যে থেকে ফড়িং চোষা দানাগুলো বাছছিল, সে একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু আমি বলছিলুম যে তাতে দোষই বা কি? কথাটা কিছু চিরদিন চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। বরং বেশী ঢাকাঢাকি করতে গেলেই সন্দেহ বাড়বে। তারা চেষ্টা করবে বাইরে থেকে খবরটা যোগাড় করতে।…তা ছাড়া বৌয়েরা তো আর এখন কচি খুকী নেই। অত চাপবার দরকারই বা কি?'

অভয়পদ তার নিরাসক্ত চোখ দুটি তুলে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বড় বৌয়ের জন্যে কোন চিন্তাই নেই। সে অত বুঝতেও পারবে না। বৌমার জন্যেই আমি ইতস্তত করছিলুম। তুমি যদি অসুবিধা বোধ না কর তো আমার আপত্তি কি?' সে আবার ভাতের থালায় মন দিলে।

'না,'—অম্বিকাপদ তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'আমি বলছিলুম যে, আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলে তারাও কি একটু সতর্ক থাকবে না? তাদেরও তো একটা বিবেচনা আছে?'

'তাদের বিবেচনাটা আশা করতে পারো কিন্তু তার ওপর ভরসা করাটা কি ঠিক হবে? কোন কাজ করার আগে খারাপ ফলটা ভেবে নিয়ে করাই ভাল। যাক্, তুমি যদি ভাল বোঝ তো তাদের খবর দাও, আমার কোন আপত্তি নেই!'

ক্ষীরোদারও তখন রাজা দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। ধনী ভায়ের বাড়ীতে গেলে সেদিকে সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—এটা তিনিও বুঝেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি অম্বিকাপদকেই সমর্থন করলেন, 'না না। তাদের আক্কেল-বিবেচনা না থাক্, লজ্জাও তো আছে। তুই তাই কর্—ওদের একখানা চিঠি দে। নইলে না হয়—কাল অফিসের ফেরতা দেখা করে মতটা নিয়ে আয়।...যদি তেমন বোঝে তো ওরাই বারণ করে দেবে। ওরা তো আর ছেলেমানুষ নয়!'

অম্বিকাপদ আড়-চোখে দাদার মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু সে-মুখ পাথরের মুখ। সেখান দিয়ে একটা কথাও বার হওয়া যে আর সম্ভব নয় তা সে জানে। অভয়পদর হিসেবে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। সুতরাং সেও চুপ করে গেল।

চিঠি লেখার চেয়ে হেঁটে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসা সোজা।

এই সোজা পথটাই ধরল অম্বিকা।

অভয় এখনও তার হাঁটা-পথ অব্যাহত রেখেছে কিন্তু অম্বিকা যাতায়াত করে ট্রেনে। সেইটেই নাকি সুবিধে। মাত্র তিনি পোয়া পথ হেঁটে গেলেই স্টেশন, আর হাওড়ায় নামলে তো কথাই নেই। আধ ক্রোশের ভেতরেই অফিস। মিছিমিছি অত হাঁটা—দাদার মত—ও তার ধাতে সয় না।

অম্বিকা ফেরে সাধারণত সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে, বড় জোর ছটা। সেদিন আটটার গাড়ি এমন কি সাড়ে আটটার গাড়িও পার হয়ে যেতে শাশুড়ী প্রমীলাকে ডেকে বললেন, 'হাঁড়ি হেঁসেল তুলে ফ্যালো মেজ বৌমা, খেয়ে দেয়ে নাও তোমরা। অম্বিকা বোধ হচ্ছে খেয়েই আসবে।'

'খেয়ে আসবে?...তার মানে?' মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'মামার বাড়ি গেছে—এটা বুঝছ না দিদি? মামার বাড়ির আদর খেয়ে আসছে।…নইলে এত রাত হয়। কান পেতে শোন না—সাড়ে আটটার গাড়ি সাঁকরেলের পোলে উঠেছে—তার মানে নটা বেজে গেছে কখন্!'

'যদি না খেয়ে আসে?'

'ভাত ডাল তো সবই রইল। কেউ তো আর কারুর ভাগের খাচ্ছে না।…চল চল আমরা ভাত বেড়ে নিই। এমনিই সারতে সারতে রাত এগারোটা বাজে।'

দেখা গেল প্রমীলাদের অনুমানই ঠিক। রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে অম্বিকা বললে, 'আজ রাত্তিরে আর খাব না মা। খেয়ে এসেছি।'

'তা বুঝিছি। মানিকতলা গিয়েছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

সাগ্রহে প্রশ্ন করেন ক্ষীরোদা, 'কী খেলি রে? ভালমন্দ খাওয়ালে তো খুব?'

প্রমীলা ঘরের মধ্যে থেকে ফিস্ ফিস্ করে মহাশ্বেতাকে বললে, 'কেমন আছে তারা, কাজের কথার কী হল—এসব চুলোয় গেল—আগে ওঁকে কৈফিয়ত দাও, কী ভালমন্দ খাওয়ালে!'

অম্বিকাও সেইখানে মায়ের পাশে বসে পড়ে ফিরিস্তি পেশ করে, 'তা খুব। পরোটা করেছিল, সে পরোটা লুচির বাড়া, পাটে-পাটে ঘি আর এ-ই পাতলা—তার সঙ্গে সুতোর মত আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, শোল মাছের কালিয়া—পাকা শোল মাছ, কী বলব মা যেন খাসি খাচ্ছি- আলুবখরার চাটনি, আর রাবড়ি। রাবড়ি নাকি ওদের ঘরে তৈরী হয়।' বলতে বলতেই যেন অম্বিকাপদর রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে।

ক্ষীরোদা ছেলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'তা ভাল, ভাল। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিস তো। বারো মাস এই ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়া, একঘেয়ে—পেটে চড়া পড়ে গেল!'

তার পর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ওরা কী বললে রে? রাজী হল?'

'হ্যাঁ—তা হয়েছে। মামার খুব ইচ্ছেটা ছিল না, রতন বললে—তা কী হয়েছে, আসুক না। আমাদের তো গাড়ি রয়েছে, দেখার সুবিধা হবে।'

'তখন তোর মামা কি বললে ?'

'আর কিছু বললে না। আমিও আর ঘাঁটাই নি। আমারই যখন গরজ—তখন অত খুঁচিয়ে লাভ কি ? কথা আছে আগের দিন গিয়ে ওখানেই থাকব।'

'তা ভাল।'

অন্ধকারে ক্ষীরোদার মুখ দেখা গেল না। তবে কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে তিনি খুশীই হয়েছেন।

সে রাত্রিতে প্রমীলা ও মহাশ্বেতা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। রান্নাঘর সারার নাম করে বসে বসে গল্প করতে লাগল। কলকাতা যাবে, আলো দেখবে, ভিড় দেখবে, রাজা দেখবে—কিন্তু সেটাও বুঝি সব নয়, মামাশ্বশুরদের রহস্যটা পরিষ্কার হবে, কেন এরা তাদের প্রসঙ্গ তোলে না, কেন এরা যেতে চায় না সেখানে—তারাই বা কেন আসে না, এতদিন পরে সেইটে জানা যাবে এই-ই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ।

জল্পনা-কল্পনারও অন্ত থাকে না। মুখখানা খুব গম্ভীর করে ভুরু দুটো কুঁচকে ভাববার ভঙ্গী করে মহাশ্বেতা বলে, 'আমার মনে হয় ওরা কেরেস্তান হয়ে গেছে।'

'দূর! তা হলে আর এত ছাপাছাপির কী ছিল! আমার মনে হয় তা নয়—মামা বোধ হয় নোট জাল করে জেল খেটেছে। আমি মার মুখে গল্প শুনেছি, কে এক জন নোট জাল করে খুব বড় মানুষ হয়েছিল। লোকে সন্দেহ করে নি আগে কিন্তু একদিন হল কি জানিস—জানবাজারের রাজ-বাড়িতে খেতে এল শালের জোড়া গায়ে দিয়ে। ফেটিং গাড়ি থেকে নামতে যাবে—কোন্ খোঁচায় আট্‌কে গেল। একটু থেমে ছাড়িয়ে নিলেই হত, তা সে বাবু থামলেন না। বরাবর সটান চলে গেলেন, শালও ছিঁড়তে ছিঁড়তে গেল। যখন অনেকখানি ছিঁড়েছে তখন শালখানা খুলে ফেলে দিলেন গা থেকে। আড়াই হাজার টাকার শাল! পয়সায় এত দুখদরদ কম—আলটপ্‌কা টাকা না হলে তো হয় না। তখনই পুলিসের সন্দ হল, সটেপটে ধরলে চেপে। ব্যস্—একেবারে দ্বীপান্তর হয়ে গেল।...আমার মনে হয় এ-ও তেমনি কিছু হবে!'

'কে জানে বাপু!'

আরও বহুরাত্রি অবধি জেগে বসে রইল ওরা। শেষে এক সময় অম্বিকা বেরিয়ে ধমক দিতে তখন রান্নাঘরের কপাটে তালা লাগিয়ে শুতে গেল।

কিন্তু তবুও কি ঘুম আসে।

শুধু সে রাত্রি কেন—তার পর বহু রাত্রিই ভাল করে ঘুম এল না। সেই অত্যাশ্চর্য রাত্রি যেদিন ওরা গিয়ে মানিকতলায় মামাশ্বশুরের বাড়ি রাত কাটাবে, সেই রাত্রিটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

॥ ৩ ॥

হাওড়ায় নেমে একখানা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে অম্বিকাপদ। হেঁটে যাওয়ার কথাই ছিল ওদের, কিন্তু ঠিক বেরোবার মুখে অভয়পদ ভাইকে ডেকে সংক্ষেপে বলে দিল, 'নেমে একখানা গাড়ি নিও, হাঁটিয়ে নিয়ে যেও না।'

কথাটা বিশেষ করে অভয়পদর মুখে এমনই বেমানান যে অম্বিকা হাঁ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুকাল। তখন অভয়পদই ব্যাখ্যা করে দিলে, 'যেখানে যাচ্ছ, তাদেরও সম্মান আছে তো! হেঁটে গেলে তাদের চাকর-বাকররা মানতে চাইবে না যে!'

তা বটে। কথাটার যৌক্তিকতা অম্বিকাপদও স্বীকার করে। যদিচ গা কর-কর করে তার এই বাজে খরচে। হাওড়া থেকে ওর মামার বাড়ি আট আনার কম রাজী হল না কোন গাড়োয়ানই। অগত্যা তাতেই রাজী হয়ে সমস্ত পথটা গজ্ গজ্ করতে করতে যায় সে, 'ডাকাতি, ব্যাটাদের স্রেফ দিনে ডাকাতি।... এইটুকু পথ আট আনা! রাজা আসবে তো—ভিড় হয়েছে শহরে, ব্যাটারা অমনি হাতে মাথা কাটছে!'

মহাশ্বেতা ও প্রমীলার এদিকে কান ছিল না। শাশুড়ী যে সমানে বক্ বক্ করে চলেছেন তাতেও না। তারা অবাক্ হয়ে কলকাতার বাড়ি-ঘর দেখছিল। গাড়ি বড়বাজার পেরিয়ে সিঁদুরেপটি হয়ে এক সময় এসে নতুন-বাজারে পড়ল। গাড়িভাড়ার শোক ভুলে অম্বিকাপদ ওদের দিকের খড়খড়িটা ভাল করে খুলে দিয়ে বললে, 'ভাল করে দেখে নাও, রাজেন্দর্ মল্লিকের নতুনবাজার।'

মহাশ্বেতা বললে, 'জানি জানি। ছোটবেলায় গিরি ঝিয়ের সঙ্গে এখানে বাজার করে গেছি কতদিন। গিরি বলত টাকা ফেললে নতুনবাজারে আর্ধেক রাত্তিরে বাঘের দুধ মেলে। দিদিমা বলতেন, এই নতুনবাজার ঝেঁটিয়েই ওদের চিড়িয়াখানার খরচ চলে।'

এবার প্রমীলার অবাক হবার পালা, সে বলে, 'চিড়িয়াখানা ?'

'কে জানে বাপু। গিরিও বলত ঝিয়েদের আর চোখ রাঙিও নি বাপু, খেতে না পাই রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানা তো কেউ ঘোচায় নি !'

তখন ব্যাখ্যা করেন ক্ষীরোদাই, 'হ্যাঁ হ্যা—রাজেন মল্লিকের জন্তু জানোয়ার পোষার যে ভারি শখ, তাই ওর বাগানকে চিড়িয়াখানা বলে। ঐখানেই আবার ওর অতিথশালা। দুপুরবেলা অবারিত দ্বার—যে যাবে ভাত ডাল আর একটা ঘ্যাঁট তরকারি বাঁধা। হপ্তায় নাকি এক দিন মাছও দ্যায়। নতুনবাজারের তোলা তুলেই ওর খরচ চলে। এসব দাদার মুখে কতদিন গল্প শুনেছি।'

হঠাৎ হি হি করে হাসতে হাসতে মুখে কাপড় চাপা দেয় মহাশ্বেতা, 'হ্যাঁ মা রাজন মল্লিকের মা নাকি একটা করে কলা খেয়ে থাকেন ? রাজন মল্লিক মরবার পর নাকি কিছু খান নি আর ? গিরি বলত।'

'কে জানে বাছা, ওসব কথা কখনও তো শুনি নি।'

ততক্ষণে গাড়ি ছাতুবাবুর বাজার পেরিয়ে চলেছে। মহাশ্বেতা খোলা জানলা দিয়ে দেখে বলে, 'ওমা, এই তো ছাতুবাবুর বাজার। এ তো আমার দিদিমাদেরই পাড়ায় এসে গেলুম সব। এই তো এইখানে কোথায় থাকতাম আমরা—'

অম্বিকা এইবার ওদের দিকের জানলাগুলো আবার তুলে দেয়। বৌ-রা জানলা খুলে এসেছে—এ ভারি লজ্জার কথা।

মহাশ্বেতা কিন্তু খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে। মানিকতলা স্ট্রীট পেরিয়ে সংকীর্ণ গলিতে ঢোকে গাড়ি, তা থেকে পাশ কাটিয়ে আরও একটা—। দু পাশে মেয়ে-পুরুষ রাস্তায় বসে বসে বাঁশের চ্যাঁচাড়ি বার করে চুপড়ি বুনছে। নিকষ কালো তাদের দেহ, যদিও স্বাস্থ্যের খুব চিহ্ন নেই কোথাও। বরং যেন কেমন কেমন। কে জানে কী জাত !...

অবশ্য ভাববারও সময় পায় না বেশী, এরই মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির সামনে এসে অম্বিকা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই গাড়োয়ান, রোকো রোকো। এই যে, এই বড় বাড়ি —।

তার পর অকারণেই মেয়েদের ধমক দ্যায়, 'নাও, সব নামো। জড়ভরত হয়ে থেকো না। বৌদি তোমার কাঁদুনে ছেলে সাবধান !'

যদিও মহাশ্বেতার ছেলে তখন অগাধে ঘুমোচ্ছে মার কোলের ভেতর।

গাড়ি থেকে নেমে কিন্তু সত্যিই হকচকিয়ে যায় মহাশ্বেতা। বিরাট বাড়ি। বাইরেই এক বিশালকায় দারোয়ান বসে (পরে শুনেছিল—ওরা ভোজপুরী দারোয়ান), সে তাড়াতাড়ি সেলাম করে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।... বাইরের রক থেকে শুরু করে চলন, মায় ওপরের সিঁড়ি পর্যন্ত সব কেমন একরকম চক্‌চকে পাথরের। টালির মত চৌকো চৌকো—কোনটা সাদা কোনটা কালো। অবাক হয়ে পা বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করছে দেখে অম্বিকা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, 'দেখছ কি, সব মার্বেল পাথর। এই পাথরের দামে আমাদের একটা দোতলা বাড়ি হয়ে যায়!'

চলন পেরিয়ে উঠানের আগেই সিঁড়ি। কিন্তু অম্বিকা সেদিকে গেল না। রক দিয়ে গিয়ে বাঁ পাশের একটা ঘরে ঢুকল। সেখানে চৌকিতে ধপ্‌ধপে ফরাস পাতা, তাতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ফরসিতে তামাক টানছেন বিশালকায় এক প্রৌঢ় পুরুষ। তাঁর শুভ্র গৌরবর্ণের সঙ্গে মাথার শুভ্র কেশ এবং বিস্তৃত বক্ষে শুভ্র যজ্ঞোপবীত—ভারি মানিয়েছে। যদিও চুল যতটা সাদা ততটা বুড়ো হয়তো নন—কারণ গায়ের চামড়া এখনও টান্‌-টান্‌ আছে, কপালেও তেমন রেখা পড়ে নি। সামনে একখানা বই খোলা – সম্ভবত তামাক খেতে খেতে ঐখানাই পড়ছিলেন। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে এবার মুখ তুলে চাইলেন।

ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন। তার পর বৌদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমাদের মামা—পেন্নাম কর। দাদা, বৌদি কোথায় গো?'

মামা বসন্তরঞ্জন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করেই ছিলেন, তেমনি অবস্থাতেই সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'কালীঘাট গেছে। ফিরতে দেরি হবে।'

তার পরই প্রণত বৌদের উদ্দেশে—'থাক্‌-থাক্‌' বলে হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বললেন, 'রতনের সঙ্গে দেখা করে নেবে তো এই বেলা নাও গে।... জামাই আসবার সময় হল।...তোমাদের জন্যে তিনতলার ঘর বোধ হয় ঠিক করে রেখেছে। সেইখানে চলে যেও। জামাইয়ের সামনে আর বেরুবার দরকার নেই। যা বেশভুষা!'

শেষের কথাটা খুব আস্তে বললেও মহাশ্বেতার কান এড়ায় নি। তারা দূর থেকেই চৌকিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল—মামাশ্বশুরের পায়ে হাত দেবার রেওয়াজ নেই—তবু মনে হল যেন ওদের জামা-কাপড়ের গন্ধ এড়াবার

জন্যেই তিনি আর কিছু না পেয়ে ডিবে থেকে একখিলি পান তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগলেন।

মহাশ্বেতা যতই বোকা হোক্—অনাদর না বোঝবার মত বোকা নয়। অপমানে তার কান মাথা গরম হয়ে উঠল। ছেলে কোলে করে সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল। অভয়পদর কেন আপত্তি ছিল এখানে আসতে—এবার যেন সে একটু একটু বুঝতে পারলে।

অম্বিকাপদও এক রকম মাকে ঠেলেই বার করে আনলে সে ঘর থেকে। বসন্তরঞ্জন আবার তাঁর নভেল ও আলবোলায় মন দিলেন।

এবার সোজা দোতলায়। নিচের দুটি ঘরের ওপর একটা টানা বড় ঘর।

বিরাট ঘর কিন্তু সবটাই যেন আসবাব ঠাসা। ঘরে কোথাও একটু জায়গা নেই। অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হল। আর এইসব আসবাবের মধ্যে তারা যে একান্ত বেমানান—সেটাও কেমন করে যেন অনুভব করতে লাগল মনে মনে।

চৌকাঠের বাইরেই বড় পাপোশ। অম্বিকাপদ চাপা ধমক দিয়ে বললে, পা মুছে নাও ভাল করে।' যদিচ ওরা আসবার আগে নিচের কলতলা থেকে পা ধুয়ে এসেছিল ; পায়ে ময়লা থাকবার কথা নয়।

মহাশ্বেতা প্রমীলা ওরা দু জনেই একটু পিছনে রইল, ক্ষীরোদা এবং অম্বিকাপদই আগে। তবু তাদের ফাঁক দিয়ে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কৌতূহল মহাশ্বেতারই বেশী। আধা-ঘুমন্ত ছেলেটাকে ট্যাঁকে নিয়ে ঘাড়টা বাড়িয়ে দেখে নেয় সে। প্রকাণ্ড ঘর, তার একপ্রান্তে তেমনি প্রকাণ্ড খাট। বিচিত্র কারুকার্য সে খাটের, গাঢ় কাল্‌চে বাদামী রঙ—কত টাকাই না জানি দাম নিয়েছে! তার ওপর প্রায় দেড় হাত পুরু বিছানা। ওপর নিচে ঝালর দেওয়া বালিশ, দু পাশে বিরাট পাশ-বালিশ। মাথার দিকে (অথবা পায়ের দিকে, কে জানে!) এক ফালি জায়গা, তাতে ভারী একটা লোহার সিন্দুক, তার ওপর কাচের ঢাকার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘড়ি। তার নিচে একটা পুতুল। ঠিক তখন সাড়ে পাঁচটা বাজার সময়, পুতুলটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘা মারলে কিসে, ঠুং করে একটা আওয়াজ হল। আরও কত কি এটা-ওটা জিনিস লোহার সিন্দুকের ওপর, এত দূর থেকে ঠাওর হল না। খাটের পাশে একটা পাথরের টেবিল। তাতে সোনালী রঙের আলো। তার পাশে আর একটা ঘড়ি, সে আবার ঘণ্টা বাজায় না, বাজনা বাজে তাতে, পনের

মিনিট অন্তর অন্তর। ফুলদানিও একটা আছে সেখানে, তাতে টাটকা ফুল সাজানো। এদিকে বিরাট আলমারি দুটো। একটার পাল্লায় আয়না বসানো। আর একটা কাঁচের পাল্লা। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি বই দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া আছে বিরাট দাঁড়া-আয়না। তার গিলটির ফ্রেমে অজস্র শৌখীন কাজ। ওপরের দেওয়ালে তেমনি ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি—কিন্তু মহাশ্বেতা এক বার সেদিকে চেয়েই আপনা-আপনি জিভ কাটলে, গুরুজনদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকানো যায় না। এই সব ছবি মানুষ ঘরে টাঙায়—ছি! আর এ ছাড়া আছে খাটের নিচে মেঝেতে বিরাট একটা ঢালা বিছানা—ধপ্ ধপ্ করছে ফরসা তার চার দিকে গোটা বারো বড় বড় তাকিয়া। এবং সেই তাকিয়ারই একটাতে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় শুয়ে আছে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে—তার পায়ের ওপর খানিকটা পর্যন্ত একখানা শাল চাপা. তাতে আগাগোড়া সূক্ষ্ম সূচের কাজ, তাকিয়ায় আধ-কাত হয়ে শুয়ে পাশের একটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে একখানা বাংলা বই পড়ছে।

সে মেয়েটি এদের দেখতে পায় নি, পায়ের আওয়াজও পায় নি বোধহয়। অথবা হাতের বইখানাতেই ডুবে গিয়েছিল। সে মুখ তুললে না। অগত্যা ক্ষীরোদাই ডাকলেন, 'রতন!'

রতন এবার বই নামিয়ে মুখ তুলে তাকাল, 'কে, পিসীমা? এসো এসো। কী ভাগ্যি! রাজদর্শনে যে পরম পুণ্য সেকথা মিছে নয়—তার নামেই তোমার পায়ের ধুলো পড়ল।...বাব্বা, আট বছর পরে তোমাকে দেখলুম।'

একটু কষ্ট করেই উঠে বসে রতন। বয়স এখনও অল্প, তবু এরই মধ্যে যেন ভারী হয়ে পড়েছে সে। যতটা পর্যন্ত মেদ থাকলে ভাল দেখায়, তার চেয়েও বেশী জমেছে তার দেহে।

সন্তর্পণে শালখানা সরিয়ে উঠে এসে একটা প্রণাম করে সে। ক্ষীরোদা তাতেই যেন অভিভূত হয়ে পড়েন, 'থাক্ থাক্ মা, হয়েছে হয়েছে। বেঁচে থাকো, গতরখানি সুখে থাকুক। রাজরাজেশ্বরী হও।'

খট্ করে কথাটা কানে লাগে—এমন কি মহাশ্বেতারও। সধবা মেয়ে মাত্রেই প্রণাম করলে ক্ষীরোদা হয় বলেন, 'সাবিত্রীসমান হও মা, নোয়া-সিঁদুর বজায় থাক্'—নয়তো বলেন, 'হাতের নো ক্ষয় যাক, পাকাচুলে সিঁদুর

পর।' এইসব। মহাশ্বেতা তাকিয়ে দেখলে প্রমীলাও বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'তক্ষণতণ রতন এগিয়ে এসেছে।

'এইটি বুঝি আমাদের বৌদি? আর ইটি? অম্বিকের বৌ? বেশ বেশ। বসবে একটু? আমি বলি কি এখন আর বসে কাজ নেই। এখনই হয়তো তোমার জামাই এসে পড়বেন, তখন লজ্জায় পড়ে যাবে।...অম্বিক, বরং এদের নিয়ে সোজা তিনতলায় চলে যাও। মোক্ষদা কোথায় গেল, সে সব জানে শোনে, দেখা শুনো করবে।'

এই বলে গলাটা একটু চড়িয়ে ডাকে, 'অ মুকি, মোক্ষদা—!'

'কী গো দিদিঠাকরুন!' বেশ শক্ত-সমর্থ খাণ্ডারনী গোছের এক ঝি এসে দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে। চওড়া পাছাপাড় শাড়ি পরনে—গাছকোমর করে বাঁধা, তার ওপর রুপোর গোট ঝুলছে।

'এই আমার পিসীমা এসেছেন। ওপরে নিয়ে যা। এঁদের খাওয়া-দাওয়া বিছনা-পত্তর,—সব ভার তোর। গ্যাখ, এখন কী দরকার। খোকার দুধ চাই কি না সব গ্যাখ। আর যেন আমাকে কোন খবর নিতে না হয়!'

অকারণে এতখানি জিভ কাটে মোক্ষদা, 'ওমা পিসীমা বুঝি? কী হবে মা।'

সে গড় হয়ে প্রণাম করে ক্ষীরোদাকে, পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে জিভে দেয়। তার পর উদ্দেশে সবাইকে একটা করে প্রণাম সেরে বলে, 'আশীর্ব্বাদ করো যেন ধম্মে মতি থাকে। আর-জম্মে কত পাপ করে এসেছিলুম—তাই এ-জম্মে ভুগতিছি। আবার যেন সামনের জম্মে ভুগতে না হয়!'

রতন হেসে একটু ধমক দেয়, 'ঐ শুরু হল মুকির বক্তৃতা। ওদের নিয়ে গিয়ে কোথায় বসাবি একটু, তেতেপুড়ে এল সবাই --না বক্‌বক্‌ শুরু করলে। যা পালা, এখুনি তোর দাদাবাবু এসে পড়বে।'

'যাচ্ছি গো যাচ্ছি। তুমি খালি বকতেই গ্যাখো। চল গো পিসীমা, ওপরে চল। এসো বাপু বৌদিরা—'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অবাক্ হয়ে রতনকে দেখছিল, বলা যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েই। মাসীরও খুব রূপ, তার মাও ফেল্‌না নয় কিন্তু এ যেন আর-এক রকম। তাদের গরীবের সংসার বলেই হয়তো অতটা বোঝা যায় না। এরা বড় মানুষ, সাত জন্মে কাজকর্ম্ম করে না—তাই হয়তো এতটা জেল্লা আছে।

তবু চোখ ফেরানো যায় না বাপু এটা ঠিক। চোখ, ভুরু, কপাল, নাক, গলা—সব নিঁখুত, একটার সঙ্গে আর একটা যেন ওজন করে বসিয়েছে ভগবান। আর তেমনি কি গায়ের রং—যেন দুধে-আল্‌তা!

ওর সেই শ্রদ্ধা-তদ্‌গত বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তে রতন হেসে ফেলে বললে, 'কী দেখছ গা বৌদি? ভাবছ এমন জানোয়ারটা কোথা থেকে এল, নাকি?...তোমাকে বাপু আর পেন্নাম করলুম না, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ..অভয়দা আমার চেয়ে নাকি মোটে দু বছরের বড়। অম্বিক আমার সমবয়িসী, বয়সে ছোটকে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতে নেই, অকল্যেণ হয়।'

॥ ৪ ॥

তিনতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে মোক্ষদা বললে, 'ঐ হোথাকে ছাদের ওপরই গঙ্গাজলের চৌবাচ্চা। হাত পা মুখ সবই ধুতে পারবে। স্যেতখানা কিন্তু নিচে। বিছানা-পত্তর সব করাই আছে। খোকার দুধ নিয়ে আসছি। চা জল-খাবার ঠাকুর ওপরে দিয়ে যাবে'খন।'

প্রকাণ্ড ঘর। এক পাশে কিছু কিছু ডেয়োঢাকনা সরিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝখানে তোশক পেতে দুটো ঢালা বিছানা।

'এ কার ঘর গা, মা মোক্ষদা?' ক্ষীরোদা প্রশ্ন করেন।

মোক্ষদা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেন যেন খুব খানিক হাসে।

বলে, 'এ এমনি খালিই পড়ে থাকে। কেউ এল-গেল তবেই ব্যাভার হয়। নইলে এটা-ওটা থাকে। আর মুখপোড়া ঠাকুর আত দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে এসে শোয়।'

'কেন গা, তার ঘর নেই?'

'থাকবে না কেন। নিচে সব আলাদা আলাদা ঘর। ঐ যে আর-এক ঝি এসে জুটেছে গোলাপী বলে—। দিদিঠাকরুনের পেয়ারের—আর বল কেন!'

আভাস দেওয়া ইঙ্গিতটাকে শেষ না করেই বলে মোক্ষদা, 'ঐ ছ্যাখ আমার মনের ভুল! চা খাবে, হ্যাঁ গো পিসীমা?'

'সে আবার কী মা? জানি নে তো!'

'আ আমার পোড়া কপাল ! এখন তো ঘর ঘর চলতেছে। এক রকমের গাছের পাতা মা, দুধ চিনি দিয়ে তৈরী হয়। দিব্যি খেতে, এই শীতে বেশ লাগবে !'

লোভে ও কৌতূহলে ক্ষীরোদার চোখ দুটি উৎসুক হয়ে ওঠে। তবু তিনি বলেন, 'কে জানে বাপু কখনও তো খাই নি। বিধবা মানুষ—! বৌরা না হয় থাক।'

'ওমা, চায়ে কোন দোষ নেই। গিন্নীমার মা-গোসাঁই আসেন, কী নিষ্ঠে তাঁর—তিনিও খান। রবিশ্যি তাঁর চা গঙ্গাজলে হয়। তা তিনি তেমনি গঙ্গাজল ছাড়া কিছুই খান না।'

'তা তবে না হয় নিয়ে এসো বাপু। দেখো কোন দোষ হবে না তো ?'

মোক্ষদা চলে গেল। ক্ষীরোদা গেলেন ট্যাঙ্কের জলে মুখ-হাত ধুয়ে দশ বার জপটা সেরে নিতে। অম্বিকা নিঃশব্দে একতলার উদ্দেশে সরে পড়ল।

প্রমীলা যেন এতক্ষণে হাঁপিয়ে মরছিল, মুখের ঘোমটা খুলে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলে, 'ওলো দিদি, ঠাকুরঝির কপালে সিঁদুর কৈ লো ? ওধারে তো ঠাকুর-জামাই রয়েছে জলজ্যান্ত !'

'ও মা, নেই বুঝি ? কী করে দেখলি তুই ? আমি তো অত লক্ষ্য করি নি।'

'তুমি যা নেকু। নোয়াও তো দেখলুম না।'

'কেন বল দিকি ? এইস্ত্রী মানুষ—!'

'মাকে জিজ্ঞেস কর না।'

'ও বাবা, সে আমি পারব না। আমার অত সাহস নেই। তুই জিজ্ঞেস কর্, বুকের পাটা থাকে তো !'

'করবই তো। সোজা কথা জিজ্ঞেস করব অত ভয় কিসের ?'

আর করলেও প্রমীলা ! ক্ষীরোদা আহ্নিক সেরে ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা সোজা প্রশ্ন করে বসল, 'হ্যাঁ মা, ঠাকুরঝির সিঁথেয় সিঁদুর নেই কেন ?...নোয়াও তো দেখলুম না।'

নিমেষে যেন কেমন হয়ে যান ক্ষীরোদা। শেজ-এর ম্লান আলোতেও সে বিবর্ণতা ধরা পড়ে।

আহ্নিক হয়ে গেছে কিন্তু জপের মালা তখনও হাতে। তাড়াতাড়ি সেটা মাথায় ঠেকিয়ে একটা পেরেকে টাঙিয়ে বলেন, 'কে জানে বাপু, হয়তো মা-কালীর কাছে নোয়া-সিঁদুর বাঁধা রেখেছে !...জিজ্ঞেস করব না হয় !'

প্রমীলার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো এড়াতেই বোধ হয় আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ততক্ষণ ঠাকুর চা নিয়ে এসেছে, এদের সব কাপে– ক্ষীরোদার জন্যে পাথরের বাটিতে, তার সঙ্গে দুখানা করে হিংএর কচুরি। একটা কাঁসার বাটিতে খোকার দুধ।

একেবারে রাত সাড়ে আটটায় মোক্ষদা আবার এল। এক বাটি খয়ের গোলা গরম করে এনে চৌকাঠটার কাছে পা ছড়িয়ে বসল, 'হেসো নি বাপু বৌদিরা ভেবো নি যেন আলতা পরতিছি। পাঁকুইয়ের জ্বালায় মরে গেলুম, তাই একটু খয়ের দিচ্ছি!'

ক্ষীরোদা তখন সেখানে নেই। তাঁর বৌদি ফিরেছেন কালীঘাট থেকে, দেখা করতে গিয়েছেন নীচে। কে জানে কেন বৌদের নিয়ে যাবার কথা তিনি তোলেন নি। অম্বিকাও কী একটা কাজে গিয়েছে যেন। খোকা ঘুমিয়েছে। শুধু দুই বউ বসে মৃদু স্বরে গল্প করছিল।

মহাশ্বেতা বললে, 'এমন শীতকালে পাঁকুই কী গো?'

'আমার কথা আর বলো না বড় বৌদি। আমার বারো মাস হাজা।··· আমায় তো দিনেরেতে রর্ধেক সময় ভিজে কাপড়ে থাকতে হয়।···তাও সে তেমন তেমন ভিজে কাপড় নয়, টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়া চাই!'

'কেন গো মোক্ষদা!'

'আর কেন, পাপের ভোগ।...গিন্নীমার যে দুর্দান্ত ছুঁচিবাই।...আমি ছাড়া অত কষ্ট করবে কে বল? পুরোনো লোক বলতে তো এক আমিই।···আমার নইলে আর কারুর কাজ পছন্দও হয় না!···তাও ভাবি মানুষটা না খেয়ে মরে যাবে হয়তো—আমিই না হয় একটু কষ্ট করি।'

'এমন ছুঁচিবাই?'

'আর বল কেন। মাথা খারাপ। আর মাথা খারাপ হবার অপরাধ কি বল! এত পাপ কি সহ্যি করতে পারে? হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষদার মুখখানা কেমন হয়ে যায়। অকস্মাৎ নিজের দুই গালে নিজেই ঠাস্‌ঠাস্ করে চড় মারে, 'এই এই!···ছ্যাখ; কী বলতে কী বলে ফেলেছিলুম!···একে মনিব তায় গুরুজন—মহাপাপ! মহাপাপ!'

মহাশ্বেতা তো অবাক।

প্রমীলাই কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, 'কাজ চুকল তোমার ?'

'এই এখনকার মত চুকল। কত্তাবাবুর খাবার হয়ে গেল। ঠাকুরকে যোগাড় দিয়ে এলুম।·· এখন তোমাদের—সে ঠাকুরই করে নিতে পারবে, নয়তো গোলাপী আছে।···আবার সেই দিদিঠাকরুনের খাবার সময় হলে আমার ডাক পড়বে। কত্তাবাবুর ঠিক সাড়ে আটটা, দিদিঠাকরুন আর দাদাবাবুর রাত এগারোটায়—এ একেবারে ঘড়িধরা। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

অকস্মাৎ এই সময় নীচে থেকে ঝন্‌ঝন্ করে বাসন ছুঁড়ে ফেলবার শব্দ পাওয়া গেল, আর তার সঙ্গে চাপা গালাগালের আওয়াজ। মোক্ষদা 'ঐ—আবার বাধল আজ!' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে ছুটল।

মহাশ্বেতা অবাক হয়ে প্রমীলার মুখের দিকে তাকাল।

'ও দিদি, বুঝলে কিছু ?' মুখ টিপে হেসে প্রমীলা প্রশ্ন করলে।

'না ভাই। অত চট্ করে আমার মাথায় কিছু আসে না।'

'আমি বুঝেছি।'

'তুই বুঝ গে যা। আমার অত ভাল লাগে না।'

সত্যিই তার ভাল লাগছিল না। আসলে মাসীদের জন্য মন কেমন করছিল তার। এই কাছেই তারা কোথায় আছে। এদিকের পথঘাট দেখেই সে চিনেছে। বিশেষ ঐ নতুন বাজার যখন অত কাছে তখন ওদের সিমলের বাড়ি দূর হবে না। তবু দেখা হবে কি না কে জানে! তারা কি এই সব আলো-টালো দেখতে পাবে? কে-ই বা দেখায়! মা-বেচারী পড়ে রইল কোথায়। অনেক বার মনে হয়েছিল—তবু শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে অভয়পদকে মার কথাটা বলতে পারে নি।···

একটু পরেই মোক্ষদা আবার এল, হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বললে, 'ধন্যি নোলা বুড়োর বাবা, নিত্যি নিত্যি এই কেলেঙ্কার! পান থেকে চুন খসলেই থালা বাসন ছোঁড়াছুঁড়ি হবে, আর বামুনের বাপান্ত!'

'কী হল গা মোক্ষদা ?'

'আর কী হবে বল। আত্তিরে কত্তাবাবুর পরোটা হয়, তা সে পরোটা তো নয়, লুচির বাড়া। ওঁর ছখানি পরোটাতে পুরো এক পোয়া ঘি লাগে। মচ্‌মচে হবে কিন্তু কালো দাগ পড়লে চলবে না।—বাসিধোপ কাপড়ের মত ধপ্‌ধপে হওয়া চাই। বলো দিকিন্ বাপু, বারো মাস তিরিশ দিন অত

নিক্তির রোজনে করা যায়? পাতলা কাপড়ের মত হবে, অথচ ভাঁজে ভাঁজে খোলা যাবে—কত নটখটি! আমি ছাড়া রমন কেউ বেলতেই পারে না, তা বেলে-টেলে দিয়ে এসেছি, ঠাকুর ভেজে ভেজে দিচ্ছে, একখানা বুঝি একটু কাঁচা থেকে গেছে, রমনি থালা বাসন ভাঙল, ঠাকুরের চোদ্দপুরুষ স্বগ্গে উঠল!…আর পারা যায় না বাপু!'

'ঠাকুর সহ্য করে?' প্রমীলা প্রশ্ন করল।

'এমনি কি আর করে! এক দিন করে ঐ কাণ্ড হয় আর পরের দিন দিদিঠাকরুন মোটা বখশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা করেন। মাইনেও তো মোটা। পেটে খেলে পিঠে সয়—এই আর কি!'

'মামাবাবু রাত্তিরে কী খান?'

'ঐ তো। পরোটা হবে—চার-পাঁচ রকম ভাজা। দুটো ডালনা চাই, তা শীতকালে এঁচোড় আর গরমকালে কপি না খেলে চলে না। এ ছাড়া হয় মাগুর মাছ না হয় শোল মাছের কালিয়া—আত্তিরে মাংস চলে না ওঁর। এর রোপর আছে রাবড়ি আর সন্দেশ, বাঁধা বরাদ্দ। শেষের পরোটাখানি কড়া করে ভাজতে হবে, সেইটি গুঁড়িয়ে রাবড়ি আর সন্দেশে মেখে খাবেন। গরমকাল হলে তাতেই পড়বে ল্যাংড়া বোম্বাই আম। দাদাবাবুর আত্তিরে কোনদিন কোর্মা হবে, কোনদিন দো-পেঁয়াজি। আবার কত্তাবাবুর যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন দিনের বেলায় মাংস চাই।'

'একটা ঠাকুর পারে এত?' মহাশ্বেতা অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে।

'আঃ পোড়া কপাল! ঠাকুর তো দু জন। ঠিকে এক জন আছে, সে আমাদের সাজার রান্না রেঁধে চলে যায় দু বেলা।…এর তো কত্তাবাবুর আর দিদিঠাকরুনের আন্না করতেই বাজিভোর হয়ে যায়! ওর সময় কখন?'

প্রমীলা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'মামাবাবু দিনের বেলা কী খান?'

'সে আর বলো নি। শুক্তো ঘণ্ট চচ্চড়ি ডালনা ডাল ভাজা—কী নয়? দু রকম মাছ চাই-ই। তার সঙ্গে পোস্ত চাই, সেও বাঁধা একেবারে। কালিয়ে পোলাও যাই হোক না কেন—পোস্তটি চাই। চিরকালের রব্যেস, মাছ মাংস তো জোটে নি কখনও, ঐ পোস্ত দিয়েই ভাত ঠেলতে হয়েছে! শুধু কি তাই—যেদিন মাংস খাবেন সেদিন আবার সাদা ভাতের সঙ্গে এত কটি পোলাও চাই। সে পোলাও যেমন তেমন করে আঁধলে চলবে না। হল্লে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন! মুয়ে আগুন [illegible] ঐ নোলার

জন্যেই তো এত বড় পাপ করা। নইলে এ কা ভদ্দর লোকের কাজ, না বামুনের

'কী করেছেন গা মোক্ষদা ? সেই থেকে বলছ ?' প্রমীলা গা টিপে দেবার আগেই মহাশ্বেতা দুম করে প্রশ্ন করে বসে।

'ঐ দ্যাখ !—কী বলতে কী বলে ফেলছিলুম !—বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, জিভ এখনই শায়েস্তা হল না। না বৌদি, আমরা হাজার হোক ঝি চাকর। তোমরা হলে আপনার লোক !·· আমাদের ওসব কথায় থাকবার দরকার কি ? যা মেজাজ, শুনতে পেলে বুকে বসে জিভ রোপড়াবে। গরীব মানুষ গরীবের মত থাকাই ভাল। এই এই—নাক কান মলা—এসব কথা আর ওঠাব নি !'

সত্যি-সত্যিই নাক কান মলে মোক্ষদা।

প্রমীলা কথাটা ঘুরিয়ে নেয় তৎক্ষণাৎ, 'তোমার আর কে কে আছে মোক্ষদা ?"

'কেউ নেই গো বৌদি - শুধু এক মেয়ে, শিবরাত্তিরের সলতে। কেমন কপাল দ্যাখ না। বলতে গেলে বিনা পণে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলুম—জামাই ভাল হবে মনে করে। কলকাতার কোন্ দোকানে কাজ করে, মোটা মাইনে, মনিবের বাড়ি খায়—নিখরচার বারো টাকা মাইনে। তা আমার এমন কপাল, জামাইটা রেঁড়েল মাতাল হয়ে উচ্ছন্নয় গেল !…কখনও-কখনও বাড়ি আসে—কালে ভদ্দরে। একগাদা ছেলেমেয়ে, মেয়েটা যে কী করে দিন চালায় তা সে-ই জানে। এই আমি গুঁজাছি এখান থেকে, নিহাত দিদিঠাকরুন ভালবাসে তাই—নইলে মাইনে আর কি বল না ? নিজের তবু এক পয়সা জমে না, বুড়ো বয়সে যে কার দোরে গিয়ে দাঁড়াব তা জানি না। আমাদের যতক্ষণ গতর ততক্ষণ রাদর। ছ মাস পড়ে থাকলে ভাত জুটবে ?…তাও কী বলব বৌদি, আজ তিন মাস ধরে এমন অক্ত-আমাশা ধরেছে মেয়েটার—পাত হয়ে গেল একেবারে, বাঁচে কি না সন্দেহ !'

প্রমীলা বলে, 'ওমা, ও তুমি ভেবো না মোক্ষদা। রক্ত-আমাশার খুব ভাল ওষুধ আছে আমার বাপের বাড়ি। আনিয়ে দেব। এক দিন খেলেই সেরে যাবে !'

'আহা, তা হলে তো বেঁচে যাই। তাই দিও বৌদিদি, তাই দিও।… ভাগ্যিস কথাটা উঠল।'

নিচে থেকে কে যেন কী বলে ডাকলে, মোক্ষদা 'আসছি ভাই বৌদি' বলে দ্রুত নেমে গেল।

মহাশ্বেতা ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, 'তোর বাপের বাড়ি এত ভাল ওষুধ আছে মেজ বৌ, কই গত মাসে আমার খোকাটা যখন অত ভুগল, তখন তো তোর মনে পড়ল না!'

'তুই থাম দিকি দিদি। তোর বোকামি দেখলে আমার গা-জ্বালা করে। ওষুধ কোথা পাব? ওকে এখন বললুম—আসল কথাটা তো ওর পেট থেকে টেনে বার করতে হবে!'

মহাশ্বেতা অবাক হয়ে গালে হাত দেয়।

॥ ৫ ॥

এরা দু জনে বসে গল্প করছিল। প্রমীলা রতনদের কথাই বলছিল। মহাশ্বেতার মনটা কিন্তু বারবারই শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছিল কথার ফাঁকে ফাঁকে। মানুষটা একেবারে একা থাকবে। বুড়ীটা পর্যন্ত এখানে নেই। যদি অসুখ-বিসুখ করে।

অবশ্য বেশীক্ষণ নয়—দশ মিনিট পরেই মোক্ষদা ফিরে এল।

'আজ আবার বিলিতী হোটেল থেকে খাবার এল দিদিঠাকরুনদের। তা এক রকম ভাল। আজ ঐ খেয়েই চলবে—এধারে আর রাঁধতে হবে না; উল্‌টে মাংসটা আমাদের ভোগে লাগবে।'

প্রমীলা সে কথায় কান না দিয়েই বলে, 'তোমার মেয়ের বয়স কত আমাকে বলো—সেটাও জানাতে হবে কিনা—আর একখানা পোস্টকার্ট এনে দিও। কালই আমি চিঠি লিখে দেব। আহা, দু মাস ধরে ভুগছে, তার দেহে রইল কি?'

'তবেই বল বৌদি। তুমিই বুঝে ছাখ। তোমরা হলে মান্‌ষের ঘরের মেয়ে, তোমরা বলবে না তো কে বলবে বল। কত মায়া দয়া তোমাদের! এখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা একটা কথা বলেও উদ্দিশ করেন না—তোর মেয়েটা রইল কি মল! দিদিঠাকরুনের কাছে কান্নাকাটি করলে বড় জোর পাঁচটা টাকা ফেলে দেবেন—যা তোর মেয়েকে পাঠাগে যা!'

'হ্যাঁ গো মোক্ষদা দিদি', প্রমীলার কণ্ঠস্বর যৎপরোনাস্তি কোমল হয়ে ওঠে, 'আমাদের ঠাকুরঝি বুঝি নোয়া-সিঁদুর বাঁধা রেখেছি ঠাকরুনবাড়ি?'

'পোড়া কপাল!' ওষ্ঠাধরে বিচিত্র বক্রহাসি ফুটে ওঠে মোক্ষদার, 'নোয়া-সিঁদুর হ'ল কবে যে বাঁধা পড়বে!'

'সে কী গো? কী ব্যাপার দিদি বল তো।'

হঠাৎ চমকে ওঠে মোক্ষদা, 'ঐ ভ্যাখ আমার বুদ্ধির ছিরি! কী বলতে কি বলে ফেললুম ভ্যাখ!...এই, এই!'

আবারও নিজের গালে মুখে চড় মারে মোক্ষদা। কিন্তু তার পরই কেমন এক রকম যেন মরীয়া হয়ে ওঠে সে, বলে—'তা দোষই বা কি! তোমরা হলে আপনার লোক, জানতে পারবেই এক দিন না এক দিন। পিসীমা তো জানেই, দাদাবাবুরাও সব জানে—তোমাদের কাছে বুঝি বলে নি এত দিন? তা চাপা কথা কত দিন চাপা রাখবে তাই শুনি! জানতে তো পারবেই। তবে বাপু একটা কথা—বলো নি যেন আমি বলেছি, তা হলেই অমনি তোমাদের শাশুড়ী টুন্‌টুন্ করে লাগাবে, মাঝে থেকে আমার চাকরি যাবে। তবে এটাও ঠিক—আমি গেলে এক দিনও চলবে না এ সংসারে। এত টেনে করবে কে? গিন্নী-মাকে সামলাবে কে?'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যেন দম নেবার জন্যেই থামে এক বার মোক্ষদা। তার পর গলা নামিয়ে বলে, 'ঐ মিন্‌সে, ঐ যে কত্তাবাবু—ঐ হল গো যত নষ্টের মূল। ওঁর ঐ আখাম্বা নোলা। নোলাই কাল হ'ল একেবারে। মুয়ে আগুন নোলার! ভদ্দরলোকের ছেলে, বামুনের ছেলে—এই কি পিরবিত্তি তোর! এমন খাওয়া মুখে তোলার আগে নিজের মুখে নিজেরা নুড়ো জেলে দিতে পারলি না?·· আমরা তো ছোটলোক, তবু আমরা কখনও এমন পয়সায় নবাবি করতে পারতুম না।'

আরও এক পর্দা গলা নামায় মোক্ষদা। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'কত্তাবাবুর কী ছেল? কাটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করত, আট টাকা মাইনে—এদিক ওদিক দু-চার পয়সা উপরি, এই তো। রবিশ্যি বোনের বে দিতে হয় নি, সে ওনার বাবাই দিয়ে গেছল—যা শুনছি তাই বলছি বৌদিদি—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন—তা বোনের বে নাই বা দিতে হল, চারটে প্রাণীর সংসারই কি কম? কত্তা-গিন্নী, দুই মেয়ে—আট আনা ভাড়ায় খোলার ঘরে থাকত। তা এমন কি আর থাকে না? ক্রেমশ তো মাইনেও বাড়ত, শুনেছি ছাড়বার আগে বারো টাকা অব্‌দি উঠেছেল। কিন্তু পোড়াকপাল আমার—নোলার জন্য দেনায় দেনায় মাথার চুল পজ্জন্ত বিকিয়ে থাকত বারো

মাস, বারো মাসই পাওনাদারদের তাগাদা শুনতে হত। এখন ভগবানেরও বলিহারী কীর্ত্তি—মেয়ে দুটো হল—মানুষ তো নয় একেবারে পরী। যে দেখত চোখ ফেরাতে পারত না—এমন রূপ। ঐ রূপ আর বাপের নোলা—কাল হল। বস্তিতে থাকা তো, দিদিঠাকরুনের যখন সবে বারো-তেরো বছর বয়স, রাস্তার কলে জল নিচ্ছিল গামছা পরে—কে এক হালদার সায়েব ব্যালেস্টার যাচ্ছিল ঐ পথে গাড়ি করে। কী যে চোখে লাগল। ব্যস্—দালালও ছিল হাতধরা, কুট্‌নী লাগালে। এসে বললে হাজার টাকা নগদ আর এক গা গয়না দেবে—সায়েবের বাগান বাড়িতে যেতে হবে!…এমন কথা আমাদের বললেও আমরা মাগীকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম! ওমা—তা নয়, মিন্‌সে বললে, আচ্ছা ভেবে দেখি দু দিন। তার পর বললে, তা হবে না, আমার মেয়ে যাবে না, ভাল দেখে বাড়ি ভাড়া করে ঘর সাজিয়ে দিক্, আমার মেয়ের ঘরেই আসবেন সাহেব। আর, হাজার নয়—দশ হাজার টাকা, আশি ভরি সোনা। সাহেবেরও তখন রোখ্ চেপেছে—সে তাতেই আজী হয়ে গেল। টাকা-কড়ি সোনা-দানা তো দিলেই, বাড়ি ভাড়া করে আসবাবপত্তরে সাজিয়ে দিলে, মাসে মাসে দেড়-শ টাকা মাইনেও বরাদ্দ হয়ে গেল। ব্যস্, বুড়ো নিশ্চিন্তি—এসে বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতে শুরু করলে—মচ্ছি-মুলোয় পাঁচ বেন্ননে! মুয়ে আগুন অমন বামুনের!'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল মহাশ্বেতা। তার চোখ দুটো যত দূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, মনে হচ্ছে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়েই আসবে। কিন্তু প্রমীলা আশ্চর্য রকম স্থির হয়ে বসেছিল, সে শুধু প্রশ্ন করলে, 'সেই হালদার সায়েবই বুঝি এলেন এখন?'

'না না। তিনি এই পাঁচ বছর হল মারা গেছেন। কী নাকি মদের বোতলে হাত কেটে বিষিয়ে উঠে মারা গেলেন দু দিনে। তা এতকাল যার কাছে রইল, দেঁড়ে-মুষে দুয়ে নিলে—তাই কি দুটো দিন তার জন্যে শোক করলে, না বুড়োরই সবুর সইল! এ যেন কোথাকার রাজা বাপু—শামপুকুর না ঝামাপুকুর, না কি ঐ রকম কোথাকার। রাজা খেতাব—তবে ঐ পজ্জন্ত। হালদার সাহেবের মত কাঁচা পয়সা এর নয়। এই যে বাড়ি ঘরদোর দেখছ—এসব সেই তার পয়সায়। কী দিল-দরাজ মানুষ ছেল বাপু কী বলব! তা হ্যাঁ, বলছিলুম, এ মিন্‌সে যেন ওৎ পেতে ছেল। সাত দিনের মাথাতেই এসে বসল। পাঁচ হাজার টাকা নগদ, দু শ মাইনে, জড়োয়া গয়না। তবে

হ্যাঁ—লোকটা ভদ্দর, হালদার সায়েবের মত মদ খায় না, চেঁচামেচি হুল্লোড় নেই। খেলেও সে কোন কোন দিন একটু-আধটু--যেমন আজ! সে কেউ টের পায় না।'

'আর-এক ঠাকুরঝির কী হল?' প্রমীলা প্রশ্ন করে।

'হুঁ—হুঁ, সে বড় শক্ত মেয়ে বাবা। সেও যেমন তেরো বছরেরটি হল, কত্তাবাবু কোন্ এক মারোয়াড়ী বাবু জুটিয়ে আনলে। সেও মোটা টাকা কবুল করেছিল। মেয়ে সটান বাবুর সামনে বেরিয়ে এসে বললে,—মাল আমার, বেচতে হয় আমি হাত পেতে তার দাম নেব। তুমি বাড়ি ভাড়া কর, লোক রাখ, আমাকে নিয়ে চল। নিজে হাতে আমি টাকা গুনে নেব। বাবার হাতে টাকা দিলে আমি কিছু জানি না। জোর করতে এলে এই ক্ষুরে নাক কান কেটে দেব—তা বলে রাখছি! এই বলে সে কোমর থেকে·ইয়া এক ক্ষুর বার করে দেখালে!···মারোয়াড়ী খুব খুশী—সে তিন দিনে সব ব্যবস্থা করে দিলে। উঃ, সে বুড়োর কী আক্রোশ! চেঁচিয়ে, গাল দিয়ে, চুল ছিঁড়ে বাড়ি মাথায় করলে একবারে। কিন্তু মেয়ে একবগ্‌গা ঘোড়ার মত জেদ ধরেই রইল—এতটুকু নুইল না। বললে, আমি·দিদির মত অত বোকা নই। তুমি আমার যদি এত বড় সব্বনাশ করতে পারো তো তুমি আমার কিসের বাবা, কিসের গুরুজন! টাকার ওপর বড় যদি কিছুই না থাকে তো টাকা আমিও চিনব এখন থেকে, তোমাকে দেব কেন? তা সে বেশ আছে, এরই মধ্যে দুখানা বাড়ি করে ফেলেছে, মারোয়াড়ীর দেখা দেখি নাকি ফাট্‌কা খেলে, তাতেও অনেক পয়সা কামিয়েছে!'

'তার নাম কি দিদি? কৈ, তার নাম তো কখনও শুনি নি।'

'শুনবে কি করে! কত্তা বলেন, সে মরে গেছে। তার নাম ধনু, রতনমণি আর ধনমণি, আদর করে নাম রাখা হয়েছিল।'

মোক্ষদা এতক্ষণ পরে একটু চুপ করে থাকে। এরাও নিঃশব্দে বসে যেন কথাটা সম্পূর্ণ বোঝবার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ ধরে। তার পর প্রমীলাই আবার প্রশ্ন করে, 'তা মামীমা কিছু বলেন নি?'

'বলে নি আবার! কান্নাকাটি উপোস মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি অনেক কিছুই করেছিল। কিন্তু এ দস্যির সঙ্গে পারবে কি করে? চণ্ডাল রাগ—এখনও, ঘেন্নার কথা বলব কি, এই ঝি-চাকরদের সামনেও, ধরে ধরে চোরের মার মারে। এইসব জন্যেই তো কতকটা গিন্নীমায়ের মাথাটা কেমন হয়ে গেছে।

ঐ দেবতাধর্ম্ম বারব্রত নিয়ে থাকে, ছুঁচি-বাই বেড়েছে। আদ্দেক দিন তো খাওয়াই হয় না। আমি ভিজে কাপড়ে সব যে'গাড় করে দেব, উনি নিজে দুটো ফুটিয়ে খাবেন! খাওয়া তো ছাই, এক বেলা শুধু দুটো ভাতে ভাত; তা'ও দুধ নয়, ঘি নয়, কিছু নয়। তাই কি সব দিন পেটে যায়? বাড়িময় মাছ-মাংসর হল্লোড়, কাকচিলেরও অভাব নেই। উনুনের ধারে মাছের কাঁটা এসে পড়ল কি জলের ছিটে লাগল—একটু সন্দ হলেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। বলে তো—নিহাৎ আপ্তঘাতী হওয়া পাপ তাই—নইলে কবে গলায় দড়ি দিতুম! এন্‌নি করে যদ্দিন যায় যাক্—আমার আর ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবার সাধ নি। তা বলবেই না বা কেন বল—গিন্নীমা যে খুব বড় বংশের মেয়ে। কী রূপ ছেল বয়েসকালে। আমরাও দেখেছি সোনার পিতিমে। এখন অবিশ্যি তার কিছুই নেই। না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে পোড়া কাঠ হয়ে গেছে!'

বলতে বলতেই কান খাড়া হয়ে ওঠে মোক্ষদার। অভ্যস্ত কানে অতি ক্ষীণ পদশব্দও বুঝি পৌঁছয়। তাড়াতাড়ি নিজের কান নিজে মলে ফিস-ফিসিয়ে বলে, 'কি বলতে কি সব বলে ফেললুম ছ্যাখ। দেখো বৌদিরা, জানে মেরো নি যেন!'

সিঁড়ির কোণ থেকে ছাদের অন্ধকারেই সাদা কাপড় পরা দুটি মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষীরোদা আসছেন—তাঁর সঙ্গে আর এক জন।

ক্ষীরোদা হেঁকে বলেন, 'কৈ গো বৌমারা, কোথায় গেলে গো সব। তোমাদের মামীমা এসেছেন—পেন্নাম করোসে—'

অত্যন্ত শীর্ণ—প্রায় ছায়া-মূর্তির মতই একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন। মূর্তিমতী বিষাদের মত মুখখানি। এ মুখ যে এককালে অত্যন্ত সুশ্রী ছিল, প্রায় রতনের মতই ছিল—অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলে তার একটা আঁচ পাওয়া যায় মাত্র। টানা চোখ দুটিতে আগের সে আবেশ আর নেই—তবু বিস্তৃতিটা আছে। গায়ের রং পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বেশভূষাও তেমনি, কঙ্কালসার হাত দুটিতে শুধু শাঁখা আর কড়। দেহের কোথাও একরত্তি সোনা নেই। পরনেও সাধারণ কস্তাপাড় নতুন-ওঠা দেশী মিলের মোটা গুনচটের মত শাড়ি।

মহাশ্বেতা গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলোর জন্যে হাত বাড়াতেই তাড়াতাড়ি হাত দুটো ধরে বুকে টেনে নিলেন তিনি, মাথায় পিঠে হাত

বুলিয়ে বললেন, 'ছি মা, পায়ে হাত দিতে নেই। সতীলক্ষ্মী তোমরা, তোমরা পায়ে হাত দিলে সে পাপ রাখার যে ঠাঁই থাকবে না মা!'

ততক্ষণ কিন্তু প্রমীলা এক ফাঁকে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে নিয়েছে। তাকেও বুকে টেনে নিয়ে দু হাতে দু জনকে চেপে ধরে বললেন, 'সীতা সাবিত্রীর মত স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করো মা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো, সন্তানদের কল্যাণ করো। আমাদের আশীর্বাদের কোন মূল্যই নেই মা, হয়তো অধিকারও নেই। মা সতীকুলরাণী তোমাদের রক্ষা করুন এইটুকুই শুধু তাঁকে কায়মনোবাক্যে জানাই প্রতিদিন '

বলতে-বলতেই তাঁর দুই চোখের কূল ছাপিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি ওঁর বাহুমূলটা একটু টিপে দিতেই যেন অনেকক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমরা এই বার নীচে যাও মা, ঠাকুরঝির জল খাওয়া হয়ে গেছে। তোমরা যাহোক দুটো মুখে দিয়ে নাও।··· মোক্ষদা মা, এদের নিয়ে যাও—'

মহাশ্বেতা বললে, 'কিন্তু ঠাকুরপো এল না যে—।'

ক্ষীরোদাই বৌদির হয়ে জবাব দিলেন, 'সে গেছে গড়ের মাঠে আলো দেখতে, তার ফিরতে অনেক রাত হবে। তোমরা খেয়ে নাও গে, তাতে কোন দোষ নেই! সে যখন হোক এসে খাবে'খন। ঠাকুরের হাঁড়ি হেঁসেল তুলতে তুলতে যার নাম রাত বারোটা। ততক্ষণে সে এসে পড়বে।'

মোক্ষদা তাড়াতাড়ি ওদের প্রায় টেনে নিয়েই নীচে নেমে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্যামার মা রাসমণি জমিদারের স্ত্রী হয়েও ভাগ্যচক্রে একই সঙ্গে স্বামী শ্বশুরবাড়ি এবং স্বামীর ঐশ্বর্য সব হারিয়ে বসেছিলেন। শুধু পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অলঙ্কার এবং কাঁঠালকাঠের দুই বড় সিন্দুক বোঝাই কাঁসার বাসন। তাইতেই তিনি দীর্ঘকাল স্বতন্ত্রভাবে আলাদা বাড়িভাড়া করে থেকে সম্ভ্রান্ত বংশের গৃহিণীর মর্যাদাতেই জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তবে তিনি বেঁচেও ছিলেন অনেকদিন। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি যেদিন চোখ বুজলেন সেদিন তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যা উমা চোখে অন্ধকার দেখল। তার স্বামী শরৎ এক বিচিত্র মানুষ। সে ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের পরিবর্তে শুনিয়ে দিয়েছিল যে সে এক রক্ষিতাকে ভালবাসে—এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে সে পারবে না। মা জ্বালাতন করছিল বলেই শুধু সে উমাকে বিয়ে করেছে। এবং সত্যিসত্যিই তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক সে রাখে নি। শাশুড়ীর নির্যাতন অসহ্য হওয়াতে যখন পাশের বাড়ির একটি মহিলা তাকে উদ্ধার করে এনে রাসমণির কাছে রেখে যান তখনও সে কোন খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে নি। অবশ্য তার পর দু-এক বার দেখা হয়েছিল বৈকি! মা যেদিন মারা যান সে দিনও সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, হয়তো বা কিছু সাহায্যও করতে পারত, কিন্তু যে স্বামী কোনদিন তাকে—ভালবাসা দূরে থাক্—স্পর্শ পর্যন্ত করলে না, যে স্বামী স্পষ্টতই এক বার-নারীর প্রেমের আকণ্ঠ মগ্ন—তার কাছ থেকে তার অবহেলিত দেহটাকে রক্ষা করার জন্য পয়সা ভিক্ষা করার চেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলাও যে ঢের সহজ! না, উমা সে ভিক্ষা চায় নি।

অথচ সেদিন আর কোন আশ্রয়ই ওর ছিল না। রাসমণি তিনটি মেয়েরই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু কারুরই নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। উমার বড় বোন কমলা অবস্থাপন্ন চরিত্রবান লোকের হাতেই পড়েছিল কিন্তু অত্যন্ত অকালে বিধবা হওয়ার

ফলে সেও আজ নিরাশ্রয়। সামান্য গহনা-বেচা কটি টাকার সুদে কায়ক্লেশে তার সংসার চলে। উমার যমজ বোন শ্যামা—তার স্বামী নরেন তো আরও অমানুষ। সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে ভিখারীর পর্যায়ে দাঁড় করিয়েও সে থামে নি। একেবারেই পথে বসত ওরা, কোন মতে পদ্মগ্রামের সরকার বাড়ির নিত্য সেবার কাজটা যোগাড় হয়েছিল তাই মাথা গোঁজবার মত একটু আশ্রয় এবং দৈনিক আধ সের আতপ চালের এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে। তাও সে কাজটুকুও তার দ্বারা হয়ে ওঠে না, ঠাকুরের ভার একরকম ঠাকুরের নিজের ওপরই। সমস্ত সংসারের ভার তরুণী স্ত্রীর ওপর তুলে দিয়ে অনায়াসে সে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করত এবং মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ এসে তাদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে, এমন-কি কিছু চুরি করেও আবার গা-ঢাকা দিত।

সুতরাং কার কাছে যায় উমা? শুধু দেহধারণের প্রশ্নই নয়। নবীন বয়স এবং অসামান্য রূপ, এই দুটি পরম শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ও চাই।

অগত্যা কমলার কাছে এসে দাড়াতে হয়েছিল তাকে। সিমলের কোন সংকীর্ণ গলির এক প্রাচীন বাড়ির একতলায় দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া করে দুই বোন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে এসে কোন মতে মাথা গুঁজে ছিল। উমা দু টাকা এক টাকা মাইনের কয়েকটি টিউশনি করত, আর কমলার ছিল মাসিক ষোলটি টাকা বাঁধা আয়। তাইতেই কোনমতে চলত ওদের। এরই মধ্যে গোবিন্দর লেখাপড়া শেখার খরচাও ছিল। সুতরাং অবসর বস্তুটি ওদের জীবনে একেবারেই ছিল না—না চিন্তার, না বিলাসের।—তবু সেই অন্ধকার ঘরেও একদা খবরটা এসে পৌঁছয় 'রাজা আসছেন'।

উমা যেখানে যেখানে মেয়ে পড়ায়, সব জায়গাতেই দেখে আয়োজন। গোবিন্দ ইস্কুল থেকে এসে খবর দেয়—তারা দু দিন বাড়তি ছুটি পাবে আর তাদের লেবু-সন্দেশ খাওয়ানো হবে। 'কিন্তু রাজা দেখার কী হবে মা?' মা'র দিকে উৎসুক মুখ তুলে গোবিন্দ প্রশ্ন করে।

কমলা উত্তর দিতে পারে না। ওদের বাড়িওলারা কাকে ধরে একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। তা ষেটের কোলে ওদেরই তো চৌদ্দ জন—মেয়েছেলে আর ছোট ছেলে মিলিয়ে। কী করে ধরবে কে জানে! বুড়ো গিন্নী বলেছেন, 'সে আমরা যেমন করে পারি ধরাব। তবে ওর বেশী আর হবে না'—কতকটা কমলাদের শুনিয়েই শেষের কথাগুলো বলা।

অবশ্য ধরেও ওদের ঐ ছেলে বুড়ো চোদ্দ জন একখানা গাড়িতে—তা কমলা নিজের চোখেই দেখেছে। কর্তার ভায়রা-ভাই এক প্রেসের ম্যানেজার। বুঝি কোন্ থিয়েটারের প্লাকার্ড ছাপে, মধ্যে মধ্যে মেয়েদের এক গাড়ি পাস দেয়। তখন ঐ একখানা গাড়ির মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে ওঁরা ধরান ঐ চোদ্দ জনকে। প্রতিদিনই কমলার ভয় হয় বুঝি সর্দিগর্মি হয়ে দু-একটা ছোট ছেলেমেয়ে মরে -কিন্তু প্রতিদিনই সে আশঙ্কাকে উপহাস করে ফেরবার সময় একখানা গাড়ি চড়ে ফেরে ওরা। যাবার সময় অবশ্য চার আনা ভাড়ার ওপর আরও দু আনা বখশিশ দিতে হয়—কিন্তু তাতে লোকসান নেই। গাড়ির ছাদের ওপর খাবারের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, পাখা, কাঁথা, বালিশের পুঁটুলি নিয়ে ওঁরা সন্ধ্যার আগেই হৈ-হৈ করতে করতে চলে যান—ফেরেন একেবারে ভোরবেলা। আজকাল রেওয়াজ হয়েছে দুখানা আড়াইখানা করে নাটক হয় সারারাত ধরে—এক-এক দিন বেশ বেলাও হয়ে যায়। তা ছাড়া আগে আরম্ভ হত রাত নটায়, এখন সাতটা না বাজতে বাজতে শুরু হয় -ছেলেমেয়েদের দুধ, বার্লি, কাঁথা সবই গুছিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সে যাক্—কমলার ওদিকে কোন আশা নেই। উমা যাদের বাড়ি পড়ায় তাদের মধ্যে এক ডাক্তারের একখানা গাড়ি আছে—সেই গাড়িটির ভরসাতে নাকি একরাশ কুটুম্ব এসে জড়ো হয়েছে। তবু তাঁরা উমাকে বলেছিলেন যে এক দিন অন্ততঃ আলো দেখাতে নিয়ে যাবেন তাকে কিন্তু উমা রাজী হয় নি। দিদিকে ফেলে, বিশেষ করে গোবিন্দকে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এক উপায় আছে গাড়ি ভাড়া করে আলো দেখতে যাওয়া কিন্তু তাতেও দুটি বড় বাধা, প্রথমত একটু শক্তগোছের পুরুষমানুষ না হলে শুধু গোবিন্দর ভরসাতে অচেনা গাড়োয়ানের সঙ্গে যাওয়া যায় না -দ্বিতীয়ত সব চেয়ে বড় বাধা হল –টাকা। গাড়িওলারা নাকি হাতে মাথা কাটছে। আলো দেখাতে ভাড়া চাইছে দু টাকা তিন টাকা পর্যন্ত –রাজা আসবার দিন নাকি পাঁচ টাকা ছ টাকা পড়বে -- এ ওদের সাধ্যাতীত।

সুতরাং কমলা শুষ্ক মুখে ঘাড় নাড়ে, 'কী বলব বাবা, আমাদের কী সে ক্ষমতা আছে?'

গোবিন্দ ম্লান চোখ দুটি মাটিতে নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আর নিতান্ত ছোট্ট ছেলেটি নেই। গত কয়েক বছরেই সে এটুকু বুঝে নিয়েছে, অন্য অন্য ছেলেদের মত আব্দার করা তার সাজে না।

এরই মধ্যে এক দিন সকালে অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক কানে এসে পৌঁছয়, 'কৈগো দিদি কোথায় গেলে ? উমি ! উমি বাড়ি আছিস নাকি ?'

প্রথমটায়—পরিচিত হলেও ঠিক মনে করতে পারে নি উমা। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ গলার আওয়াজ তার ভগ্নীপতি নরেনের।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সে। আর যাই হোক নরেন তাদের এ ঠিকানা খুঁজে বার করবে এ আশঙ্কা সে কখনও করে নি। পাঁচ জনের সঙ্গে বাস, বাড়িওলারা, বিশেষত বুড়ো গিন্নী বড় বেশী কৌতূহলী, তাঁর মুখও বড় প্রখর। হয়তো এই নিয়ে অন্ততঃ বিশ দিন খোঁটা দেবেন। নরেনের তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, হয়তো এমন বেশভূষায় এসে দাঁড়াবে যে পরিচয় দিতেই লজ্জা করবে। আর তেমনি তার কথাবার্তাও—

উমা বেরিয়ে এসে দেখলে তার অনুমান সবটা ঠিক না। বেশভূষাটা আজ অন্ততঃ চলনসই। একটা ধোয়া থান পরনে এবং গায়ে একটা ফরসা উড়ুনি। হয়তো সদ্য কোন ক্রিয়া-কর্মে পাওয়া। যদিও কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে পরা এবং অবিরত রোদে-জলে চলার ফলে পা দুটির অবস্থা বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজের পায়ের মতই, তবু এক জোড়া নতুন চটি থাকায় খানিকটা ভদ্রতা বজায় আছে। হাতে অতি পুরাতন এবং ছেঁড়া একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি থেলো হুঁকো ও কলকে। বেশ প্রশান্ত এবং সহাস্যমুখে ওধারে সারি সারি দাঁড়ানো বাড়িওলাদের দিকে তাকিয়ে আছে। উমা যত তাড়াতাড়িই বেরিয়ে আসুক—বুড়ী গিন্নী তারও আগে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং নিঃশব্দ-কৌতুকে নিরীক্ষণ করছেন আগন্তুকটিকে।

উমা বেরিয়ে আসতেই তিনি মুখ টিপে প্রশ্ন করলেন, 'কে হয় গা তোমাদের, মা উমা ?'

উমা উত্তর দেবার আগে নরেন নিজেই উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি ওদের ভগ্নীপতি হইগো মা-ঠাকরুন। এ বাড়ির আমি মেজ-জামাই !'

'বেশ জামাই !' আবারও মুখ টিপে বলেন তিনি।

প্রীত এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে নরেন উত্তর দেয়, 'সে যা বলেন নিজগুণে, হেঁ হেঁ।

তা ভাল, ভাল—খোঁজখবর যে রাখেন এই ভাল। আপনাদের ভরসাতেই তো এখানে ফেলে রাখা। সত্যিই ধরুন দুটো সোমত্থ মেয়ে থাকে—হুট্ করে অমনি পুরুষ আসা তো ঠিক নয়।

'তুমি বাছা বুঝি এদের গার্জেন? তা কৈ এতকাল তো দেখি নি কোন দিন?'

'দেখবেন কী করে মা, নিজের শুয়োরের পাল দেখব না এদের দেখব! মাগী তো বিইয়েই খালাস—কী জ্বালা তা আমিই জানি। দেখেশুনে ইচ্ছে হয় এক-এক দিন দিই গোরবেটার জাতকে কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে। কেউ মানুষ হবে ভেবেছেন? কেউ না, কেউ না।'

উমা তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। বাড়িওলাদের সবাই হাসছে। পাগল বা সং দেখলে যেমন হাসে। সে প্রাণপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলায়। বলে, 'ভেতরে আসবেন, না সারাদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে বকবেন!'

'না—না—এই যে যাই।'

ভেতরে এসেই বলে, 'ও চামডাইনী বুড়ী কে রে? বাড়িউলী বুঝি? মাগীর চিপ্‌টেন কেটে কেটে কথা ছ্যাখ না এক বার।'

ততক্ষণে কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই যে দিদি, দাও দিকি একটু চা তৈরী করে। এ আবার পোড়ার এক অব্যেস করে ফেলেছি। ভয় নেই, চা-চিনি সব নিয়ে এসেছি যোগাড় করে। তার পর উমি, সব ভাল তো?'

উমা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে, 'এখানকার ঠিকানা কে দিলে আপনাকে? ছোড়দি?'

'বজ্জাত মাগী দিতে কি চায়? কত করে বললুম হারামজাদীকে—কিছুতেই দিলে না। আমিও তেমনি—বিছানার নীচে থেকে তোদের পুরোনো একখানা চিঠি টেনে বার করলুম। তাতেই তোদের ঠিকানা লেখা ছিল এ বাড়ির। তা সে-ও হয়ে গেল অনেকদিন। ছ মাস আগের কথা—ঘুরতে ঘুরতে এদিকে আসাই হয় না—নিহাত এই রাজা আসছে শুনলুম তাই! কলকাতায় আসতে হবে, মনে পড়ল, ব্যাগের মধ্যে থেকে টেনে বার করলুম চিঠিখানা। বলি আস্তানা যখন একটা আছেই তখন আর ভাবনা কি? এই নাও যোগাড় সব—'

চা-চিনির মোড়ক দুটো বার করে দিয়ে নিজে তামাক সাজতে বসে নরেন।

কমলা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে, 'তা ওরা সব আছে কেমন?'

'আছে, আছে—ভালই আছে।' মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে উত্তর দেয় নরেন।

উমা বিরক্তি আর গোপন করে না। বলে, 'তুমিও যেমন দিদি, ও তাদের কি খবর রাখবে? ছ মাস আগে এক বার গিয়েছিল তা তো শুনলেই।'

হা-হা করে প্রায় অট্টহাস্যে হেসে ওঠে নরেন।

'বেড়ে বলিছিস ভাই। জিতা রহ। যাই বল দিদি, উমিটা কেলেভার আছে। আর নইলে কি মাস্টারি করতে পারে! কথাটা বলেছে মন্দ নয়। কতকটা তাই বটে। তবে কি জানিস উমি, ওরা ভালই থাকবে তা আমি জানি। ও মাগীর কি মরণ আছে? মলে ওরও হাড় জুড়োয়—আমারও হাড় জুড়োয়। যমের অরুচি। ওদের মরণ নেই—বুঝলি, ওদের মরণ নেই। আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে—

আরও এক দফা হেসে নিয়ে কলকেতে ফুঁ দিতে থাকে নরেন। অসহ্য ক্রোধ দমন করতে না পেরে উমা সরে পড়ে।

কমলা চা এনে ধরে দিয়ে বললে, 'তার পর? মতলবটা কি?'

'মতলব! ঐ যে বললুম রাজা আসছে, বাজি পুড়বে, আলো জ্বলবে, তাই দেখতে এলুম। তা আস্তানা তো চাই। তোমরা থাকতে আর কোথায় যাব বল!'

'এখানে থাকবে কোথায়? আমরা এক ঘরে থাকি কোন মতে। ও ঘরটা তো মালে ঠাসা। এর ভেতর পুরুষমানুষ তুমি থাকবে কোথায়?'

'ও, সেজন্যে কিছু ভেবো না দিদি। সে আমি ঠিক করে নেব। ঐ যে বাড়ি ঢুকতে চলনটায় বেঞ্চি গাথা রয়েছে একটা? ঐখানেই তোফা শুয়ে থাকব এখন। আমরা পুরুষমানুষ, সব অব্যেস আছে। বলে কত রাত গাছতলায় কেটে যায়, তো পাকাবাড়ির ব্যবস্থা! সেজন্যে কিছু ভেবো না। তুমি এখন রান্না চড়াও দিকি, বেশ হিং-আদা-মৌরি দিয়ে যেমন রাঁধো বিউলির ডাল, অনেক দিন খাই নি। আর কড়াইশুঁটির ডালনা। সেবার খেয়ে গিয়েছিলুম যেন অমর্ত, আজও মুখে লেগে আছে। খাওয়ার আমার কোন গোল নেই। বেগুন-

পোড়ার সঙ্গে দু কুচি আদা পিঁয়াজ দিও তাতেই দিব্যি খাওয়া হয়ে যাবে। আর একটা আলুভাতে। ব্যস্!'

চা শেষ করে নরেন হুঁকোয় টান দেয়।

॥ ২ ॥

বিকেল বেলা টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠে নরেন বলে, 'দিদি যাবে নাকি আলো দেখতে? যাবে তো চলো। গোবিন্দ কী বলিস?'

গোবিন্দের চোখ আগ্রহে, ঔৎসুক্যে জ্বলতে থাকে। সে মা'র মুখের দিকে চায়।

কমলা তখনই কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে না। বিব্রত মুখে উমার দিকে চায়।

নরেন আবারও বলে, 'চল না দিদি, সেই তো গাড়ি করতেই হবে একটা— তোমাদেরও দেখা হয়ে যাবে।'

তুমি কি গাড়ি করবে নাকি?'

'ওমা তা করব না! তোমাদের কি নিয়ে যাব হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে? আমি একা হলে আলাদা কথা—'

'বেশ তো তুমিই যাও না ভাই!'

'সে কী কথা। তা কখনও হয়। এলুম যখন, তোমাদেরও কেউ নেই —আমার তো এটা কত্তব্যের মধ্যে পড়ল গো!'

কমলা উমার মুখের দিকে চায়।

উমা ঘাড় নাড়ে, 'না দিদি, আমি কোথাও যাব না।'

কমলা বলে, 'তা হলে আমিই বা যাব কেমন করে। তুমি একাই যাও ভাই—'

'তাই তো, যাবে না? গোবিন্দটা—? গোবিন্দ না হয় চলুক।'

উমা দৃঢ়স্বরে বলে, 'না, গোবিন্দ একা আপনার সঙ্গে যাবে না।'

'যাবে না? তবে থাক্।'

গোবিন্দ মিনতি করে, 'তুমি চল না ছোট মাসী। তুমি গেলেই আমাদের সকলের যাওয়া হয়। তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি ছোট মাসী—চল—'

সে দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উমা।

কমলা সমস্ত বুঝে বলে, 'তাই চ উমা। কোথাও তো যাস না!'

নরেনে মহা উৎসাহে গিয়ে গাড়ি ডেকে আনে।

এ পাড়া থেকে বেরিয়ে বৌবাজার ধর্মতলা হয়ে সাহেব-পাড়া পড়বার মুখে গাড়ি আট্‌কে গেল। বিষম ভিড়, অসংখ্য গাড়ি, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, ফিটন, টমটম—ভাড়াটে পাল্‌কি গাড়ি—কিছুরই অভাব নেই। সদ্য আমদানি দু-একখানা মোটর গাড়িও আছে। এদিক ওদিকের গাড়ি এমন 'জ্যাম্‌' হয়ে আছে যে কোন দিকেই কোন গাড়ি নড়ছে না—শুধু চারদিক থেকে চেঁচামেচি হচ্ছে।

এরই মধ্যে একটা ডাক আসে কোথা থেকে, 'বড় মাসীমা ছোট মাসীমা —শুনছ!'

মহাশ্বেতার গলা। উমা ত্রস্তেব্যস্তে চারিদিকে চায়।

'এই যে এদিকে।' আবারও শোনা যায়।

'আঃ! চুপ কর না বৌমা। চারদিকে পুরুষমানুষ সব—কী মনে করবে।' কার চাপা-গলার শাসনও কানে যায়।

অর্থাৎ খুবই কাছে। কিন্তু দেখা যায় না।

অবশেষে নরেনই দেখতে পায়। ঠিক ওদের গাড়ি সমান্তরালে বিপরীত-মুখী গাড়ি একটা। মাঝে আর একখানা বিপুল বগিগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় এরা দেখতে পায় নি। কোচবক্সের নীচে একটা খাঁজ দিয়ে মহাশ্বেতা দেখেছে।

নরেনই নেমে গেল। কোন মতে ঘোড়ার মুখ বাঁচিয়ে গলে চলে গেল ওদের গাড়ির ফাঁকে।

'তুই এখানে কোথা থেকে রে? ও এই যে বেয়ান প্রাতঃপেন্নাম। এই যে বাবাজী—'

'আঃ! কী যে কর বাবা। আমার মেজ দ্যাওর।'

'অ। বেশ বেশ। তা তোরা কোত্থেকে। কার গাড়ি এ?'

মহাশ্বেতা উত্তর দেবার আগেই অম্বিকা তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, 'আমার মামার এক বন্ধুর গাড়ি—'

'এসেছ কোথায় বাবাজী?'

'আমার মামার বাড়ি।'

'তা বেশ বেশ। ঠিকানাটা দাও—কাল সকালে দেখা করব'খন।'

আজ্ঞে হ্যা দেব বৈকি। বরং আপনাদেরটাই দিন না—কাল সকালে এদের নিয়ে যাব'খন।'

অম্বিকাপদ চট করে ওদিক থেকে নেমে পড়ে।

'আমি যাব তোমার সঙ্গে ঠাকুরপো?' ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'পাগল! এই গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে দিয়ে?'

কিন্তু এর ভেতরেই গাড়ির ভিড় পাতলা হয়ে আসে। এদের গাড়োয়ানও ঘোড়ার পিঠে চাবুক দেয়। অম্বিকাপদ আবার গাড়িতে চড়তে যায়।

'বাবাজী, একটা কথা —'

ওর জামার হাত ধরে টানে নবেন; চুপি চুপি বলে, 'একটা টাকা হবে বাবা? আমি বাড়ি ফিরেই পাঠিয়ে দেব। কুটুমের ঋণ রাখব না...ছাখ না, এরা ধরলে এত করে—না বলতে তো পারি না। তা পয়সা কিছু কম পড়ে গেল—'

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে অম্বিকাপদ একটা টাকা বার করে দিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল। গাড়ি তাব আগেই চলতে শুরু করেছে।

নরেনের গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে। পুলিস এসে সরিয়ে দিচ্ছে গাড়ি। নরেন ছুটতে ছুটতে এসে নিজেদের গাড়িতে চড়ে বসল।....

সাহেব-পাড়ায় আলো দেখে নরেন বেলভেডিয়ার যাবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু উমা বেঁকে দাঁড়াল। সে এখনই ফিরবে। তার ভাল লাগছে না একটুও। তা ছাড়া নরেনকে সে চিনে নিয়েছে এই ক বছরে বেশ ভাল রকমই। ওর এই আত্মীয়তাতে সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কোথা দিয়ে কী করে বসবে—হয়তো সে ভয়ও একটু ছিল।

অগত্যা ফিরতে হয়—গোবিন্দ এবং নরেনের ঘোরতর অনিচ্ছাতেও। বাড়ি ফিরে এল ওরা রাত এগারোটারও পর। ভিড়েই দেরি বেশী হয়েছে। ঘণ্টা হিসাবে গাড়িভাড়া—পাঁচ টাকা ভাড়া পাওনা হয়ে গেছে গাড়োয়ানের।

কমলারা নেমে ভেতরে চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দু জনেই ফিরে দাঁড়াল!

পাগলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে নরেন, আর অনবরত মুখে একটা চাপা 'হায়, হায়' 'হায় হায়' ধ্বনি করছে।

'কী সর্বনাশ! এ কী বিপদে পড়লুম গো!...এখন কী করব গো!'

'কি, হয়েছে কী?' কমলা এগিয়ে আসে তাড়াতাড়ি—

'ট্যাঁকে—ট্যাঁকে টাকা কটা রেখেছিলুম দিদি—সে টাকা ফরসা। বললে বিশ্বাস না কর—এই দ্যাখো—।'

সে উড়ুনিটা তুলে ট্যাঁকটা দেখাবার ভঙ্গী করে একটা।

'এখন উপায়?'

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে নরেন বলে, 'নিশ্চয় ঐ ওদের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেছি—তখনই কোন্ ব্যাটা আমার এই সর্ব্বনাশটি করে বসে আছে! দোহাই দিদি, এই নাককান মলছি আর কখনও যদি করি এমন—এযাত্রা মান বাঁচাও। যেমন করে পারি আমি সাত দিনের মধ্যে—।'

কমলা উমা দু জনেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর যাই হোক—এতটার জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। মাসিক ত্রিশ টাকারও কম আয়ে তাদের তিনটি প্রাণীকে ঘরভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে হয়—তার ভেতর থেকে পাঁচ টাকা অপব্যয় করার কথাটা ধারণা করতেও দেরি হয় বৈকি!

কাছে এসে নরেন বলে, 'টাকা যদি না থাকে তো দু-এক কুচো সোনা-ফোনা রেখে না-হয় বাড়িউলী মাগীর কাছ থেকেই ধার নিয়ে চালিয়ে দাও দিদি—আমি কাল সেটা পোদ্দারের কাছে রেখে ওদের টাকা মিটিয়ে দেব। আমি এই কথা দিচ্ছি দিদি, যেমন করে হোক—। সাত দিনও যাবে না! দেখে নিও—'

স্তম্ভিত স্থাণুবৎ কমলার হাতে একটা টান দিয়ে উমা বলে, 'চলে এসো দিদি। যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। এখন আর ভেবে লাভ কি। যা হোক করে বাক্স ঝেড়ে দিয়ে দাও। এত রাত্তিরে আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না। এরা এখনো ফেরে নি তাই রক্ষে, নইলে এতক্ষণে সার দিয়ে এসে দাঁড়াত।'

সত্যিই তখন আর দেরি করার সময় নেই। গাড়োয়ান অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর তার বেশ চড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই—

অগত্যা কোনমতে পা ধুয়ে ভেতরে গিয়েই বাক্স খুঁজতে বসতে হয়। এ কৌটো ও কৌটো করে শেষ অবধি পাঁচ টাকা পুরো হয় বটে—তবে পরের দিনের জন্যে পাঁচটা পয়সাও পড়ে থাকে না ওদের। মাসের শেষ—রাজা আসার হাঙ্গামে সকলেই ব্যস্ত—কমলার সুদ এবং উমার মাইনে—কবে

পাওয়া যাবে তারও ঠিক নেই- সবটাই অনিশ্চিত। উমার যেন কান্না পেয়ে যায়।

কমলা নরেনের হাতে দিতে যাচ্ছিল টাকাটা—উমা বললে, 'না দিদি, গোবিন্দ দিয়ে আসুক। আবার যদি কিছু হারায় ও থেকে তো আর কোন উপায় থাকবে না!'

নরেন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় উমার দিকে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

গাড়োয়ান ততক্ষণে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েচে।

মুখহাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি দুপুরের তৈরী রুটি তরকারি নরেন আর গোবিন্দকে খেতে দেয় কমলা। নরেনের দুঃখ আর অনুতাপ ততক্ষণে কমে গেছে, সে মহা উৎসাহে গোবিন্দকে বোঝাতে লাগল, আলিপুরের দিকে গেলে এর চেয়ে ঢের বেশী আরও ভালো ভালো আলো দেখতে পাওয়া যেত।

কমলারও অসহ্য বোধ হচ্ছিল সত্যি কথা, তবু সে নিজে বোধ হয় কিছুই বলতে পারত না—কড়া কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না—উমা বাইরে থেকে ডেকে বললে, 'ওঁকে বলে দাও দিদি, কাল সকালেই যেন অন্য কোথাও ব্যবস্থা করেন। এখানে আর সুবিধে হবে না। আর এক পয়সাও ঘরে নেই যে ওঁকে খাওয়াব—'

একেবারে যেন আগুনের মত জ্বলে ওঠে নরেন, 'দিদি, তোমরা কি ভাবছ আমি মিছে কথা বলছি, আমার চুরি যায় নি! কোন্ বেজন্মা মিছে কথা বলে, কোন্ শুয়োরের বাচ্ছা মিছে কথা বলে! আমি তা হলে এ দায় ঘাড়ে করব কেন! নিজে তো পায়ে হেঁটে দেখতে পারতুম—'

হঠাৎ গোবিন্দ বলে ওঠে, 'মেসোমশাই, তখন ঐ যে ও-গাড়ির সেই ভদ্দরলোকের কাছ থেকে টাকা না কি চেয়ে নিয়ে চট্ করে পেটকাপড়ে বেঁধে ফেললেন- সেটাও কি চুরি গেছে?'

ক্ষোভে এবং অভিমানেই বোধ করি নরেনের বাক্‌রোধ হয়ে যায়। খানিক পরে—খাওয়া শেষ করে উঠে বলে, 'বেশ—বললেই হত সোজাসুজি যে জায়গা হবে না—ছেলেবুড়ো সবাই মিলে এমন অপমান করবার কি দরকার ছিল?... আমারই ভুল হয়েছিল এখানে আসা। হাজার হোক্ এ-ও সেই বেউড় বাঁশের ঝাড় তো! ঝকমারি হয়েছিল—'

গজ গজ করতে করতে ব্যাগ এবং হুঁকো কলকে গুছিয়ে নিয়ে নরেন সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ল।

কমলা পূজো-আহ্নিক শেষ করে বাইরে এসে উমার কাছে দাঁড়াল।

উমা এসে পর্যন্তই উঠোনের দিকের অন্ধকার রকে বসেছিল, আর ওঠে নি। কমলা কোমল কণ্ঠে বললে, 'উমা চ, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবি—'

'তুমি খাও দিদি, আমি—আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

উঠান অন্ধকার কিন্তু ওপরের সিঁড়ির মুখে কেরোসিনের একটা দেওয়াল-আলো জ্বালা ছিল, তার ম্লান আভাতেও ওর গালে জলের চিহ্ন কমলার চোখ এড়াল না। সে আর কথা কইলে না, অনুরোধও করলে না। সে-ও নিঃশব্দে পিছনটায় বসে পড়ল। শুধু উমা নয়, সে-ও দেখেছে—আর একটি মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে শরৎ আলো দেখে বেড়াচ্ছে। উমার স্বামী শরৎ।

দু জনেই সেই অন্ধকারে বসে থাকে বহুক্ষণ। কেউই কথা কয় না। কওয়ার প্রয়োজনও নেই। পেছন থেকেই কমলা বুঝতে পারে ঠিক কাঁদার মত ফুঁপিয়ে না কাঁদলেও উমার কপোল বেয়ে জল ঝরছেই, আর উমাও বোঝে যে তার অবস্থা দিদির অজানা নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

দূর রাজপথে তখনও উৎসব-যাত্রীদের গাড়ির আওয়াজ উঠতে থাকে মধ্যে মধ্যে। আরও দূরে কোথায় থিয়েটার হচ্ছে, মাঝে মাঝে তার সঙ্গীতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একঘেয়ে ভাবে পাশের বাড়ির কলে জল পড়ে যাচ্ছে। বোধ হয় বাড়িতে কেউ নেই, যাবার সময় কারুর কল বন্ধ করার কথা মনে হয় নি।... ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে অবিশ্রান্ত।

কমলারও কত কথা মনে পড়ে যায়। শ্যামার বিয়ের কথা। কি না ছিল ওদের, জাজ্বল্যমান সংসার। ভাল ভাবে চললে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারত। সব উড়িয়ে দিলে দুটি ভাই—দেবেন আর নরেন। তবু দেবেন আরা না কোথায় ডাক্তারি করে সংসার চালাচ্ছে। নরেন একেবারে নির্বিকার। কোন দিন কোন দায়িত্ব বহন করল না আজ পর্যন্ত। তার তুলনায় কমলার নিজের বরাতও এমন কি ঢের ভাল। ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে তার স্বামীর কথা। বিবাহিত জীবনের অতি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটা স্বল্প কটি বৎসর। তার পর বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা। গোবিন্দ কি মানুষ হবে?...সে আরও কত দিন পরে?

উমাটা—। সত্যিই ওর কি আছে? কি নিয়ে থাকবে?

শরৎকে বুঝতে পারে না কমলা। আসত তো ওদিকে মধ্যে মধ্যে। বেশ

কথাবার্তা, যেন উমার ওপর মায়াও আছে মনে হয়। তবে এমন কি করে হয়? অমন তো কত পুরুষেরই 'বার-টান' আছে, ঘরের বৌকে ছোঁবে না তাই বলে? ওদের অদৃষ্টে সবই যেন উল্‌টো হয়।...

নিজেকেই দায়ী মনে হয় কতকটা। মা অনেক ইতস্তত করেছিলেন। কমলাই জেদ করে সেদিন। কার্তিকের মত রূপ ছিল শরৎ-জামাইয়ের। আচার-আচরণেও অতি ভদ্র। কেমন করে যে ও এত নিষ্ঠুর হল!...

হৈ-হৈ করতে করতে গাড়ি বোঝাই করে বাড়িওলারা এসে পড়ে। তখন রাত দুটো বেজে গেছে। এদের দু জনেরই একসঙ্গে যেন চমক ভাঙে। এখনই যত বাজে গল্প আর কে কতটা দেখতে পেলে তার হিসেব-নিকেশ শুরু হবে। চট্ করে ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দেয় উমা। কমলাও ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে ঘরদোর সেরে শুয়ে পড়ে। সে রাত্রে দু জনের কারুরই খাওয়া হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দ সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরলই জ্বর নিয়ে। সামান্য জ্বর—রাত নটা নাগাদ ছেড়ে গেল। এমন একটু-আধটু হয়ই। তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামালে না। পরের দিন সুজির রুটি আর মাছের ঝোল খেয়ে ইস্কুলে গেল। সেদিন কিন্তু ছুটির আগেই ফিরে এল। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে দেখে মাস্টার মশাইরা গায়ে হাত দিয়ে দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। পরের দিন আর ইস্কুলে গেল না। কিন্তু সেদিনও ঠিক দুটো নাগাদ জ্বর এল। খুব বেশী নয় হয়তো—তবু জ্বরই।

কমলা চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাড়িওলাদের গিন্নী ব্যবস্থা দিলেন বেল-পাতা আর শিউলি পাতার রস। এক জন বললেন জোলাপ দিতে। এইভাবে টোট্‌কা-টুটকি চলল তিন-চার দিন। কিন্তু জ্বর বন্ধ হল না। রোজই দুটো নাগাদ আসে, রাত নটা দশটা নাগাদ ছেড়ে যায়। উমা কমলা দু জনেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। বাড়িওলা-গিন্নী শুনিয়ে গেলেন 'উঠতি বয়স, খুব সাবধান বাছা। এই বয়সটাতেই বড্ড থাইসিস হয় শুনেছি। ডাক্তার দেখাও!'

গলির মোড়ে চারু ডাক্তার কী নতুন এক রকম চিকিৎসা করেন—হোমিওপ্যাথির মতই। বাড়িওলার মেয়ে মালতীর পরামর্শে তাঁকেই ডাকা হল। মালতী বলল, 'খরচাও বেশী নয়, আট আনা ভিজিট আর দু পয়সা করে ওষুধের পুরিয়া—কিন্তু ওষুধ ওঁর শুনেছি ডাকলে কথা কয়।'

সাত দিনের দিন তাঁকে ডাকা হল। তিনি এসে দশ আনা পয়সা নিয়ে চার দাগ ওষুধ দিয়ে গেলেন। নাড়ী দেখে জিভ দেখে আঠারো রকম প্রশ্ন করে বলে গেলেন, 'ভয় নেই, এই চার পুরিয়াতেই সারবে—বড় জোর আর চার পুরিয়া।'

'কী জ্বর' প্রশ্ন করাতে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'কেন, জানলে কি নিজেরাই চিকিৎসা করবেন?'

তিন-চারে বারো পুরিয়া ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেল—আরও একটা

ভিজিটও নিলেন তিনি, কিন্তু জর বন্ধ হল না। সে ঠিক নিজের নিয়মে আসে, নিজের নিয়মে যায়। মাঝখান থেকে ছেলে নেতিয়ে পড়ছে। আর উঠে কলঘরেও যেতে পারে না—এত দুর্বল হয়ে পড়ল।

বুড়ী গিন্নী বললেন, 'করছিস কি মাগী, ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবি? এই বয়সে ভাতার খেয়েও আক্কেল হল না! আবার ছেলেটাকেও খেতে চাস? ভাল ডাক্তার ছ্যাখা!'

কমলা আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, উমাই ধমক দিলে বুড়ীকে, 'কি বলছেন যা তা। আমাদের ছেলে, টানটা আমাদেরই বেশী। ভাবনার কথা—সে কি আমরা বুঝি না? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তো!'

'দরকার হলে ঘটিবাটি বেচতে হবে মা। ওর পাঁচটা নয় দশটা নয় ঐ একটা।···ওর কষ্ট দেখতে পারি না বলেই বলা। তুমি কি বুঝবে মা? পেটে একটা ধরতে তো বুঝতে!'

তিনি খর খর করে চলে যেতে যেতে সবাইকে শুনিয়ে গেলেন, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! এদিকে তো এক কড়ার মুরোদ নেই—বাকি। ছ্যাখ না!'

বাড়িওলা লোকটি মন্দ নন। তিনি সব শুনে মালতীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এ পাড়ায় ডাক্তার বটব্যালের খুব নাম-ডাক। দু টাকা করে ফী,—বলে কয়ে এক টাকা করে দিতে পারি। ডাকতে চান কি?'

কমলা উমার মুখের দিকে চাইলে। অগত্যা। উমা বললে, 'তাই ডেকে দিতে বল ভাই, দরকার হলে ঘটিবাটিই বেচতে হবে—কী করব!'

ডাক্তার বটব্যাল এক টাকা করে ভিজিট নিতে রাজী হলেন বটে কিন্তু ওষুধপত্তরে রোজ আর একটি করে টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। নিজেদের বাজার বন্ধ করে দিলে—শুধু আলু-ভাতে ভাত খাওয়া, জীবন-ধারণের মত—কমলার মুখ দিয়ে ভাতই গলতে চাইত না, নিহাত উমার ধমকে কিছু মুখে তুলত সে। উমা বলত, 'ছেলের মুখ চেয়েই মুখে দিতে হবে। ওর সেবা করা চাই তো। তুমি যদি বিছানায় পড় তো দেখবে কে?'

তবু খরচা কমানো যায় না কিছুতেই। বাক্স ঝেড়ে দু-এক কুচি সোনা যা ছিল সব বার করে দিলে কমলা মালতীর বাবাকে। কিন্তু দেখা গেল সোনা কিনতে যা দাম বেচবার সময় তার তিন ভাগের দু ভাগও পাওয়া যায় না।

তা হোক—গোবিন্দ ভাল হয়ে উঠুক - তা হলেই হল। কমলা মা

কালীকে সোনার বেলপাতায় বুকের রক্ত মানসিক করলে। উমা আগেই জোড়া-সত্যনারায়ণ মেনেছিল। কিন্তু না দেবতাদের কৃপা আর না বটব্যালের ওষুধ - কিছুতেই কিছু হল না। ঠিক দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুষঘুষে জ্বর চলতে লাগল প্রত্যহ।

এর পর ডাকতে গেলে আর. এন দত্তকে ডাকতে হয়। কিন্তু সে এক গাদা টাকার দরকার। অঙ্কটা শুনে দু জনেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। তাও এক বার এলেই হবে কিনা ঠিক কি! বার বার যদি ঐ টাকা দিয়ে আনতে হয়—?

পাড়ার একটি বিধবা বৌয়ের সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিল কমলা, সে পরামর্শ দিলে, 'শিবপুরে দীনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল গঙ্গাজল। শুনেছি ধন্বন্তরি—গেলেই সাববে।'

উমা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, সে সম্ভব নয়। ছেলে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে একেবারে. এখন গাড়িতে তুলে অত পথ নিয়ে গিয়ে দেখানো যাবে না। গাড়ির ধকল সইতে পারবে না।'

দুই বোন দুপুরবেলা বাক্স পেঁটরা খুলে দেখতে বসল—কোথায় কি আছে। মোটামুটি হিসেব তো আছেই—তবু মনে হয় যদি আর কিছু বেরোয়!

থাকার মধ্যে আছে উমার দু গাছা বালা, যা সে হাতে পরে থাকে বারো মাস—আর গোবিন্দর পৈতের আংটি। আরও দুটি জিনিস আছে বটে কিন্তু সেদিকে চেয়ে দু জনেই স্তব্ধ হয়ে গেল। গোবিন্দর বাবার বিয়ের আংটি-- এটি নাকি তাঁর বড় প্রিয় ছিল, বিয়ের পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কখনও খোলেন নি। আর রাসমণির সোনা-বাঁধানো নাভিশঙ্খ একটি। এটি নাকি রাসমণিরও মায়ের চিহ্ন। দুটোর কোনটাই বেচতে মন সরে না।

অনেকক্ষণ পরে উমা বললে, দু গাছা লাল রুলি কিনে এনে এই বালা দুটোই খুলে দিই দিদি—গোবিন্দ বেঁচে থাকলে আমার সব রইল। এ বালার দাম কি?'

হঠাৎ কমলার মনে পড়ে গেল। সে বললে, 'না তার দরকার হবে না। মা গোবিন্দর বৌয়ের জন্তে যা দিয়ে গেছেন, সেটা আমি রেখে দিয়েছি আলাদা করে। দুটো বালা আর এক জোড়া কেরাপাত। তাই বার করি।'

'ছি। মা'র চিহ্ন গোবিন্দর বৌ ভোগ করবে না?'

কমলা ম্লান হেসে বললে, 'বাঁচলে তবে বিয়ে, তবে বৌ। বাঁচুক আগে—'

উমা তবু জেদ করে বললে, 'আগে আমার বালাটাই যাক না দিদি—'

'না বোন। আমি মন স্থির করেছি।'

সেই দিনই যা হয় ব্যবস্থা করা দরকার। আর সময় নেই একেবারে।

কমলা গহনাগুলো নিয়ে মালতীর বাবার কাছে যাচ্ছিল, উমা তার হাত চেপে ধরলে। বললে, 'না দিদি—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো আমারই অন্যায়—কিন্তু তবু দেখি না একটু হাত বদল করে। সোনার দাম বাইশ টাকা, কালও পথে এক স্যাক্‌রার দোকানে জিজ্ঞাসা করে এসেছি, অথচ মামাবাবু বেচতে গেলেই পনেরোর বেশী দাম পান না।'

'কি করবি তবে, কাকে দিবি?'

'আমি যাঁর বাড়ি চার টাকার টিউশনি করি, রসময়বাবু--বুড়ো মানুষ, বেশ ধর্মভীরু বলেই মনে হয়। তাঁকেই গিয়ে দিই না?'

'ছাখ যা হয় কর। কিন্তু তাঁকে কি এখন পাবি?'

'দেখি। না হয়—না হয় নিজেই যাব কোন পোদ্দারের দোকানে -'

'সে কি রে! না না, তুই যাস নি।'

'কেন যাব না দিদি। সবই করছি, বাইরে বেরিয়ে পুরুষ মানুষের মত রোজগার করছি, আর এইটেই পারব না? এক দিন না এক দিন করতেই তো হবে সব। কেউ যখন নেই—তখন কতকাল আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে এমন করে ঠকব বল!'

উমা আর দাঁড়াল না।

কিন্তু রসময়বাবু বাড়ি ছিলেন না। তিনি কী সব বিলিতী ওষুধের কারবার করেন। দুপুরবেলা খেতে আসেন ঠিকই—দুটো আড়াইটেয় আবার বেরিয়ে যান। আর কেউ তেমন পুরুষও নেই তাঁদের বাড়ি, যাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়।

উমা আর অপেক্ষা করল না। মালতীর বাবাকে দুপুরবেলা বলেই দেওয়া হয়েছে আর. এল. দত্তকে ডাকতে। টাকা নিয়ে না গেলে দাঁড়িয়ে অপমান।

উমা সোজা নতুন বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। লাল শালু টাঙানো সার সার পোদ্দারের দোকান। কিন্তু ফুটপাথ পেরিয়ে ওদিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার।

আজন্ম সংস্কার। কী মনে করবে লোকগুলো কে জানে! ভদ্রঘরের

মেয়েছেলে পোদ্দারের দোকানে এসেছে মাল বেচতে—হয়তো বিশ্বাসই করবে না। হয়তো ভাববে সে 'ঐ সব' ঘরের মেয়ে।—ছি, ছি, কেন এ সাহস করতে গেল সে। দিলেই হত মালতীর বাবাকে।—ভয়ে লজ্জায় উমার যেন কান্না পেতে লাগল।

কিন্তু উপায়ই বা কি? দেরি করা চলবে না। এখনই যা হয় করা দরকার।

প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করে দৃঢ় পদক্ষেপে ওপারে গেল উমা।

ওদিকে চাইতেও পারছে না। তখনও অপরাহ্ণের ভিড় দেখা দেয় নি। দোকানদাররা বেশির ভাগই অলসভাবে বসে রয়েছে। ওকেই দেখছে নিশ্চয়, ওর দিকেই চেয়ে আছে। এইটে কল্পনা করেই যেন উমা আর ওদিকে চেয়ে দেখতে পারলে না। সে ভেবেছিল ওরই মধ্যে বুড়ো-মত একটা দোকানদার দেখে তার কাছেই যাবে। কিন্তু এখন অতগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে ওদিকে তাকিয়ে কে বুড়ো আছে খোঁজা একেবারেই অসম্ভব —ইতিমধ্যেই হয়তো ওদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তাকে নিয়ে। সুতরাং কোন দিকে না তাকিয়ে ঠিক সামনে যে দোকানটি পড়ল—উমা সেখানে গিয়েই উঠল।

'কি চাই গা বাছা তোমার?' কণ্ঠস্বরে যেন বেশ একটু অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ।

অপমানে এবং বিরক্তিতে যেন কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। প্রাণপণে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলে উমা। তার পর যথাসাধ্য নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, 'এইটে বেচতে চাই।'

বালা জোড়াটা দোকানদারের সামনে নামিয়ে রাখলে।

'অ'। কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক শব্দ করলে দোকানী। তার পর এক গাছা বালা তুলে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে উলটে পালটে দেখলে।

'এ তো দেখছি সেকেলে জিনিস, এ তো এখনকার নয়। এ যে চোরাই মাল নয় কেমন করে জানব আমি?'

সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল উমার মুখ।

'চোরাই মাল! কি বলছেন আপনি! চোরাই মাল নিয়ে এসেছি আপনাকে বেচতে!'

'কি জানি বাছা!' বিরসকণ্ঠে বলে দোকানদার, 'হাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যে

আর যেতে ইচ্ছে করে না।—আনে, তোমাদের মত মেয়েরা হামেশাই আনে —বাবু না থাকলে যখন মধ্যে মধ্যে কষ্টে পড়ে তখন গয়না বেচেই খেতে হয় যে—কিন্তু সে সব জিনিস আমরা দেখলেই চিনতে পারি। চক্ষু বুজে নিই। নতুন জিনিস, হয়তো রসানও ওঠে নি। কিন্তু এ অন্তত পঞ্চাশ বছরের মাল হবে, সিন্দুকে তোলা ছিল!'

উমা আর থাকতে পারলে না। রাগে দুঃখে অপমানে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আপনি মুখ সামলে কথা বলুন। কি ভেবেছেন আমাকে। আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখছেন না! নিতে হয় নেবেন না হয় ফিরিয়ে দেবেন, খদ্দেরকে অপমান করতে আসেন কোন্ সাহসে?—আমাকে তুমি তুমি বলেই বা কথা বলছেন কেন—আপনি বলতে পারেন না!'

সে বালা জোড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে দোকান থেকে নেমে আবার ফুটপাথে এসে পড়ল। এর পর কি করবে কোথায় যাবে—তা সে জানে না, শুধু ক্ষোভে, লজ্জায়, একটা উপায়হীন ক্রোধে তার সেইখানেই মাথা কুটে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।—সে ভেবেও দেখে নি কিছু, ভাববার ক্ষমতাও ছিল না, বোধ করি সহজাত সংস্কারেই কোনমতে রাস্তা পেরিয়ে একেবারে এ পাশের ফুটপাথে এসে থমকে দাঁড়াল।

কিন্তু এইবার ভগবান বোধ করি মুখ তুলে চাইলেন। অতি পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছল, 'এ কি, এখানে কি করছ? মুখচোখ এমন কেন? কি হয়েছে? কারুর কোন বিপদ আপদ—?'

দুই চোখ তখনও অশ্রুতে ঝাপ্‌সা, তবু চিনতে দেরি হ'ল না। সেই বাষ্পাকুল চোখ দুটি তুলে শরতের দিকে তাকিয়েই সে যেন ফেটে পড়ল, 'তোমার মত পুরুষ যার স্বামী তার কি হতে বাকি থাকে বল—সিঁথিতে সিঁদুর হাতে নোয়া থাকতেও শুনতে হল যে আমি বেশ্যা!—এর চেয়ে বিধবা হওয়াও ঢের ভাল ছিল!'

বলতে বলতে ঝরঝর করে দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়তে লাগল। কোনমতে—কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারলে না সে।

তখনও পথে লোকজন বেশী চলতে শুরু করে নি বটে, তবু যে দু-একজন ওদিক দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা অবাক হয়ে চাইতে লাগল। বিব্রত শরৎ ব্যাকুলভাবে বললে, 'কী হয়েছে কি, ব্যাপারটা কি খুলেই বল না ছাই!—

একটু'এদিকে এস, সবাই ফিবে ফিরে দেখছে—চল বরং কোম্পানির বাগানের ঐ বেঞ্চিটায় বসবে চল।'

'না, ওখানে বসতে আমি পারব না। সরকারী বাগানে বসে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইলেই আমার ষোল কলা পূর্ণ হয় বটে!'

পরপুরুষ!

কী একটা কৌতুক কবতে গিয়েও শবতের উদ্যত রসনা লজ্জায় থেমে যায়।

'তা এখন ব্যাপাবটা কি আমাকে বলবে তো। কে অপমান করলে তোমাকে?'

'ঐখানের একজন পোদ্দাব। মুখের ওপরই আমাকে শুনিয়ে দিলে যে সে আমাকে বেশ্যা বলে মনে করে এবং চোব বলে সন্দেহ কবে।'

'তা তুমিই বা একা এমন ভাবে পোদ্দাবের দোকানে গিয়েছিলে কেন?'

'কী কবব? আমার আর কে আছে বল। গয়না বেচতে হবে যখন তখন পোদ্দারের দোকানে না গিয়ে উপায় কি?'

'কী সর্বনাশ। তুমি কাউকে চেন না—জান না, গয়না বেচতে গিছলে? ওদের মধ্যে এক-একটি সাংঘাতিক লোক আছে যে!'

'উপায় কি। গোবিন্দর আজ তিন সপ্তাহ অসুখ। বড় ডাক্তাব ডাকতে হবে, বাড়িতে একটি টাকা নেই। নিজের গয়না নয়, সে সবও তো ঘুচে গিয়েছে। সব সময় টিউশনিও থাকে না তেমন, বেচে বেচেই চালাতে হয়। এই বালাজোড়া গোবিন্দব বোয়ের জন্যে দিদিকে মা দিয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কিছুই নেই বেচবার মত!'

'ইস্!—তাই তো!'

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যেই দূরে তিন-চারজন অলস কৌতূহলী লোক জমে গিয়েছে, এখানে এই অবস্থায় দেরি করাও যায় না। সব সংকোচ দমন করে সে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, 'শোন এক কাজ কর—তুমি ফিরে যাও। বালা বেচতে হবে না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টাকা নিয়ে যাচ্ছি।'

অনেক—অনেকখানি ভরসা যেন। এই কথা, এই ধরনের কথা শোনবার জন্যেই তো তার নারী-জীবনের পূর্ণপাত্র সাজিয়ে বসে আছে সে—কতকাল, কতকাল ধরে। একটা স্বস্তির, একটা কৃতজ্ঞতার নিঃশ্বাসই বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে—

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়ে যায় কয়েকদিন আগেকার একটি দৃশ্য। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক, একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বেড়াচ্ছে আলো দেখে। পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরতা এবং প্রীতি তাদের মুখচোখে মাখানো।—

নিমেষে কঠিন হয়ে ওঠে উমার মুখ! সে বলে, 'না, পথ ছাড়। আমি বেচেই যাব এ বালা—যেমন করে পারি আমার দায় আমিই দেখব।'

দুই হাত জোড় করে শরৎ। মিনতি করে বলে, 'মান-অভিমানের সময় এ নয়। অন্তত গোবিন্দর অসুখের কথাটা ভাব। তুমি বাড়ি যাও। আমি যাচ্ছি।'

তবুও উমা কি বলতে যাচ্ছিল, শরৎ বাধা দিয়ে বললে, 'ধর, আমিই বাঁধা রাখছি বালাজোড়া। তুমি জান না, এ বেচতে গেলে তুমি আধা কড়িও পাবে না। মাঝখান থেকে বিস্তর অপমান ও বাঁকা কথা শুনতে হবে। তা ছাড়া দরকারের তো এই শেষ নয়। যদি সত্যিই কোন ভারী অসুখ হয়, গয়না বেচবার ঢের সময় পাবে। দোহাই তোমার, এখন তুমি বাড়ি যাও।'

উমা আর কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু অকারণে আবারও তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে! সে শরতের দিকে তাকায় না কোন কথাও বলে না—নিঃশব্দে বাড়ির পথ ধরে।

॥ ২ ॥

বড় ডাক্তার এসে তিন দিনেই জ্বর ছাড়িয়ে দিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি ব্যবস্থা যা দিয়ে গেলেন তা এদের পক্ষে সাধ্যাতীত। বলে গেলেন, 'একে কোথাও চেঞ্জে পাঠানো দরকার। পশ্চিমের কোন জায়গায়, দেওঘর, মধুপুর বা ঐরকম কোথাও। নইলে আবারও এই রকম হতে পারে—আর এবার হলে সারানো শক্ত হবে!'

শরৎ অনেক সাহায্য করেছে। তারও ছোট্ট কারবার, আলাদা থাকে—সে একটা পুরো সংসার, এদিকে মা এখনও বেঁচে—বস্তুত দুটো সংসার চালাতে হয়। তাকে আর বলাও উচিত নয়। কমলাই বারণ করলে, বললে, 'কানে শুনলে হয়তো সে ধার-দেনা করেও দেবে। তাকে আর শোনাস নি।…যা হয় হবে।'

কিন্তু 'যা হয়'টা যে কি তা কেউ বলতে পারে না। দুই বোন দুই বোনের মুখের দিকে তাকায়। অথচ ছেলেটার দিকেও চাওয়া যায় না। এই বছরেই ওর পাস দেবার কথা। আর দু মাস পরে ওর পরীক্ষা। এই অবস্থায় পরীক্ষা দেবেই বা কি করে? পাসের পড়া নাকি দিনরাত পড়তে হয়। ভাত যেদিন দেওয়া হল সেইদিনই গোবিন্দ বইখাতা নিয়ে বসেছিল—কিন্তু আধ ঘণ্টা পড়াব পরই মাথা ধরে উঠল। কমলা এসে জোর করে বই কেড়ে নিয়ে শুইয়ে দিলে।

অথচ এই 'পাসে'র দিকে চেয়েই আছে বলতে গেলে কমলা। চাকরি একটা হয়তো গত বছরেই হয়ে যেত। মালুর বাবার অফিসে, পনেরো টাকা মাইনের দপ্তরির চাকরি একটা খালি ছিল। মালুর বাবা নিজে থেকেই খবরটা দিয়েছিলেন. বলেছিলেন—'অফিসের চাকরি, কোনমতে ছুঁচ হয়ে সেঁধোনোর ওয়াস্তা। তার পর ঠিকমত বড়বাবুকে তেল দিতে পারলে সে ছুঁচ ফাল হতে কতক্ষণ?'

শ্যামার বড় জামাই অভয়পদও একটা চাকরির খোঁজ দিয়েছিল। কারখানার চাকরি, লোহা-পেটানো কাজ বলে কমলার পছন্দ হয় নি। এত সাধের ছেলে তার, ওর বাবা কী দরের মানুষ ছিলেন, তাঁর ছেলে করবে লোহা-পেটোনো কাজ? থাক্ গে, এতদিনই যখন কষ্ট করে কাটল, কোনক্রমে আর একটা-দুটো বছর কাটবে না? একটা পাস করতে পারলে ভাল চাকরির অভাব কি?···অনেক স্বপ্ন আছে কমলার, গোবিন্দ বড় সরকারী চাকরি পেলে কি কি করবে সে।

কিন্তু শরীরটাই যদি বিগড়োয় তো পাস করবে কে? এমনিতেই গোবিন্দর একটু বেশী বয়স হয়ে গেছে। এই পাড়াতেই ওর বয়সী অনেক ছেলে আছে তারা কেউ কেউ সামনের বছর দুটো পাস দেবে। একজন তো এ বছরই সে পরীক্ষা দিচ্ছে। গোবিন্দর স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিও এখনও ছেলেমানুষের মত। নানা দুর্বিপাকের মধ্যে একটা বছর নষ্টও হয়ে গেছে।

এই সব দিনরাত তোলাপাড়া করে কমলা মনে মনে। ছেলের রক্তশূন্য মুখের দিকে চায় আর বুক শুকিয়ে ওঠে ওর।

উমার সঙ্গে রোজই রাত্রে পরামর্শ চলে তার, কোন দিন বলে, 'হ্যাঁ রে আসল থেকে দু শ টাকা ওঠাব? কতই বা সুদের তফাত হবে? কষ্ট করে চালিয়ে নিতে পারব না?'

উমা বলে, 'সে টাকা তো যখন তখন ওঠানো যায় না শুনেছি। পারবে কি? অত হাঙ্গাম করবেই বা কে?'

'না হয় যে গয়নাগুলো বেচতে যাচ্ছিলি, সেইগুলোই বেচে দিই শেষ অবধি—কী বলিস?'

'কিন্তু দিদি টাকা হলেই তো হবে না। পাঠাবে কোথায়? কার সঙ্গে? সবাই মিলে গেলে একগাদা টাকা খরচ। মা সেবার গিয়েছিলেন রাঘব ঘোষালের সঙ্গে, কতগুলি টাকা গলে গেল, মনে নেই?'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না।

ডাক্তারের কথাগুলো বিভীষিকার মত ওদের দিনের আহার এবং রাত্রের তন্দ্রা বিষাক্ত করে তোলে শুধু।

গোবিন্দের পড়াও হয় না। পড়তে পারে না সে কিছুতেই। ক্রমশ পরীক্ষার আশা সুদূরপরাহত হয়ে যায়।

শরৎ আসে মধ্যে মধ্যে ফল-টল দিয়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী বসে না। তাকে দেখলে আজও চোখ জুড়িয়ে যায় কমলার। যেমন চেহারা, তেমনি ভদ্র কথাবার্তা, তেমনি বিবেচনা।…সঙ্গে সঙ্গে উমার জন্য হাহাকার ওঠে মনের মধ্যে। এমন স্বামী ভোগ করতে পেলে না!…কত বিচিত্র মানুষ হয়—আশ্চর্য! তাদের বরাতেই এমন হয় শুধু…আর কারুর তো এমন হতে শোনে নি!

ছেলের চিন্তার মধ্যেও কালীকে ডাকে সে, 'হে মা কালী, শরৎ জামাইয়ের সুমতি দাও মা। জোড়া পাঁঠা দেব তোমাকে। হে মা সংকটা, মহাসংকট বার করব তোমার রাস্তার ধুলো খেয়ে।'

উমার মনের কথা মুখে ফোটে না…শরৎ এলেই সে বাইরে চলে যায়। স্বামীর সঙ্গে কথা যে একেবারে কয় না তা নয়, কিন্তু সে দৈবাৎ!

হেম আসে মাঝে মাঝে খবর নিতে।

এবার এল অনেকদিন পরে।

গোবিন্দর অসুখের সে কিছুই জানত না। এখন ওর শরীরের অবস্থা দেখে সে অবাক।

এরা কোন খবরই দেয় নি। দেবার মত মানসিক অবস্থা বা অবসরও ছিল না। কিন্তু হেম যখন মৃদু অনুযোগ করলে তখন কমলা মুখের ওপর সে

কথাটা বলতে পারলে না, এও বলতে পারলে না যে তাদের খবর দিয়ে কোন লাভও হ'ত না। চুপ করেই রইল।

একথা সেকথার পর চেঞ্জে যাবার কথা উঠল।

হেম খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কাজ করলে হয় বড় মাসীমা। ...আমার সেই জ্যাঠা এতদিন পরে এখানে এসেছে জান?'

'তাই নাকি? কবে রে?'

নরেনের দাদা দেবেন।

যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবার পর যখন আর কিছুই রইল তখন নরেন বিচলিত হয় নি কিন্তু দেবেন হয়েছিল। সে একদা বেরিয়ে গিয়েছিল নিজের ভাগ্যান্বেষণে...বহু দূর, পশ্চিমে কোথায়...আরা না কী এক জায়গায়। সে সব জায়গার নামও শোনে নি ওরা। খোট্টার দেশ, এই জানত। সেইখানেই কয়েকটা ওষুধ নিয়ে নাকি রাতারাতি ডাক্তার হয়ে বসেছিল। তখন এলোপ্যাথি বলেই চালাত—এখন বুঝি হোমিওপ্যাথি বইও নিয়ে গেছে একখানা। কিছুদিন ডাক্তারি করার পর একদিন এসে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। আর একবার মাত্র এসেছিল এখানে, ওদের মা মরবার সময়—তার পর আর কেউ কোন খবরই পায় নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও কেউ জানত না।

'এই মাসখানেক হল। অনেক খুঁজে খুঁজে আমাদের বার করেছেন। ওখানে গিছলেন এই দিন-পনেরো আগে।'

'তার পর? কী করছে রে?'

'সেই ডাক্তারিই নাকি করছেন এখনও। আমার সে দাদা মারা গেছে—জান? এখন আবার জ্যাঠাইমার খুব অসুখ। তাই এখানে নিয়ে এসেছেন। জ্যাঠাইমারই এক ভাই এখানে বুঝি ডাক্তার হয়েছে—মেডিকেল কলেজে চাকরি করে—তারই ভরসায় এনে ফেলেছে। জ্যাঠাইমা নাকি বাঁচবে না।'

'তা তাঁর কথা কি বলছিলি?'

'ভাবছিলুম জ্যাঠামশাই তো যাবেনই দিনকতক পরে। তাঁর সঙ্গে গোবিন্দকে পাঠালে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ—তোর জ্যাঠাইমা রইল এখানে—তাকেই কে খেতে দেয় তার ঠিক নেই—তার সঙ্গে আমার রোগা ছেলে পাঠিয়ে তাকে আরও আতান্তরে ফেলি আর কি!'

কথাটা সেদিনকার মত ওখানেই চাপা পড়ে গেল

কিন্তু একেবারে পড়ল না।

হেমের মুখে খবর পেয়ে শ্যামা এল বোনপোকে দেখতে।

বরাবর হেঁটেই আসে সে। সেদিনও ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এবং তার ওপরের বোনটাকে হাঁটিয়ে, দুটো ডাব এবং আরও কি কি ফল পুঁটলি করে ঝুলিয়ে এই দীর্ঘ চার ক্রোশ পথ হেঁটে এসে উঠল। হাঁটু অবধি ধুলো, চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে আতঙ্ক হয়; মেয়েটা তো নেতিয়ে পড়েছে।

'কেন এ কাজ করিস শ্যামা, কোন্‌দিন পথেই মুখ থুবড়ে মরবি! তুই নিজে যা হয় কর, ঐটুকু মেয়েকে হাঁটিয়ে এনেছিস কী বলে?'

'ওদের অত কষ্ট হয় না। সারা দুপুরই তো টো টো করে ঘুরে বেড়ায় এ-বাগানে ও-বাগানে—এক দণ্ড কি পায়ের বিশ্রাম আছে! সবটা জড়িয়ে ক ক্রোশ হয় তা দ্যাখ না!'

'হ্যাঁ—সেই সঙ্গে এতটা পথ একটানা হেঁটে আসা সমান হ'ল?'

'একটানা তো আসি নি। পথে অনেকবার বসেছি। একটানা পারব কেন?…আমার সঙ্গে দু-দুটো মোট। হাত বদলালেও মাঝে মাঝে বসতে হয়। পথে খাইয়েও নিয়েছি ওকে। ক্ষুদভাজার নাড়ু গোটাকতক করে নিয়ে বেরিয়েছিলুম, তাই ওকে দুটো দিয়েছি, নিজেও খেয়েছি।…গোবিন্দকে খেতে দেবে কিনা জানি না তো, তবে ওর জন্যেই আরও করা। খেতে ভালবাসে—খাবে কি খাবে না, খানিক দোনোমোনো করে শেষ অব্‌দি নিয়েই এলুম। খায় খাবে, নয়তো উমি খাবে'খন্‌।'

পুঁটুলির একপ্রান্ত থেকে নাড়ুগুলো বার করে—কলাপাতায় জড়ানো।

ক্ষুদের নাড়ু—অর্থাৎ চালের ক্ষুদ ভেজে গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে নাড়ু বাঁধা।

সরকার বাড়িতে চালের ক্ষুদ দিয়ে আগে মাছ কেনা হ'ত—আজকাল মেছুনীরা নিতে চায় না, সেই ক্ষুদগুলো শ্যামা সংগ্রহ করে। বেশী জমলে ডাল বা ডালের ক্ষুদ মিশিয়ে এক-আধ দিন খিচুড়ি হয়, আর নইলে গুড়ের যদি যোগাড় থাকে—এই মিষ্টান্নটি তৈরী হয়। প্রথম একদিন খুব সংকোচের সঙ্গেই শ্যামা এনেছিল এ বাড়ি, কিন্তু গোবিন্দ খুব উৎসাহ প্রকাশ করায় আজকাল প্রত্যেকবারই এই পদার্থটি তৈরী করে আনে। ক্ষুদের নাড়ু কি নারকেল নাড়ু। নারকেল সংগ্রহ করা কঠিন আজকাল—সরকার বাড়ির

ছেলেমেয়েরাও কান খাড়া করে থাকে কখন একটা নারকেল পড়বে—সেই শব্দের দিকে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে যোগাড় করা কঠিন। তা ছাড়া হাতে পেলেও খরচ করতে মন চায় না। নারকেল বিক্রি হয় সহজে। তাই নারকেল ভেঙে নাড়ু করা আর বড় একটা হয়ে ওঠে না।...

মুখহাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে শ্যামা বললে, 'আরও ঐ জন্যেই এলুম আমি। হেম যেদিন ফিরল এখান থেকে—কী বার যেন, হ্যাঁ সোমবার, অফিস করে বাড়ি ফিরল তো—সেইদিনই বট্‌ঠাকুর গেলেন আবার। হেমের মুখে সব শুনে ওকে দিয়েই কথাটা বলালেন। ওঁর খুব ইচ্ছে, বললেন, আমার তো বাড়ি পড়েই আছে। চাকরও আছে রাতদিনের। দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া, তা আমাকে গিয়ে তো করতেই হবে, আর তোদের জ্যাঠাইমা তো ছ-মাস পড়ে, সেই আমাকেই তো সব করতে হয়েছে। আমি যদি এক মুঠো ফুটিয়ে নিতে পারি ওকেও তা থেকে দিতে পারব। তার জন্যে আমার বাড়তি কোন খাটুনি তো নেই। চমৎকার জায়গা, জলহাওয়া খুব ভাল...চটপট সেরে উঠবে। টাকায় ষোল সের সতেরো সের দুধ...তাও আদ্ধেকদিন কিনতে হয় না, রুগীরাই ঘটি ঘটি দুধ দিয়ে যায়। দুধ-ঘি অজস্র, তবে হ্যাঁ, মাছ পাওয়া যায় না। তা আমি শুনে ভাবলুম গোবিন্দ তো আমাদের মাছের তত ভক্তও নয়। ডালটাই ভালবাসে বেশী। যাক না, ঘি-দুধ আছে যখন, জলও ভাল, চট্‌পট সেরে উঠবে। লোকটা যখন অত আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইছে—কী বলিস উমি?'

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়, বিশেষ যখন কোথাও পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। বরং কতকটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হয়।

তবু উমা খানিকটা চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, 'তোমার আত্মীয় তুমি বুঝে ত্যাখ। এর পর এ নিয়ে কোন কথা-টথা উঠবে না তো?'

'কথা আবার কি উঠবে? আর ওঠে উঠবে। আমাদের যখন দরকার তখন অত ভাবলে চলবে কেন? যেমন করে হোক আমাদের দিন কিনে নিতে পারলেই হ'ল। এর পর কথা উঠলেও কাজটা তো ফিরবে না!'

সংসারের বাস্তব পাঠশালায় শ্যামা এই জ্ঞানই লাভ করেছে—সহস্র অভিজ্ঞতার ফল এটা।

প্রয়োজনের কাছে কিছুই বড় নয়—দুটো কথা তো তুচ্ছ!

গালাগাল গায়ে বেঁধে না, দুর্নাম তো নয়ই।

অপমানের জ্বালা ?

ক্ষুধার জ্বালা তার চেয়ে ঢের বেশী সত্য, ঢের বেশী বাস্তব।

যাদের পেট ভরা আছে, তারাই মানুষের 'কথা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।

শ্যামা আবারও কণ্ঠস্বরে জোর দেয়, 'রেখে বোস দিকি। কে কী বলবে আর কে কী ভাববে সে কথা এখন ভাববার সময় নয়। যেমন করে হোক ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো।'

তা বটে। কিন্তু তবু উমা খুঁত খুঁত করে। বলে 'সেখানে গিয়ে যদি আবার অসুখ-বিসুখ করে? রোগা ছেলে -ওর একটু তোয়াজও দরকার। সে ভদ্রলোক শেষ অবধি যদি বিপদে পড়েন? দূরের পথ, হুট্ করতেই গিয়ে পড়তে পারব না। তা ছাড়া সে বাড়িতে মেয়েছেলে নেই, আমাদের যাওয়াও চলবে না।···সব কথাগুলো ভেবে গ্যাখ দিদি ভাল করে।'

কমলার মায়ের প্রাণ। ছেলের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে তারও আশার দিকটাই দেখতে ইচ্ছে করে।···শ্যামার মত সে-ও প্রয়োজনটাকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে।

গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সে ও তো একটা ডাক্তার এতদিনে কি আর কিছুই শেখে নি।···নইলে ওখানকার লোক এখনও তাকে পয়সা দিচ্ছে কেন? ঐ করেই পেট চালাচ্ছে এটা তো ঠিক। কিছু একটা হলে সে কি আর একটু-আধটু ওষুধ দিতে পারবে না।'

'একটু-আধটু ওষুধ তো এখানকার দুজন ডাক্তার দিয়েছিল দিদি, কী হল তা তো দেখলেই।'

'তা তোর বড় ডাক্তারই তো ওকে চেঞ্জে পাঠাতে বলছে। সব জায়গাতে যে আর এল দস্তু নেই—সে কথা সে-ই তো সব চেয়ে বেশী জানে।'

উমা দিদির মনোভাব বুঝে চুপ করে যায়।

সত্যিই—কীই বা করবার আছে। এখানে একতলার এই স্যাঁতসেঁতে ঘরে রেখেই কি বাঁচাতে পারবে? সেখানকার টানের হাওয়াতে আপনিই ভাল হয়ে উঠবে হয়তো।

তার নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরে নিয়ে কমলা সাগ্রহে প্রশ্ন করে শ্যামাকে, 'তা হলে তার সঙ্গে যোগাযোগটা হবে কি করে?'

'এই তো কাছেই থাকেন বট্ঠাকুর। কামাপুকুরে মামাশ্বশুর-বাড়ি উঠেছেন

যে! এখান থেকে নাকি বেশী দূরে নয়। আমি ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি তাঁকে, যাবার আগে দেখা করে যাবেন। যদি তোমাদের পাঠানো মত হয় তো উনিই এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন যাবার আগে।'

॥ ৩ ॥

দেবেন সত্যি-সত্যিই একদিন এদের সঙ্গে দেখা করতে এল। দিন তার ঠিকই ছিল···দিন এবং গাড়ির সময়ও জানিয়ে দিয়ে গেল। বললে, 'মোটঘাট থাকবে সঙ্গে, গাড়ি করতেই হবে একটা··অমনি ওকে তুলে নিয়ে যাব।···ওর সঙ্গে কিছুই দেবেন না, শুধু ওর জামা-কাপড় দিলেই হবে। বিছানা-ফিছানা সেখানে ঢের আছে—সে সব কিছু লাগবে না।'

কমলা কথা কয় নি। মাথায় ঘোমটা টেনে দূরে বসে ছিল। উমাই আসন পেতে বসালে, জলখাবার দিলে। কথাও কইতে হ'ল তাকে। বললে, 'দিদি এখনও ভাল হলেন না—আপনি চলে যাচ্ছেন, তিনি তো আরও কাতর হয়ে পড়বেন!'

'তা কী করব বল। আমাকে তো করে খেতে হবে। আর এক ব্যাটা ডাক্তার এসে বসেছে যে সেখানে। এ-ই তাই আমি দেড়মাস নেই, রুগীগুলো সব বোধ হয় তার খপ্পরে গিয়ে পড়ল।···তোমাদের দিদি আর কি বাঁচবে—শেষ অবধি হয়তো মরবেই—মিছিমিছি আমার কজি-রোজগারটা খোয়াই কেন?'

একটু যেন চটেই ওঠে সে।

অগত্যা উমা চুপ করে যায়।

এই ধরনের মানুষের সঙ্গে ঐটুকু ছেলেকে পাঠাতে তার মোটেই ভাল লাগে না কিন্তু আর কোন উপায়ও যে নেই। 'এবার হলে সারানো শক্ত হবে' ডাক্তারের সাংঘাতিক কথাগুলো কানে বজ্রগর্জনের মতই নিত্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।···তা ছাড়া কমলা যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে প্রস্তাবটাকে। এখন বাধা দিতে গেলে অনেকখানি ঝুঁকি নিয়েই দিতে হয়। এর পর···ঈশ্বর না করুন যদি সত্যিই গোবিন্দর কোন সংকটাপন্ন অসুখ হয়···উমা মুখ দেখাতে পারবে না দিদির কাছে।···

সুতরাং যাওয়াই সাব্যস্ত হয়।

নির্দিষ্ট দিনে দেবেন এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

গোবিন্দ এই সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে যেতে আগে রাজী হয় নি। এতদিন পর্যন্ত মাকে ছেড়ে সে থাকে নি কোথাও এক দিনও—ইদানীং উমা ওদের সঙ্গে বাস করতে আসার সময় থেকে মাসীও তার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে জড়িয়ে গেছে—এই দুজনের স্নেহাঞ্চল থেকে এই প্রথম তার বাইরে যাওয়া। বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য তার কম নেই···তাই বলে এই কাঠ-খোট্টা অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে অত দূর দেশে যেতে তার একটুও ভাল লাগছিল না। নিতান্ত মা অনেক করে বুঝিয়ে বলাতেই সে রাজী হয়েছে। তা ছাড়া এইভাবে ইস্কুল কামাই করে ঘরে বসে থাকতেও তার খুব বিশ্রী লাগছিল—দুবল শরীর, মা-মাসীর পুতুপুতু ভাব, অর্ধেক জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ, এগুলোও প্রীতিকর নয় একটুও। যদি দু-চার দিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন ফিরে পাওয়া যায় তো না হয় চোখ-কান বুজে কাটিয়েই দেবে। কিন্তু তবু গাড়িতে বসে মা-মাসীর মুখের দিকে চেয়ে তার দুই চোখ জ্বালা করে জলে ভরে এল। গলির বাঁকে বাড়ি এবং মা-মাসী অদৃশ্য হবার আগেই তার ঝাপ্‌সা চোখের সামনে থেকে তারা মুছে গেল।···

এর পর দুটো দিন কমলা এবং উমার আহার-নিদ্রা রইল না। এমন কি, দুজনে যেন নিঃশ্বাসটাও ধরে রেখেছিল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়। গোবিন্দর নিজের হাতের লেখা পোস্টকার্ডখানা এসে পৌঁছতে তবে প্রথম ওদের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়ল।

তার পর শুরু হল দিন গোনা।

মুস্কিল এই যে কতদিন থাকলে ডাক্তারের মতে 'চেঞ্জ' হয়, তা এরা কেউই জানে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাও হয় নি। তেমনি কী করে এবং কার সঙ্গে গোবিন্দ ফিরবে তাও এরা জানে না। দেবেনকে সে প্রশ্ন করার কথা মনেও পড়ে নি স্ত্রী সাংঘাতিক অসুস্থ যার সে মাঝে মাঝে আসবে নিশ্চয়ই। এবং যেমন সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তেমনি আবার যেদিন আসবে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে এই রকম একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল আপনা-আপনিই।

ওরা দিন গুনতে থাকে প্রথম থেকেই। এক দিন এক দিন করে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে পক্ষ এবং পক্ষ থেকে যখন মাস গড়িয়ে গেল তখন এঁরা দুজনেই

হাঁপিয়ে উঠল। চিঠি দেয় গোবিন্দ নিয়মিতই—কিন্তু তবে চিঠি ও মানুষে অনেক তফাত। শেষে কমলা উমাকে দিয়ে দেবেনের নামেই চিঠি লেখালে—অনেকদিন তো হয়ে গেল, এতদিনে নিশ্চয়ই গোবিন্দ সুস্থ হয়ে উঠেছে। যদি ওঁর এখন দু-চার দিনের ভেতর আসার সম্ভাবনা না থাকে তো আর কোন চেনা লোককে দিয়ে পাঠানো যায় না? পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে, তা ছাড়া উমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে খুব। বাজার-হাট করার দ্বিতীয় কোন লোক নেই। ইত্যাদি—

পরের ডাকেই দেবেনের জবাব এল।

সে লিখেছে…

'পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ এই যে তুমি একান্ত বুদ্ধিমতী হইয়াও এমন অবুঝের মত পত্র লিখিয়াছ কেন বুঝিলাম না। হাওয়া বদল করিতে গেলে কোথাওকার জলহাওয়া সহ্য হইতেই পনেরো দিন লাগিয়া যায়। শ্রীমান আসিয়াছে মাত্র এক মাস, ইহারই মধ্যে কী এমন তাহার গায়ে শক্তি বাড়িবে? এতই কষ্ট যখন করিয়াছ তখন অধীর হওয়ার কোন অর্থ নাই। আরও কিছুদিন চালাইয়া লও, আগামী মাসের প্রথম দিকে আমার যাওয়ার কথা আছে, সেই সময় আমিই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। এখানে তেমন কোন আস্থাভাজন লোক নাই যে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমানকে পাঠাইব। তোমার দিদিকে আমার নমস্কার জানাইবে, তুমি আমার আশীর্বাদ লইবে।' ইত্যাদি…

আরও এক মাস!

দুজনের কারুরই ভাল লাগল না কথাটা। এতদিনে হয়তো পড়াশুনো সব ভুলেই বসে রইল। তার ওপর কেমন জায়গা, মানুষজন সব কেমন কিছুই জানা নেই—কাদের সঙ্গে মিশছে, স্বভাব বিগড়োচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে!…মানুষটিও তো ঐরকম, চোয়াড় কাঠখোট্টা…ওর হাওয়াও বেশীদিন গায়ে লাগা ভাল নয়।

উমা অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'কে জানে লোকটার মতলব কি! আমার বাপু ভাল লাগছে না রকম-সকম।'

কমলা ভেতরে ভেতরে তেমন আশ্বাস বোধ না করলেও মুখে জোর দেয়, 'মতলব আবার কি। তোর যেমন কথা!'

'বলা যায় না! মেজ জামাইবাবুরই দাদা তো!'

॥ ৪ ॥

চিঠিখানা পাবার বোধ হয় তিন-চার দিন পরেই হঠাৎ দেবেন এসে হাজির হ'ল। সে একা—গোবিন্দ আসে নি সঙ্গে।

বিবর্ণ মুখে কোনমতে প্রশ্ন করলে কমলা, 'খোকা, আমার খোকা কোথায় ?'

সে যে দেবেনের সঙ্গে কথা বলে নি এর আগে কোনদিন, তাও ভুলে গেল।

'ভয় নেই, সে ভাল আছে। আমি এধার থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে হঠাৎ চলে এসেছি। তোমাদের দিদির খুব বাড়াবাড়ি -বোধ হয় এই শেষ অবস্থা!'

'তা তাকে নিয়ে এলেন না কেন?' উমা প্রশ্ন করে, 'সে একা রইল ওখানে...'

'ঠিক একা নয়। ঐ হতভাগা বাঁদরটা গিয়ে পড়ল কিনা। আমারও হঠাৎ চলে আসা—বাঁদরটা বললে, আমি এলুম সবে, অমনি চলে যাব? আমিও থাকি গোবিন্দও থাক। তুমি যদি এর ভেতর না এসো তো আমি ওকে নিয়ে দিনসাতেক পরে রওনা হব।'

সহস্র আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উমা প্রশ্ন করলে, 'কে গিয়ে পড়ল? কার কথা বলছেন?'

'কে আবার? তোমার গুণধর মেজ জামাইবাবু। বৌমা তো ঠিকানা জেনেছেন সেখান থেকে ঠিকানা জেনে বিনা টিকিটে মূর্তিমান গিয়ে হাজির একেবারে!'

'কী সর্বনাশ!' প্রায় অসাড় কণ্ঠ থেকে শব্দটা আপনিই বেরিয়ে যায়।

দেবেন যেন এবার একটু বিরক্তই হয়। বলে, 'ও আবার কী কথা! সর্বনাশ আবার এর মধ্যে কী হল! সে কি বাঘ না ভালুক যে তোমাদের ছেলের কাঁচা মাথাটা কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে?...সাত দিনে এমন কি সর্বনাশ করবে শুনি?...এত যদি তোমাদের ভয়—এত নিধি যখন তখন বাপু তোমাদের ছেলে চোখছাড়া করা উচিত হয় নি।...তা ছাড়া ছেলেও তো বললে মেসোমশায় যখন এসেছেন, দু দিন থেকেই যাই। তাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি। খুচরো টাকা পয়সা দিয়ে এসেছি

গোবিন্দর হাতে—পাছে ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া উড়িয়ে দেয় সব—ভয়টা কিসের এত ?'

এর পর আর কথা বলা চলে না। কুটুম্ব মানুষ—সেধে উপকারই করতে এসেছে। কী-ই বা বলা যায় আর !

কিন্তু নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি থাকে না এদেব।

উমা বলে, 'চল দিদি, আমরা দুজনে চলে যাই, ওকে ফিবিয়ে নিযে আসি। জিজ্ঞেস কবে কবে চলে যাব এখন ঠিক।'

'ওমা কী বলিস !' কমলা অবাক হয়ে যায উমাব কথা শুনে, 'দু-দুটো সোমত্থ মেয়েছেলে একলা যাব এতটা পথ ? কোন্ দিক দিয়ে কী করে যেতে হয় তাই তো জানি নে।'

'সেটা জেনে নিলেই হবে দিদি। কত তো কাঙাল-গবীবেব মেয়েছেলে একা একা ঘুরছে। আমরাই বা তাব চেয়ে এমন ভাল কিসে ?'

'গ্যাখ্ না—সাতটা দিনই তো! এর মধ্যে সে আব কী করবে তোব ছেলের ?'

'কী যে সে না করতে পাবে তা তো জানি না। হয়তো এর মধ্যেই মদ ভাঙ্ খাওয়াতে শেখাবে—তা গ্যাখ !'

উমার আশঙ্কা শুধু যে সত্য হয় তাই নয়—সত্য কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

সাতদিনের দিন গোবিন্দ নয়—একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠিব লেখক নরেন। উমাকে সম্বোধন করে লেখা।

যদিচ চিঠির ভাষা প্রাঞ্জল, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি থাকলেও দুর্বোধ্য নয়—তবু দুই বোনই চিঠিখানা বারতিনেক করে পড়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনে হল যেন ও-চিঠির একটি বর্ণও তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি।

নরেন লিখেছে—

'পরমস্বভাসীর্বাদ স্বভঙ্ক বিষেস : –

কল্যাণীয়া উমা, একটি পরম স্বভসংবাদ জানাইয়া এই পত্র দিতেছি। শৃমান গোবিন্দর পিত্রিদেব জিবীত নাই, কিন্তু আমরা আছি, তাহার প্রেতি অভিভাবকদের যাহা কত্তব্য তাহা অবস্তই আমরা প্রাণপণে করিয়া যাইব। অবস্ত যতটা সামথ্যে কুলায়। শৃমান গোবিন্দ বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছে—সুবিধ

সংস্কারের পব পর ক্রেম অনুসারে এখন তাহাব বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। আমার শর্গগত জৈষ্ঠ ভায়রা বাঁচিযা থাকিলে সে কত্তব্যের কথা আমাদেব ভাবিতে হইত না, তিনিই ভাবিতেন। কিন্তু কী বলিব আমাদেব দুর্ভাগ্যক্রেমে তিনি অকালে গত হইলেন। যাহা হউক শ্রীমানেবও খুব সাধ সে একটি যোগ্য পাত্র দেখিযা বিবাহ কবে, তাহাব সাধ-আহ্লাদ মিটানো আমাদেব কত্তব্য। এমত বিধায়, আগামী কালই এ মাসেব শেস বিবাহেব দিন থাকায -কালই একটি সুপাত্রব সহিত তাহাব বিবাহ সম্পন্ন কবাইযা দিযাছি। পাত্রটি শ্রীমানদেব পাল্‌টি ঘব নৈকস্যি কুলীন। দেখিতে দিব্ব সুশ্রী। পাত্র দেখিযা শ্রীমান বডই আহ্লাদিত হইযাছে। যাহা হউক আজ কুসুমডিঙা সাবা হইল, আমি আগামী কাল ফুলসজ্জা সাবিযা আগামী পবশুই ছেলে বৌ লইযা রওনা দিব। তোমবা সব ঠিক কবিযা বাখিও। দিদিকে প্রেণাম দিও, তুমি আশীব্বাদ লইও। যদি পাবো তো সে মাগীকেও একটা সংবাদ দিও। ইতি—নিযত আশীব্বাদক শ্রীনবেন্দ্র নাথ সম্মা।'

॥ ৫ ॥

চিঠিখানা যখন আসে তখন উনুনে বান্না চডেছিল ওদেব। তবকাবিটা পুডে ঝলা হয়ে সেটাও যখন জ্বলে উঠল -তখন চৈতন্য হল। উনুনটা একেবারে নামিয়ে দিযেই এসে বসল উমা। আহারেব কথা—অথবা আহার্য প্রস্তুত করার কথা এখন আর কল্পনা কবাও সম্ভব নয়।

সর্বনাশ যা হবাব তা হয়েই গেছে। কোথাও কিছু বাকী বাখে নি নবেন।

বিযে শুধু নয—কুশণ্ডিকাও শেষ কবে তবে চিঠি দিয়েছে—সে চিঠি পাবাব আগেই সম্ভবত বৌভাত এবং ফুলশয্যাব অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেছে। কে করলে সে সব ব্যবস্থা—কারা কবলে বা কী অধিকারে করলে সে প্রশ্ন অবান্তর। সেবকম তুচ্ছ কথা নিয়ে বা সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন পাত্র নরেন নয়।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে কমলার স্বব বেরোয়। সে কেমন এক রকম অশ্রুব মতই করুণ হাসি হেসে কতকটা অসংলগ্ন ভাবে বলে, 'ঠাট্টা করেছে বোধ হয় নরেন জামাই—কী বলিস ?'

উমা জবাব দেয় না। তার দুই চোখ দিয়ে আগুন বেবিযে আসে।

কেন, কেন ও লোকটা তাদের এমন সর্বনাশ করবে ?

কেন, কেন -কী অধিকাবে ?

'এবার এলে আমি তাকে জুতো মাবব দিদি। গুরুজনই হোক আর যাই হোক্! তুমি দেখে নিও !'

কমলা সে কথার উত্তর দেয় না। এসব কথা তার মাথাতেই ঢোকে না।

বিশ্বাসও হয় না হয়তো।

প্রাণপণে ঝাপ্‌সা চোখ দুটো মুছে আবাব ও চিঠিটা পড়ে।

উমা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এ বিয়ে আমরা মানব না দিদি, ও বউ আমরা নেব না। যাব সঙ্গে ষড করে করেছে তাব কাছেই বাখুক মেয়ে।… তাবা জানে না, নেকা। মা বইল এখানে, তাকে জানানো হল না—বিয়ে দিয়ে দিলে।'

কমলা একটু ভযে ভয়ে তাকায় বোনের দিকে, কতকটা যেন মিনতির মতই বলে, 'কিন্তু মেযেটার দোষ কি বল। যদি সত্যিই জাতেব মেযে হয় তো—বাপ-মার পাপে তাকে অত বড শাস্তি কী করে দিবি? নিজেব কথাটা ভেবে দ্যাখ্‌ উমা, মেয়েছেলেব এত বড অভিশাপ আব নেই।'

চাবুকেব মতই কথাটা এসে পড়ে উমার বুকে।

সত্যিই তো, সে নিজেই তো সবাব ঘৃণিত, অভিশপ্ত। বিনা অপরাধে এই গুরু দণ্ড বহন করে চলেছে সে আবাব পবকে দণ্ড দেবার কথা মুখে আনে কোন্ লজ্জায়।

নির্জনে গিয়ে চৌকাঠে নিজে-নিজেই মাথা খোঁড়ে।

আজ দিদিব মুখেও এ খোঁটা তাকে শুনতে হল।

সে দিন এবং সে রাত্রি কাটল দুই বোনের অব্যক্ত এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে।

ছেলের মা, অকারণে নিরম্বু থাকতে নেই, তাতে ছেলের অকল্যাণ হয়—শুধু সেইজন্যেই বাত্রে একটু গুড় গালে দিয়ে দুই বোন জল খেলে এক ঘটি করে—তাও উমাই কথাটা মনে করিয়ে দিলে। কমলার সে স্তম্ভিত ভাবটা সারা দিনেও কাটে নি।

ভোরবেলা দেবেন এল রাধারাণীর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে।

পবশু শেষ রাত্রে মারা গেছে সে। কাল দুপুরে ফিরেছে ওরা শ্মশান থেকে। তার পব আর আসা হয় নি। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছে।

কমলা এবং উমা দুজনেই ছলছল চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য পরিচয়

ওদের, কিন্তু শ্যামার মুখে দুজনেই অনেক কথা শুনেছে —অনেক দিনের অনেক কাহিনী। সে হিসেবে ওদের খুবই পরিচিত যেন।

দেবেনের মুখের দিকে তাকানো যায় না—সে যেন দু' দিনেই অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছে। বাহ্যত কোন শোক প্রকাশ করলে না বটে, সহজ এবং সাধারণ ভাবেই সংবাদটা দিলে কিন্তু ঠিক অত সহজে যে সে ঘটনাটা নিতে পারে নি তা স্পষ্টই প্রকাশ পেল ওর চেহারায় এবং উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে। রগ দুটো যেন আরও বসে গেছে, চোখের কোলে গভীর কালি, গাল দুটো ঢুকে গেছে মুখের ভেতর—এমন কি চুলগুলোও যেন বেশ পাকা দেখাচ্ছে।

দু-একটা কথার পরই দেবেন হঠাৎ প্রশ্নটা করে বসল—'সে আসে নি, নরেন? করছে কি এখনও?'

এই শোকের মুখে সংবাদটা দেওয়া উচিত হবে কি না কমলা মনে মনে এতক্ষণ এই চিন্তাই করছিল —কথাটা উঠতে সে নীরবে চিঠিখানা বার করে ওর সামনে ফেলে দিলে।

দেবেন চিঠি পড়ে ক্ষেপে উঠল একেবারে।

'আমি ওকে খুন করব। ওকে গুলি করে মারব। জুতো মারতে মারতে মেরে ফেলব—হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছাকে। ওর গলায় পা দিয়ে জিভ টেনে বার করব! কী ভেবেছে ও? আমি মরে গেছি!...ছি ছি, এত বড় আস্পদ্দা ওর!...নিশ্চয় ঘুষ খেয়েছে দিদি, মোটা টাকা খেয়েছে। নৈকুষ্যি কুলীন না ছাই—এ সেই ভুবন ঘোষালের দামড়া মেয়েটা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি।...মেয়েটা যদি গোবিন্দর চেয়ে বয়সে বড় না হয় তো কী বলেছি!'

সে যেন দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল।

চেঁচামেচিতে বাড়িওয়ালারা সচকিত হয়ে উঠলেন। উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল দু-একজন। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বুড়ী গিন্নীরই বেশী। রসালো প্রসঙ্গের আভাস পেয়ে তাঁর দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে উঠল।

কমলা বিপন্ন হয়ে বললে, 'আপনি শান্ত হোন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বিয়ে তো আর ফিরবে না—হিন্দুর বিয়ে, শালগ্রাম শিলা আগুন আর ব্রাহ্মণ সামনে রেখে ভার যদি সে নিয়েই থাকে—'

'কিসের ভার নেওয়া, কিসের বিয়ে!—বার করছি সব! বাড়ি ঢুকতে দেবেন না—একদম চৌকাঠের বাইরে থেকে মেয়েটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে

দেবেন সেজন্য দায়ীক আমি।…উঁ—গছিয়ে অমনি দিলেই হল!'

আর এক পাক যেন নেচে এসে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় আবার বললে, 'ওরা তিন পুরুষ ঐখানেই আছে—ক্ষেত-খামার দেখে, জমি জায়গা নিয়ে নেড়ে চেড়ে খায়। একদম দেহাতী চাষা, বুঝলেন? ওদের মেয়ের বিয়ে হবে কোথায়—কে নেবে? ওখানে তেমন বাঙ্গালীই নেই, বামুন তো খুব কম।… যা আছে দূরে দূরে—কে বা সম্বন্ধ করে আর কে বা কি!—মেয়েটা এমনি দেখতে মন্দ নয় কিন্তু কালো। তাব ওপর নেই বাপের পয়সার জোর।—গোবিন্দকে দেখে এস্তক্ ছোঁক ছোঁক কবছে, ভরসা করে আমার কাছে কথাটা পাড়তে পারে নি। পাড়তে এলে ধুধ্ধুড়ি নেড়ে দিতুম—তা জানে। এখন আমি নেই…ঐ হাবামজাদা শুয়োরের বাচ্ছাকে ঘুষ খাইয়ে কাজ সেরে নিয়েছে। জাতটা তো বাঁচল তাব পব তুমি নাও না-নাও, না হয় ঘরেই পুষবে। এম্‌নেও পুষতে হচ্ছিল অম্‌নেও পুধবে। কম ফন্দিবাজ ধুক্তু মানুষ ঐ ঘোষালটা।'

আরও খানিকটা চেঁচামেচি করে দেবেন উঠে পড়ল।

'আমি চল্লুম হাওড়া ইস্টিশনে। ঐখানে জুতো মারতে মারতে যদি গোরবেটাকে মেরে না ফেলি তো আমার নাম নেই! ঐখান থেকেই সে ছুঁড়ীকে আমি ফিরিয়ে দেব - কিচ্ছু ভাববেন না।'

কমলা এবং উমা দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

উমা বললে, 'কাল থেকে আপনার নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন একটু। অন্তত একটু জল খেয়ে যান। আমাদেব অদৃষ্ট—আপনি আর কি করবেন?'

দেবেন প্রথমটা প্রবল আপত্তি তুলল।

'না, না। ওসব থাক। আর এক দিন হবে। আমার মন-মেজাজের ঠিক নেই ছোড়দি। ওসব ভাল লাগছে না। ছি ছি, বলতে গেলে জোর করেই আমি নিয়ে গেলুম ছেলেটাকে —যদি রেখে না আসতুম তো এমন কাণ্ড ঘটত না।…এর বারো আনা দায়ীক যে আমি হয়ে পড়লুম!'

আরও খানিকটা পেড়াপীড়িতে একটু বসে এক ঘটি শরবত খেয়েই রওনা দিলে সে।

যাবার সময় কমলা বলে দিলে, 'যা হবার হয়ে গেছে উমা, ওঁকে বুঝিয়ে বলে দে—মিছিমিছি এর ওপর আর কেলেঙ্কার না করেন!'

দেবেন চলে যেতেই মালতীরা ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

মালতীর ঠাকুমা বললেন, 'কী হয়েছে গা মেয়ে -বলি ব্যাওরাটা কি ?'

তাঁর রসনা সরস হয়ে উঠেছে ভালরকম একটা কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে, ধৈর্য ধরা কঠিন।

চুপ করে থাকলে চলবে না। চাপা দেবার চেষ্টাও বৃথা। একই বাড়ি, বলতে গেলে একত্র থাকা। একটু পরেই হয়তো ওরা এসে হাজির হবে। তখন সকলেই জানতে পারবে সব কথা।

কমলা নতমুখে সব কথাই খুলে বললে। উমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বুড়ী গিন্নী গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'অবাক করেছে মা !···মিনসে এত বড় শয়তান ! ঘুষ খেয়ে পরের ছেলে বেচে দিয়ে বসে রইল ? বলি তোমাদের আত্মীয় তো সব বেশ !—তা যখন ঐ সম্পর্কেরই লোক—তখন বিশ্বাস করে ছেলে ছাড়া তোমার উচিত হয় নি বাছা, স্পষ্ট কথা যা বলব !'

মালতীর মা শাশুড়ীর সামনে আজও চেঁচিয়ে কথা কন না। ঘোমটার মধ্যে থেকে বললেন, 'তা কি করবে এখন ঠিক করলে খোকার মা ?'

'কী করব ?' কমলা বিপন্নভাবেই বলে, 'সে বেচারীর দোষ কি বল ! তাকে কোথায় ফেলব। হাজার হোক ছেলেরই বৌ, ছেলে যখন তাকে বিয়ে করেছে !'

বুড়ী গিন্নী এদের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন, 'ওমা, তাই বলে অমনি বৌ ঘরে তুলবে নাকি ! অমন কাজও ক'রো না। অমন লোকের মেয়ে যখন তখন সেও ধাড়ী শয়তান। গুণতুক্ সব শিখে আসছে, এই বলে দিলুম—তোমাদের হাড়ীর হাল করে ছাড়বে। যাকে ঘুষ দিয়ে ঐ মেয়ে গছিয়েছে তার সঙ্গে বুঝুক, তোমরা ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বার ক'রে দাও !'

কমলা চুপ করে থাকে।

ওরে মনের ভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে মালতীর মা আবারও ফিস্ ফিস্ করে বলেন, 'বলি তা যদি না পার তো এধারে উয্যুগ সজ্জুগ কর।'

'উয্যুগ !' কমলা একটু অবাক হয়েই যায়।

'ওমা, উয্যুগ নেই ? বরণ করতে হবে না ? ন্যাটা মাছ চাই না ? দুধ ? বলি নিত্ত-কিত্ত আছে তো সব !'

মালতীব মা কাজেব মানুষ। তিনি এদেব কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হন।

এতক্ষণে কমলাবও হুঁশ হয়। সে ওঁব হাত ধবে বলে, 'যা হয় তুমি কব বৌদি, আমি ববং গোটা দুই টাকা দিই—আমি আব কিছু পারছি না।'

মোটামুটি একটা আয়োজন কবতে না কবতেই সদবেব বাইরে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াবাব শব্দ হল। ছেলেমেয়েবা উন্মুখ হয়েই ছিল—তাবা ছুটে গিয়ে দেখেই হৈ-চৈ কবে উঠল। মালতী একটা শাঁখ বাজাতে বাজাতে ছুটে এল—মালতীর মা এসে হাত ধবে বৌকে নামিয়ে নিলেন।

অপবাধীব মত মাথা হেঁট কবে নেমে দাঁড়াল গোবিন্দ। বেচাবী মা-মাসীব দিকে চাইতেও পাবছিল না।

একাই এসেছে ওবা।

কাবণ নবেন আব যাই হোক নির্বোধ নয়। সে গাড়ি ভাড়া করে ওদেব চাপিয়ে দিয়ে হাওড়া থেকেই সবে পড়েছে। তবে গাড়ি-ভাড়াটা নাকি যাবাব আগে দিয়ে গেছে গোবিন্দব হাতে।

ওব এতখানি বিবেচনায় উমা এবং কমলা দুজনেই বিস্ময় বোধ কবে।

বৌ দুধে আলতায় এসে দাড়াতে মালতীব মা তাব মুখটা তুলে ধবে বললেন, 'না ঠাকুবঝি, দিব্যি বৌ—খুব ঠকো নি বাপু, যাই বল।'

এতক্ষণ কমলা সেদিকে তাকাতে পাবে নি সত্যিই।

বহুদিনেব বহু আশা গড়ে উঠেছিল তাব এই একমাত্র ছেলেকে কেন্দ্র করে। বৈধব্যের পব ভবিষ্যতের সব আশা গিয়ে সংহত হয়েছিল ঐ জীবনটিতে। ছেলে বিদ্বান হবে, বড় হবে মানুষেব মত মানুষ হবে।

সেই সমস্ত আশায় ছাই দিয়ে দুগ্রর্হেব মত, বোঝার মত যে এসে ঘাড়ে চাপল তাব প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণা যে কমলাব অন্তর ছাপিয়ে উঠবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রবল একটা বিদ্বেষ, দুর্নিবাব একটা রোষ অনুভব কবে সে। এক সময় মনে হয় সত্যিই টুকবো টুকরো করে ফেলে সে মেয়েটাকে, দু হাতে গলা টিপে শেষ কবে দেয় সে ঐ সর্বনাশীকে। তাতে নিজের জীবন যায় যাক—ছেলেব জীবন তো স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ হবে।

প্রাণপণে প্রবল হৃদয়-দ্বন্দ্ব দমন করবার চেষ্টা করে সে। দু' হাতে বুকটা চেপে ধরে।

উমার দিকে ফিরে বলে, 'তুই যা বোন—যা করতে হয় কর্।'

উমা ঘাড় নেড়ে বলে, 'না। আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ এখনই আর ওর লেগে কাজ নেই দিদি। তুমি মা। শুধু তো ছেলেরই নও, আজ থেকে ওর-ও মা!'

সামান্য একটু সময়। সকলেই একটা কি নাটক অনুভব করছে বাতাসে। মালতীর ঠাকুরমার মুখে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হাসি। মালতীর মা বিপন্ন বোধ করেন নিজেকে। এমন সময় নতুন বৌই এক কাণ্ড করে বসল। হয়তো বাপ-মা শিখিয়ে দিয়েছিল আসবার সময়। কিংবা নরেনই—কে জানে! সে দুধে-আলতার পাত্র থেকে হেঁটে এগিয়ে এসে কমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর একটা পায়ে হাত রেখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন মা!'

আহা, বাছা রে!

এই শব্দটাই বুঝি বেরিয়ে আসতে চায় কমলার মুখ দিয়ে—প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

সমস্ত নিষ্ফল ক্ষোভ, সমস্ত ব্যর্থ রোষ নিমেষে এক সীমাহীন সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

'ষাট ষাট' বলে সে দু-হাতে তুলে ধরে বৌকে।

মালতীর মা মিছে বলে নি। কালো নয়—তবে ফরসাও নয়। শ্যামাঙ্গী বলা যেতে পারে। কিন্তু মুখখানি অপূর্ব। প্রতিমার মত ঢেউ খেলানো চুলের ভার, গড়নও নিখুঁত। তবে গোবিন্দর পাশে হয়তো একটু বেমানানই লাগবে। অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা। সেই কারণেই অনেকখানি বড় দেখাচ্ছে ওর পাশে। নইলে মুখ এখনও কচি আছে। খুব বেশী হলেও গোবিন্দর সমবয়সী হবে।

মালতীর ঠাকুমা সকলকে শুনিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, 'ভাল হয়েছে, বৌ ছোট ভায়ের হাত ধরে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাবে খন!'

কমলা কিন্তু বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে অপূর্ব একটা তৃপ্তি অনুভব করে মনে মনে। এমনি একটি বৌই বুঝি তার স্বপ্ন ছিল মনের অবচেতনে। সে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, 'এসো মা এসো। তোমার অপরাধ কি মা। আমার ভাগ্য!...আজ, আজ তিনি থাকলে এ তো আনন্দেরই কথা হ'ত!'

দুই চোখ আর বাধা মানে না... হু-হু করে কেঁদে ফেলে কমলা।

অনেকক্ষণ, অনেক বিপরীত মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করেছে সে। সব ঝড়ের প্রশান্তি হয় বুঝি এই বর্ষণেই। শান্ত প্রকৃতিস্থ হয় সে।

বৌটি বেশ সপ্রতিভ ধরনের মেয়ে।

পশ্চিমে মানুষ হয়েছে বলেই বোধ হয় এদেশী চালচলনে ততটা অভ্যস্ত নয়। সোজা চোখ তুলে তাকায়, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলে,—হাসির কথায় শব্দ করে হাসে। বধূসুলভ লজ্জা নেই—সে অভাবটা সম্বন্ধে তেমন সচেতনও নয়।

বৌয়ের নাম তারা।

সে নিজেই ব্যাখ্যা করলে, 'ঠাকুমার দেওয়া নাম কালীতারা। তা কালী আবার আমার দিদিমারও ডাকনাম—তাই মা ডাকেন শুধু তারা বলে।'

দেবেনের অনুমানই ঠিক। ভুবন ঘোষালেরই মেয়ে সে।

উমা প্রশ্ন করলে, 'জামাইবাবুর দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি তোমাদের হাওড়াতে?'

'কৈ না তো!' অবাক হয়েই উত্তর দিলে তারা, 'তাঁর যাবার কথা ছিল নাকি?'

উমা কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে, 'না, খবরটা পেয়ে তিনি খুব রেগে গিছলেন কিনা। তাই ভাবলুম যদি সেখানে গিয়ে পড়ে একটা রাগারাগি চেঁচামেচি করেন'

তারা আরও অবাক হয়ে বললে, 'কেন, তিনি তো জানতেন!'

'সে কি!' একই সঙ্গে কমলা ও উমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

গোবিন্দ এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি, মাথা হেঁট করেই বসে ছিল। সে এবার মুখ তুললে। বললে, 'ওরা কেউ কম নয় মা। উনি আমার শ্বশুরের কাছে তিন শ টাকা ধার করেছিলেন ক-বারে, এক পয়সাও দিতে পারেন নি, শ্বশুর শেষে ওঁকে বলে যে এই বিয়ে ঠিক করে দাও, তা হলে আর তোমায় টাকা দিতে হবে না। তখন থেকে জপাচ্ছে আমাকে। নিহাত চলে আসতে হ'ল তাই—তাও মেসোমশায়কে পাহারা রেখে এল। বাড়ি থেকে বেরোতে দিত নাকি আমাকে? চোখে চোখে রাখত দিনরাত। মেসোও দুশখানি টাকা খেয়েছে।...তার ওপর আজ এখানে নেমে দানের বাসনগুলোও হাতাবার তালে ছিল। নিহাত—', খানিকটা থেমে আরক্ত-কপোলে কোন মতে কথাটা শেষ করে গোবিন্দ, 'নিহাত ও ঝগড়া করলে বলে তাই। গাড়িভাড়ার টাকাকড়ি সব শ্বশুর মশাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিনা—আমি তা জানতুমও না, সব ও-ই আদায় করেছে!'

দু-দুবার স্ত্রীর কথাটা উল্লেখ করার লজ্জায় গোবিন্দর কান দুটো আবীরের মত রাঙা হয়ে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

আজকাল শ্যামার দিন কাটে অবিচ্ছিন্ন একটিমাত্র চিন্তার মধ্য দিয়েই। সেটা হল অর্থ-চিন্তা। হেম বং-কলে কাজ করে কিন্তু সে সামান্য কাজ। দশ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিল, এখন পনেরো টাকা পায়। সকাল সাতটায় খেয়ে বেরোতে হয়- ফেরে সেই সন্ধ্যা ছটায়। কারণ আটটায় হাজিরে। দেড় ক্রোশ হেঁটে যাওয়া- পুরো একটি ঘণ্টা সময় লাগে। তা হোক--মাইনেটা যদি আর একটু বেশী হ'ত—শ্যামার অত দুঃখ করার কিছু থাকত না। এধারে যজমানি কাজটা হেম মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছে বটে, তবে তার অবসর কৈ? সাতটায় যাকে বেরোতে হবে সে আর পূজো করে কখন? সরকার-বাড়ির নিত্যসেবাটা সারতেই হয়, তাতেও অন্তত পনেরো মিনিট সময় লাগে।

হেম অবশ্য খুব ভোরে ওঠে কিন্তু অত সকালে যজমানরা পূজোর আয়োজন করে রাখবে—এটা আশা করা যায় না। খন্দ লক্ষ্মীপূজোর দিনগুলোতে হেম অফিস কামাই করে—কারণ পাঁচ-সাত বাড়ির পূজো সেদিন পাওয়া যায়। তাও দুটো বৃহস্পতিবার পর পর পেটের অসুখের অজুহাতে কামাই করা যায় না—অফিসে সন্দেহ করবে। যেদিন সংখ্যায় বেশী পূজো পাওয়া যায় সেদিনই কামাই করে শুধু। পরেরটা বা আগেরটা —যার খুব গরজ সে আগে বলে রাখে, ভোরে উঠে যোগাড়ও করে রাখে। কিন্তু সে আর ক'টা? মোট কথা চাকরি করতে গেলে যজমানির আয় খুব বেশী হয় না। আর শুধু যজমানির আয়ের ওপর নির্ভর করে চাকরি ছাড়ার কথা বলতে পারে না শ্যামা। হেমও তাতে রাজী হয় না। ন-মাসে ছ-মাসে ষষ্ঠীপূজো, বছরে ছটা দিন লক্ষ্মীপূজো, তার ওপর ভরসা করে বসে থাকতে সে রাজী নয়। তিনপো এক সের চাল, একখানা করে গামছা আর দু আনা চার আনা দক্ষিণে! কী হয় এতে? আর মেলে কিছু কাটা ফল—তাও এখানে কেউ ফল কিনে দেবতাকে দেয় না—যা বাড়ির উঠোনে হয়—কলা পেয়ারা শসা—তাই দিয়ে কাজ সারে। সেসব ফল ছেলেমেয়েরা খেতেও চায় না। ফলগুলো আস্ত দিলেও না হয় বিক্রি করা যেত।

সরকাররা নিত্যসেবার মজুরি একটু কিছুও বাড়াতে রাজী হন না। নরেন যেদিন এই কাজটি ভরসা করে শ্যামাকে এই তিন দিক চাপা ঘরটিতে এনে তুলেছিল সেদিনও য' মিলত আজও তাই মেলে। সকালে আধ সের আতপ চালের একটা নৈবেদ্য, রাত্রে খানকতক বাতাসা আর একপো দুধ। অবশ্য এই ঘরটায় থাকতে দেন—সেটাও একটা বড় লাভ। কিন্তু আধ সের চালে আজকাল এক বেলাও কুলোয় না। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, তাদের পেটও বেড়েছে। তা ছাড়া কিছুই খেতে পায় না বেচারীবা, ভাত আর ভাত—দুবেলা দুটি মুঠো ভাত শুধু! সেটা কমাতে গেলে চলে না। জলখাবারের কথা কেউ চিন্তাও করে না। কোনদিন দৈবাৎ যদি কিছু মেলে সে কথা আলাদা—সেটা রীতিমত উৎসবের দিন হয়ে ওঠে ওদের কাছে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে বটে—কিন্তু এখনও কান্তি আছে, কানু আছে—ছোট মেয়ে তরু আছে। তবু এর মধ্যে গোটাকতক মবে গেছে। কেউ হয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই মরেছে—কেউবা মাস দুই তিন ভুগে ও ভুগিয়ে মরেছে।··· সে আর এক কষ্ট—এমন পয়সা নেই যে চিকিৎসা হয়। সন্তান নিজের চোখের সামনে ভোগে—বসে বসে দেখতে হয়। ভগবান তাকে যেন সব দিক দিয়েই মারতে চান।·· তার কাছেই বা এতগুলো পাঠান কেন ? আর পাঠানই যদি তো এমন আধমরা করে পাঠাবার কী দরকার !

মঙ্গলা বলেন নিহাত মিছে নয়, 'মহাপাপ! মহাপাপ! এসব হ'ল মহাপাপের ফল—বুঝলি বামনী ? আর জন্মে কত লোককে বঞ্চিত করেছিলি, তাই এই জন্মে ভগবান এমন বেঁধে মারছেন! মুয়ে আগুন বামুনের—কোন্ চুলো থেকে কতকগুলো খারাপ ব্যামো ধরিয়ে এসে এমনি করে দগ্ধাচ্ছে তোকে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি মেয়ে, ওর গর্মির ব্যামো আছে। তাইতেই নাকি এমনি সব হয়।··দেখিস্ তোরও শরীর ঝাঁঝ্‌রা করে দিয়ে যাচ্ছে—তোর কী হয় তাও দেখিস্! তাও বলি বাপু, তুই তেমনি নিঘিন্নে নিপিত্তে—আমি হলে সাত জন্মে অমন ভাতারের ত্রিবৃ-সীমানায় ঘেঁষতুম না।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে রাগে দুঃখে অপমানে শ্যামার চোখে জল এসে যায়। অথচ কী বা উত্তর দেবে সে!···এ সন্দেহ তার অনেক কালের। বহু দিন আগে তার বুড় জাও এই কথাটি বলে গিছলেন, 'নিশ্চয়ই এরা কোন খারাপ ব্যামো ধরিয়েছে ভাই।' সেদিন অবশ্য কথাটার মানে বুঝতে পারে নি—কিন্তু আজ পারে।

দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শ্যামার—সতেরো বছরের রূপবান কিশোর স্বামীর সঙ্গে। সে মূর্খ, সে গোঁয়ার—কিন্তু তবু সেদিন বালিকা-বয়সের সমস্ত মনটুকু দিয়েই ও স্বামীকে ভালবেসেছিল—তাকে অন্তরের কামনার আসনে বসিয়েছিল।...যা নিঃশেষে দিয়েছিল তা আর নিঃশেষে ফিরিয়ে নিতে পারে নি।

অনেক সয়েছে সে। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা নির্বোধের মত উড়িয়ে নরেন আর তার দাদা এইসব রোগ কিনেছে। সে-সময় ওদের ফেলে রেখে দিয়েছিল গুপ্তিপাড়ার এক নির্জন বাড়িতে। দিনের পর দিন উপবাসে কেটেছে—মারধোর নির্যাতন, অনেক কিছুই পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে। নরেন ঠগ্, নরেন বাটপাড, নরেন মিথ্যুক। সবই জানে শ্যামা। তবু যখন সে এসে দাঁড়ায়—তখন আজও বুকটা তার দুলে ওঠে বৈকি। যতই সে প্রতিজ্ঞা করুক মনে মনে যে কিছুতেই আর কোন সম্পর্ক রাখবে না স্বামীর সঙ্গে --কোন প্রতিজ্ঞাই টেঁকে না শেষ পর্যন্ত।

আজকাল নরেনও আসে কালেভদ্রে, কখনও-সখনও। পাঁচ-ছ মাস তো বটেই, এক-এক সময় আট মাস দশ মাসের ব্যবধানে আসে সে। কোথা থেকে উল্কার মত এসে হাজির হয়। কখনও কিছু হাতে করে আসে—ব্রাহ্মণ-বিদায়ের বা দৈবাৎ-জোটা যজমানির দু-একটা জিনিস নিয়ে। কখনও একেবারেই শুধু হাতে এসে ওঠে। সে সব সময় বরং ঘর থেকে কাপড় কিনে দিতে হয় শ্যামাকে এমনিই অবস্থায় এসে ওঠে। শতছিন্ন কাপড়, গায়ে জামা নেই, পরনে জুতো নেই—একহাঁটু ধুলো। মুখচোখ দেখে মনে হয় কত কাল কিছু পেটে পড়ে নি।

কিন্তু তবু—সে সব দিনে পূর্ব সংকল্পমত তাকে দোরের কাছ থেকে বিদায় দিতে সে পারে না কিছুতেই। বরং খাইয়ে, পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলতেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোথায় থাকে সে এই দীর্ঘ সময়গুলো—কী করে—কী খায়—এসব প্রশ্ন অনাবশ্যকবোধে কোনদিনই করে নি শ্যামা, এখনও করে না। কী উন্মত্ত উৎসবে তার দিন কাটে, কোন্ সংসর্গে সে এমন স্ত্রী, ফুলের মত ছেলেমেয়ে ছেড়ে পথে মাঠে ঘাটে দিন কাটায়, ভেসে ভেসে বেড়ায়—তা সে-ই জানে। জিজ্ঞাসা করলেও তো সত্য জবাব পাবে না—সে কথা শ্যামা ভাল করেই জানে। তাই ইচ্ছা করে না ওর, অকারণে কাদা ঘাঁটবার।

তবে নরেনের লম্ফঝম্প আজকাল অনেক কমেছে। আগেকার সে

সপ্রতিভ ভাবটাও যেন আর নেই। ছেলে বলে হেমকে সে যেন একটু সমীহই করে বরং। হয়তো হেমের কথাবার্তা শুনে তার মতিগতিও অনুমান করতে পারে অনায়াসে—পিতৃভক্তির চাপ বেশী সহ্য করানো যাবে না তাকে দিয়ে। অবশ্য হেম যখন থাকে না তখন মাঝে মাঝে পুরোনো অভ্যাসবশত হাঁকডাক করে এক-এক দিন—'উঃ। রোজগেরে ছেলে বলে ওঁকে ভয় করে চলতে হবে নাকি! ভারি তো রোজগার। এখনও এই শম্মা রেগোলে ওর এক মাসের রোজগার সাত দিনে কামিয়ে আনতে পারে।···অত মেজাজের ধার ধারি না আমি, ছেলেকে তোমার বলে দিও। আমার বাড়ি, আমার সংসার—তেমন বুঝলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব বাড়ি থেকে। হুঁ। রাগলে আমি বাপেরও বেটা নই!'

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কণ্ঠে আগেকার সে উগ্র স্বর আর ফোটে না। শ্যামা গ্রাহ্যও করে না আজকাল। কথায় কানই দেয় না। খুব অসহ্য হলে বলে, 'থাম দিকি। মেলা ভ্যানর্ ভ্যানর্ করতে হবে না। তোমার মুরোদ এ সংসারের কারও আর জানতে বাকী নেই—টিকটিকি আরশোলাগুলো পর্যন্ত জেনে গেছে। চুপ কর।'

'বটে! বড্ড যে তেজ হয়েছে দেখছি। অনেকদিন পিঠে তোমার চেলাকাঠ ভাঙি নি—নয়?'

বলে—কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে চুপ ক'রেও যায়।···যেমন শামুকগুলো আঘাত পেলেই নিজেকে গুটিয়ে নেয় খোলের মধ্যে, কতকটা সেই রকম।··· ওর এই অধঃপতন (?) দেখে বরং শ্যামার এক-এক সময় বিচিত্র কারণে একটু দুঃখবোধই হয়।

খরচ দিন দিন বেড়েই যায়। সে অনুপাতে আয় বাড়ে না। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়। সরকারদের বিস্তৃত বাগানের কলাটা আমটা নারকেলটা আনাজটা চুরি করে বিক্রি করা—এইটেই বেশী ভরসা। কিন্তু ওরাও কড়া পাহারা রাখে। পিটকীর ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তারা তো সারাদিনই চোখে চোখে রাখে। তারই মধ্যে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সরাতে হয়। ফলে কান্তি কানু তরু—এরা বেশ সুদক্ষ চোর হয়ে উঠেছে। অনেক সময় প্রথম রাত্রে ঘুমিয়ে নিয়ে মাঝরাতে উঠে অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ে ওরা—সাপখোপের ভয়ও করে না। অক্ষয়বাবু আজকাল হাঁস পুষছেন, মাঝে মাঝে তারা জলে

ডিম পেড়ে যায়। তরুটা বড্ড ডিম খেতে ভালবাসে তাই সারাদিনই বলতে গেলে পুকুর-ধারে বসে থাকে সে। একটা ডিম পেলে ওদের উল্লাসের সীমা থাকে না—শ্যামা সেইটিই ভেজে বড়া করে—তার ডালনা করে দেয় ছেলেমেয়েদের, একটা ডিমে সকলকার খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এ কাজটি সারতে হয় খুব গোপনে। ডিমের খোলাটা কাপড়ের মধ্যে করে লুকিয়ে সকলের অগোচরে পগারে ফেলে আসতে হয় কিংবা একেবারে বড় রাস্তায়, নইলে ধরতে পেলে আর রক্ষা থাকে না। সবাই মিলে গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়ায় একেবারে। বিশেষ পিঁটকীর যা মুখ হয়েছে—সে বামুন বলে মানে না, শাপমন্যিরও ভয় করে না। এত কাণ্ড করেও সব দিন শ্যামা পেট ভরে ছেলেমেয়েদের দুবেলা খেতে দিতে পারে না, সেইটেই বড় দুঃখ ওর। মা রাসমণি যত দিন বেঁচে ছিলেন, তবু মধ্যে মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে দু-পাঁচ দিন ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে আনত, এখন সে পথও ঘুচেছে। কোন দিকেই আর কেউ নেই ওর।

॥ ২ ॥

এত দুঃখের মধ্যে একটি সান্ত্বনা ছিল শ্যামার—মেয়ে দুটি ভাল ঘরে পড়েছে। বড়র তো কথাই নেই। অভয়পদর মত জামাই পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। হয়তো খুব সচ্ছল অবস্থা নয় কিন্তু শ্যামা এতদিনে মানুষ চিনতে শিখেছে—সচ্ছল অবস্থা আসতেও খুব দেরি হবে না ওদের। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান ছেলে অভয়পদ—ওর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

মেজমেয়ে ঐন্দ্রিলার শ্বশুররা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। ধান-চাল খেত-খামার গরু-বাছুর—জাজ্বল্যমান সংসার। শ্বশুর মেয়ে দেখে পছন্দ করে বলতে গেলে বিনা পয়সায় নিয়ে গেছেন। পথ চলতে চলতে পুকুরঘাটে ঐন্দ্রিলাকে দেখে খোঁজ করে এসেছিলেন মাধব ঘোষাল। নিজেই কথা পেড়ে সেধে নিয়ে গেছেন। অবশ্য সেধে নিয়ে যাবার মতই মেয়ে ঐন্দ্রিলা। তার গর্ভের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল। অমন রূপসী মেয়ে রাজারাজড়ার ঘরেও দুর্লভ। হরিনাথ দেখতে ভাল নয় তত, রংটা বিশেষ করে খুবই কালো। সেজন্য প্রথমটা ঐন্দ্রিলা রীতিমত বিদ্রোহই করেছিল। ছেলেবেলা থেকে কালো দেখতে পারত না সে, কালো মাছ খেত না, কালো হাঁড়ির ভাত খেতে চাইত না। কিন্তু কালো হোক, হরিনাথের স্বাস্থ্যটি

ভাল—লম্বাচওড়া জোয়ান ছেলে। বলতে নেই, দুটিতে ভাবও হয়েছে খুব। খুব বেশী দূর তো নয়, দু ক্রোশের মধ্যেই ঐন্দ্রিলার শ্বশুরবাড়ি। ও গাঁয়ের বহু লোক এপাড়ায় আত্মীয় বা কুটুমবাড়ি আসে, মুখে মুখে বহু কথাই ছড়ায়। অনেকে শুধু খবর শোনাবার জন্যই একেবারে অপরিচিত বাড়িতেও যেচে আলাপ করতে ঢোকেন--

'কৈ গো বামুন দিদি,—এই বাছা এলুম, তোমার ঘর সংসার দেখতে। আমাদের আড়গোড়ের কল্‌না ঘোষালের বেয়ান তো তুমি? বেশ, বেশ। আসব আসব করি অনেক দিন থেকেই—আবার ভাবি তোমরা কি মনে করবে! শুনেছি তুমি বাছা আবার লেখাপড়া জান, তার ওপর শহরের মেয়ে—হয়তো কথাই কইবে না। আমরা হলুম গে মুখ্‌খু-সুখ্‌খু সেকেলে মেয়েমানুষ। তা কী বল বাছা, বসব একটু—না চলে যাব?'

'ওমা সে কী কথা! আসুন আসুন—এই যে। অ তরু, ওমা আসনটা পেতে দে মা। শিগ্‌গির। কী ভাগ্যি আমার—আপনারা দয়া করে গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন! এই যে বসুন।'

শ্যামাকে জোর করেও মুখে আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয়।

ভাগ্যে কাপড়খানা কালই ফুটিয়েছিল। সেলাইও করা হয়েছে। সেলাইটা আবার চোখে না পড়ে যায়—হে মা সিদ্ধেশ্বরী!

যিনি এসেছেন তিনি তখন জাঁকিয়ে বসেন।

'তা বাপু বেশ মিষ্টি ব্যাভার তোমার, মানতেই হবে। শুনেছি কলকাতার মেয়েরা সব মারমুখো হয়েই থাকে। তাই তো ভরসা করে এতকাল ঘেঁষি নি। তোমার বেয়াই-বাড়ি সেদিন গিছনু—তোমার মেয়েই বললে, যাবেন না কাকীমা, আমার বাপের বাড়ি। ঐ তো কাছেই যান। বলি তাই আজ—। যা হয় করে মরীয়া হয়েই ঢুকে পড়লুম। এই পাশেই আমার কুটুম-বাড়ি কি না। এই যে চট্টখণ্ডীরা—ওদের বৌ হ'ল আবার আমার আপন পিসীমার ননদ। সেই সুবাদেই জানাশুনো যাতায়াত। তা ছেলেমেয়ে কটি গা তোমার সবসুদ্ধ?'

এইভাবে শুরু হয়, অন্তহীন আলাপ এবং পরিচয়ের এক-একটি ইতিহাস। মোটামুটি কাঠামো সবগুলোরই এক। শুধু বর্ণ-বৈচিত্র্যে বা তথ্যে হয়তো একটু-আধটু এদিক-ওদিক।

এদেরই মুখে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির খবর পায় শ্যামা।

'শ্বশুর খুবই ভাল। তবে শাশুড়ী মাগী বাপু একটু দজ্জাল আছে। মুখে যে খুব গালমন্দ দেয় তা নয়। কেমন জান—ঐ যাকে বলে শেতল-বৌ-কাঁটকী। আর ছেলেমেয়েগুলো সব মা'র দিকে। বড় ছেলেব মোটা রোজগার বলে মুখে কিছু বলতে পারে না—কিন্তু কালোর বাড়ি সোন্দর মেয়ে গিয়ে পড়েছে তো, সবাই হিংসে করে। আর যাই বল বাপু, তোমার মেয়েটারও একটু বাড়াবাড়ি আছে। বড্ড বেহায়া। রূপের দ্যামাকও তো আছে, তার ওপর সোয়ামীর সোহাগ ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অতটা কিন্তু ভাল নয়। এসে বাপু সাবধান করে দিও একটু।'

একই কথা বলে সবাই।

কী করে এমন সাহস পেল ঐন্দ্রিলা—শ্যামা ভেবে পায় না, মনে মনে লজ্জা অনুভব করে সত্যিই।

মঙ্গলার কানেও নানা কথা আসে। আর তিনি রেখে-ঢেকে বলবারও চেষ্টা করেন না। সোজাই বলেন, 'না বাপু বামনী, যতই বলিস এতটা ভাল নয়। হ'লই বা ভাতার-সোয়াগী—বলি আমাদেরও তো বয়স ছিল লো, সোয়ামী যে ধরে নেয় নি তাও নয়, চিরকাল উঠেছে বসেছে আমার কথায়। তাই বলে আমরা অত ঢলাঢলি বেলেল্লাগিরি করেছি কখনও? কি ঘেন্নার কথা মা। তোর মেয়েটা পাগলী আছে—তা যা-ই বলিস।'

শ্যামার লজ্জা করে—আবার আনন্দও হয় বৈকি।

একটু যেন গর্বও অনুভব করে—ঐন্দ্রিলার এই দুর্জয় সাহসে।

মেয়ে-জামাইয়ের খুব ভাব হয়েছে। একটু অসাধারণ রকমেরই। জামাই যতক্ষণ বাড়ি থাকে—নাকি কেবলই মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েও নানা ছুতোনাতায় যখন তখন ঘরে গিয়ে তার বরের সঙ্গে গল্প করে আসে। দুজনের চোখ শুধু দুজনের দিকে। এর বাইরে কোন লোক বা কোন পৃথিবীর যেন অস্তিত্বই নেই। দিনের বেলা স্বামীর ঘরে যাওয়া বা গল্প করা—এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট নিন্দের ব্যাপার। কিন্তু তাতেও থামে নি ঐন্দ্রিলা। হরিনাথ যখন অফিস যায় তখন সংসারের যতই কাজ থাকুক—ঐন্দ্রিলা গিয়ে ছাদে ওঠে। ছাদের পূব-দক্ষিণ কোণটা থেকে সে-ই বড় রাস্তার বাঁক পর্যন্ত নাকি দেখা যায়। সেই কোণে গিয়ে আলসেয় বুক চেপে ঝুঁকে পড়ে দেখে ঐন্দ্রিলা -যতক্ষণ হরিনাথকে বিন্দুর মতও দেখা যায় ততক্ষণ। শ্বশুর শাশুড়ী

কত গালাগালি দিয়েছেন, দেওর-ননদরা ঠাট্টা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে গেছে— কোন কথাই গায়ে মাখে না মেয়ে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারো মাস ঐ এক অবস্থা। আবার ফেরবার সময়ও ঠিক সময় বুঝে ছাদে উঠে যায় সে। যেদিন হরিনাথের ওভারটাইম থাকে—সেদিন তো কথাই নেই। যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নেমে আসে চারিদিকে—ততক্ষণ ঐন্দ্রিলা ছাদ থেকে নামে না। নামলেও ভাল ক'রে কাজকর্ম করে না—কারুর কথা শোনে না, মুখ ভার ক'রে থাকে। রাত্রে হরিনাথ এলে তবে তার মুখে আবার হাসি ফোটে, কাজে-কর্মে উৎসাহ আসে।

'না-না, তুইই বল বামনী, এত ঢলাঢলি কি ভাল? এ বাপু দস্তুরমত বেলেল্লাগিরি। গেরস্ত-বাড়িতে এসব কাণ্ড ভাল নয়। শ্বশুর মিন্‌সে নাকি বড্ড ভালবাসে, তাই কিছু বলে না। তারই দাপটে বাড়ির আর সকলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। সে মিন্‌সে চোখ বুজলে—ত্যাখন?'

প্রায়ই বলেন মঙ্গলা।

'ভাতার আবার ভালবাসে না কার?...তোর মত ভাতার ধর্ দৈবে-সৈবে এক আধ-জনের। কিন্তু তাই বলে জগৎ সংসার সব পর ক'রে শুধু তার গলা জড়িয়ে বসে থাকতে হবে—আর শ্বশুরবাড়িকে শত্তুরপুরী ক'রে তুলতে হবে—এই বা কেমন কথা। ঈশ্বর না করুন—বলতে নেই, বরেরই যদি ভালমন্দ কিছু হয়? ঐ শ্বশুরবাড়িতে কি ওকে বাস করতে হবে? লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে না?...তুই একটু বুঝিয়ে বলিস বামনী। পাড়া ঘরে যে আর কান পাতা যায় না। শাশুড়ী ননদ সহ্য করবে কেন?'

কথাটা ভাল লাগে না শ্যামার। শিউরে উঠে নিজেই সিদ্ধেশ্বরীর উদ্দেশে কানমলা খায় গোপনে, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে ঐন্দ্রিলা এলে বকে দেবে খুব। কিন্তু মেয়ে আসে না বাপের বাড়ি। নিজে থেকে তো আসেই না—কখনও-সখনও শ্যামা আনতে পাঠালেও সে-ই সোজা বলে দেয় যে তার আসার সুবিধা হবে না। অপমান বোধ করে শ্যামা—কিন্তু কারণটা বুঝে অপরাধ নেয় না। আসলে জামাইকে ছেড়ে আসতে রাজী নয় সে। ষষ্ঠী বা ঐরকম কোন উপলক্ষে হরিনাথের সঙ্গে এসে তখনই চলে যায়। সে সময় কোন কথাই বলা যায় না। কেমন যেন লজ্জাও করে—এসব প্রসঙ্গ তুলতে।

একটা রাত থাকলেও না হয় পাশে শুইয়ে কথাটা পাড়ত সে। অন্ধকারে চক্ষুলজ্জা থাকে না ততটা—কিন্তু এক রাতও মেয়ে থাকতে রাজী হয় না।

অনুরোধ করলে বলে, 'না বাপু, সে আমার স্থবিধে হবে না। তোমার জামাইয়ের বড় অস্থবিধে হয় আমি না থাকলে। একখানা ঘরে বাস তোমাদের —জামাইকে তো আর রাখতে পারবে না।'

আহত হয় শ্যামা। চোখে জল এসে যায় তার। মনে হয় শুনিয়ে দেয় ভাল ক'রেই—কিন্তু শেষ অবধি সামলে নেয় নিজেকে।…ষাট্‌ ষাট।

এরই মধ্যে এক দিন খবর এল ঐন্দ্রিলা সন্তান-সম্ভবা।

আনন্দেরই কথা কিন্তু খরচের কথা মনে পড়ে শ্যামার মুখ শুকিয়ে যায়। মহাশ্বেতা তাকে সাধের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, প্রথমবার সাধ হয় না বলে তার পরের সন্তানের বেলাতেও সে ঝঞ্ঝাট ছিল না। কিন্তু ঐন্দ্রিলার এই প্রথম। অন্তত একটা কাপড় দিতেই হবে। আর খুব খেলো কাপড় দিলেও চলবে না।

ভেবে শ্যামার ঘুম হয় না রাত্রে।

একেবারে যে নেই তা নয় - এত দুঃখের মধ্যেও হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে ন্যাকড়ায় বাঁধা কটি টাকা জমেছে তার। তবে সে টাকায় হাত দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না। ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করা অর্থ—বিশেষ উদ্দেশ্যেই সে জমাচ্ছে—এক-একটি আধ্‌লা করে।

উমাকেই একটা চিঠি দেবে কাকুতি-মিনতি করে—না কৌশলে মেয়েকে দিয়ে বড় জামাইয়ের কাছে কথাটা পাড়বে, এই কথাটাই রোজ ভাবে সে—কিন্তু কিছুতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। উমা হয়তো সটান 'পারব না' বলে দেবে —কেমন এক রকমের মন হয়েছে তার। গোবিন্দও বোনপো—হেমও তাই। গোবিন্দর সংসারে টাকা গুঁজতে পারে অথচ তার বেলায় এক পয়সা বার করতে গেলেই কষ্ট!

না, বলতে গেলে জামাইকে বলাই স্থবিধা।

কিন্তু—

এখনও একটা দুর্নিবার লজ্জা এসে যেন বাধা দেয়। এখনও ওটুকুকে জয় করতে পারে নি শ্যামা।…

অবশেষে এই দুশ্চিন্তা থেকে অভয়পদই অব্যাহতি দেয় ওকে। এক দিন অফিসের ফেরত এসে অতি সহজেই একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি দাওয়ায় নামিয়ে রেখে চলে যায়। কেন, কার জন্য—কিছুই বলে না। বলার দরকারও

নেই। শ্যামা বোঝে—এবং মনে মনে অভয়পদর শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঐন্দ্রিলার সাধে মাধব ঘোষাল বেশ একটু ঘটাই করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান হরিনাথ—তাব সন্তান আসছে, তাঁর প্রথম পৌত্র বা পৌত্রী। বংশের আর এক পুরুষের সূচনা হচ্ছে। এ একটি বিশেষ ঘটনা বৈকি! তা ছাড়া ঐন্দ্রিলাকে তিনি একটু বেশী স্নেহেব চোখে দেখেন সে কথাটাও অস্বীকার করাব উপায় নেই। তাঁর কালোর বংশ—যেদিকে তাকান নিকষ কালো গায়ের রং। তাব ভেতর পদ্মফুলের মত এই বধূটি যখন ঘোরাফেবা করে, তখন তাঁব চোখ জুড়িয়ে যায়। শুধু ও-ই সুন্দরী নয়, সম্ভবত ওব দ্বারা তাঁব এই বংশের 'পণ' বদলাবে, এ আশাও তিনি রাখেন মনে মনে। আবার হয়তো কোন দিন এই বাড়িতেই ফুটফুটে সব ছেলে-মেয়েবা ঘুবে বেডাবে, সেদিকে চেয়ে চেয়ে অনাগত কালে ভাবী গৃহস্বামীদের মন তৃপ্ত হবে—এমন ক'রে তাঁর মত প্রতিনিয়ত দৃষ্টি আহত হবে না অবিরাম কালো রঙের দিকে চোখ পড়ে!

সে অসম্ভব ঘটনাও—অন্তত আজ তাঁব কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়—যদি ঘটে তো সে তাঁর এই পুত্রবধূটির জন্যই ঘটবে, এই রকম একটা ধারণাও কেমন ক'রে জন্মে গেছে তাঁর। তাই নিজেরই অজ্ঞাতে তিনি ঐন্দ্রিলাকে বেশী আদর এবং প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন কখন—তা তাঁব হুঁশ থাকে না। হুঁশ হয় একেবারে গৃহিণীর গঞ্জনায়; তিনি বলেন, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি' হয়েছে হতচ্ছাড়া মিন্সের। মতিচ্ছন্ন হয়েছে।...আদর দিয়ে দিয়ে ছুঁড়ীর পরকালটি খাচ্ছেন একেবারে। সোন্দর! সোন্দর বৌ যেন ভূভারতে আর কারুর হয় না! আর কী এমন সোন্দর তাও তো বুঝি না—থাকার মধ্যে তো আছে এক ঐ রংটা—হাঁসা মোমবাতি! ড্যাবা ড্যাবা গোরুর মত চোখ, নাকের তো কত বাহার, মাঝখান দিয়ে যেন রেলগাড়ি চলে গেছে। না গড়নের সৌষ্টব, না মুখের কোন ছিরিছাঁদ্। চলনটাও যদি একটু ভাল হ'ত তো বুঝতুম। মেয়ে

যেন দিনরাত নেচেই আছেন! রাম রাম! সোন্দর দেখে একেবারে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বসল মিন্‌সে—তখনই বারণ করেছিলুম যে শুধু ঐ রং দেখে অমন ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তুলো না!···আমারই ভুল হয়েছিল—তখন যদি আর একটু জোর করতুম তো এমন কাণ্ডটা ঘটত না।···তিখিরীর ঘর থেকে মেয়ে এনে আমার সব দিক গেল!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাধব ঘোষাল এসব কথা কানে তোলেন না। প্রথম প্রথম ভয় হত তাঁর ঐন্দ্রিলার জন্য। ঐটুকু মেয়ে—সে হয়তো কষ্ট পাবে। কিন্তু ঐন্দ্রিলাও নির্বিকার। সে যে শুধু গ্রাহ্য করে না তা নয়—মনে হয় যেন শুনতেই পায় না। এক-একসময় খুব অসহ্য হলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি শাশুড়ীর নাকের কাছে তুলে দেখিয়ে চরম উপেক্ষা হেনে সরে যায় সেখান থেকে। মাধব ঘোষালই বরং উপযাচক হয়ে কোন কোন দিন সান্ত্বনা দিতে যান, 'ও মাগীর কথা গায়ে মেখো না বৌমা, ওর মুখখানা চিরদিনই অমনি কদুয্যি! আমায় সারাটা জীবন জ্বালাচ্ছে!'

'কে কান দিচ্ছে ওদিকে বাবা। আপনিও যেমন, কুচ্ছিতরা কখনও সোন্দরকে সহ্য করতে পারে? হিংসে তো হবেই একটু। ওদের আর দোষ কি, মাসীর মুখে শুনেছি কত তা-বড় তা-বড় লেখাপড়া-জানা লোকও সহ্য করতে পারে না -তার চেয়ে সোন্দর মানুষ!'

মাধব ঘোষাল নিশ্চিন্ত হয়ে হুঁকোয় টান দিতে শুরু করেন আবার।

সুতরাং এই পুত্রবধূটির প্রথম সাধে একটু বেশী ঘটা করবেন সেইটেই স্বাভাবিক। এমনিতেই বড় গুষ্টি তাঁদের, খুব নিকট-আত্মীয়দের বললেও এক-শোর ওপর দাঁড়ায়। মাধব ঘোষাল হুকুম করলেন, তা ছাড়াও পাড়াঘরের সব সধবাদেরই বলা হোক। তখনকার দিনে মহিলারা কেউ একা আসতেন না, এমন কি শুধু কোলের সন্তানটিকে নিয়েও নয়। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যে যতগুলি সন্তান থাকত সব কটিকেই নিয়ে আসতেন। ফলে লোক দাঁড়াল—ব্রাহ্মণ-সজ্জন কুটুম্ব-প্রতিবেশী সব জড়িয়ে চারশোর মত। গৃহিণী দাঁতে দাঁতে ঘষলেন, অন্য ছেলেরা একরকম অসহযোগই করল - কিন্তু মাধব কোন কিছুতেই দমলেন ন। পুকুরে জাল ফেলে মাছ উঠল, চাষের চাল—তরি-তরিকারিও কিনতে হ'ল না—মোটা খরচের মধ্যে শুধু দই মিষ্টি, তার জন্য তিনি এমন দিনে কৃপণতা করবেনই বা কেন? তা ছাড়া হরিনাথও কিছু টাকা দিয়েছিল তাঁকে গোপনে।

দুপুরের খাওয়া—প্রথম দল বসতেই বেলা দুটো বেজে গেল। ফলে অতিথি-অভ্যাগতের পালা যখন চুকল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে রীতিমত রাত হয়ে গেছে। সারাদিনের পর পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে স্নান পূজা সেরে মাধব ঘোষাল এসে খেতে বসবেন—হঠাৎ তাঁর একটা কাঁপুনি দেখা দিল। প্রবল কাঁপুনি। খাওয়া আর হ'ল না—কোনমতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। প্রথমে কাঁথা চাপা দেওয়া হ'ল, তার পর লেপ—তাতেও কাঁপুনি থামে না। দু তিন জনে চেপে ধরে রইল—তবুও তিনি কাঁপতেই থাকলেন হি-হি ক'রে।

হরিনাথ ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। আড়গোড়েতে ডাক্তার নেই, আঁদুল থেকে ডেকে আনতে হ'ল। তিনি এসে দেখে এবং সব শুনে বললেন, 'সারাদিনের ছুটোছুটি, ঘামের পর গিয়ে পুকুরে ডুবে চান করেছেন—তাই একটু সর্দি-গর্মি মত হয়েছে। ভয় নেই, আরাম হয়ে যাবে।'

ডাক্তার ওষুধ ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সে ওষুধও আসবে তাঁরই ডাক্তারখানা থেকে। প্রথম ওষুধ পড়তে পড়তেই রাত বারোটা বাজল। সেদিন বাড়ির কারুরই আর খাওয়া হ'ল না। ঐন্দ্রিলা সারারাত মাথার শিয়রে বসে রইল। কাঁপুনির মধ্যেই মাধব বার বার বলতে লাগলেন, 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড় মা, এই অবস্থা -ঠায় বসে রয়েছ, বিষম ব্যথা হবে কোমরে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলা সে কথা কানেই তুলল না, 'আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন বাবা, আপনার ঘুম এলেই আমি উঠে যাব।'

শেষ রাত্রে কাঁপুনি থেমে প্রবল জ্বর এল।

পরের দিন হরিনাথকে ডেকে বললেন—'বুকটায় এমন ব্যথা করছে কেন বল্ দিকি? নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট কচ্ছে!'

আবারও ডাক্তার এলেন। বাবুরাম ডাক্তার। বড় নাম-করা চিকিৎসক। তিনি এসে পরীক্ষা করে সংক্ষেপে বললেন—'নিমোনিয়া।' দুটো দিকেই—। আশ্চর্য! এক রাত্তিরের মধ্যেই কী ক'রে এমন হল!'

পুলটিশ, সেঁক-তাপ, মিক্সচার—কিছুরই ত্রুটি ঘটল না। কিন্তু আশা যে বিশেষ নেই, তা ডাক্তারের গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মাধব ঘোষাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর বংশের সম্ভাব্য সুশ্রী শিশু—নবাগত সেই অত্যাশ্চর্য ও বহু-প্রতীক্ষিত আগন্তুককে দেখা আর তাঁর হয়ে উঠল না।

॥ ২ ॥

ঐন্দ্রিলা আঘাত পেলে খুবই। বাপের মত স্নেহময় শ্বশুর তার। বাপের চেয়েও বেশী আপন বরং। পিতৃস্নেহ যে কি জিনিস তা তারা কটি ভাই-বোন তো টেরই পেলে না। ছেলেবেলা থেকেই দেখছে যে সে লোকটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং অবাঞ্ছিত এক জীব। শ্বশুরের কাছে এসেই সে প্রথম পিতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছিল। এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটিকে পুকুর-পাড়ে বসে থাকতে দেখে সেই যে মাধব ঘোষালের পছন্দ হয়েছিল, তিনি আর কারও কোন কথাই শোনেন নি—সমস্ত রকম বাধা ও প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে তাঁর 'মা'-কে তিনি ঘরে এনেছিলেন। সে প্রীতি ও সে স্নেহ কোনদিনই কমে নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। আজ হঠাৎ এমন অসময়ে ওর সেই প্রিয় ও নিরাপদ আশ্রয়টি মাথার ওপর থেকে সরে যেতে অনেকখানিই অসহায় বোধ হ'ল।

আর বোধ করি সেই জন্য শাশুড়ী-দেবর-ননদদের কথাগুলো এখন কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারলে না। তারই সাধ উপলক্ষে এই সর্বনাশটি হ'ল এ কথা সে অস্বীকার করে কেমন করে? কথাটা যে সর্বাগ্রে তার মনেই এসেছে। কোন্ সর্বেনেশে রাক্ষস তার পেটে আসছে—ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তার প্রধান অবলম্বন এমন করে ঘুচিয়ে দিলে!

শাশুড়ী আজকাল প্রকাশ্যেই বলছেন, 'ডাইনী! অত বড় সাজোল মানুষটাকে শুষে খেয়ে ফেললে! কী মন্তরে যে ভুলোল তা জানি না।... ডাইনীর নিঃশ্বেসে বিষ আছে। ডাইনীর পেটে রাক্ষস এসেছে—মা'র পেট থেকেই মানুষ খেতে শুরু করলে। এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। দেখে নিও তোমরা!'

দেবর-ননদরা এত কাল বাপের ভয়ে কিছু বলতে পারত না, তারাও এবার প্রকাশ্যে ধিক্কার দিতে লাগল। হরিনাথ যদিও জ্যেষ্ঠ—সে একে শোকার্ত, তায় কেমন একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়েছে; বাপের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অংশত নিজেকেও যেন দায়ী বোধ করছে সে—সুতরাং সে এসব কথার কোন প্রতিবাদ করতে বা ভাইবোনদের তিরস্কার করতে পারে না। ঐন্দ্রিলার মনের অবস্থা অনুমান করে তার কষ্ট হয় খুবই—তবুও পারে না! যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু।

ঐন্দ্রিলা উত্তর দিতে পারত। তার অভ্যস্ত মুখে জবাবটা আসত ঠোঁটের কাছাকাছি—'মন্তর জানা থাকলে তো তোমাদেরও বশ করতে পারতুম মা! তা হলে আর এমন কথা শুনব কেন?' কিন্তু কিছুই বলতে পারত না। নিরতিশয় আত্মধিক্কার এবং আত্মগ্লানি বোধ করতে করতে সে মনকে এই বলে শাসন করত যে—এ গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা তার প্রাপ্য। তারই কোনও পাপে এই রাক্ষস পেটে এসেছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি।

কান্না এবং পরিতাপের সময় অবশ্য বিশেষ ছিল না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশরাত্রেই শেষ। শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে। কিন্তু এধারেও, শুধু যে মন ভেঙেছে তাই নয়, দেহটাও যেন এলিয়ে এসেছে। তবু কোনমতে যতটা সম্ভব করে ঐন্দ্রিলা, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট—শ্রাদ্ধটাও নির্বিঘ্নে হ'ল না। শ্রাদ্ধের পরের দিন, নিয়মভঙ্গের আগেই—তার প্রসব-বেদনা উঠল।

আবারও একটা ধিক্কার এবং গঞ্জনার ঝড় বয়ে গেল। যেন এজন্যও সে দায়ী। চুপ করে দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করলে সে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসহ্য যেন এই বাক্যবাণ।

হরিনাথকে নিজে গিয়েই দাই ডেকে আনতে হ'ল। মেজ ভাই শিবুকে বলতে সে সাফ্ জবাব দিলে, 'আমি পারব না। এখনও অশৌচ গেল না, আমি দাইয়ের বাড়ি যাব? যেতে হয় তুমি যাও।'

এ সময়ে আর এই সব কথা নিয়ে হাঙ্গামা করা যায় না। উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে দৌড়য় হরিনাথ। ঐন্দ্রিলা একা পড়ে পড়ে কাত্‌রায়—গোয়াল ঘরের পাশের সেই অপরিচ্ছন্ন আঁতুড়ঘরে। ঘরটা কেউ সাফ্ করেও দেয় নি। স্তূপাকৃতি জঞ্জালের মধ্যে কোনমতে নিজেই একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল সে। ননদরা তো নয়ই, শাশুড়ীও এসে উঁকি মারেন নি এর ভিতর।

দাই শশীর মা অনেক কালের লোক। এ বাড়ির হরিনাথ ছাড়া সবাইকে প্রসব করিয়েছে সে। এ অঞ্চলের ডাকসাইটে দাই, কাউকে পরোয়া করার লোক সে নয়। সে এসে বেশ চারটি কথা শুনিয়ে দিলে হরিনাথের মাকে, 'হ্যাঁ গা, বলি ও বাছা শিবুর মা! এ তোমাদের কেমন ধারা ব্যাপার? শোক কার না হয়? শোকের জন্যে কি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছ তোমরা? তা তো আর কর নি। তবে? বাড়ির বড় বৌ, বংশের প্রথম সন্তান হচ্ছে—

এই আস্তাকুঁড়ে! বলি ওরই বরের রোজগারে তো খাচ্ছ। এখন তো সে-ই বাড়ির কর্তা। কথাটা একটু হুঁশ ক'রে ভেবে দেখ! ছিঃ! পাড়ার লোকে শুনলে বলবে কি?'

গৃহিণী একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। সামনেই যে মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঝালটা গিয়ে পড়ল তারই ওপর, 'আমার না হয় শোকে-তাপে মাথার ঠিক নেই—বলি তোরাও কি সব হুঁশপব্বের মাথা খেয়ে বসে আছিস?—জানি তো রাক্কস আসছে—সপুরী একগাড করতে—কিন্তু তাই বলে তো আর পার পাব না। আমাদের কাজ তো আমাদের করতে হবে। যা দা-দেইজী শত্তুর চারদিকে—একটি কথার ফ্যাঁকড়া পেলে তো আর রক্ষে নেই। উপকার করতে কেউ আসবে না, কিন্তু চুনকালি দিতে সবাই পা বাড়িয়ে বসে আছে।...যা না—ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দে না একটু—হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছিস কি?'

হরিনাথ ওরই মধ্যে এক ফাঁকে গিয়ে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসে, 'ছাখো না—কোল-আলো-করা খোকা আসছে তোমার, এক বাবা গিয়ে আর এক বাবা আসছে। ছেলে দেখলেই মা ভুলে যাবেন।'

ঐন্দ্রিলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'ওগো আমি আর বাঁচব না। আর আমি বাঁচব না কিছুতেই—'

শশীর মা খন্‌খন্ করে ওঠে, 'ও মা, ও কি ছিরির কথা! বালাই ষাট্! এই তো—আর দেরি নেই বাছা একটুও—এখুনি সব ব্যথা জুড়িয়ে গেল বলে। তুমি দাদা এবার যাও দিকি এখান থেকে, আমাকে গোছ করতে দাও একটু!'

সন্ধ্যার একটু পরেই নবজাত শিশুর কান্না শোনা গেল।

শাশুড়ী ননদরা এবার সবাই ছুটে এলেন—কৌতূহলই আরও স্থির থাকতে দিল না।

'কী হ'ল গো, ও শশীর মা?'

দালানে দাঁড়িয়ে হরিনাথ আশা-আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কান পেতে থাকে উত্তরের দিকে। অর্ধ-অচেতন ঐন্দ্রিলাও।

শশীর মা বলে, 'খুকী গো বাছা—খুকী। পদ্মফুলের মত ফুটফুটে খুকী!'

'আবার খুকী! পোড়া কপাল হরের। এক ফুটফুটে খুকী আমার গুষ্টিসুদ্দু জ্বালিয়ে খেলে, আবার সেই! ডাইনীর বেটি ডাইনী, মায়ের পেট থেকে থেক্কো শুরু করেছে। হাড় খাবে মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে!'

শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি উঠল না—আনন্দ প্রকাশও কেউ করলে না। ঐন্দ্রিলার প্রথম সন্তান হ'ল।

ক্লান্ত মুদিত দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার। আশা তারও ছিল মনে মনে। তার ওপর হরিনাথের সান্ত্বনাটাতে বড়ই আশ্বাস পেয়েছিল সে।

সে-ও মনে মনে বলতে লাগল, 'রাক্কুসী, রাক্কুসী। আমার সুখের বাসায় আগুন লাগাতে এসেছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কোথায় কোন্ মুলুকে যুদ্ধ বেধেছে—তার জন্যে এখানে কেন জিনিসপত্রের দর চড়বে, মহাশ্বেতা কিছুতেই তা বুঝে পায় না। যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধেও যে ওর খুব পরিষ্কার ধারণা আছে তা নয়—মারামারি কাটাকাটি একটু বড় রকমের এই মাত্র বোঝে। কিন্তু তার জন্যে এখানে কাপড়ের দর চড়ে যাবে, নুনের বাজারে আগুন লাগবে—তার মানে কি?

লড়াইয়ের খবর যে ওদের রোজ এনে দেয়—এ সম্বন্ধে সেও খুব ওয়াকিবহাল নয়। মহার ছোট দেওর দুর্গাপদ ইস্কুলের পড়া শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এসে বসেছে। বার দুই পরীক্ষাও দিয়েছিল কিন্তু সুবিধা হয় নি। ক্ষীরোদার একান্ত সাধ—তাঁর ছোট ছেলে একটা পাস করুক, তিনি পীড়াপীড়ি করে রাজী করিয়েছিলেন ওকে আবও এক বার পরীক্ষায় বসতে, কিন্তু অম্বিকাপদ এক কথায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলে। বললে, 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই বোঝা যায়! ওর আর কিছু হবে না, মিছিমিছি আরও এক রাশ টাকা খরচা!...তার চেয়ে দিনকতক ঘরেই বসে থাক, বাগান-টাগানগুলো দেখুক—এর ভেতরে চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখি একটা।'

এর পর আর ক্ষীরোদা কিছু বলতে সাহস করেন নি। সুতরাং দুর্গাপদর অখণ্ড অবসর। মাঝে অম্বিকাপদ হেঁটে কলকাতায় গিয়ে পোস্তা থেকে আলু কিনে আনার ভার দিয়েছিল ওকে, পর পর দু বার রাস্তায় পয়সা হারিয়ে

ফেলতেই কথাটা বুঝে সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হ'ল। এখন দুর্গাপদ ঘণ্টা দু-তিন করে পাড়াটা ঘুরে আসে আর লাফাতে লাফাতে বাড়ি ঢুকে নতুন নতুন খবর দেয়।

'ইউরোপে বুঝলে বৌদি—দারুণ এক কাণ্ড হয়ে গেছে। এক রাজ্যের রাজপুত্তুর আর এক রাজত্বে গিয়েছিল, সেখানকার কে এক বেটা তাকে মেরে ফেলেছে। তাই নিয়ে মহা হৈ চৈ হচ্ছে। হয়তো খুব বড় লড়াই একটা বেধে যেতে পারে।'

'কি বললে? কী দেশ? ইউরোপ? সে আবার কোথায়?' চোখ বড বড করে মহাশ্বেতা প্রশ্ন করে।

'ইউরোপ গো, ইউরোপ জান না? কি মুস্কিল! তোমরা ছাই জিওগ্রাফি পড় নি, মুখ্খু মেয়েমানুষ—তোমাদের কি বোঝাব!'

'তুমি তো এত পণ্ডিত, এক্‌জামিন দিতে বসে এসব লেখাপড়া কোথায় যায়?' মুখ টিপে হেসে প্রমীলা ফোড়ন কাটে।

দুর্গাপদ কোন দিনই মেয়েদের কথা গ্রাহ্য করে না, সে একটা 'হুঁ!' বলে কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে মহাশ্বেতাকে বোঝাতে বসে, 'সে অনেক দূর বড় বৌদি—হাজার হাজার ক্রোশ দূর। সেখানে শুধু সাহেবরা থাকে, সাদা চামড়ার লোক।'

'ও, সায়েবদের দেশ! বিলেত বল! মিছিমিছি ইউরোপ-মিউরোপ অত কথা বলছ কেন!'

'তোমরা ঐ এক বিলেতই শিখেছ। আরে বাপু সাহেব কি এক রকম আছে? ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুশ—সবাই সাহেব। তোমরা দেখলে কি চিনতে পারবে?—তা পারবে না। যারা জানে তারা ঠিক চিনে নেয় কোন্‌টা কে। বিলেত হল ইংরেজের দেশ। খুবই ছোট্ট একরত্তি দেশ। তাও ওটা ঠিক ইউরোপে নয়, দেশ ছাড়া—আলাদা মুল্লুক একটা।'

'তুমি বুঝি সব দেখলেই চিনতে পারো ছোট্ ঠাকুরপো!' প্রমীলা আবারও চিমটি কাটে।

এবার আর উত্তরও দেয় না দুর্গাপদ, চরম তাচ্ছিল্যভরে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

মহাশ্বেতার কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য থাকে না। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। সাহেবদের আবার আলাদা আলাদা জাত

আছে? মাগো, সব সাহেবই তো এক বকম দেখতে, ওদেব আলাদা আলাদা চেনে কেমন কবে—কে জানে!

অনেক দিনের কথা মনে পড়ে যায়। মহাব দিদিমা ছিলেন চন্দননগবেব মেয়ে, তিনি ফবাসীদেব কতকটা বেশী আপন মনে কবতেন। পথে ঘাটে সাহেব দেখলে নাক সিঁটুকে বলতেন, 'যতই বলিস তোবা, আমাদেব ফরাসীদের মত ইংবেজবা সুন্দব নয়। হুম্‌দো হুম্‌দো মুখ আব রূপী বাঁদরের পেছনের মত লাল বং। না চেহাবাব লালিত্য আব না বঙেব বাহার।'

তখন কথাটাব মানে বুঝত না এখন যেন খানিকটা খানিকটা বুঝতে পাবে। 'সত্যি, দিদিমা অনেক জানত শুনত বাপু—যত যা-ই বল। এখনকাব লেখাপড়া জানা পুরুষদেব ঘোল খাইয়ে দিতে পাবত।' মহাশ্বেতা মনে মনে তারিফ কবে।

আব এক দিন তেমনি ঝড়েব মত ছুটে এসে দুর্গাপদ খবব দিলে, 'ভযানক কাণ্ড মা। ইংরেজ আর জার্মানে লড়াই বেধে গেল। ত্যাখো না—কী কাণ্ড হয়।'

'সে আবাব কিবে? এই সেদিন কী একটা বললি অষ্টিবিয়া মষ্টিবিয়া—কত লড়াই বাধছে রে? কলি দেখছি এইবাবেই চাব-পো হয়ে উঠল!'

'না।...তোমাদের দেখছি বোঝানোই মুশকিল। ওবে বাপু সেই একই লড়াই। আগে তো দুটো দেশই ঝগড়া বাধালে। লড়াইও শুরু হ'ল। এখন দু পক্ষই চাচ্ছে দল ভারী কবতে। এ দেশ ও দলে যাচ্ছে তো ও দেশ এ দলে আসছে। এমনি আর কি। এখন শুনছি আসল লড়াইটা হচ্ছে ইংবেজদেব সঙ্গে ওদের—মানে জার্মানীব লোকদেব। জার্মানীব মতলব নাকি আগাগোড়াই এই—ইংরেজদের মুলুকগুলো হাতাবে ওদেব নাকি বড্ড লোভ এই বাংলা দেশের ওপর। এখানকার মাটিতে তো সোনা ফলে। আব ওদের দেশে শুনেছি কিচ্ছু পাওয়া যায় না।'

ক্ষীরোদা অবিশ্বাসের হাসি হাসেন, 'হ্যাঁ, ইংরেজদেব মুলুক অমনি নিলেই হ'ল! মহারাণীর রাজত্বে সূয্যি অস্ত যায় না—এদেব দাপট কী সোজা।'

'সেই জন্যেই তো ওদেব এত আক্রোশ গো। এরা কেন এত রাজত্ব ভোগ করবে?'

তার পর একটু দম নিয়ে দুর্গাপদ ওদের জ্ঞান দিতে বসে, 'ইংরেজদের আব অত দাপট নেই। এখন নাকি জার্মানীর জোরই বেশী। সবাই তাই

বলছে। বলছে যে ইংরেজরা তিন মাসের মধ্যেই হেরে ভূত হয়ে যাবে। জার্মানী নাকি অনেক দিন ধরেই এই মতলব আঁটছে। একটা মজার কথা আজ শুনে এলুম—চক্কত্তি মশায় গল্প করছিলেন—মহারাণী ভিক্টোরিয়া বেঁচে থাকতেই নাকি জার্মানীর রাজা এক তাস বার করেছিল, তাতে সায়েবের জায়গায় নিজের ছবি ছেপেছিল আর বিবির জায়গায় মহারাণীর···এ তো আবার মহারাণীর নাতি হয় কি না—মুখে বললে দিদিমাকে নিয়ে রসিকতা করেছি। দিদি-নাতির রসিকতা তো এমন চলেই। কিন্তু সবাই বললে আসল মতলবটা ঐতেই বুঝিয়ে দিলে !'

ক্ষীরোদা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'ওমা, তাই নাকি ! পেটে পেটে এত !··· অবাক করেছে। তা মহারাণী কিছু বললেন না ?'

'কী বলবেন ? হাজার হোক নাতি তো !'

'ওমা—তা মামাতো ভায়ের সঙ্গে লড়াই করবে ?'

'হ্যাঁ, রাজারাজড়াদের আবার মামাতো পিসতুতো ভাই !···নিজের ভাইকেই বড় রেয়াত করে !···নবাবরা তো শুনেছি রাজা হয়েই আগে ভাইগুনোকে কেটে ফেলত।···তার ওপর এরা তো আবার সাহেব !'

॥ ২ ॥

এসব গল্প-কথা—শুনতে মন্দ লাগে না। কোন্ সুদূর মুলুকে—কাদের যেন গল্প, তার সঙ্গে ওদের জীবন-যাত্রার সম্পর্ক কি ?

কিন্তু সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হতে হ'ল বৈ কি।

বিলিতি কাপড়, কেরোসিন তেল, চিনি,—এমন কি নুন পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। দশ আনা বারো আনার কাপড়খানা দেড় টাকা দু টাকায় পাওয়া দায়, আরও দূর গাঁ অঞ্চলে নাকি ভদ্দর ঘরের মেয়েরা গামছা পরে কাটাচ্ছে। লজ্জা নিবারণ করতে না পেরে নাকি কোথায় একটি মেয়েছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে। এর মানে কি ?

স্বামীর কাছে প্রশ্ন ক'রে উত্তর মেলে না। খুব বিরক্ত করলে অভয়পদ বলে, 'ও তুমি বুঝবে না। মেলাই কাণ্ড।'

অম্বিকাপদর তো সময়ই নেই। দিনরাত্ত সংসারের কাজ আর হিসেব।

এই নিয়েই ব্যস্ত সে। তাকে কিছু বলতে গেলেই হাত নেড়ে বলে, 'সর সর। আমার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর করার সময় নেই।'

অগত্যা দুর্গাপদকেই পাকড়াও ক'রে ধরে মহাশ্বেতা।

ব্যাপারটা কি, তাকে বুঝতেই হবে।

দুর্গাপদ বিজ্ঞভাবে বোঝাতে বসে, 'আরে, এটা আর বুঝলে না? ওসব মাল তো বিলেত থেকেই আসত। তা সে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা তো! জাহাজে করে আসে। জার্মানীরা একখানা জাহাজও আসতে দিচ্ছে না। গোটা গোটা জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে রোজ, মাল সুদ্দু। ওরা এক রকম ডুবো জাহাজ বার করেছে, জলের তলা দিয়ে চলে। তাদের কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তারা সবাইকে দেখে। ইংরেজদের জাহাজ দেখছে আর ডোবাচ্ছে।... মাল আসছেই না, তার পাবে কি।'

ব্যাপারটা যে ঠিক বোঝে—তা নয়! তবু এক রকম সান্ত্বনা পায়। কারণ একটা আছে—সেইটেই বড় কথা।

'তা এ পোড়ার যুদ্ধু থামবে কবে। থামলে যে বাঁচি, হাড় জুড়োয়।'

'বল না কথাটা এক বার দাদাকে। দাদা হরির লুট মানছে যুদ্ধ এখন না থামে। আর তোমার কী এমন অসুবিধেই বা হচ্ছে? তোমার কি পরনে কাপড় নেই? না ব্যান্নুনে নুন জুটছে না?'

সে-ও এক সমস্যা মহাশ্বেতার।

ইদানীং অস্বাভাবিক একটা কি কাণ্ড-কারখানা চলছে ওদের বাড়িতে, যার কোন মাথা-মুণ্ডু সে বোঝে না। দু ভাইই অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফেরে, কোথায় যায় কি করে—কোন হদিসই পাওয়া যায় না। বাড়ি ফিরেও দু জনে মেজ কর্তার ঘরে দোর দিয়ে বসে কি সব করে, বাইরে থেকে আড়ি পেতে দু-এক দিন টাকা গোনবার শব্দও পেয়েছে। মেজকর্তার হিসেব-নিকেশের কাজও বেড়েছে যেন আজকাল।

আবার এক-একদিন রাত-দুপুরে দু ভাই কোথায় বেরিয়ে যায়। সঙ্গে দুর্গাকেও নিয়ে যায় তুলে। তার পর ভারী ভারী লোহার মাল গড়াতে গড়াতে বয়ে নিয়ে আসে। মোটা মোটা তারের বাণ্ডিল, কলকব্জা যন্ত্রপাতি—এক-এক দিন এক-এক রকম। এই সব মাল—চুপিচুপি রাত-দুপুরে এসে ঘরে ওঠে,

আবার দু-চার দিন পরে কারা সব এসে নিয়ে যায়। মনে হয় টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘরেরও অভাব নেই আর। এর মধ্যে দু-দুখানা ঘর ক'রে ফেলেছে অভয়পদ। যদিও মহাশ্বেতা শোয় সেই আগেকার ভাঙা-ঘরেই। নতুন ঘর একখানা নিয়েছে অম্বিকা—আর একখানায় বুড়ী, দুর্গা আর ওর শাশুড়ী শোয়। পুরোনো ঘরগুলোতে শুধু মাল থাকে আজকাল।

ব্যাপারটা দিন-দিনই হেঁয়ালি হয়ে উঠছে মহাশ্বেতার কাছে। মনে হয় প্রমীলা জানে কিন্তু তার কাছে ভালরকম কোন জবাব পাওয়া যায় না—শুধু সে মুখ টিপে হাসে আর বলে, 'নেকু!...কী দিয়ে ভগবান তোকে গড়েছিল দিদি, তাই ভাবি!'

অনেকদিন পরে, অনেক সাধ্য-সাধনায় প্রমীলাই ওকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে, 'ওলো, চোরাই মাল লো চোরাই মাল। বট্‌ঠাকুর যে কোম্পানির ভাঁড়ার দেখেন। এস্টোর না কি বলে সেইখানে থাকেন। গঙ্গার ওপর বড় টিনের চালা—সেইখানে বসেন উনি একা। এদিক ওদিক দেখে বড় বড় ভারী মাল গঙ্গায় গড়িয়ে ফেলে দেন। নৌকো ঠিক করাই আছে, সন্ধ্যের পর সেই নৌকো গিয়ে মাল তুলে নেয়। তার পর তারা এসে এই সরস্বতীর খালের মুখে মাল দিয়ে যায়। নৌকোয় আসে বলেই তো অত রাত হয়। রাত্তিরে গিয়ে মাল তুলে আনে। অনেক মাল ঐখানে ঐখানেই বিক্কিরি হয়ে যায়, যা হয় না সেইগুলোই বাড়ি আসে। আবার খদ্দের ঠিক হলে তারা রাত-দুপুরে বাড়ি এসে মাল তুলে নিয়ে যায়। যুদ্ধুর বাজারে লোহা-লক্কড়ের দাম তো বিস্তর বেড়েছে কিনা—চারগুণো পাঁচগুণো দাম। তাই চোরাই মালও মোটা টাকায় বিক্কিরি হয়!'

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে মহাশ্বেতা। তার পর বলে, 'ও মা, তা ধরা পড়ে না?'

'এঁরা তো গোড়ার দিকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকেন না। এস্টোরের দারোয়ান জানে—তা সে তো ভাগ খায়! ধরা পড়ে নৌকোর মাঝিমাল্লারা জেল খাটবে। তারা মোটা টাকা মুনাফা পায়, এক-আধ মাস জেল খাটলেই বা কি? দু-একবার ধরা পড়েছেও নাকি এর মধ্যে কিন্তু আগে থাকতেই বলা-কওয়া ছিল, এদের নাম করে নি তারা, কোথা থেকে তুলে এনেছে তাও

এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু একটু পরিষ্কার হয় মহাশ্বেতার কাছে। দুর্গাপদর সেদিনের ইঙ্গিতটাও বুঝতে পারে।

সেইজন্যে যত দিন যুদ্ধ চলে তত দিনই ভাল—এদের কাছে।

রাত্রে শোবার সময় মহাশ্বেতা আর কথাটা চেপে রাখতে পারলে না। যদিচ এখনও অভয়পদ সেই আগের মত চলনেই রাত কাটায় তবু প্রথম রাত্রে খানিকক্ষণ ঘরে শোয় সে, ছেলেমেয়েদের আদর করে এই সময়টা। দু-একটা কি হিসেব-নিকেশও করে প্রদীপের আলোতে বসে। এই সময় একটু যা দেখাশুনো হয় তার সঙ্গে। আজ ঘরে আসতেই মহাশ্বেতা কথাটা বলে ফেললে, 'তোমরা চোরাই মালের কারবার কর! তোমরা চোর? ছি!'

এই প্রথম অভয়পদর মুখের প্রশান্তি যেন একটু নষ্ট হয়। ভ্রূ কুঁচকে সে বলে, 'কে—বললে কে তোমায়? তুমি এসব কথায় থাক কেন? কী বোঝ তুমি সংসারের?'

'যে-ই বলুক। কথাটা তো সত্যি। আর সংসার বুঝি না বুঝি চুরি করা যে দোষ সেটা বুঝি।'

'সে আমিও জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে দোষ নেই। তিনটে সায়েবের কাজ আমি একা করি, মাইনে পাই সিকির সিকি! আরও কম বরং। একেবারে গোমুখ্খু সায়েবও একটা পায় তিন শো টাকা, আমি পাই তেত্রিশ টাকা। তাও এ্যাদ্দিনে। আমার সংসারটা চলে কিসে?'

মহাশ্বেতা খানিকটা চুপ ক'রে থাকে। এই যুক্তিগুলোর যেন জবাব খুঁজতে থাকে সে মনের মধ্যে। শেষে কিছুই না পেয়ে বলে, 'তা হোক বাপু, কাজটা ভাল না। শেষে কোন রকমে লোক জানাজানি হয়ে গেলে সে একটা ঢিঢিক্কার!'

অভয়পদ এ কথার উত্তর দেয় না। খাতাপত্র কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এত পয়সা কার জন্যে তাও তো বোঝে না মহাশ্বেতা। নিজে তো বাবু বিছানাও ছেড়ে দিয়েছেন আজকাল। খালি একটা কাঠের বেঞ্চিতে একটা কাঠের পিঁড়ি মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকেন!

ভোগই যদি না করলে তো এমন অধর্মের পয়সা কামিয়ে লাভ কি?

নিবন্ত দীপশিখার কম্পিত মৃদু আলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে, কিন্তু মহাশ্বেতার চোখে ঘুম নামে না।

কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে সে।

॥ ৩ ॥

যুদ্ধের খবর পুরোপুরি শ্যামাও রাখে না কিন্তু ওর প্রত্যক্ষ ফল যেটা, সেটার খবর তার কানে পৌঁছয় ঠিকই। পয়সা নাকি বাতাসে উড়ছে, ধরে নিতে পারলেই হ'ল। ধরে নিচ্ছেও অনেকে, তা তো সে চোখেই দেখছে। তার মধ্যে বড় জামাইও এক জন। কথাটা বুঝতে মহাশ্বেতার যত সময় লেগেছে ততটা হেমের লাগে নি—এবং হেমের মুখ থেকে শ্যামার কানে উঠতেও দেরি হয় নি। মেয়ে-জামাইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে হোক, তাতে শ্যামা আনন্দিতই—যদিচ বোকা অভয়পদ নাকি সব টাকাই, মায় এই চুরির টাকাও, মেজ ভাইয়ের হাত ধরে দেয়, মেয়ের কথাবার্তা থেকে এই কথাটা শোনা পর্যন্ত শ্যামার মনে স্বস্তি নেই, যত জেরা করেছে মেয়েকে তত সেই সন্দেহটাই দৃঢ় হয়েছে।

কিন্তু উপায়ই বা কি? মেয়েটা যা আকাট বোকা, ওর দ্বারা একটি পয়সাও আদায় হবে না, তা শ্যামা বিলক্ষণ জানে। মেয়েকে 'বোকা' 'মুখ্খু' 'নেকী' বলে গালাগাল দিয়ে মনের ঝাল মেটাবার চেষ্টা ক'রে শুধু। উপদেশও দেয় মাঝে মাঝে, 'রোজ একটা করে পয়সা চেয়ে নিলে তোর মাসে আট আনা জমে যায়, বছরে ছ টাকা। টাকায় দু পয়সা করে সুদ সব জায়গায়, দুটো টাকা খাটালেও মাসে এক আনা করে হাতে আসে! বছরে বারো আনা। তুই এমন বোকা যে তাও আদায় করতে পারিস না! আর দেবে নাই বা কেন? জোরের সঙ্গে চাইবি। স্বামীর টাকা পরিবার চাইবে—এর মধ্যে আবার লজ্জাই বা কি ভয়ই বা কি? ওদিকে দেখ্ গে যা তোর জা টাকার আণ্ডিল সরাচ্ছে। সে তো তোর মত বোকা নয়। সে তোর শ্বশুরের গুষ্টির সব কটাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে! ঐ হবে আর কি, দিন থাকতে দিন কিনে নিচ্ছ না, এর পর ঐ জায়ের বাঁদীগিরি করতে হবে বলে দিলুম!···আমার পেটের মেয়ে তুই—এত বোকা!'

মহা মাথা নিচু করে থাকে, নয়তো অন্যদিকে তাকায় আর মুচকি মুচকি হাসে অপ্রতিভের মত। বড় জোর বলে, 'কী জানি বাপু, সে আবার যা মানুষ, চাইতে ভয় হয়। হয়তো এক বিপরীত কাণ্ড করে বসবে। যে লোকের সঙ্গে ঘর করতে হয়—চেন না তো তাকে! আমাকে কোন কথা বলে নাকি? না আমি কিছু টের পাই? যা কিছু পরামর্শ ঐ মেজর সঙ্গে—দুটি ভাই-ই সমান, মনকলা খায় শুধু ভেতরে ভেতরে ওরা।'

'যা, যা!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয় শ্যামা, 'সে শুধু তোরই কাছে। তোর জার কাছে মনকলা খেয়ে পার পায় কি? সে ছাখ্ নাড়ী-নক্ষত্র জেনে বসে আছে। তোকে বলবে কি কথা—তুই কি মানুষ একটা! যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সারা গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবি।'

যতই বলুক আর যা-ই করুক, ও চুরির পয়সা মেয়ের বাক্সে একটিও উঠবে না—তা শ্যামা বিলক্ষণ বোঝে। বোঝে বলেই জামাইয়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ও অসন্তোষ জমে ওঠে মনের মধ্যে। সে অসন্তোষ মেয়ের দোতলায় ঘর ওঠবার সংবাদেও যেমন যায় না—মেয়ের গায়ে নতুন সাত ভরির তাগা আর পাঁচ ভরির কেবল্ হাব উঠতে দেখেও যায় না। কারণ প্রশ্ন করার আগেই মহাশ্বেতা খুশী হয়ে খবরটা দেয়, 'তা ওদের বাপু নেয্য বিচার, কোন অর্শদর্শ নেই, আমারও যত ভরিব জিনিস হয়েছে, মেজ বৌয়েরও ঠিক তত ভরির। এক চুল ইদিক উদিক নেই। এক প্যাটেন—এক সব। বরং আমার হারটার দেড পাই বেশী ওজন আছে। ওজনে বেশী বেরোতে মেজ বললে, তবে ঐ হারটা বৌদি নিক, হাজার হোক মান্যে বড়!'

'নে বাপু, চুপ কর্।' শ্যামা বিরস মুখে ধমক দিয়ে ওঠে, 'তোর ঐসব ন্যাকাপনা কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে। অত বোকামি আমি সইতে পারি নে। অর্শদর্শ নেই! কেন অর্শদর্শ থাকবে?…বলি টাকাটা কি তোর দেওর বাড়তি রোজগার করে? সে তো থাকে কলকাতার আপিসে বসে, চুরিটা তো হয় গঙ্গার ধারের গুদোমে। ওর মধ্যে তো মেজ কর্তার এক পয়সাও পাওনা হয় না। তার বৌ পাবে কেন?…তুই যেমন নেকী। পড়ত আমার পাল্লায় তো সমান ওজনের গয়না গড়ানো বার করে দিতুম।…তুই ঝগড়া করতে পারিস না?…কেন পাবে মেজ বৌ, কেন পাবে ও—তাই শুনি?'

'ওমা তাই কি বলা যায় নাকি? একত্তরে রয়েছি।' কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাবে বলে মহাশ্বেতা। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলে, 'তাই তো শুনেছি মেজ ঠাওর আমাদের এঁর চেয়ে মাইনে বেশী পায়।…তার ওপর আমার সংসার বড়—ওর তো এখনও ছেলে-পিলেই হ'ল না। আমার তো যেটের তিনটি—এরই মধ্যে। খরচ তো আমারই বেশী।'

কুণ্ঠিত ভাবের মধ্যেই সামান্য একটু গর্বের সঙ্গে তাকায় মায়ের দিকে। খুব জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা, হিসেবের কথা মা'র সামনে বলতে পেরেছে—গর্বটা এই জন্যেই।

অসহিষ্ণু ভাবে শ্যামা জবাব দেয়, 'তুই থাম বাবা। তোর কথা শুনলে হাসব কি কাঁদব তাই ভেবে পাই না।...ক টাকা মাইনে বেশী পায় তাই শুনি? আমি হেমের কাছে সব শুনেছি। বড় জামাই পান তেত্তিরিশ, মেজকন্তা পায় চল্লিশ।...কী এমন তফাতটা? ওদিকে যে বাড়তি মোট মোট টাকা আনছে জামাই? তার হিসেবটা দেখেছিস? জানিস কত টাকা রোজগার হয় এক-এক দিনে? আমি হেমের মুখে সব শুনেছি। এক বাণ্ডিল তারের দামই ছিয়ানব্বুই টাকা!'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা। জবাব দিতে পারে না।

কিন্তু শুধু মেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে এইটেই একমাত্র অভিযোগ নয়। মনে মনে আরও একটা অভিযোগ শ্যামার আছে জামাই সম্বন্ধে।

হেমকে অভয়পদই চাকরি ক'রে দিয়েছে, আর এমনই চাকরি যে এক পয়সা বাড়তি আয় হবার সম্ভাবনা নেই সেখান থেকে। রং কলের চাকরি। এক টিন রং পাচার করতে পারে বড় জোর—কিন্তু তার কীই বা দাম? অথচ ঝুঁকিও কম নয়।...হেমকে সে ইঙ্গিতও দিয়ে দেখেছে শ্যামা—কিন্তু কোন সুবিধা হয় নি। একেবারে নিরাশ ক'রে দিয়েছে হেম, 'বাব্বা, চারদিকে সাত শো লোক। সবাই ঐ তাল খুঁজছে! আমি কী এমন মাতব্বর চাকরে বল? চুরি কি আর হচ্ছে না, দেদার চুরি হচ্ছে ঠিকই—তবে সে সব উঁচু মাইনের বাবুরা, সায়েবরা করছে। আমাদের কোন সুবিধে নেই।'

মা'র অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতাতে এক-এক দিন হেসে ফেলত হেম, বলত, 'মা তুমি কি মনে কর যে লোহার কারখানাতে ঢুকলেই আমার দেদার রোজগার হ'ত? ঐ বড়-জামাইবাবুর অফিসেই কি সবাই অমনি রোজগার করছে? ওটা বরাত, নইলে এত লোক থাকতে ঐ তেত্রিশ টাকা মাইনের লোককেই বা সাহেবরা অত বড় স্টোরের ভার দেবে কেন? আর ঐ নির্জন গঙ্গার ওপর জায়গায়? স্টোরও তো ঢের আছে!'

এসব কথা বোঝে না শ্যামা, বিশ্বাসও করে না। অদৃষ্টকে দোষ সে-ও দেয় অবশ্য, কিন্তু আসলে সে এর জন্য দায়ী করে ওদের দু জনকেই। কতকটা হেমের অকর্মণ্যতা, তার চেয়েও বেশী অভয়পদর আক্রোশ! সে চায় না যে হেম তার নিজের চেয়ে বেশী রোজগার করুক। নইলে এর চেয়ে ভাল চাকরি কি একটা যোগাড় ক'রে দিতে পারত না?

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনেই গজ গজ করে এক-এক দিন, 'আড়ি আকোচ—আড়ি আকোচ! আসল কথা—করবে না কিছু। ভিখিরী ভিখিরীব ম থাক্—অত কেন? আমি কি আর বুঝি নে মনের ভাব! সবাই বলে জামা ভাল, জামাই ভাল। মিট্‌মিটে ডান।···নিজেরা মড়-মড় টাকা বোজগা করছেন, আমাব বেলায় এমন এক চাকরি—যে একটা পয়সা বাড়তি আমদানি নেই।···ভগবানও তেমনি একচোকো। যাকে দেবে, ঢেলে দেবে একেবারে—যাকে দেবে না, তাকে কিছুই দেবে না।···সকলকারই দিন ফেবে, আমার দি ফেরবার নাম নেই।'

॥ ৪ ॥

হঠাৎ একটা সুযোগ কিন্তু এসে যায়।

অক্ষয়বাবু যুদ্ধ বেধে পর্যন্ত মেতে উঠেছেন লড়াই নিয়ে। আগে এক-খানা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ নিতেন, এখন দৈনিক কাগজ নিচ্ছেন। অফিস থেকে ফিরে এলে রোজ বৈঠক বসে তাঁর দাওয়ায়। গ্রামসুদ্ধ লোক আসে, আলোচনা চলে অনেক বাত পর্যন্ত। সে হল্লায় শ্যামা বিরক্তই হয়। লড়াইয়ের খবরে তার কোন কৌতূহল নেই। এদের এই অতিরিক্ত কৌতূহলেব কোন কারণ তাই সে বুঝতে পারে না। 'কোথায় লড়াই বেধেছে তার ঠিক নেই, তোদের তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? বলে, এক গাঁয়ে ঢেকি পড়ে আব গাঁয়ে মাথা ব্যথা।···কোথায় কোন্ মুলুকে জার্মানীরা কী করছে, তাই নিয়ে তোরা গেলি যেন! আসল কথা যাহোক একটা কিছু নিয়ে খানিক চকড়বা করা চাই। উত্তম ওষুধ জুটেছে এখন!'

অক্ষয়বাবু বাড়ির মধ্যেও জ্ঞান দেন মধ্যে মধ্যে, তামাক খেতে খেতে বলেন, 'জান গিন্নী, ইংরেজ রাজত্ব আর থাকবে না। জার্মানেরা নিয়ে নেবে সব। আমাদের বাবুরা তো ইরি মধ্যে জার্মানি পড়তে লেগে গেছেন।'

মঙ্গলা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'ওমা সে কি কথা গো! অমন কথা ব'লো না—ইংরেজদের হারিয়ে দেবে অমনি এক কথায়? বলে এত বড় মোগল পাঠান যা পারলে না জার্মানেরা তাই পারবে

'রেখে দাও তোমার মোগল পাঠান। সে সব ঢাল-তলোয়ারের রাজত্ব আর নেই। এখন কামান-বন্দুক, জেপেলিন, মাইন, বোমা। জার্মানেরা

জেপেলিন বার করেছে, এই গেরামের মত একটা জাহাজ বাতাসে ওড়ে।... আর হাউইজার না কি কামান—তার গোলা গিয়ে পড়ে দশ-বারো কোশ দূরে।'

অবিশ্বাসের হাসি হেসে মঙ্গলা জবাব দেন, 'কার গাঁজায় দোক্তা কম হয়েছে? দশ ক্রোশ দূরে কামানের গোলা গিয়ে পড়ছে আর গেরাম উঠছে বাতাসে! রেখে বসো দিকি!'

অক্ষয়বাবু চটে ওঠেন, 'তুমি কামানের কি বোঝ? কামান দেখেছ চোখে যে ফট্ করে একটা কথা বলে বসলে? আর জেপেলিন আকাশে উঠছে কি না—এই ছবিতে দ্যাখো, এই, ই।'

খবরের কাগজখানা মেলে ধরেন অক্ষয়বাবু মঙ্গলার চোখের সামনে।

এবার মঙ্গলা বিশ্বাস করেন। বলেন, 'ওমা কী হবে! তা হলে তো ইংরেজরা পারবে না! বলি সত্যি সত্যিই জার্মান আসবে নাকি?...আমাদের ছেলেদের ইংরিজি ছেড়ে আবার জার্মানি শিখতে হবে? তা হ্যাগা, কদ্দিনে আসবে ওরা?'

তার পরই হঠাৎ গলাটা খাটো করে আবার প্রশ্ন করেন, 'তাই বুঝি তুমি কোম্পানির কাগজগুলো সব বেচে দিয়ে নগদ করে নিলে!'

'চুপ চুপ!' চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন অক্ষয়বাবু, 'মাগী আমার সব্বনাশ না করে ছাড়বে না দেখছি, বাড়িতে ডাকাত না পড়ালে আর চলছে না।'

কিন্তু এসবে প্রায়ই কান দেয় না শ্যামা। কান দেবার তার অবসরও নেই। দুঃখের ধান্দায় যাকে ঘুরে বেড়াতে হয় তার অত বাজে খবর নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। ইংরেজই থাক আর জার্মানিই আসুক—তার দুঃখু ঘুচবে না!

এর মধ্যে এক দিন একটা কথা কানে আসে। শ্যামা আর হেম দু জনেই চমকে ওঠে সে কথা শুনে।

অক্ষয়বাবু কাকে বোঝাচ্ছেন, 'বলি শুধু কাপড়ের কথা তুলছ কেন? কোন্ জিনিসটা এদেশে হয় বল। ছিষ্টি তো সেই জাহাজ ভর্তি হয়ে আসত, তবে আমাদের দিন চলত।...অত কথা কী বলব, শিশি-বোতলগুলোর কি দাম হয়েছে! একটা ছোট শিশি, তাই তিন-চার আনায় বিকুচ্ছে! পুরোন শিশি যোগাড় করে না নিয়ে গেলে ডাক্তারখানায় ওষুধ মেলে না আজকাল। যদি বা দেয়, এক শিশি মিক্চারের দামের সঙ্গে শিশির দাম ধরে নেয় চার আনা।'

শ্যামা উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে।

কিছুদিন আগেই ওর ফোড়ন আর মশলা রাখবার ভাঁড় ভেঙে গিয়েছিল, শ্যামা বলেছিল খাবারের দোকান থেকে কটা ভাঁড় চেয়ে আনতে। হেম তার বদলে অফিস থেকে দু-তিনটে শিশি এনে দিয়েছিল। ওদের অফিসে নানান জিনিস আসে—ছোট বড় মাঝারি শিশি ক'রে। সে সব শিশি এক পাশে জড়ো হয়, যার যা দরকার নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয় ঝেঁটিয়ে, শিশিগুলো দেবার সময় এই ইতিহাসটুকুও বলেছিল হেম।

এমনিই যদি রোজ কটা করে শিশি আনতে পারে তা হলেও তো হয়! রোজ দুটো করে আনলেও অন্তত চার আনা পয়সা। মাসে সাড়ে সাত আট টাকা!

লোভে, আশায় শ্যামার চোখ জ্বলতে থাকে।

চাপা গলায় সে ছেলেকে তিরস্কার করে, 'তুই বেটাছেলে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াস—তা কি একটা খবরও কান দিয়ে শুনিস না? অ্যাদ্দিন রোজ একটা করে শিশি জমলেও কতগুলো জমে যেত বল্ দিকি? মেয়েমানুষেরও অধম তোরা!'

হেম বিরক্ত হয়ে বলে, 'হ্যা, দুটো পুজো সেরে সাড়ে ছটায় অফিস যাচ্ছ, সন্ধ্যে সাতটায় ফিরি—কত সময় আমার! আমি এখন যাই বাজারে বাজারে ঘুরে কোন জিনিসের কী দর বাড়ল তাই খবর নিতে!'

তখনকার মত মাকে থামিয়ে দিলেও হেম শেষ অবধি রাত্রে বাড়ি ফিরল দুই পকেটে দুটো শিশি নিয়ে। অ্যাসিডের শিশি, ছোট ছোট। তা হোক, শ্যামা সেগুলো সযত্নে সাজিয়ে রাখে তক্তপোশের নিচে। সস্নেহে তাদের গায়ে হাত বুলোয়। এখন আর ওগুলো সামান্য কাচের শিশি নয় তার কাছে—মণিমুক্তার মতই মূল্যবান।

সেদিন থেকে প্রায়ই নিয়ে আসে হেম—একটা দুটো করে। কোন কোন দিন তিন-চারটেও আনে। কিন্তু সে অবাক হয় মায়ের ভাবগতিক দেখে। জমিয়েই যাচ্ছে শিশিগুলো, কৈ বেচবার তো কোন লক্ষণ নেই!

এক দিন মুখ ফুটে প্রশ্নও করে, 'কাল তো ছুটি আছে, বাজারে গিয়ে দেখব নাকি কত দর ওঠে?'

'ক্ষেপেছ তুমি! এইখানে বেচতে যাও আর চারদিকে ঢিটিক্কার পড়ে যাক্। যা শত্রুপুরীতে বাস। ও এখন জমুক। এক পুঁটুলি হলে কলকাতায় গিয়ে বেচে আসব আমি নিজে। তাতে দামও বেশী পাব। তুমি যা হাঁদা ছেলে, আধাকড়িতেই হয়তো বেচে দিয়ে বসে থাকবে, ভাববে খুব লাভ করেছ!'

সত্যি-সত্যিই শ্যামা এক দিন এক পুঁটুলি শিশি নিয়ে কলকাতায় এল। নতুন বাজারের ধারে সার সার যে সব পুরনো শিশি-বোতলের দোকান সেই-খানে ঘুরে দরদস্তুর করে বেচে পয়সা গুছিয়ে আঁচলে বাঁধলে—মোট এক টাকা চৌদ্দ আনা!

তার পর কমলাদের ওখানে গিয়ে উঠল।

কমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'কিরে, হঠাৎ?'

'না। এমনিই। অনেকদিন তোমাদেব দেখি নি, তাই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

একটু একটু ক'রে সাহস বাড়ে হেমের। আজকাল সে একটা ছোট ঝাড়ন নিযে অফিসে যায়, আসবার সময় পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে আসে শিশি-বোতল। সেখান থেকে বার করা অসুবিধা নয়, এখানে আনাই অসুবিধা। কে দেখবে, কী ভাববে! তবু আসবার পথে ওল কি কচুব শাক কি কালকাসুন্দা তুলে পুঁটুলির ওপরের দিকে বেঁধে নেয়—যাতে বোতলগুলো ঢাকা পড়ে থাকে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা এ তো কথাতেই আছে, শাক দিয়ে বোতল ঢাকতে দোষ কি! আপন মনেই হাসে হেম এক-এক দিন। তাও সাধ্যমত দিনের আলোয় পাড়ায় ঢোকে না—বেশ একটু অন্ধকার হলেই আসে।

কিন্তু তাতেও মুশ্‌কিলের শেষ হয় না শ্যামার।

ঘর তো ঐ একখানা। তক্তপোশের নিচে ছাড়া কোন জিনিস রাখবার জায়গা নেই। অথচ পিঁটকীর ছেলেমেয়েরা হরদমই আসছে এ ঘরে। ওর কপালে যে হয়েছে সবই বিপরীত। বিয়ে হলে মেয়েছেলে শ্বশুরঘর করবে—এই তো সবাই জানে। কপাল পোড়ে সে আলাদা কথা—এর বর আছে আসে-যায়, ভাব-সাবেরও কমতি নেই। অথচ বারো মাসই পড়ে আছেন বাপের বাড়ি। কি না—তাদের অবস্থা ভাল নয়, খাওয়া-দাওয়া ভাল নয়। মুখে আগুন অমন নোলার আর অমন পিরবিত্তির। এ শুধু শ্যামারই কপাল! এক-আধটা হলে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু এক পুঁটুলি বোতল-শিশি

টাকা সোজা কথা নয়। অথচ এক পুঁটুলি না হলে কলকাতায় যাওয়ার মজুরি পোষায় না। শিশি-বোতল এখানে কিনবে কে? মৌড়ীর থটিতে নাকি দোকান হয়েছে কিন্তু সে-ও তো বহুদূর। তার চেয়ে সোজাসুজি কলকাতাতে যাওয়াই ভাল। দব হু হু করে বাড়ছে সেখানে। একটু ভারী পুঁটুলি বয়ে নিয়ে যেতে পারলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকাও হয়। তা নইলে চলেই বা কেমন ক'রে। বার আনা দামের রেলির বাড়ির ধুতিটা আড়াই টাকা হয়ে গেছে। তাও দুষ্প্রাপ্য।

শ্যামা নিত্য নূতন জায়গা উদ্ভাবন করে সেগুলো লুকোবার। ছোট ছোট পুঁটুলি বেঁধে রেখে দেয়। দিনের বেলা বিছানার কাঁথাগুলো একপাশে গোটানো থাকে—তার আড়ালে রাখা চলে, কিন্তু রাত্রে সে আশ্রয় থাকে না। অথচ ওদের আসবাব সময় অসময় নেই। আর তার ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি—দিন রাত ঐ পিঁটকীর ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গেই খেলা। মঙ্গলার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা বড় জোর হেমের সঙ্গে গল্প করে, বাইরে বাইরেই সেটা চলে। এরা শুধু ঘরে নয়, সটান দুম্ করে তক্তপোশের ওপরই উঠে পড়ে—হুড়যুদ্ধ তো লেগেই আছে। কোন্ দিন না ঐ বোতলগুলোর ঘাড়ে পড়ে সব ভাঙে। ভাঙুক, সেটা অত ভয়ঙ্কর ক্ষতি নয়, কিন্তু যা টিটিক্কার হবে তার পর এই নিয়ে—ভাবতেই শ্যামা শিউরে ওঠে।

দাঁতে দাঁত চেপে গালাগাল দেয় ছেলেমেয়েদের, 'মুখে আগুন, নাথখোরের ঝাড়। এমন নইলে এ দুগ্‌গতি হয়! আমার পেটেই বা আসবে কেন? লজ্জা-ঘেন্না হায়া-পিত্তি কিছু নেই। হরদম মার খাচ্ছেন, অপমান হচ্ছেন—কথায় কথায় তো ওরা দিয়ে যাচ্ছে দুমদাম বসিয়ে,—তবু কি লজ্জা আছে? ওদেরই সঙ্গে যত খেলা। আর ওরাও তেমনি—ছেলেমেয়ে তো নয় দস্যি এক-একটি, গিলছে কুটছে আর ডাকাত তৈরী হচ্ছে।'

শুধু কি তাই!

ভয় ওর নিজের ছেলেমেয়েদেরও কম নয়। যা বোকা, ওরাই হয়তো গল্‌গল্ ক'রে কোন্ দিন বলে ফেলবে। মঙ্গলার স্বভাব—নিজের কোটে পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করা—কী রান্না হ'ল, কী দিয়ে খেলি, কী করলি সারাদিন মা কোথায় যায়, কি করে—এই সব নানা প্রশ্ন।

তাই সে অবশ্য নিত্য এক বার করে আড়ালে ধমক দেয় কান্তি-তরু-কানুকে, রোজ সতর্ক করে দেয়, তবু দুশ্চিন্তা থেকেই যায় একটা।

অবশ্য সমস্যা যতই হোক্—শ্যামা অসাধ্য সাধনই করে। একটি একটি করে দশ মাস কেটে যায়—ওর রহস্য প্রকাশ পায় না তখনও। কেবল ওর নিজেরই বুদ্ধির দোষে কথাটা উমাদের কাছে জানিয়ে ফেলেছিল। লাভ হয় নি কিছুই—শুধু শুধু জানাজানি হয়ে ওদের কাছে একটু খাকতাই হতে হ'ল।

কার কাছে যেন শুনেছিল শ্যামা, দোকানে নিজেরা নিয়ে গেলে বড ঠকায়, তার চেয়ে ঘরে রেখে ফিরিওয়ালাদের কাছে দরদস্তুর করে বেচতে পারলে অনেক বেশী দাম পাওয়া যায়। তাই এক দিন লজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা দিদির কাছে পাড়তে গিয়েছিল। এই উপকারটুকু ওরা করতে পারবে না? কোথাও যেতে হবে না—হাটে নয় বাজারে নয়, বাড়ির দোরে শিশি-বোতলওলা ডেকে দর ক'রে বেচা—এ আর এমন কঠিন কাজ কি?

কমলা হয়তো এক কথাতেই রাজী হয়ে যেত, কিন্তু উমা একেবারে বেঁকে দাড়াল, 'ছি! ও তো চোরাই কারবার ছোড়দি।...কথাটা তুমি মুখে আনলে কি ক'রে! ছোটখাটো ফল-পাকুড় চুরি করতে করতে তোমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, তাই আর এর অপমানটা দেখতে পাও না, কিন্তু আমরা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে হয়ে চোরাই মাল বেচব—এ কথা তুমি মুখে আনলে কি ক'রে? গোবিন্দ কী শিক্ষা পাবে বল তো? বৌমাই বা কি ভাববেন?...তা ছাড়া আমরাও এক জনদের বাড়ির মধ্যে বাস করি—তারা [illegible] বলবে। তোমার না হয় লাভ হবে, তোমার সবই সইবে—আমাদের লা[illegible] মধ্যে তো চোর বদনাম! ও আমরা পারব না!'

মাথা হেঁট ক'রে চলে আসতে হয়েছিল শ্যামাকে। নিজের বোন[illegible] জেনেশুনেও কেন যে কথাটা পাডতে গিয়েছিল! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজে[illegible] গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ পর পর দু-তিনটে দিন হেম এল শুধু-হাতে।

শ্যামা প্রশ্ন করলে, 'কিরে, কি ব্যাপার!'

হেম উত্তর দিলে না প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন সংক্ষেপে শুধু বললে, 'একটু অসুবিধে হচ্ছে।'

তৃতীয় দিনেও ঐভাবে আসতে দেখে শ্যামা চেপে-চুপে ধরল, '[illegible] আনতে পারলি না কিছু? কি ব্যাপার? নাকি পথে নিজেই বেচে [illegible] আসছিস?'

কুটিল সংশয়ের সুর তার কণ্ঠে। কাঁচা টাকার ব্যাপার—কাউকেই বিশ্বাস নেই তার।

হেম এ খোঁচা গায়ে মাখল না, কিন্তু একটু বিরক্তভাবেই বললে, 'সকলেরই তো চোখ আছে, পয়সারও দরকার আছে! শুধু আমিই লুটেপুটে খাব—অন্য লোকে তা সইবে কেন?'

শ্যামা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'এত কাল সইছিল, এখন আর হঠাৎ সইছে না?'

'জানি নে। চুপ কর দিকি একটু—বকো না।'

ছেলের মুখের ভাব কেমন থমথমে। গলার আওয়াজটাও ভাল নয়, শ্যামা আর পেড়াপীড়ি করে না—তখনকার মত চুপ করে যায়। কিন্তু ভাবগতিক তার আদৌ ভাল লাগে না।

সারারাত ঘুম হ'ল না তার। এটা বাড়তি, হিসেবের মধ্যে নয়, তবু এতদিন ধরে নিয়মিত পেয়ে আসার ফলে, টাকাটা যেন প্রাপ্যর মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। ন্যায্য পাওনার মতই ওটার ওপব ভরসা জন্মেছে—তেমনি ভয়ও হচ্ছে বৈকি বন্ধ হওয়ার আভাসে-ইঙ্গিতে।

সমস্ত রাত অজ্ঞাত আশঙ্কার কণ্টক-শয্যাতে ছট্‌ফট করার পর ভোরের পর এ একটুখানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের দাঁ ারে চম্‌কে ধড়মড়িয়ে উঠল শ্যামা।

ঝাড়! রেন এসেছে।

লজ্জা-উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন তুড়িলাফ খাচ্ছে। বিজয়গর্বে তার সমস্ত মুখ কথায় সিত, কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত উল্লাস।

ওদে 'হবে না! এ যে হতেই হবে! ঈশ্বর তো আছেন এক জন মাথার ওপর! ও দর্পহারী মধুসূদন কারুর দর্প সন না। তেজ হয়েছিল—তেজ! বলি এখন সে তেজ রইল কোথায়? দু পয়সা রোজগার ক'রে ধরাকে সরা দেখেছিল একেবারে। যেমন দেমাক ঐ গোরবেটার, তেমনি দেমাক মাগীর। নে—এখন মায়ে-পোয়ে বসে বসে দেমাকের গোড়ায় জল ঢাল!'

শ্যামা আজকাল আর ভয় করে না স্বামীকে। বেরিয়ে এসে ধমক দিলে, 'বলি ও হচ্ছে কি, ষাঁড়ের মত গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন!…পাঁচটা মানুষ ঘুমোচ্ছে, তারা কি মনে করবে! ভোর বেলাই নেশা-ভাঙ করেছ বুঝি?'

'নেশা! নেশা হয়েছিল তোর—তোদের!…পয়সার নেশা। সে নেশা ছুটে যাবে!

শেষের দিকের কথাগুলো বলবার সময় অদ্ভুত একটা সুর বেরোল নরেনের কণ্ঠে। সে যেন এক পাক্‌ নেচেই নিল।

এতক্ষণে শ্যামার তন্দ্রা ভেঙেছে রীতিমতই। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। এতখানি উল্লাস—প্রতিহিংসার মত আনন্দ—একেবারে অকারণ হতে পারে না।

সে উঠোনে নেমে এসে এবার একটু চাপা গলাতেই বললে, 'বলি এবার একটু থামবে কি? কী হয়েছে কি? অত ফুর্তি কিসের?'

'তোদের তেজ ভেঙেছে যে। ফুর্তি করব না? ছেলের চাকরির অংকারে ধরাকে সরা দেখছিলি একেবারে। চাকরি তো গেল! আমাকে চোর বলে অপগেরাজ্যি করা হ'ত। এবার ছেলেকেও তো চোর বলে দেগে ছেড়ে দিলে একেবারে। তার কি করবি? বেটাছেলের চোর-বদনামের চেয়ে আর কোন বদনাম আছে? এই বয়সে চোর বদনামে চাকরি গেল। তোরা নাকি নেহাত নিঘিন্নে নিপিত্তে, তাই লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছিস! অন্য লোক হলে গলায় দড়ি দিত!'

সে চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ কেন, পাড়াসুদ্ধ লোকেরই ঘুম ভাঙবার কথা। মঙ্গলারাও ভিড় ক'রে এ'সে পড়েছিলেন। এই বার বাসিমুখে গোটা দুই পান আর খানিকটা দোক্তা পুরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলি কার চাকরি গেল গো ঠাকুর? ভোরবেলা শুভ সংবাদটি নিয়ে এলে কার?'

'কার আবার—ঐ গোরবেটার! এই যে—এই হারামজাদী মাগী—বুঝলেন না, বেউড় বাঁশের ঝাড়ে বেউড় বাঁশই হয়—বুঝলেন না। ঐ মাগী চোর, দেখছেন না, আপনাদের বাগানকে বাগান চুরি করে ভুষ্টিনাশ করলে! তার ছেলে আর কত ভাল হবে! আবার ঐটি যে পেয়ারের ছেলে!'

'বলি তোমার ছেলের—আমাদের হেমের চাকরি গেল? কী বলছ গো ঠাকুর? হ্যাঁলা, ও বামনী, কি বলছে পাগলা ঠাকুর?'

'কি বলছি ঐ গোরবেটার জাতকেই জিজ্ঞেস করুন না। চাকরি গেল, তাই কি এমনি? চোর দুর্নামে। আমার ছেলে তুই—সামান্য শিশিবোতল চুরি করে চাকরিটা খোয়ালি! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার! তা নয়—কিনা শিশিবোতল! তা আবার হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলি! বেটা বেজন্মা আকাট কোথাকার!'

শ্যামার মনে হ'ল সমস্ত মাটিটা টলছে। এই বাড়ি, উঠোন শুধু নয়—সমস্ত পৃথিবীটাই।—কিন্তু পৃথিবীটা টলে নি, টলছে ওর নিজেরই মাথা। এই মুহূর্তে

সত্যি সত্যিই একটা বড় ভূমিকম্প হ'লে যেন বাঁচত সে—সীতার মত মাটিতে সেঁধিয়ে যেতে পারত।

কিন্তু তা হ'ল না। মঙ্গলা আর সবাইকে ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন এবার, সঙ্গে সঙ্গে পিঁটকীও—যেখানে হেম মাথা হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তার পর অবিশ্রান্ত জেরায় সবই বেরিয়ে এল—একটি কথাও গোপন করা গেল না।

শিশিবোতলগুলোর যখন কোন দাম ছিল না—তখন কারুরই নজরে পড়ে নি। শেষে টনক নড়ল সবাইকারই। বিশেষ করে দারোয়ানদের। ওটা ওদেরই প্রাপ্য বলে তারা মনে করলে—মাঝখান থেকে এই বাবুটা ভাগ বসায় কেন? দু-তিন দিন হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল তারা। শেষে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল—চার ভাগের এক ভাগ নেবে হেম। কিন্তু হেম বেছে বেছে ভাল-গুলোই নিত, তার ফলে দারোয়ানরা চটে একেবারেই কণ্টক দূর করলে। ছোট সাহেবকে জানিয়ে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছে সেদিন।

ঐ কটা শিশিবোতল কোম্পানীর লাভের ঘরে জমা হ'ত না এবং হবেও না কোন দিন। সাহেবও ভাগ বসাতে আসবেন না। কিন্তু চুরি চুরিই—সাহেব সেটা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন। নিহাতই ছেলেমানুষ, কাজটা ক'রে ফেলেছে—বাবুরাও সকলে ওর হয়ে অনুরোধ উপরোধ করায়—সাহেব পুলিসে দেন নি বটে, কিন্তু ওকে চাকরিতে বাহাল রাখতে আর কিছুতেই রাজী হন নি। কালও হেম গিয়েছিল—এই তিন দিনই যাচ্ছে—অনেকেই ওর হয়ে বলেছেন, কিন্তু সাহেব কোন অনুরোধই শুনতে রাজী হন নি। কাল একেবারে জবাব হয়ে গেছে!

মঙ্গলা মুখে কিছুই বললেন না, বরং ক্ষেত্র-মাফিক দু-একটা সহানুভূতি ও সান্ত্বনার কথাই বললেন, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর মেয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে যে সানন্দ কৌতুক ও ব্যঙ্গের হাসি উঁকি মারছিল তা নিতান্ত বালকদের চোখেও ছাপা রইল না। পিঁটকী বেরিয়ে গিয়ে, এ উঠোন পেরিয়ে নিজেদের উঠোনে পড়বার মুখে বেশ সকলের শ্রুতিগোচর ভাবেই বললে শুধু, 'ঠিক্ই বলেছে ঠাকুর, ভগবান আছেন! পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেধের—এ তো জানা কথা।'

॥ ২ ॥

বিপদ একা আসে না—এতকাল শুনেই এসেছিল শ্যামা—কথাটার মর্ম এবার হাড়ে হাড়ে অনুভব করলে।

হেমের চাকরি যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐন্দ্রিলার খবর।

এর মধ্যে অবশ্য প্রথম সংবাদটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক—

ওদের মত হৃতদরিদ্রের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী লোকের আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার মত দুর্ঘটনা আর নেই। এমন কি তা বোধ হয় সাধারণ আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যাথার চেয়েও দুঃসহ। অন্তত শ্যামার তাই মনে হ'ল। এর আগে তার দু-তিনটি সন্তান হয়ে মরে গেছে—একটি তো বেশ বড় হয়েই—তাতেও বোধ হয় দুঃখটা এত দুর্বহ বলে মনে হয় নি। প্রতিটি দিন-রাত্রি যেন চিন্তাটা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকে মনে। ঘুম হয় না কিন্তু জাগরণের মুহূর্তগুলিও কাটে যেন একটানা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

টাকা আছে। এই ক মাসের শিশি বোতল বেচা টাকার একটি পয়সাও সে সংসারে খরচ করে নি। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে—তার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনই বাড়িয়েছে, বাড়তি টাকায় হাত দেয় নি। কাপড়ের দামটাই সব চেয়ে বেশী—তার জন্য ছেলেমেয়েগুলোরই দুর্দশা। বাড়িতে তারা ছেঁড়া 'কানি' পরে থাকে বললেই হয়। শ্যামাও তাই—তবে তাকে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতে হয় বলে আস্ত শাড়ি একখানা অন্তত বাঁচিয়ে রাখে। আর গোটা কাপড় লাগে হেমের। তবে যত অভাবই হোক—ব্রত-পার্বনের কল্যাণে লালপাড় শাড়ি এবং ধুতি এক-আধখানা মেলেই।

কিন্তু সে অন্য কথা।

টাকা জমেছে। আছেও তা খুব সঙ্গোপনে। নরেনের কেন—ছেলে-মেয়েদেরও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

কিন্তু সে টাকাতে শ্যামা প্রাণ ধরে হাত দিতে পারবে না। সে টাকার একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও খরচ করতে রাজী নয় সে।

ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে, মনের সঙ্গোপনে একটি অতিশয় উচ্চাভিলাষ মাথা তুলেছে ওর মধ্যে। ওর পক্ষে তা অসম্ভব, একান্ত দুরাশা—সে উচ্চাশা সফল হবার সুদূরতম সম্ভাবনা এমন কি নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে পারে না সে—তবু তা কী এক অমোঘ এবং দুর্নিবার শক্তিতে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বিলাস তো নয়ই—জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও নিজেকে বঞ্চিত ক'রে সে সেই আশা-তরু-মূলে জল সিঞ্চন করছে। বরং বুকের রক্ত সিঞ্চন করছে বলাই উচিত।

নিজের বাড়ি।

কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও হাসি পায় ওর নিজেরই। তার মত পরাশ্রয়ীর নিজের বাড়ি, একে উচ্চাশা বললেও যথেষ্ট বর্ণনা হয় না।

একেই বুঝি বলে বামনের চাঁদ ধরবার শখ। ব্যাঙের সাগর পার হবার সাধনা।

তবু—তাই-ই তো করছে সে।

একটি একটি করে প্রায় ছ' শোটি টাকা জমেছে ওর!

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

গুনতে বসলে নিজের হাত এবং চোখকেও বিশ্বাস হয় না যেন। কিন্তু বার বার গুনে দেখেছে সে। আর মাত্র কয়েকটি টাকা হলেই ঐ কল্পনাতীত সংখ্যা পূর্ণ হবে।

ওর মত ভিখারীর পক্ষে কুবেরের ঐশ্বর্য।

এর থেকে সামান্য কিছু টাকা খরচ করলেও এখন অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে—তা শ্যামা জানে। একটি পয়সারও ক্রয়ক্ষমতা কতখানি তা তার বেশ জানা আছে। যত আক্রাই হোক্—এখনও এক পয়সার নুনে সাত দিন চলে। এক পয়সার পাঁচ ফোড়নে মাস চালায় সে। অবশ্য ফোড়ন ব্যবহার করার খুব পক্ষপাতীও নয় শ্যামা। সামান্য তেলে তাকে রাঁধতে হয়—ফোড়ন দিলে সেটুকু তেল ফোড়নেই শুষে নেয়। ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিশে তার স্বাদ বাড়াবার কোন কাজে লাগে না।

ছেলেমেয়েগুলো সদা-সর্বদাই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে। তাদের কোটরগত চক্ষুর উদগ্র লোলুপ দৃষ্টির দিকে তাকালে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগে বৈ কি! শতছিন্ন মলিন বেশ—ভিখারীরও অধম। তবু ঐ টাকা থেকে একটি পয়সাও ভাঙতে পারে না শ্যামা।

না। ভাঙবেও না। বহু অপমান সয়েছে সে। বহু লাঞ্ছনা। প্রতিটি অপমানের স্মৃতি তার মনে জমা আছে। স্মৃতির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিশে আছে সে ইতিহাস। একা পথ চলতে চলতে কিংবা নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে পাতা কুড়োতে কুড়োতে সেই রশিতে টান পড়লেই নতুন ক'রে জ্বলতে থাকে প্রত্যেকটি ঘা। লোকে বলে মার খেয়ে খেয়ে কড়া পড়ে যায়—তখন আর লাগে না। ভুল কথা, কড়ার ওপর লাগলে আরও বেশী যন্ত্রণা হয়। অবিশ্রান্ত পথ চলে চলে তার পায়ের নীচে অগুনতি কড়া পড়েছে। সে কড়ার কোনটি দৈবাৎ যদি কোন কাঁকর কি খোয়ার ওপর পড়ে—বেদনায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।...

যদি উপবাস ক'রে ক'রে সত্যিই কোনদিন ছেলেমেয়েরা মরতে বসে—তখন যা হয় করবে। তার আগে নয়।

হেম ঘোরে টো টো করে। লজ্জাই বেশী তার। বাড়ির লোক, বিশেষত সরকারদের সামনে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করে। মনে হয় প্রতিটি লোকের সকৌতুক দৃষ্টি চোর বলে তাকে বিদ্রূপ করছে। চুরি তারা বহুদিন থেকেই করছে সত্যি কথা—কিন্তু সে চুরি আলাদা। চুরে করে চাকরি যাওয়ার মত অপমানকর নয় তো।

চাকরি অবশ্য বসে নেই তার জন্যে। তার ওপর অফিস থেকে কোন সার্টিফিকেট পায় নি। তবু ঘোরে—এখানে ওখানে, পাগলের মত। অফিসে অফিসে ঘোরে আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

শ্যামা নিজে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছেলের হয়ে যজমানির কাজ চায়। কিন্তু সকলকারই পুরনো লোক আছে। বাড়তি কাজ মেলা শক্ত। লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজো ছাড়া বাডতি কাজ পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া—শ্যামা বেরিয়ে আসতে আসতে তাকে শুনিয়েই কেউ কেউ মন্তব্য করে—'বাব্‌বা, ও চোরকে কে বাড়িতে ঢোকাবে! তার পর পুজোর বাসনকোসন নিয়ে পালাক এক দিন!'

এই অনিষ্টটি করে গেল নরেন। নইলে কাকে-বকেও টের পেত না। বাপ হয়ে চিরদিন ছেলেমেয়েদের অনিষ্টই করে যাচ্ছে সে। স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের পথে বসিয়ে, অপরের বাড়ির দাসত্ব করিয়েও শান্তি নেই তার।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করে শ্যামা। অনুপস্থিত স্বামীকে গালাগালি দেয় অনুচ্চকণ্ঠে।

আর এদেরও চেনে সে। ভাল করেই চেনে। সবাই সাধুপুরুষ। অফিসে যারা চাকরি করে—অফিস উজোড় করে নিয়ে আসে। কাগজ, পেন্সিল, নিব, কলম—এগুলো কি চুরি নয়! নিজেরাই বলে 'উপ্‌রি' আছে। 'উপ্‌রি'টা কি? চুরি, না হয় ঘুষ—কিন্তু সেও তো জুচ্চুরি।

গালাগাল দিয়ে তখনকার মত গায়ের জ্বালা মেটে বটে কিন্তু আয়ের কোন উপায় হয় না। উত্তেজনার শেষে আসে অবসাদ আর একটা হিম-হতাশা। একটু একটু করে মনটা গুঁড়িয়ে আসে কোথায় যেন!

এরই মধ্যে এল দ্বিতীয় দুঃসংবাদ।

ঠিক আগের দিনই শ্যামা ভাত বেড়ে দিতে দিতে হেমকে উপদেশ দিয়েছে, 'এক বার হরিনাথের কাছে যা না। ওর তো রেল অফিস - যখন-তখন লোক নেয়। যদি একটা কাজ-কর্ম করে দিত!'

'গিছলুম তো। তুমিও তো বলেছ। আবার গিয়ে লাভ কি!' হেম সংক্ষেপে জবাব দেয়। এ জ্বালাতন তার ভাল লাগে না। মায়ের নিত্য অভিযোগ এবং নিত্য নূতন উপদেশ। মায়ের অতিরিক্ত আগ্রহই তাকে চুরিতে প্ররোচিত করেছিল সেটা আজ মায়ের মনে নেই। মা তো এখন স্পষ্টই বরং বলে, 'চাকরি বাঁচিয়ে চুরি করতে পারতিস তো চুরির মানে হ'ত! এমন কাঁচা চুরি করতে যাস কেন? তার চেয়ে যা পেতিস—দুঃখের ভাত সুখ করে খেতুম।'

শ্যামা আজও ছেলের কথার উত্তরে জিদ করে, 'এক বার গেলে কি এক বার বললে যদি চাকরি হ'ত তা হলে আর ভাবনা ছিল না। এসব ব্যাপারে বার বার যেতে হয়, অনেক সময় মানুষ বিরক্ত হয়ে ক'রে দেয়! দায় কার? তার না তোর?'

হেম নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যায়।

নাজ্‌নে ডাঁটা সস্‌সড়ি আর ভাত। চুরি করে নাজ্‌নে ডাঁটা পাওয়া যায়—ডাঁটা আর আমড়া। ডাঁটা সস্‌সড়ির সঙ্গে আমড়া-গোলা কাঁচা অম্বল। এই চলছে কদিন ধরে। তাতে তত কষ্ট ছিল না—মায়ের বাক্যিতে যত কষ্ট। প্রতিদিনই ভাত খেতে বসলে শুরু হয় এই নাকে-কান্না এবং অভিযোগ! অন্য সময় পালিয়ে বেড়ায়, খেতে বসলেই জব্দ! এই সময়টা চোখকান বুজে শুনতেই হয়। ফলে ভাতটাই বিষ মনে হয় আজকাল।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হেমকে প্রতিজ্ঞা করতেই হয় যে কাল সকালে সে আড়গোড়ে যাবে।

কিন্তু সেই কাল সকালের আগেই ভোরবেলা দোরে ধাক্কা পড়ে ওদের।

প্রথমটা মনে হয় নরেন শ্যামার চোখমুখ কঠিন হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু তার পরেই মনে হয়, শুধু দোরে ধাক্কা দিয়ে চুপ করে থাকবার লোক তো নয় সে, এতক্ষণ তার চিৎকারে পাড়া জেগে উঠত।

বিস্মিত এবং কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে দোর খুলতেই চোখে পড়ল—ঐন্দ্রিলা, মেয়ে কোলে দাঁড়িয়ে অঝোরঝরে কাঁদছে। তার চুল উসকোখুসকো, বেশবাস অবিন্যস্ত, চোখেমুখে কালি—যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে গেল শ্যামা।

'এ কী রে? এমন ভাবে কোথা থেকে? কার সঙ্গে এলি? ব্যাপার কি? ওদের বলে এসেছিস তো? এত ভোরে এলিই বা কেন? জামাই ভাল আছেন তো?'

এক সঙ্গে এক সহস্র প্রশ্ন করে শ্যামা।

ঐন্দ্রিলা প্রায় টল্‌তে টল্‌তেই ঘরের মধ্যে এসে মেঝেতে বসে পড়ে।

'একটু জল দাও মা—জল!'

ততক্ষণে ছেলেমেয়েরাও উঠে পড়েছে। হেমই ছুটে গিয়ে জল গড়িয়ে নিয়ে এল। তরু কোল থেকে মেয়েটাকে নিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি।

শ্যামা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণ আন্দাজ করতে পারে নি সে। সে ভাবছে জেদী মেয়ে তার—শ্বশুরবাড়িতে, হয়তো বা জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেই, এমন ভাবে পালিয়ে এসেছে। এই নিয়ে কত অশান্তি হতে পারে সেই ভেবেই সে আকুল।

সে প্রশ্ন করেই যাচ্ছে উপর্যুপরি।

জল খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে সেই চরম দুঃসংবাদটি দিলে ঐন্দ্রিলা।

না, কারুর সঙ্গে আসে নি সে। কাউকে বলেও আসে নি! সে সময়ও ছিল না।

হরিনাথের অসুখ করেছে। সাংঘাতিক অসুখ।

পরশু জ্বর নিয়েই ফিরল অফিস থেকে। সামান্য জ্বর। কাল অফিস যেতে বারণ করেছিল ঐন্দ্রিলা, শোনে নি। বিকেলে অফিস থেকে ওকে ধরে নিয়ে এল অন্য বাবুরা ধরাধরি করে। অজ্ঞান, অচৈতন্য। সেখানে গিয়ে নাকি কাশতে গিয়ে রক্তবমি করেছে। এক বার নয়—অনেক বার। অফিসের ডাক্তার দেখে বলেছে—যক্ষ্মাকাশ, রাজযক্ষ্মা। এখন থেকেই খুব ভাল চিকিৎসা হলে এক আনা আশা আছে বাঁচবার। নইলে—

কথা শেষ করতে পারলে না ঐন্দ্রিলা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল আবারও।

পাথর হয়ে গেছে শ্যামা। কিছুই তার মাথাতে যাচ্ছে না যেন। তার অমন স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ জামাই, কষ্টিপাথরের মত রং এবং তেমনিই কঠিন শরীর।

তার ঐ রোগ হ'ল? যক্ষ্মা! যে রোগের নাম শুনলেই লোকে শিউরে ওঠে!

'না না খেঁদি, তোর ভুল হচ্ছে!' শ্যামা বলে ওঠে।

সেইজন্যেই তো এসেছে ঐন্দ্রিলা।

কালই হাতে যা ছিল তাই দিয়ে বাবুরাম ডাক্তারকে এনেছিল সে। কাল রাত্রেই। তিনি বলে গেছেন সাহেব-ডাক্তার ডাকতে হবে। তিনিও রাজ-যক্ষ্মাই মনে করেন, কিন্তু এ রোগের এখানে চিকিৎসা করা অসাধ্য। বাইরে পাঠাতে হবে। কিন্তু তার আগে এখনই আর. এল. দত্ত অথবা কোন ভাল সাহেব-ডাক্তার আনা উচিত।

অর্থাৎ এখনই এক গোটা টাকা বার করতে হবে। বত্রিশ টাকা ফি, পাড়াগাঁয়ে এলে ডবল। তা ছাড়া গাড়িভাড়া আছে।

টাকা ঐন্দ্রিলার কাছে ওর অর্ধেকও নেই।

একে তো মাইনের সব টাকা আজও মায়ের হাতেই ধরে দেয় হরিনাথ, তার ওপর দু-এক টাকা করে যা ঐন্দ্রিলা জমিয়েছিল, মাত্র মাসখানেক আগেই ধার নিয়ে বসে আছে—হরিনাথ নিজেই। অফিসের কোন্ বন্ধুর বোনের বিয়ে হচ্ছিল না—তাকে দিয়েছে। সে নাকি মাসে মাসে শোধ দেবে কিছু কিছু করে। কিন্তু এখন?

শ্যামা তাকে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা ধার দিক, সে গয়না বেচে পরে শোধ করে যাবে। কিন্তু গয়না বেচা বা বাঁধা দেওয়া কোনটাই তো এখই হতে পারে না, অথচ এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। মাত্র পঞ্চাশটি টাকা—দেবে না, দিতে পারবে না শ্যামা?

পাথরের মধ্যেও কি এমন অনুভূতি থাকে?

একটা হিম-শৈত্য মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে কেন ওর এমনভাবে!

পঞ্চাশ টাকা!

'দোহাই মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এখনও ডাক্তার ডাকলে হয়তো বাঁচতে পারে, বাঁচবার পথ থাকে একটা।'

হ্যাঁ থাকে। কিন্তু সে সম্ভাবনা এক আনা মাত্র। মেয়ে নিজেই বলেছে একটু আগে। মেয়ে আর জামাই। না দিলে তাগাদা করা যাবে না, আদায় করা যাবে না।

'আমি, আমি কোথায় পাব মা টাকা? আজ ছ মাস তোর দাদার চাকরি নেই।' শ্যামারই মনে হয়—আর কে যেন দূর থেকে কথা কইছে। সে নয়।

ঐন্দ্রিলা চিরদিনই মুখফোঁড়।

বলে, 'টাকা তুমি জমিয়েছ মা, তা আমি খুব জানি। যে শিশিবোতল চুরি করে দাদার চাকরি গেল, সেগুলো বেচায় সব টাকাই তো তোমার হাতে আছে!'

'ছিল বৈ কি মা—ছিল। কিন্তু এই ছ মাস কি খাওয়ালুম এই রাবণের গুষ্টিকে? কী হাল হয়ে আসছে দেখছ না? হাতে পয়সা থাকলে কি এমন দশা করে রাখি ছেলেমেয়েদের?'

ঐন্দ্রিলা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে।

'পঞ্চাশটা টাকাও দিতে পারলে না মা!'

'কেন, তা তোর শাশুড়ী দিতে পারলে না? চেয়েছিলি তার কাছে? মাগীর হাতে তো যথাসর্বস্ব। এ-ই বড় ছেলে!'

'তোমরা সবাই সমান মা। কাল রাত্রে তাঁকেই তো বলতে গিয়েছিলুম। তিনি বল্লেন—এ রোগে কেউই বাঁচে না, কাউকে বাঁচতে তিনি দেখেন নি, কানেও শোনেন নি কারুর বাঁচবার কথা। ছেলে মারা গেলে সংসার তো ঠিকই থাকবে, তাঁকেই চালাতে হবে। মিছিমিছি যে বাঁচবে না তিনি জানেন, তার পেছনে যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে তিনি সর্বস্বান্ত হতে পারবেন না।' কঠিন ব্যঙ্গের সুরে কথা কটা বলে ঐন্দ্রিলা, তার চোখে আর জল নেই।

শ্যামা মাটির দিকে চেয়ে ছিল। সেই ভাবেই বললে, 'তুমি মিছিমিছিই ঠেস দিয়ে কথা বলছ মা! তোমার শাশুড়ীতে আমাতে ঢের তফাত। তার আছে সে দিচ্ছে না, আমার সত্যিই নেই। ভিখিরী আমি—কী ভাবে আমার দিন চলে তা কি আর তুমি জান না?'

ঐন্দ্রিলা তরুর কোল থেকে এক টানে মেয়েটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'সবই জানি মা, তোমাকেও জানি। তবু মন মানে নি তাই ছুটে এসেছিলুম!'

ঘরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল আবার।

'একটা উপকার করবে? এই চার গাছা চুড়ি রেখে কায়েত দিদির কাছ থেকে এনে দিতে পারবে একশোটা টাকা! দেড় ভরি ক'রে আছে এক-এক গাছা।'

'দেখি না হয় বলে। তুই একটু বোস্ না। একটু কিছু মুখে দিয়ে যা না হয়!'

'থাক। আমার এখন মুখে না দিলেও চলবে মা। মুখে দেওয়ার পব্বটাই তো শেষ হতে বসেছে। এখন এই উপকারটা করতে পার কিনা দেখ দিকি!'

সে মেয়েটাকে সেইখানেই মেঝেতে নামিয়ে রেখে চুড়িগুলো খুলতে শুরু করে।

তা হোক। তবু শ্যামা পারবে না তার সেই পাঁচশ ছিয়াশি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা ভাঙতে।

ছেলেদের উপবাস করতে দেখেও প্রাণ ধরে ভাঙতে পারে নি সে। জামাইয়ের জন্যে আজ ভাঙতে পারবে না। হরিনাথের মা ছেলেরই উপার্জন করা টাকার গাদায় বসে যদি ছেলের চিকিৎসার জন্যে সেই টাকা বার করতে না পেরে থাকে তো ওর দোষ কি।

বহু কষ্টের টাকা তার—বহু সাধনার টাকা।...

চুড়িগুলো নিয়ে মঙ্গলার কাছে গিয়ে সংবাদটা দিতে দিতে শ্যামা কেঁদে ফেলল।

সে কান্নাও তার সত্য। কিন্তু যে দুঃখ ঐ টাকা কটা সম্বন্ধে তাকে এমন কঠিন করেছে সে দুঃখ আরও সত্য। তাই কিছুতেই পারল না সে মেয়েকে চুড়ি ক-গাছা ফেরত দিতে।

আর মেয়ে তো চুড়ি বাঁধা দিতে দেরি হবে বলেই তার কাছে চাইছিল, শেষ পর্যন্ত সেই বাঁধা দিয়েই তার টাকা শোধ দেবে বলেছিল। সেই কাজটাই যখন অবিলম্বে হয়ে গেল তখন আর কী এমন অপরাধই বা তার হয়েছে।

বার বার নিজের মনের কাছেই কৈফিয়ত দেয় শ্যামা।

মঙ্গলা একশো টাকার একখানা নোট ওর হাতে আলতো ফেলে দিয়ে বললেন, 'উনি বললেন যে ছ ভরিতে একশ টাকা দেওয়া যায় না, তা ছাড়া হাতের চুড়ি ক্ষয়েও গেছে হয়তো—তা হোক্, থে দিয় এত বড় বিপদে ওসব কথা আর ভেবো না—দিয়েই দাও।'

চুড়ি ক-গাছা তখনও অবশ্য ওঁরই পেটকাপড়ে বাঁধা—গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে সিন্দুকে পুরতে হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঐন্দ্রিলা এদের কোন খবর দেয় নি। দেওয়ার ইচ্ছা বা অবসর কোনটাই ছিল না। মাসীদের অবস্থা সে জানে—মিছিমিছি ব্যস্ত ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া খবর দিতে গেলে চিঠি লিখতে হয়—চিঠি লেখার সময় কৈ তার?

কথাটা শ্যামার মুখেই শুনলে এবং একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল এরা—উমা ও কমলা। বিশ্বাস হয় না কথাটা, যেমন হয় নি শ্যামারও। বিশ্বাস হবার কথাও নয়। হরিনাথ? ঐ লোহার মত সুস্থ সবল শরীর যার!

এদের খবর দিয়ে যে বিশেষ ফল হবে না—তা শ্যামাও জানত। কিন্তু সে কথা হিসেব ক'রে সে আসে নি। চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে নি বলেই এসেছে। কথাটা কাউকে বলা দরকার। অন্তত কারুর সঙ্গে দুঃখটা ভাগ ক'রে নিতে না পাবলে সে যে পাগল হয়ে যাবে।...তাই হঠাৎ আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছে, উদ্‌ভ্রান্তের মত। ছেলেমেযে কাউকে নেয় নি সে, তাদের কথা ভাবেও নি। হেম আছে—যা হয় করবে। এই সমস্ত পথটা একটানা কোথাও না বসে একরকম ছুটে চলে এসেছে সে।

তার শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ কেশ, অপরিসীম ক্লান্ত এবং অবসন্ন দৃষ্টি—সবটা মিলিয়ে মূর্তিমান হতাশা যেন। কোনমতে এদের এখানে পৌঁছে বাইরের রকটাব ওপরই এলিয়ে পড়ল একেবারে।

কমলা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল।

'কি রে? এমন ক'রে—এই অসময়ে, একা? কী হয়েছে? ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো?'

আশঙ্কায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে কমলা।

উত্তর দিতে গিয়ে চোখের জলই বেরিয়ে আসে প্রথম।

তার পর একটু একটু করে এই সংবাদ!

অবিশ্বাস্য, শ্বাসরোধকারী সংবাদ। বলে এবং কপাল চাপড়ায় শ্যামা।

'কী পাপ ক'রে এসেছিলুম দিদি, এততেও কি তার শেষ হ'ল না!' বার বার বলে সে।

অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে কমলা শুধু বললে, 'কী বলছিস শ্যামা! তুই—তুই ভুল শুনিস নি?'

শ্যামা সজোরে একটা চাপড় মারলে কপালে।

'আমার কপাল যে দিদি। এ সবই আমার কপালের ফল। এ কপাল না হলে ভুল হ'ত হয়তো। খারাপ খবর আমার কপালে কখনও ভুল হবে না!'

এ কী শোনালে, হে ভগবান! এ কী শোনালে!

মনে মনে দুজনেই শুধু এই প্রশ্ন করে অবিরাম; যদিও মুখে কারুরই আর স্বর ফোটে না।

অনেকক্ষণ পরে উমাই প্রথম সংবিৎ ফিরে পায়।

এগিয়ে এসে শ্যামার ডান হাতখানা ধরে ফেলে বলে, 'অমন করে কপাল চাপড়াতে নেই ছোড়দি। ওতে মেয়ে-জামাইয়েরই অকল্যাণ হবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নাও, ওঠো—মুখে মাথায় একটু জল দাও দিকি—'

উমার কথাতে কমলারও যেন চৈতন্য হয়। সক্রিয় হয়ে ওঠে তার হাত-পাগুলো, আর মাথাও।

সেও উঠে পড়ে বলে, 'ঠিক কথাই তো—সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছে হয়তো, এখনও মুখে একটু জল পড়ে নি। আমার যেমন পোড়া বুদ্ধি, আগেই গেলুম ঐসব কথা পাড়তে।...তুই ওকে কলতলায় নিয়ে যা উমি, আমি ততক্ষণ একটু শরবত করি।'

হাত-পা ধুয়ে, ঘাড়ে মাথায় খানিক জল থাব্‌ড়ে দিয়ে একটু সুস্থ হ'ল শ্যামা। শরবত খেয়ে প্রশ্ন করলে, 'বৌমা কোথায়? গোবিন্দ?'

'বৌমা বাপের গেছেন। বিয়ের পর এতকাল পাঠানো হয় নি তো। এবার ওঁরা এসে নিয়ে গেলেন। আর গোবিন্দ আপিস গেছে।'

'আপিস।' প্রশ্নটা আচম্বিতে বেরিয়ে আসে—তাই সতর্ক হবার অবসর পায় না শ্যামা। তীক্ষ্ণ, আর্ত শোনায় কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে—সমস্ত দুঃখের মধ্যেও মনে পড়ে হেমের চাকরি নেই।

এরা কাকে ধরে কেমন ক'রে চাকরি পেলে? আমার হেমের হয় না?

কমলা অতটা লক্ষ্য করে না, মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'আর কি করব বোন। ওর লেখাপড়া আর হবে না। এত বয়স হয়ে গেল—বার বার বাধা পড়ছে—আর কবে পাস করত বল্। বসিয়ে খাওয়াবারও সঙ্গতি নেই, এক্ষেত্রে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করা ছাড়া উপায় কি?'

'কোথায় বেরোচ্ছে? পাচ্ছে-টাচ্ছে কিছু? কাকে ধরে ব্যবস্থা করলে দিদি? আমার হেমের একটা উপায় হয় না?'

'পোড়া কপাল। তুমিও যেমন ছোড়দি!' উমা বলে ওঠে, 'দিদি কাকে ধরবে—কাকে চেনে? গোবিন্দরই এক ইস্কুলের বন্ধু—তার বাবার বুঝি ম্যাপ ছাপার কারখানা আছে—সেইখানে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে বাবাকে বলে। এখন কিছুই পায় না, কাজ শিখছে। ছ মাস গেলে দশ টাকা জলপানি দেবে, আরও ছ মাস পরে মাইনে। এখন কোথায় কি।'

তবু ভাল! নিজের অজ্ঞাতেই কথাটা নিঃশব্দে মনের মধ্যে উচ্চারিত হয়

সে নিঃশ্বাস ফেলে একটা। স্বস্তির নিশ্বাসের মতই আরাম অনুভব করে যেন।

গোবিন্দ চাকরি করছে এবং মাইনে পাচ্ছে—দুটো খবর একসঙ্গে সহ্য করা কঠিন হ'ত বৈকি!

গোবিন্দর উপার্জন শুরু হ'লে, কমলার হাতে টাকা এলে শ্যামার লাভ ছাড়া লোকসান নেই—তবুও, সংবাদটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসটাকে চেপে ধরেছিল; এখন সেইটেই সহজে বেরিয়ে এল।

খেতে বসে প্রসঙ্গটা আবারও হরিনাথের অসুখে ফিরে এল। শ্যামা যায় নি কিন্তু হেম রোজই যায়। হরিনাথের নিজের ভাইরা কেউ সেদিক মাড়ায় না। এমন কি মা-ও না। তিনি শুধু বাইরে থেকে ঐন্দ্রিলার ভাত জল আর রুগীর পথ্যি দিয়ে যান। কী ভাগ্যি মেয়েটাকে রেখেছেন তবু। কিন্তু সেদিকে যাই হোক—চিকিৎসার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করতে রাজী নন তিনি। ছেলে গেছেই—ঘটনাটা দুঃখের হলেও, পরিতাপের হলেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যখন—তখন সেই-মতই চলতে হবে। এত বড় সংসার তাঁর, রোজগারের কেউ রইল না – আবার তিনি ঘরের যথাসর্বস্ব বার ক'রে দিয়ে কি পথে দাঁড়াবেন? যে যাবেই তার জন্যে, যারা থাকবে তাদের সর্বনাশ করবেন কেন?

'এ ধারে বড় ডাক্তার আসছে', শ্যামা বলতে থাকে, 'মড়-মড় টাকা খরচ হচ্ছে; এবেলার ওষুধ ওবেলা পাল্‌টে দিচ্ছে—অ্যাকো অ্যাকো ওষুধের দামই চার টাকা পাঁচ টাকা।…ডাক্তার বলছে এই অবস্থাতেই পাহাড়ের ওপর কি সমুদ্দুরের ধারে নিয়ে যেতে—কিন্তু সে ব্যবস্থা করবে কে? তাতেও তো এক গাদা টাকা চাই! অর্থবল লোকবল ছাড়া কি হাওয়া-বদল হয়? তা ছাড়া ঐ সাংঘাতিক রুগী, সেকেন্‌ ক্লাস ছাড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না—সেও শুনছি রিজাব করতে হবে। এ সব তো চাট্টিখানি টাকার খেলা নয়! খেঁদির গয়না সব গেছে—সোনা-রত্তি বলতে আর কোথাও কিছু নেই—এখন নাকি ওর অফিসের টাকায় হাত পড়েছে। মেয়েটার আর ইহকাল পরকাল কিছুই রইল না।'

শ্যামা বলছে—এরা শুনছে। তিন জনেরই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে কখন। হাতের ভাত কড়কড়িয়ে উঠেছে, থালায় ভাত-তরকারি অখাদ্যে পরিণত হচ্ছে—কারুরই খেয়াল নেই।

মেয়েদের এত বড় বিপদ এবং দুর্ভাগ্য আর নেই—এরা সকলেই মেয়েছেলে, সেইটে অনুভব করছে মর্মে মর্মে। তিন জনেরই দৃষ্টি সজল হয়ে উঠেছে, বুক কাঁপছে থর থর [illegible]। আহারে রুচি নেই কারুরই।

উমা প্রশ্ন করল, 'তুমি গিয়েছিলে ?'

'না। আমি যাই নি।'

'কেন ?' আশ্চর্য হয়ে যায় উমা, 'মেয়ের এত বড় বিপদ—!'

'আমি গিয়েই বা কি করব বল্। যদি কোন কাজে লাগতুম তো সে কথা আলাদা। মেয়ের এত বড় বিপদে—এক পয়সা সাহায্য করার ক্ষমতা তো নেই—শুধু শুধু জামাই-বাড়ি যাওয়া, সে ভারি লজ্জার কথা। তা ছাড়া কখনও যাই নি !'

'ক্ষমতা নেই' কথাটা বলার সময় শ্যামার গলাটা অকারণেই কেমন যেন কেঁপে যায়।…কদিন আগে ঐন্দ্রিলার কথাগুলো কি মনে পড়ে ? কে জানে !

'তা বলে মেয়ের এত বড় বিপদে—! অর্থে না পার, সামর্থ্যেও তো কিছু করতে পার !'

'তাই বা পারি কি ক'রে বল্ !' আস্তে আস্তে মাথা নিচু ক'রে বলে শ্যামা। 'দু দিন চার দিন গিয়ে থাকলে হয়তো ওর একটু আসান হ'ত কিন্তু এদিকে আমার সংসার যে অচল হয়ে যায়—হেমের চাকরি নেই, জানিসই তো—আমার উঞ্ছবৃত্তি ক'রে খাওয়া। তা ছাড়া ওর শাশুড়ী মাগীর যা মুখ, নিজে দিচ্ছে না এক পয়সাও কিন্তু শুধু-হাতে গিয়ে দাঁড়ালে একঝুড়ি কথা শোনাবে। সে ভারি অপমান !'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সকলেই।

শেষে যেন কমলাই জোর ক'রে নিজেকে সচেতন করে, 'নে—ভাত ব্যান্নন জল হয়ে এল, যা পারিস দুটো মুখে দিয়ে নে !'

কিন্তু সে ভাত আর মুখে তোলা সম্ভব নয়—কমলাও তা জানে। উমা আর চেষ্টাই করলে না। শ্যামা পাতে ভাত নষ্ট করার কথা কল্পনা করতে পারে না - তবু সেও দু-চার গ্রাস মুখে তোলবার পর চেষ্টা ছেড়ে দিলে।

একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'একটা হাঁড়ি-টাড়ি বরং দাও দিদি—ভাতগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখি - যাবার সময় নিয়ে যাব।'

শিউরে ওঠে কমলা, 'এই ডাল-মাখা—এঁটো ভাত—নিয়ে যাবি কিরে !'

'তা হোক। আমাদেরই তো এঁটো। ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে। এত ভাত নষ্ট করতে পারব না।'

॥ ২ ॥

শ্যামা বিকেলেই আবার ফিরে গেল। সব ফেলে রেখে হঠাৎ চলে এসেছে, এ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় তার - তাই কমলাও থাকতে অনুরোধ করলে না।

উমা যথারীতি পড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু দু-এক বাড়ি ঘোরার পরই সে ফিরে এল। ভাল লাগছে না তাব – অপরিসীম ক্লান্তি লাগছে যেন। তারই বেশী লেগেছে খবরটায়। ঐন্দ্রিলা তার কাছে অনেকদিন ছিল ছেলেবেলায়। বলতে গেলে তার কাছেই মানুষ। ফুটফুটে বুদ্ধিমতী মেয়ে। একটু প্রখরা হয়তো, তবে সে প্রাখর্যকে অনায়াসে দীপ্তিও বলা চলে।

মায়া বসাতে দেবে না কিছুতেই – ঐন্দ্রিলাকে যখন কাছে রাখতে রাজী হয়, বার বার এই প্রতিজ্ঞাই করেছিল উমা—তবু সে মনের মুখে পুরো লাগাম লাগাতে পেরেছিল কি?

পারে নি। মনের অনেকখানিই সেদিন দখল ক'রে নিয়েছিল ঐন্দ্রিলা।

নিঃসন্তান রমণীর সমস্ত বুভুক্ষা সেদিন তার প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল ঐ মেয়েটির মধ্যে। সকল তৃষ্ণা মেটে নি এটা সত্য কথা—কিন্তু আংশিক শান্তি হয়েছিল বৈকি!

ঐন্দ্রিলার বিবাহে তার সমস্ত অন্তরে বেদনাব টান পড়েছিল।

হয়তো নিজের মেয়ে হলে আরও আঘাত লাগে কিন্তু তাতে একটা সান্ত্বনা থাকে, তৃপ্তি থাকে। ভবিষ্যতের আশাও থাকে। উমার কাছ থেকে এই যাওয়া যে একেবারে যাওয়া। তার লেগেছিল বেশী। অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল সে।

দীর্ঘ দিনের অদর্শনে সে ব্যথায় একটা প্রলেপ পড়েছিল—আজ আবার নতুন ক'রে দগ্‌দগিয়ে উঠল ঘা-টা। ··

কিছুতেই প্রাত্যহিক কাজে মন বসাতে পারল না। ছাত্রীদের নির্বুদ্ধিতা অন্যদিন ক্লান্তিকর মনে হয়, আজ বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

ঐন্দ্রিলার এই বিপদ! এই সাংঘাতিক বিপদ!

এর চেয়ে সর্বনাশ মেয়েদের যে আর কিছুই হতে পারে না। যথাসর্বস্ব হারাতে বসেছে সে—আক্ষরিক অর্থেও যথাসর্বস্ব। চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। অথচ কীই বা বয়স তার! বলতে গেলে কৈশোরও কাটে নি, এই ঠিক প্রথম বয়স!

শুনেছে এ জগতে সৎ যে তারই ভাল হয় ; সতীত্বের বহু গৌরব, বহু বিজয়গাথা শুনেছে ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু না তার জীবনে না তাব আত্মীয়স্বজন কারুব জীবনে—কখনই সে তার কোন প্রমাণ পেলে না।

শ্যামার যত দোষই থাক্—মনে-প্রাণে-দেহে সে সতী।

আর ঐন্দ্রিলা। স্বামীকে এমন উগ্র, আবেগময়, সকল সংস্কারের অতীত ভালবাসার কথা—দেখা তো দূবে থাক শোনে নি পর্যন্ত। ঐন্দ্রিলা যদি সতী না হয় তো সতীত্বের কী অর্থ তা বোঝে না উমা। তা হলে স্বয়ং সতীকুলরাণীবও সতীত্বে সংশয় জাগা সম্ভব।

এই তো কিছু আগেই শ্যামা বলছিল, কী অতন্দ্র, অস্খলিত সেবা দিয়েই না ঐন্দ্রিল৷ ঘিরে রেখেছে স্বামীকে। গত কদিনে এক রাত্রিও সে বিশ্রাম পায় নি, ঘুম তো কল্পনাতীত। দিনরাত্রের একটি মুহূর্তও স্বামীকে ছেড়ে ওঠবার তার উপায় নেই—হয়তো তাব ইচ্ছাও নেই। হেম নাকি দু-এক বার প্রস্তাব করেছিল, সে বসছে, ঐন্দ্রিলা একটু গডিয়ে নিক—কিন্তু ঐন্দ্রিলা রাজী হয় নি। হরিনাথের কখন কি অসুবিধা হয, কখন কি প্রয়োজন হয়—তা সে ছাড়া নাকি আর কেউ বুঝবে না!

এই তো কালই নাকি—হেম যখন গিয়েছিল, তাব কিছু আগেই রক্তবমি করেছে হরিনাথ—সেই বমি দু হাতে ধরতে গিয়ে সমস্ত কাপড ভেসে গিয়েছে ঐন্দ্রিলার। সে বেরিযে এসেছে একেবারে যোগিনী হয়ে, মনে হয়েছে রক্তবস্ত্রই পরেছে সে!

হে ঈশ্বর, এ কী করলে। এ কী কবলে। কী পাপ করেছিল ঐটুকু মেয়ে তোমার কাছে। কেন ওর সুখের বাসা এমন করে ভেঙে দিচ্ছ!

বার বার পাগলের মত অস্ফুট কণ্ঠে আপনমনেই বলে উমা।

নিষ্ঠুর, নীরন্ধ্র কোন পাষাণপ্রাচীরে যেন সে প্রশ্ন বারবারই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। নির্মম কোন অন্ধ এবং বধির দেবতা তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ মেলে এই সংসারের দিকে চেয়ে আছেন, কিছুই তাঁর চোখে পড়ে না, কোন হাহাকার তাঁব কানে পৌছয় না!

উমা বাড়ি ফিরেও স্থির হয়ে বসতে পারে না।

ক্রমলাকে প্রশ্ন করে, 'দিদি কিছুই কি আমরা করতে পারব না? কোন কিছুই করবার নেই আমাদের?'…

কমলা নিঃশব্দে চোখের জল মোছে।

অথচ সময়ও যে আর নেই তা দুজনেই বোঝে। ঐন্দ্রিলার চরম সর্বনাশের মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে, অমোঘ অপ্রতিহত গতিতে। শ্যামার মুখে শোনা রোগের বিবরণেই তা বোঝা যায়। আর বড় জোর পনেরো দিন কি কুড়ি দিন—কি এক মাস।

ডাক্তার বলে গেছেন, একেই বাংলায় বলে রাজযক্ষ্মা—ইংরেজিতে গ্যালপিং থাইসিস। এ রোগ প্রকাশ পাবার পর রোগী দু মাসের বেশী নাকি বাঁচে না সাধারণত। এক মাস তো কেটেই গেছে কবে।···

অবশেষে উমা একসময় বলে ওঠে, 'দিদি আমি এক বার দেখতে যাব?'

'সে কি রে! তুই যাবি কি? কার সঙ্গে যাবি? তার মা-ই গেল না—। কে কী বলবে—'

'কী বলবে? আর বললেই বা কি? আমার আর মান অপমান কি দিদি! তা ছাড়া আমি—আমি তো হরিনাথের নিজের শাশুড়ী নই—আমার কোন অপমানই গায়ে লাগবে না।···কিন্তু এক বার না গিয়ে যে আমি থাকতে পারছি না—ভেবে গ্যাখো তো মেয়েটার অবস্থা, এই বিপদে একলা কী করছে সে, ঐটুকু এক ফোঁটা মেয়ে!··ঐ রুগী কোলে ক'রে একা বসে থাকা···এক জন আপনার লোক কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও তবু খানিকটা জোর পায়। নইলে পাগল হয়ে যাবে যে!'

'কিন্তু সে জায়গা তো তুই চিনিসও না—কি ক'রে কোথা দিয়ে যেতে হয়!'

'ইস্টিশান থেকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে চলে যাব এখন—সে আমি ঠিক খুঁজে নেব।'

'তা হলে না হয় যা এক বার খোকাকে সঙ্গে ক'রে',—কমলা অনেক ইতস্ততঃ ক'রে শেষ পর্যন্ত মত দেয়।

'না না, দিদি। একে গোবিন্দর শরীর ভাল নয়, তার ওপর ঐ সব্বনেশে রোগ। ওকে নিয়ে যাব না। পদ্মগ্রামের পথও চিনি না যে—নইলে ওখানে গিয়ে হেমকে নিতুম সঙ্গে। গোবিন্দ আমাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে আসুক বরং—আমি ঠিক চলে যাব।'

কমলা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লে, 'না উমি, তা হয় না। একলা যাওয়া তোমার কিছুতে হয় না। বিপদ আপদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—পাড়াগাঁ জায়গা, নানা কথা উঠবে, সে সব শুনতে হবে তাকেই। মাঝখান থেকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হবে মেয়েটার!'

বিমূঢ় নিরুপায় হয়ে বসে থাকে উমা।

গোবিন্দর কথা দিদি বলেছে উপায় নেই বলেই—তা উমা জানে। ঐ রোগের মধ্যে গোবিন্দকে নিয়ে যাওয়া যায় না। দিদিরও একমাত্র সন্তান।

অথচ আর তেমন লোকই বা কৈ ?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল উমা বসে বসে।

ক্রমশঃ অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে এল। কলকাতাব গলিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বহুক্ষণই। বুকচাপা ধূমমলিন দুঃসহ সন্ধ্যা। তাবই মধ্যে ঝুপ্‌সি অন্ধকাবে পাথরের মত বসে রইল উমা।

একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে—সেই প্রথম থেকেই আব্‌ছা আব্‌ছা মাথা তুলতে চাইছে বার বার, বার বাবই প্রবল বেগে সরিয়ে দিচ্ছে সে চিন্তাটাকে।

না, না, তা হয় না। তা সে করবে না। পারবেও না। সে বড অসম্মান। বড় লজ্জার কথা। ছিঃ।

অথচ ঘুরে-ফিরেই আসছে কথাটা। অস্পষ্ট তার রূপ—তবু মনের অগোচর পাপ নেই। সে আব্‌ছা ভাবনাটাকে উমা অস্বীকাব ক'রে উড়িয়েও দিতে পারে না।

॥ ৩ ॥

অবশেষে তেতলা বাড়িগুলোর কার্নিস থেকেও আকাশের শেষ রক্তরাগ মিলিয়ে এল। নিচে রাস্তায় নতুন আমদানি গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে বহুক্ষণ। তারই একটা ফালি আলো তেরছা ভাবে এসে পড়েছে ওদের ঘরের নোনাধরা দেওয়ালে—

গোবিন্দ ফিরল অফিস থেকে।

'কী হয়েছে ছোট মাসী ? এমন ভাবে বসে যে ! পড়াতে যাও নি তুমি ?'

'না রে।...বাবা, শোন একটা কথা।...তুই, ওর—মানে, এই তোর মেসোমশাইয়ের ছাপাখানা চিনিস ?'

'কার ?' যেন বিস্ময়ে দু পা পিছিয়ে যায় গোবিন্দ। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

'তোর ছোট মেসোমশাইয়ের কথা বলছিলুম।'

প্রায় ফিসফিসিয়েই বলে কথাগুলো। সমস্ত রক্ত কানে এবং মাথায় চড়ছে বলতে বলতে। কান আগুন হয়ে উঠেছে। মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

'ছোট মেসোমশাই?…অ।…হ্যাঁ চিনি। এই তো গবানহাটাব মোডটা ঘুরলেই।'

'আমাকে এক বাব নিয়ে যাবি বাবা? এখনই?'

'তু-তুমি? তুমি যাবে সেখানে? কী বলছ?' তোতলা হয়ে যায় গোবিন্দ, 'তুমি সেখানে যাবে কি?'

'হ্যাঁ বাবা, বিষম দবকাব। আমাকে নিয়ে চ।'

তবু গোবিন্দব বিশ্বাস হয না কথাটা।

'তুমি যাবে কেন—আমি ববং গিয়ে ডেকে আনি না।'

'না বে, সে সময আব নেহ।'

'চল তবে।' জুতোটা আবাব পাযে গলাতে গলাতে প্রশ্ন কবে গোবিন্দ, 'কিন্তু ব্যাপাবটা কি, কিছুই তো বুঝছি না।'

'হবিনাথেব বড্ড অসুখ, বাজযক্ষ্মা। একা মেযেটা সেই মবণাপন্ন রুগী নিয়ে বসে আছে, দেখবাব কেউ নেই। আমি এক বাব যাব। তাই—'

কমলা ওদিকে রান্নায ব্যস্ত ছিল, গোবিন্দব গলাব আওযাজ পেযে এখন ছুটে এল। উমাব প্রস্তাব শুনে সে-ও অবাক।

'তোব মাথা খাবাপ হ'ল উমি? খোকা গিয়ে শবৎ জামাইকে ডেকে আনুক না।'

'আর সময নেই। আজই বাত্তিবে আমি যেতে চাই।…আয খোকা—'

উমা কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে এসেছে সদবেব কাছে। অগত্যা গোবিন্দকেও নেমে আসতে হয।

'তাই বলে এমন ক'বে এক বস্ত্রে—টাকা-পযসা—', কমলা ব্যাকুল হয়ে বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই উমা হাঁটতে শুরু কবেছে, কথাগুলো সম্ভবত তার কানেও গেল না।

শবৎ হেঁট হয়ে নিজেব ডেস্কেব ওপর ঝুঁকে পড়ে বোধ করি কী একটা হিসেব দেখছিল, বাইবে রাস্তায জুতোর আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

গোবিন্দর আসাটাই যথেষ্ট অপ্রত্যাশিত—কিন্তু তার পেছনে ও কে!

চকিতে এক বার কর্মচারীদেব দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিস্মিত এবং বিমূঢ় মুখে উঠে বেরিয়ে এল সে।

'এ কী কাণ্ড? এমন ভাবে হঠাৎ? এসো এসো, এদিকে এসো। ট্রেজিল্‌ম্যানটা আবার হাঁ ক'রে এই দিকে চেয়ে অ

একটু এদিকে সরে এসে উমা বিনা ভূমিকাতেই কথাটা পাড়লে,—'হরিনাথের মরণাপন্ন অসুখ। খেঁদি একা, ওর বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত কেউ ঘরে ঢোকে না। ছোড়দিও যাচ্ছে না…মেয়েটা পাগল হয়ে উঠেছে একেবারে। · আমি এক বার যাব এখনই।…তুমি, তুমি আমায় নিয়ে যাবে? · অসুখটা খারাপ গোবিন্দকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

প্রস্তাবটা এমন অভাবনীয় আর আকস্মিক যে, কথাটা বুঝতেই শরতেব বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কযেক মুহূর্ত প্রতীক্ষা ক'বেই চাপা অথচ প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি, তুমি এটুকুও পাববে না?'

'দাঁডাও, দাঁড়াও। পারব না কে বলছে তোমাকে? কিন্তু এখনই কি ক'রে হয়। এই রাত্রিবেলা, অচেনা জায়গা, তুমিও যাও নি কখনো। কাল ভোবে গেলে কি হয়?'

'হরিনাথের অবস্থা যা শুনলুম, এখন তখন। এই অন্ধকাব রাত—একা মেয়েটা — যদি সত্যিই সেই অবস্থা হয়—'

কথাটা শেষ করতে পারে না উমা, কান্নায় গলা আটকে যায়।

একটু পরে আবার বলে, 'আমি একাই যেতুম। রাত বলেই তোমার কাছে এসেছি। এত রাত্রে, বিপদ-আপদের কথা ছেড়েই দাও, ওরা কী বলবে না বলবে—। একমাত্র—একমাত্র তোমাব সঙ্গেই এত রাত্রে কুটুমবাড়ি যাওয়া যায়।'

কথাটা বলে সেই অশ্রুবিকৃত মুখেও একটু হাসল উমা। অদ্ভুত, অর্থপূর্ণ, অথচ হতাশাময় এক রকমের হাসি।

সে হাসিতে মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল শরৎ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'কিন্তু অন্তত আধ ঘণ্টা তো তোমাদের দাঁড়াতেই হবে। ছাপাখানা না হয় ওরা কেউ বন্ধ করবে—চুরির ভয় আছে, কী আর করব—কিন্তু খুব জরুরী কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে, খদ্দেরের বাড়ি পুরুফ পাঠাতে হবে—বাড়িতেও একটা খবর—'

বলতে বলতেই সচেতন হয়ে থেমে যায় শরৎ।

উমা বলে, 'হ্যাঁ বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে হবে বৈকি!…বেশ, আমরা এখানেই দাঁড়াচ্ছি। তুমি সেরে নাও।'

আবার ম্লান হাসে সে।

'তুমি—তুমি বরং বাড়িতেই থাক না। আমি এখনই গিয়ে পড়ছি।'

শরৎ একটু বিব্রত ভাবে বলে।

'না, বাড়ি আর ফিরব না। এইখানেই দাঁড়াচ্ছি।'

শরৎ আর একটু ইতস্তত ক'রে মেরজাইয়ের পকেট থেকে চারটে টাকা বার ক'রে গোবিন্দের হাতে দেয়। বলে, 'জামাইয়ের অসুখ দেখতে যাচ্ছি—ফল-টল তো কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা বরং কয়েকটা বেদানা, আঙুর—আর যা ভাল বোঝ কিছু কিছু কিনে নিয়ে এসো—ততক্ষণে আমার সারা হয়ে যাবে।'

'জামাই' শব্দটা নিজেরই কানে বোধ করি আঘাত করে। আবারও রক্তাভ হয়ে ওঠে তার সুগৌর শুভ্র ললাট।

॥ ৪ ॥

গোবিন্দ ওদের হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে গেল। তার মুখে ওদের দেখা হওয়া থেকে যাওয়া পর্যন্ত সব বিবরণ শুনে কমলা দুই হাত জোড় ক'রে বার বার কপালে ঠেকাল।

'হে মা আনন্দময়ী, শরৎ জামাইকে সুমতি দাও মা। এই থেকেই যেন ওর সব পাল্টে যায়—আর যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। বুক চিরে রক্ত দেব মা তোমাকে সোনার বিল্বিপত্তর দিয়ে।'

উমার জীবনে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। স্বামীর সঙ্গে সে যে কোন দিন সত্যি-সত্যিই কোথাও যাবে বা যেতে পারবে—এ চিন্তা আজ সকাল পর্যন্ত ছিল ওর সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু তাই তো শেষ পর্যন্ত হ'ল!

শরতের মনে আর যা-ই হোক, যে ঝড়ই উঠুক—বাইরের প্রশান্তিটা বোধ করি প্রাণপণ চেষ্টাতেই সে আবার ফিরিয়ে এনেছিল। তার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে বাইরের কোন লোকের কিছু অনুমান করার উপায় ছিল না। সাধারণ ভাবেই এক স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাচ্ছে—এইটুকুই মনে হবার কথা।

উমার অবশ্য এদিকে এত সচেতনতা ছিল না—থাকবার কথাও নয়—ঐন্দ্রিলার চিন্তাই তার মনের বেশির ভাগ জুড়ে তখন—তবুও এই ঘটনার অভিনবত্ব একই সঙ্গে তার মনে একটা বেদনা ও সকরুণ কৌতুকের দোলা দিচ্ছিল বৈকি!

তবু ট্রেনের পথটা একরকমে কাটল। গাড়িতে ভিড় ছিল না বেশী, এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসলেও যত দূর সম্ভব ব্যবধান বজায় রেখেই বসতে পেরেছিল ওরা। দু জনে দু দিকে চেয়ে বসে থাকারও কোন অসুবিধা ছিল না। উমা প্রায়

সমস্তক্ষণই স্তব্ধ দৃষ্টিতে বাইবের অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে বসে রইল—আর শরৎ রইল বেশির ভাগ সময়ই চোখ বুজে আত্মচিন্তায় ডুবে।

কিন্তু বিপদ বাধল স্টেশনে নেমে।

রাত বেশী হয় নি—কিন্তু তখনই সমস্ত স্টেশনটা থমথম কবছে—মধ্য রাত্রির মতই নির্জন ও নিস্তব্ধ। বাইরে যত দূব দৃষ্টি যায় কোন লোকালযেব চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ে না—বড বড গাছ ও বাঁশঝাডে এক নিবিড নীরন্ধ্র অন্ধকার রচনা ক'রে রেখেছে।

এই অবস্থায় অজানা পথে যাওযা যায না। পথ জিজ্ঞাসা কবতে গেলেও লোক চাই।

শরৎ বিপন্ন মুখে উমাব দিকে চাইল। উমা বিমূঢ।

শেষে শরৎ এগিয়ে গিযে স্টেশন মাস্টাবেব শবণাপন্ন হ'ল।

'বলতে পারেন—আডগোডেব পথটা কোন্ দিকে পডবে, আর কী ভাবে যাওয়া যায়?'

স্টেশন মাস্টাবটি প্রবীণ। তিনি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে ওদেব দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপাবটা বোঝবাব চেষ্টা ক'বে বললেন, 'দেখুন, আমি স্থানীয় লোক নই। আডগোডে একটা জাযগা আছে শুনেছি কিন্তু ঠিক কোথা দিয়ে যাওয়া যায় তা জানি না। আব সে আপনারা বলে দিলেও যেতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন—একটা পাল্‌কি নিন, পাল্‌কি বেহারারা এখানকার বেশির ভাগ লোককেই চেনে, - ওরা ঠিক পৌছে দেবে।'

'পাল্‌কি!' শরৎ যেন আরও বিব্রত বোধ করে, 'দুটো পাল্‌কি পাওয়া যাবে তো?'

'বোধ হয় না। দিনের গাড়িগুলোর সময় দু-তিনটে থাকে তবু—রাত্রিবেলা একটাই পড়ে থাকে সাধারণত। দেখছি—'

তিনি লণ্ঠন হাতে ক'রে বেরিয়ে এলে তারই ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল—পাল্‌কি একটা পড়ে আছে বটে কাঁটা-গাছের বেড়ার ধারে—একটা বিরাট কাঠ-চাঁপা গাছের তলায়—কিন্তু একদম বেওয়ারিশ, অর্থাৎ তার বেহারাদের পাত্তা নেই। অনেক ডাকাডাকিতেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না—তখন মাস্টারমশাই এক জন চাকর পাঠালেন খোঁজ করতে।

বললেন, 'এই কাছাকাছিই থাকে। তবে বাসায় থাকে তো ভাল, আর যদি নেশাভাঙ্ ক'রে কোথাও পড়ে থাকে তা হলে ঐ পর্যন্ত!'

স্টেশন মাস্টারের ছোট ঘরে চেয়ার নেই, টুলের সংখ্যাও প্রয়োজনাতিরিক্ত

নয়। তবু তিনি একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'মেয়েদের একটা ওয়েটিং রুম তৈরীর কথা হচ্ছে—তা কবে হবে জানি না। ওঁকে বরং এই টুলটা বাইরেই বার ক'রে দিই—একটু বসতে বলুন—।'

শরৎ প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে, 'না না—দরকার নেই। আমরা বাইরে ততক্ষণ একটু পায়চারি করি।'

উমা সব কথাই শুনেছিল স্টেশন মাস্টারের সামনে কিছু বলতে পারে নি, এখন শরৎ বাইরে আসতেই নিচু গলায় কেমন এক রকম সংকোচের সুরে বললে, 'একটা পাল্‌কিতে কী ক'রে—মানে পাল্‌কিতে না চড়ে ওদের কিছু পয়সা দিলে আলো ধরে পৌঁছে দেয় না?'

শরৎ কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'কিন্তু সেটা বড় খাবাপ দেখাবে। স্বামী-স্ত্রী এক পাল্‌কিতেই চড়ে থাকে সাধারণত। মাস্টারবাবু আবার কী ভাববেন হয়তো! তা ছাড়া দেরিও হয়ে যাবে অনেক। রাস্তা ভাল নয়, খালি পা তোমার, হোঁচট খাবে—কী করবে! লতা-টতার ভয়ও তো আছে!'

অর্থাৎ সাপখোপ। রাত্রে নাম করতে নেই।

উমা আর কথা কইলে না।

অনেকক্ষণ পরে স্টেশনের চাকরটি ফিরে এল। বেহারাদের পাওয়া গেছে। মূল্যবান কোন নেশা করে নি—একটু ভাঙ্ খেয়েছে বোধ হয়—তা তাতে কাজ আটকাবে না।

সংবাদটা ফিসফিস ক'রে জানাল পোর্টার নগেন, আরও জানাল যে এত রাত বলে ওরা ডবল ভাড়া চাইছে, তবে সে অনেক বলে-কয়ে বারো আনাতে রাজী করেছে।

অগত্যা। শরৎ বললে, 'পাল্‌কি এই ফাঁকায় আনতে বল—আর দেশলাই জ্বেলে দ্যাখো—তাঁরা কেউ আছেন কিনা।'

উমা চুপি চুপি বললে, 'ভাঙ্ খেয়েছে বলছে—খানা-ডোবা কি পগারে ফেলে দেবে না তো?'

শরৎ একটু হেসে উত্তর দিলে, 'আমাদের বরাত। তবে নেশা করা ওদের অভ্যাস আছে, মনে তো হয় কিছু হবে না!'

সংকীর্ণ-পরিসর পাল্‌কির মধ্যে দু জনকে মুখোমুখি বসতে হ'ল। হাঁটুর সঙ্গে হাটু ঠেকাই শুধু নয়—এক জনের হাঁটুর ওপর আর এক জনের হাঁটু এসে পড়ল।

এই প্রথম দীর্ঘক্ষণ ধরে এত ঘনিষ্ঠভাবে স্বামীকে ছুঁয়ে থাকার সুযোগ ঘটল উমার। মন যথেষ্ট ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন থাকলেও ঘটনাটার অভিনবত্ব

কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল ক'রে তুলল বৈকি !

দু দিকের দরজা যতটা সম্ভব খোলা। তারই মধ্য দিয়ে প্রাণপণে মুখ বার ক'রে রইল উমা। শরৎ ঠিক অতট না হলেও, আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরেই চেয়ে বইল।

স্বামী-স্ত্রী। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন পাল্‌কির সংকীর্ণ পরিবেশে ঘনিষ্ঠ হয়েই বসে ওরা। দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ দু জনে শুনছে, হাঁটু দুটোর যেখানটা ছুঁয়ে আছে পরস্পবের—সেখানকার শিরাগুলো দু জনেরই দপ্‌দপ্‌ করছে। অপবের সম্পূর্ণ অনুভূতিগোচর সেটা। হয়তো কান পেতে থাকলে স্ত্রীর বুকে শোণিত-তবঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠার শব্দও স্বামীর কানে যেত। তবু দু জনেই নির্বাক এবং যত দূর সম্ভব বাহ্যত নিস্পন্দ।

অন্ধকার রাত। সরু, পায়ে-চলা-পথের মত অপরিসর রাস্তা—তার দু ধারে নিবিড় বাঁশবন ও বড় বড় বিভিন্ন গাছে জড়াজড়ি। নিবেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ দেখা যায় না—জন-বসতির চিহ্ন চোখে পড়ে না—শুধু সেই একাকার অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি ঘুবে বেড়াতে থাকে—ওপরে নিচে, চার পাশে। যেন চারিদিকে ঘূর্ণমান নক্ষত্ররাশির মধ্যে অন্ধকার মহাশূন্যে চলেছে ওরা। বাইবে পাল্‌কি-বেহারাদের নিঃশ্বাসেব শব্দ না থাকলে—সবটা অপার্থিব ও অবাস্তব বোধ হবাব কথা।

এক বার মাত্র ফিসফিস কবে প্রশ্ন করল শবৎ, 'ভয় করছে ?'

উমা কোনমতে উত্তব দিল, 'না।'

নিজেদের কাছেই ওদের গলা অপরিচিত মনে হ'ল। কেমন যেন বিকৃত রুদ্ধ স্বর। অতিকষ্টে স্বর ফুটল দু জনেরই।...

উমা যেন একটু বিস্মিত হয় নিজের অবস্থায়। কৈশোর কেটে গেছে কবে—যৌবনও। সন্তান হয় নি বলেই হয়তো—এখনও দেহের বাঁধন আছে, মধ্যবয়সী দেখায় না। প্রথম বয়সের মাদকতাও নেই, চাপল্যও নেই। সে সব কোন্‌ অতীতের কথা। অনুভূতি আবেগ—এগুলোও তো আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, তবে বুকের রক্তে অকারণে এ কিসের তরঙ্গ জেগেছে, সমস্ত স্নায়ুতে এ কিসের কাঁপন ? কেন স্বর বেরোয় না কণ্ঠে, কেন রাজ্যের সংকোচ গলা চেপে ধরে ?

সে কি পাগল হয়ে গেল ?

না, না, না। এ তাদের প্রণয়-অভিযান নয়।

এসব কিছুই নয়। নিতান্তই দায়ে-পড়ে প্রয়োজনের গরজে সে স্বামীর কয়েক ঘণ্টার সাহচর্য প্রার্থনা করেছিল এবং স্বামীও, একান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিতান্ত এড়াতে না পেরে, সেটুকু দিতে রাজী হয়েছেন। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে যেন ভুল না বোঝে।

বার বার মনকে চোখ রাঙায় উমা। বুড়ো বয়সের আদিখ্যেতা বলে নিজেকেই ব্যঙ্গ করে। জামাই মৃত্যুশয্যা পেতেছে, একা মেয়ে বসে আছে সেখানে—শুধু সেই কথাটাই প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করে।

অবশেষে একসময়, সে যে সহজ হয়েছে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যই, নিজে থেকে কথা বলে, 'ওরা বোধ হয় সব শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে, না? এ তো নিষুতি রাত দেখছি এখানে!'

প্রাণপণ চেষ্টায় কথাগুলো বেরোল বটে কিন্তু তবু এখনও সে কণ্ঠস্বর এমনই বিকৃত শোনাল যে—নিজের এই শোচনীয় পরাজয়ের লজ্জায় সত্যি-সত্যিই চোখে জল এসে গেল উমার—শরৎ কী জবাব দিলে, তা তার কানেও গেল না।

॥ ৫ ॥

বেহারারাই ডাকাডাকি করে জাগালে সবাইকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হরিনাথের মাও বেরিয়ে এলেন, হ্যারিকেনটা তুলে ধরে আগন্তুকদের চেনবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'কে গা এত রাত্তিরে—কৈ চিনতে তো পারছি না!'

উমা এগিয়ে এসে মাথার কাপড়টা একটু তুলে উত্তর দিলে, 'আমি আপনার বেয়ান হই দিদি।'

'বেয়ান? সে আবার কি?'

'আমি আপনার হরিনাথের ছোট মাসশাশুড়ী। এত দিন তো খবর পাই নি, আজই খবর পেয়ে ছুটে আসছি।'

হরিনাথের মা ঈষৎ কান্নার ভঙ্গী করে বললেন, 'আর কী দেখতে এলে বেয়ান, এতদিন পরে? আমার অমন সাজোয়ান সাড্ডোল ছেলের কিছুই যে নেই আর!...সে যে যেতে বসেছে। তার রক্ত যে শুষে নিয়েছে সব।'

তার পরই যেন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বললেন, 'তা সঙ্গে ইনি?'

কোথায় যেন একটু খোঁচা থাকে সে প্রশ্নে।

উমা ওপরের রকে উঠে এসে জবাব দিলে, 'উনি যে আপনার বেয়াই! এত রাত্রে মেয়েছেলে কার সঙ্গে আর আসতে পারে বলুন?'

'অ। তবে যে শুনেছিলুম—! তা বেশ বেশ। মিটে-টিটে গেছে ভাই, ঘরকন্না করছ, এইটেই আনন্দের কথা।...যার যা হক, তা পাবেই—দু দিন আগে হোক আর দু দিন পিছে হোক।'...

উমার কান-মাথা অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল যেন। সে পড়েই যেত—কোনমতে ঘরের দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল।

হয়তো হরিনাথের মা আরও কিছু বলতেন—মুখরোচক প্রসঙ্গের তৃপ্তি তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল—কিন্তু অকস্মাৎ বাধা পড়ল। ঐন্দ্রিলা ইতিমধ্যে অতি-পরিচিত গলার স্বর শুনে বিস্মিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও উমাকে চিনতে পেরে সে প্রায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল।

'মাসীমা! ছোট মাসীমা!'

তার পর একেবারে ওর পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ল, 'ওগো মাসীমা! কী দেখতে এলে মাসীমা? আমার সর্বনাশের যে আর দেরি নেই! ওগো আমি যে আর পারছি না। আমি যে পাগল হয়ে যাব।'

পাগলের মতই টিপ টিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তে লাগল সে উমার পায়ের কাছে। তার পাশে বসে পড়ে উমা কোনমতে জোর ক'রে ঐন্দ্রিলার মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিলে, কিন্তু সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না। মর্মান্তিক দুঃখের এই বুকফাটা অভিব্যক্তির সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তারও এতক্ষণকার সমস্ত হৃদয়াবেগ, সমস্ত ক্ষোভ দুঃখ অপমান বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে—চোখের জল কিছুতেই, কোনমতেই অভিমান ও মর্যাদাবোধের পাষাণপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকছে না।

ঐন্দ্রিলার মাথাটা বুকে চেপে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠতে পেরে অবশেষে সে যেন বাঁচল।

আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হ'ল না অবশ্য। শরতের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই রাত্রেই নতুন ক'রে রান্নার আয়োজন করা হ'ল। এবং ঠিক চর্ব্য-চুষ্য গোছের ব্যবস্থা না হলেও নিতান্ত নগণ্য হ'ল না। উমার গলা দিয়ে কোন আহার্য তখন নামা সম্ভব নয়-এ কথা করজোড়ে বার বার

জানিয়েও কোন ফল হ'ল না। অশোভন পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত উঠে এসে থালার সামনে বসল এবং দু-এক গ্রাস নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়ল।

তার পর শোয়ার পালা।

বেয়ান একটু যেন বিশেষ অর্থ-পূর্ণ মুচকি হেসে জানালেন যে, ওপাশের ঘরে খাটে তাদের শয্যা প্রস্তুত, উমারা এইবার শুয়ে পড়ুক। আর রাত করবার দরকার নেই।

উমা একবার অপাঙ্গে শরতের মুখের পানে তাকাল। তার প্রশান্ত ভাবলেশহীন মুখে কোন উত্তেজনা কি উদ্বেগই নেই, সে যেমন বাইরের রকে পায়চারি করছিল, তেমনই করছে—শুধু তার মুখের চুরুটটা প্রতিবারই দীর্ঘটানে অনেকখানি করে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে।

মাথা নামিয়ে উমাও সহজ কণ্ঠে বলল, 'তুমি শুয়ে পড গে যাও। আমি এ ঘরে এসেছি, এ কাপড়ে খাটে শোব না। আমি খেঁদির কাছেই থাকব রাত্রে।'

হরিনাথের মা বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'না না' বেয়ান। এই এত কাণ্ড ক'রে আসা—আবার রাত জাগা উচিত হবে না। তুমি শুয়ে পড়। আমরা তো আছিই, বৌমা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবেন স্বচ্ছন্দে।'

বিরক্তিটা এবার আর উমার কণ্ঠে চাপা রইল না। সে বললে, 'না বেয়ান --ঘুমোতে আমি আসি নি। তা ছাড়া বেশীদিন তো থাকতে পারব না, কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে। যে ক-ঘণ্টা আছি একটু মেয়ের পাশেই বসে থাকি। কিছুই করতে পারব না তা জানি, --তবু দুঃখটা এক দিন ভাগ ক'রে নিতে পারব অন্তত। আপনি বরং শুয়ে পড়ুন গে।...আপনারা তো রোজই রাত জাগছেন—একদিন একটু বিশ্রাম নিন।'

তার কণ্ঠস্বরে কী ছিল কে জানে, হরিনাথের মা যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। হয়তো বেশী ঘাঁটাতেও সাহস হ'ল না। আস্তে আস্তে বললেন, 'তবে যা ভাল হয় করো। বেয়াই মশাই আপনি শুয়ে পড়ুন বরং—আর অনর্থক রাত করবেন না।'

শরৎ হাতের চুরুটটা ফেলে দিয়ে এবার উমার মুখের দিকে তাকাল। বেশ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আমিও না হয় থাকি না তোমাদের সঙ্গেই। একটা রাত না-ই ঘুমলুম!'

এইটুকু সহানুভূতিতেই কি উমার গলা এত অবাধ্য হয়ে ওঠে? শরৎকে এই মুহূর্তে ঈর্ষাই করে সে। কেমন অনায়াসে সহজ ও স্বাভাবিক হয় ও--

উমা পারে না কেন?···প্রাণপণে গলার কাঁপন চেপে সে বলে, 'না না। অনর্থক তোমাকে আর রাত জাগতে হবে না। দরকারও তো নেই।··· আবার কাল সকালেই তো তোমাকে কাজে বেরোতে হবে। তা ছাড়া ঐ রোগের মধ্যে যাওয়া! পুরুষ মানুষ তোমরা তোমাদের ওপর বহুলোকের ভাত-ভিক্ষে নির্ভর করছে।'

দশম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হরিনাথের মৃত্যুর পর ঐন্দ্রিলাকে মা'র কাছেই এসে উঠতে হ'ল। একেবারে শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়েই চলে এল সে বলতে গেলে।

তার কারণ ওখানে আর থাকবার মত অবলম্বন কিছু ছিল না ওর, আশ্রয়ও না।

হরিনাথকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐন্দ্রিলা। ডাক্তারের মতে তার যে কদিনের মেয়াদ, তার চেয়ে ঢের বেশী দিন। উমার দেখে আসার পরও প্রায় দেড় মাস বেঁচে ছিল।

কিন্তু সেজন্য মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি।

উমার কথামত সাহেব-ডাক্তারই ডেকেছিল ঐন্দ্রিলা। উমার কথামত —অর্থাৎ উমার পরামর্শে। কিন্তু পরামর্শ কথাটা নিতান্তই শোভনতার খাতিরে ব্যবহার করা চলতে পারে। ঐন্দ্রিলা আগেই মন স্থির করেছিল। উমার যখন মত চাইলে তখন উমা আর 'না' বলতে পারে নি। জানে অনর্থক, জানে যে শুধু তাতে ওর ইহকালের সম্বলটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবে—ফল কিছু হবে না। তবুও পারে নি। সে হরিনাথের মা-ও নয়, শাশুড়ীও নয়। টাকার ব্যবহারিক মূল্য তার অত জানা নেই। তার কাছে মেয়ের অন্তরের কথাটাই বড়। জামাই যদি দুটো দিনও বেশী বাঁচে, মেয়ের কাছে সেইটেই লাভ। সেই জন্যই তাকে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশটার দিকে চোখ বুজে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলতে হয়েছিল, 'ডাকতে হয় তো এখনই ডাক, দেরি ক'রে লাভ নেই।'

কিন্তু সে একরাশ টাকার দরকার।

অত টাকা ঐন্দ্রিলার কল্পনারও বাইরে। তার গহনা প্রায় সবই চলে গেছে। অফিস থেকে যতটা পাওয়া সম্ভব, তা পেয়েছিল - সে-ও সব শেষ।

'টাকা? টাকা কোথা থেকে আসবে?'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল হরিনাথ।

'সব তো শেষ করলে। কেন এ কাজ করছ!' আবারও বলেছিল সে।

'তুমি চুপ কর।...আমার ভাবনা আমিই ভাবব। তোমার অত সব তাইতে কথা কেন বল তো!'

এই বলে সে জোর ক'রে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে রেখে চলে এসেছিল।

এসেছিল সটান শাশুড়ীর কাছে।

কলকাতায় মাসী আর দিদিমার কাছ থেকে অনেক কথাই শুনেছে সে, অনেক কথা শিখেছে। মোটামুটি ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে বিষয়-সম্পত্তির মোটা কথাগুলো জানে।

শাশুড়ীর কাছে এসে বলেছিল, 'মা, এ বিষয়ে ওঁরও তো ভাগ আছে। সেই ভাগটা বিক্রি করব। আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'ইস্! ভারি তো বিষয়! এখানে পাড়াগাঁয়ে এসব সম্পত্তির দাম কি!'

'যত দামই হোক, কিছুও তো হবে। এখন তাই লাভ। সাহেব-ডাক্তার ডাকতে হবে, একশ টাকা এখুনি চাই।'

'এখনই চাই বললেই তো হবে না। আমরা তো তোমার খাস তালুকের প্রজা নই বাছা যে হুকুমমত চলব! বিষয় এখনও ভাগ হয় নি। এখনও আমার নাবালক ছেলে আছে। বিষয় আমি ভাগ করতে দেব না। বেচবি কাকে?...রাক্কুসী! আমার সব্বস্ব খেয়েও রাক্কুসীর পেট ভরে নি--নাবালক ছেলেগুলোর মুখের দুটো ভাতও খেয়ে নেবার মতলব!'

ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল ওর শাশুড়ীর মুখ।

কিন্তু তাতেও ঐন্দ্রিলা ভয় পায় নি। ভয় পাবার উপায় ছিল না ওর। হরিনাথের জন্যে সাহেব-ডাক্তার চাই। আনতেই হবে ওকে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিয়েছিল, 'শুনেছি ভাগ না করা বিষয়ও কেনবার লোক আছে। সস্তায় কেনে তারা, মামলা-মকদ্দমা ক'রে নেয়। আমি তা হলে তাদেরই সন্ধান করি। কায়েত দাদুর কাছে গেলেই খোঁজ পাব।'

বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন শাশুড়ী। অকথ্য কদর্য ভাষায় গালি-গালাজও করেছিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলা অপেক্ষা করে নি, তর তর করে নেমে এসেছিল দালান পেরিয়ে রক থেকে উঠোনে। কিন্তু তাকে কোথাও যেতে হয় নি শেষ পর্যন্ত। মেজ দেওর শিবু এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

'আহা-হা, একটু থামো না। ছেলেমানুষি কর কেন! কত টাকার দরকার এখন তোমার? আমি মা'র কাছ থেকে আদায় ক'রে দিচ্ছি।...দাদাকে দিয়ে একটা রসিদ সই করাতে পারবে তো? এখনও নাবালকের সম্পত্তি—দস্তুরমত সইসাবুদ সব রাখতে হবে। এর পর যদি ফট্‌কে-মান্‌কে বড় হয়ে নালিশ দেয়!'

ফটিক আর মানিক—হরিনাথের দুই ছোট ভাই।

কিন্তু ঐন্দ্রিলার সে সব কোনদিকে কান ছিল না। কী রসিদ—রসিদ না দলিল তাও দেখে নি সে। হরিনাথেরও দেখার মত অবস্থা ছিল না। ঐন্দ্রিলা সই করাচ্ছে -তাই যথেষ্ট। এর ভেতর অফিসের টাকা আনাতে কয়েক বারই এমন সই করতে হয়েছে তাকে। এবারেও তাই মনে করেছিল সে। ঐন্দ্রিলাও সই করেছিল—সাক্ষী হিসেবে। কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে তখন কোনমতে টাকাটা নিয়ে সে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

সাহেব ডাক্তার তিন দিন এসেছিলেন। ডবল ফি আর গাড়ি-ভাড়া। এ ছাড়া দামী ওষুধ আছে। সাহেবের দোকান থেকেই ওষুধ আনবার ফরমাশ হয়েছিল। তাতেও কম খরচ হবার কথা নয়। তবু হেম প্রত্যহ হেঁটে গিয়ে ওষুধ কিনে আনত, ডাক্তারের কাছে খবর দিত।

এমনি তিন-চারখানা দলিলে সই করতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে।

হেমও জানত না। জানলেও তা রদ করবার উপায় ছিল না।

হরিনাথ ডাক্তারের হিসেব এবং অনুমান অতিক্রম করলেও সত্যি সত্যিই এমন কিছু বেশী দিন বাঁচে নি। বাঁচলে হয়তো তার জীবদ্দশাতেই সাংঘাতিক খবরটা পেতে হ'ত তাকে।...ঐ চরম আঘাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন ভগবান তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে।

প্রথম শোকের দুঃসহ আঘাতে, এবং হয়তো এতদিনের অমানুষিক ক্লান্তি-হীন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার প্রথম স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় ঐন্দ্রিলা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। সে মূর্ছা তিন দিন ভাঙে নি। কারা নিয়ে গেছে হরিনাথকে, কখন নিয়ে গেছে, কে তার মুখাগ্নি করেছে—কিছুই টের পায় নি।

ওর শাশুড়ীরও শোক লাগে নি তা নয়—তবু তার মধ্যেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ঢং! আদিখ্যেতা! বলে মা'র চেয়ে বেথিনী তারে বলি ডান। ...গেল আমারই পেটের ছেলে গেল! আমার চেয়ে তো আর ওর বেশী নয়?

কদিনের দেখাশুনো তোদের!···আমি যদি এখনও খাড়া থাকি—ওরই এত শোক যে একেবারে মুচ্ছো গেল। শহরে ছিল, নবেল-পড়া মাসীর কাছ থেকে কন্না সব রকম শিখে এসেছে।'

সুখের বিষয় এ কথাগুলো ঐন্দ্রিলার কানে যায় নি।

কিন্তু প্রথম জ্ঞান হবার পরই কানে যা গেল, তাও কম নয়।

শুনলে যে এ বাড়িতে, শ্বশুরের সম্পত্তির কোন কণামাত্রেও তার কোন অধিকার নেই। হরিনাথের যা ভাগ তা সে বেঁচে থাকতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ভায়েদের কাছে বিক্রি ক'রে গেছে।···সাক্ষী আছে তার বৌ। সুতরাং এখানে আর কোন আশ্রয়ের আশা যেন ঐন্দ্রিলা না করে। এই অশৌচের কটা দিন অবশ্য তাঁরা আর কিছু বলবেন না। কিন্তু তার পর যেন মানে মানে সে পথ দেখে। বাপের বাড়ি কি মাসীর কাছে—যেখানে খুশি!

'ঢের সয়েছি, ঢের সহ্যি করেছি। আর নয়। রাক্কুসী ডাইনী মড় মড় করে আমার স্বামীপুত্তুর চিবিয়ে খেয়েছে—আরও কিছুদিন থাকলে এ বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। সবাইকে খাবে।···শিবেটা তো এক নম্বরের আহাম্মুক, বলে—হাজার হোক দাদার বউ, দাদার মেয়ে—থাক না!··· আমাদের সংসারে তো কত রবাহুত অনাহুত খেয়ে যাচ্ছে পেত্যহ! সে আমিও জানি। না হয় বুঝতুম ঝি রেখেছি। ঝিয়ের মত থাকত, খাটত, খেত। বলি কত ফেলা-ছড়াও তো যায়! কিন্তু একে রাখব কি ক'রে? নিঃশেষে রক্ত চুষে খাবে। শিবেকে তাই বললুম, খবরদার অমন ভুল করিস নি। কত্তা ওই চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে নিজের সব্বনাশ আমার সব্বনাশ করে গেলেন। তুই আর ভুলিস নি! ওদিকে চাইবি না পজ্জন্ত—যদি বাঁচতে চাস। ওকে রাখব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওকে বিদেয় ক'রে তবে আর কাজ। কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করব।'

এ কথাগুলো শুধু ঐন্দ্রিলা শোনে নি, হেমও শুনেছিল। অপমান, দুঃসহ ক্রোধে তার মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছিল, কপালের শিরাগুলো উঠেছিল ফুলে। মাথার মধ্যে রক্ত-সঞ্চরণের এমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছিল যে নিজের কথাগুলোই শোনা কষ্টকর।

তবু সে প্রাণপণেই নিজেকে সংবরণ করেছিল। ওদের জবাব দেয় নি, ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বোনকে বলেছিল, 'তুই এখনই চ খেঁদি। যদি আমাদেরও একবেলা জোটে তো তোরও জুটবে!'

ঐন্দ্রিলার জ্ঞান হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রচণ্ড আঘাতে ওর দেহ-মন সমস্ত যেন এক হিম অনুভূতিতে নিথর হয়ে গিয়েছিল। তার নড়বার শক্তি তো ছিলই না—কথা কইবারও না।

সে অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে একসময় স্খলিত শিথিল কণ্ঠে বলেছিল, 'তার কাজটা শেষ ক'রে যাব না? তার শেষ কাজটা? ··তাতে যদি মেয়েটার আবার কোন অকল্যাণ হয়? কী বল তুমি? যা হয় কর। আমি আর কিছু ভাবতেও পারছি না যে।'

হেম আর কথা বলতে পারে নি।

কীই বা বয়স ওর। এই বয়সেই সব চলে গেল। এখন শুধু ঐ গুঁড়োটুকুই ওর অবলম্বন। সত্যিই যদি কিছু ক্ষতি হয় তার তো চিরদিন মনে হবে হয়তো এই জন্যেই—। থাক।

শুধু অনেকক্ষণ পরে চুপি চুপি বলেছিল, 'পারবি থাকতে? এই কটা দিনও কি কাটাতে পারবি? ও মাগী সব পারে, হয়তো খুন ক'রেই ফেলবে।'

'আমি সবই পারব দাদা আমার দ্বারা হয়তো সবই সম্ভব। হয়তো সত্যিই আমি ডাইনী রাক্কুসী। আমার অসাধ্য কিছুই নেই। আমার হয়তো মরে যাওয়াই উচিত, এখানে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলুম, যদি সেখানেও দিই। আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে এই প্রথম ওর চোখে জল বেরিয়ে এল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম কান্না ওর

॥ ২ ॥

শ্রাদ্ধের পরের দিনই হেম নিয়ে এল ওকে। নিয়মভঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করলে না। বললে, 'ওর আবার নিয়মভঙ্গ কি? ও কি আর মাছ মাংস খাবে? তেল—আমাদের ওখানেই দিতে পারবে।'

শাশুড়ী শেষ-মুহূর্তে পৌত্রীর দিকে চেয়ে একবার চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন—অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেমন থাকে মেয়েটা মধ্যে মধ্যে খবর দিও। ডাইনীর মেয়ে ডাইনীই হবে···তবু হরের মেয়েটা—'

'আপনারাই খবর নেবেন মধ্যে মধ্যে—'

শুধু এইটুকু উত্তর দিয়েছিল হেম। সম্পর্ক যখন চিরকালের জন্যই উঠছে তখন মিছিমিছি শেষ মুহূর্তে কতকগুলো কটু কথা বলে আর শুনে লাভ কি!···

নিয়ে আসতেই হ'ল ঐন্দ্রিলাকে। শ্যামাকেও ঘরে তুলতে হ'ল। উপায় নেই। চিরকালই বইতে হবে, তার মেয়ে, সে আর কোথায় ফেলবে?

কিন্তু এখন এই বোঝার ওপর বোঝা দুঃসহ হয়ে উঠল।

হেম চাকরি পায় নি এখনও। লড়াই শেষ হয়ে এসেছে—তার সুতীক্ষ্ণ কামড় দরিদ্র সংসারের কণ্ঠনালী কামড়ে ধরেছে বরং বেশী ক'রে--শ্বাসরোধ হয়ে আসছে নিম্নমধ্যবিত্তদের, কিন্তু এখানে তার দরুন কাজ এমন কিছু বাড়ে নি যাতে চাকরি সহজপ্রাপ্য হয়। অভয়পদদের অফিসে ঢোকানো চলত হয়তো কিন্তু হেমের প্রাক্তন অফিসেরই এক সাহেব এ অফিসে চলে এসেছেন। তিনি ওকে বিলক্ষণ চেনেন। অভয়পদর সাহস হয় না ঢোকাতে। সার্টিফিকেট নেই কাজের—বরং কলঙ্ক বা দুর্নাম আছে। কাজ পাওয়া শক্ত বৈকি।

দু বেলা দু মুঠো ভাত, তাও যেন অসাধ্য হয়ে আসছে। শ্যামার রাত্রে ঘুম হয় না। ঐন্দ্রিলা আসার পর বহু রাত্রে উঠে এসে সে একা বসে থাকে বাইরের রকে। আরও ঘুম হয় না—মেয়েটাও ঘুমোয় না বলে। প্রায়ই সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে, আর কেউ না টের পাক মা পায়।

নরেন আসে নি বহুকাল। মেয়ের এমন হ'ল সে খবরটা পর্যন্ত পেলে না সে। এলেও হয়তো বিশেষ কিছু উপকারে লাগত না, বরং অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। তবু মনে হয়—এক-একবার অকারণেই মনে হয়-হয়তো মেয়ের এত বড় সর্বনাশ দেখলে একটু প্রকৃতিস্থ হবে সে, হয়তো টান ফিরে আসবে ছেলেমেয়েদের দিকে। কিছুও যদি আনতে পারে সে—চালটা ময়দাটাও—তা হলেও অন্ততঃ উপবাসটা বাঁচে।

ঐন্দ্রিলা আসবার পর তবু একটা উপকার হয়েছে, ওর মেয়ের দুধের জন্যে উমা তিন টাকা ক'রে দিতে রাজী হয়েছে, এক মাসের টাকা পাঠিয়েও দিয়েছে। কমলাও পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে থোক্—কিন্তু এ সবে কীই বা হয়। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ!

হেম ঘোরে টো টো ক'রে, ঘোরার কামাই নেই তার।

কাজ মেলে না। মিছিমিছি শরীরটাই নষ্ট হয়। ওর যথার্থ সোনার মত রং—যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে, এত রোগা হয়ে গিয়েছে যে খালি গায়ে দেখলে ভয় করে।

এই যখন অবস্থা—তখন হঠাৎ অভয়পদ একটা প্রস্তাব নিয়ে এল। কথা-প্রসঙ্গে বললে, 'কান্তিটার কথাটা একটু ভাবুন না। আট-ন বছর

বয়স হয়ে গেল—না ইস্কুল না পাঠশালা! এমনি ক'রেই কি চলবে? বেটা-ছেলে মানুষ, লেখাপড়া না করলে খাবে কি ক'রে? যা হয় দুটো পাতাও তো পড়তে হবে!'

শ্যামা এখনও ঘোমটার মধ্য দিয়ে কথা বলে জামাইয়ের সঙ্গে—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আজও সেই ভাবেই বললে, 'সবই তো বুঝি বাবা—এক বামুনের ঘরের গরু নিয়ে চিরকাল জ্বলেপুড়ে মলুম। আবার ছেলেকেও তাই করবাব কি আর সাধ! কিন্তু আসল কথা যে অন্যত্তর বাবা। দু বেলা খাওয়া তো ওরা ভুলেই গেছে বলতে গেলে—এক বেলা তাই সব দিন জোটে না। ফল-পাকুড় ডুমুর-সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটে। ইস্কুল-পাঠশালে পড়াচ্ছি কোথা থেকে? নিজেরা একটু নিয়ে বসা—তাই হয়ে ওঠে না!'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে অভয়পদ বললে, 'ওকে কাছছাড়া করতে রাজী আছেন?'

'তার মানে? কাছছাড়া- মানে—?' মুখ তুলে বিস্মিত উৎসুক নেত্রে তাকায় এবার, ঘোমটার মধ্য দিয়েই।

আবারও কিছুক্ষণ মৌন থেকে অভয় বলে, 'মানে এই জানাশুনোর মধ্যেই অবশ্য—ধরুন যদি কেউ নিজের বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাতে রাজী থাকে, খরচ-পত্তর সবই তার—খাওয়া-পরা কিছুর জন্যই ভাবতে হবে না!'

'সে তো ওর মহা ভাগ্য বাবা।' তবু কেমন একটু ধীরে ধীরেই বলে শ্যামা। কোথায় যেন একটা দ্বিধা ওর কণ্ঠে। কোথায় একটু সংকোচ।

'না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।' অভয়পদ প্রশ্নটা অনুমান ক'রে নিয়ে একটু হেসে জবাব দেয়, 'ভয় নেই, পুষ্যিপুত্তুর নিতে চাইবে না সে। এমনি আমি আপনাদের অবস্থার কথা বলেই তাকে রাজী করিয়েছি, তার এমন কোন আগ্রহ নেই।'

'তা হলে সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব বাবা! সত্যি-সত্যিই ভাগ্যের কথা!··· অবশ্য অবস্থা যা, পুষ্যি নিতে চাইলেই বা আপত্তি করবার জোর কৈ? ছেলেটা ভাল খেয়ে পরে বাঁচবে, মানুষ হবে—সেইটেই তো মহা লাভ!···তা এ কার বাড়ি রাখবে বলছ? এখানে না কলকাতায়?'

'কলকাতায়।'

সংক্ষেপে শুধু এই কথাটা বলে আবারও চুপ ক'রে যায় অভয়পদ। শ্যামা এবার বোঝে যে কোথাও একটা কোন কাঁটা আছে প্রস্তাবটার মধ্যে। খুব

সরল সহজ নয় ব্যাপারটা। সেও চুপ ক'রেই থাকে। শঙ্কিতও হয় না—কারণ হঠাৎ-সৌভাগ্যে সে আস্থা হারিয়েছে অনেক কালই, আজকাল আশা আর সে করে না কোন কারণেই—কারুর কোন আশ্বাসে বা কিছুতেই। এই দীর্ঘকালের অভাবে এবং দারিদ্র্যে এটা সে বেশ বুঝেছে যে সহজে কোন মানুষ কারুর উপকার করতে চায় না। যখনই কেউ কারুর উপকার করতে আসে তখন বুঝতে হবে যে তারও স্বার্থ আছে এই ব্যাপারে। বিশেষতঃ শ্যামার যা অদৃষ্ট তার কিছু মাত্র উপকারের প্রস্তাবও আসলে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। তাই মনে মনে সে হাসেই বরং—আত্মবিদ্রূপের হাসি।

অবশেষে অভয়পদই কথাটার জের টেনে বলে, 'আপনা-আপনির মধ্যেই। সজাত, আমাদের আত্মীয়, খুবই আত্মীয়। যত্ন-আত্তির অভাব হবে না। কথাটা কি জানেন, ঠিক আমাদের মানে গেরস্ত ধরনের নয়।...হয়তো, হয়তো আপনি ওর কাছে শুনে থাকবেন কিছু কিছু আমার মামাতো বোনের কথা বলছি। তার কাছে সেদিন পেড়েছিলুম কথাটা। সে রাজী আছে। আপনার যদি আপত্তি থাকে অবশ্য—'

সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে যেন কোনমতে কথাগুলো বলে ফেলে অভয়পদ।

আশাভঙ্গের কথা নয়—তবু যেন আঘাত লাগে একটা শ্যামার।

এতটা নীচে তাদের বংশে কেউ কখনও নামে নি বোধ হয়।

ভ্রষ্টা নারীর অন্নদাস। এর চেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের অধোগতি আর কি হতে পারে। প্রস্তাবটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন একটা উষ্মাও বোধ করে—অভয়পদর এই ধৃষ্টতায়। কিন্তু প্রায় তখনই সে উষ্মা তাকে দমন করতে হয়। ভিখারীর আবার সম্মানবোধ! বিশেষত নরেনের ছেলেমেয়ে—ব্রাহ্মণ-সন্তানের মর্যাদা সত্যিই কি ওরা দাবি করতে পারে?

অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে সে উত্তর দেয়, 'মহা বলে নি অবশ্য, তবে আমি কানাঘুষো কিছু শুনেছি বৈকি। আমি আর কি বলব বাবা, আমার কি আর বলবার কোন উপায় আছে? নাচারের আর বাছবিচার কি?'

শ্যামা একটু মিথ্যাই বলে। মহাশ্বেতা তাকে সবই বলে গেছে। তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকতে পারে নি। কিন্তু সে-টা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। মেয়ে সব কথা এসে বাপের বাড়িতে গল্প করে—এটা জানালে, সে-মেয়ের সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ীর ধারণাটা খারাপ হতে বাধ্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অভয় অনুমান করেছে ঠিকই—তবু অনুমানটাকে নিশ্চিত ক'রে লাভ কি?

অভয়পদ কম কথার মানুষ। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তা হলে কি ঠিক করছেন ?'

শ্যামা কথাটার ঠিক স্পষ্ট জবাব তখনই দিতে পারে না। যেন নিজেকেই বোঝায় সে, 'আজকাল আর কোন্ সংসারে কোন্ বংশে এসব দোষ নেই বল। ···ছেলে থাকবে—নিরুপায় হয়ে, তাতে এমন দোষ কি ? সে রকম বুঝলে এর পর একটা প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই চলবে। কিংবা পৈতের পর না হয় আর পাঠাব না। তদ্দিনে হেমের কি আর একটা উপায় হবে না ?···সেই কটা দিন চলুক না। তা ছাড়া কে-ই বা টের পাচ্ছে ? · বললেই হবে কলকাতায় মাসীর বাড়ি থেকে পড়ছে ! না কী বল বাবা ?'

একটু অসহায় ভাবেই শেষের প্রশ্নটা করে শ্যামা।

অভয়পদ ছাতাটা বগলে করে উঠে দাঁড়ায় একেবারে। 'তা হলে একটা দিন-টিন দেখে নিই। ওর জামা-কাপড় কি আছে ক্ষার ফুটিয়ে রাখবেন—আমিই সঙ্গে ক'রে রেখে আসব।'

সে বেরিয়ে যায় সহজ স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু শ্যামা বসে থাকে অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে।

॥ ৩ ॥

কান্তিকে নিয়ে যেদিন অভয়পদ চলে গেল, সেদিন আর শ্যামার মুখে অন্ন গেল না। শুধু ছেলের অকল্যাণ হবে বলেই একটু গুড় গালে দিয়ে জল খেয়ে নিয়েছিল ছেলে যাবার সময়। তার বড় আদরেব ছেলে কান্তি, বড় সাধ করে নাম রেখেছিল কান্তিচন্দ্র। বাপেব নিখুঁত দৈহিক গঠনের সঙ্গে মায়ের গোলাপ ফুলের মত রং নিয়ে জন্মেছে সে।

কিন্তু মাকাল ফলের মত রূপসর্বস্ব নয় তাই বলে। গুণেরও অন্ত নেই ঐটুকু ছেলের। এই বয়সেই শান্ত, ভদ্র, বিনত ও বিবেচক। সে যে কবে থেকে আবদার করা ছেড়ে দিয়েছে তা শ্যামার মনেও পড়ে না। এত ছেলেমেয়ের মধ্যে এইটিই যেন তার যথার্থ দুঃখের অংশভাগী। প্রাণপণে সাহায্য করে সব কাজে, অথচ কোন দিন মুখ ফুটে কিছু চায় না, কোন অনুযোগ করে না। লেখাপড়ায় ঝোঁক খুব—তবু সে সম্বন্ধেও একটা কথা বলে নি কখনও। শুধু দিন-রাতের কোন এক সময়—দুর্লভ অবসরের সুযোগে

সামান্য মলিন ছেঁড়া-খোঁড়া বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে—আর মাঝে মাঝে করুণ চোখে সুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে চুপ করে ব'সে থাকে।

সেই ছেলে চলে গেল ওর—অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ ও আবেষ্টনীর মধ্যে। হয়তো কেউ তাকে ডেকে খেতে দেবে না। সে যা ছেলে না খেয়ে মরে গেলেও কোন দিন চেয়ে খাবে না। মুখ ফুটে কোনদিনই কোন কথা কাউকে বলতে পারবে না। একেবারে সমস্ত আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্যুত হয়ে মন-গুমরে গুমরেই হয়তো একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে।

না- ভাল করে নি শ্যামা ওকে পাঠিয়ে। পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া নাই শিখুক—মুটেগিরি ক'রেও তো খেতে পারবে।

অভয়পদকে বলবে সে, কালই ডাকিয়ে পাঠাবে তাকে- বলবে, 'বড়ই ভুল হয়ে গেছে বাবা, তোমার সে বোন যেন কিছু মনে না করেন তুমি গিয়ে কান্তিকে ফি রয়ে নিয়ে এস।'

কিন্তু অভয়পদ যখন আসে তখন কিছুই বলা হয় না। কারণ সে আসে সম্পূর্ণ এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে। শ্যামার দিক্‌ দিশাহীন অন্ধকার জীবনে আলোকের সন্ধান নিয়ে আসে সে। যা সুদূরতম কল্পনারও অতীত—তাই যেন হঠাৎ একেবারে সামনে, হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়।

কান্তিকে কলকাতায় রতনের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেই দিনই ফিরে এখানে এল অভয়পদ। বগল থেকে ছাতাটি নামিয়ে দাওয়ায় পেতে তার ওপরই বসে হাঁক দিলে সে, 'কৈ গো ছোড়দি, জল খাওয়াও এক ঘটি।'

ছোড়দি অর্থাৎ ছোটশালী, তরুবালা। এই মেয়েটিকে খুব স্নেহ করে অভয়পদ। আদর ক'রেই ছোড়দি বলে ডাকে।

যাকে ডেকে পাঠাবার কথাই সারাদিন ধরে চিন্তা করেছে শ্যামা, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকেই হঠাৎ আসতে দেখে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে, 'তুমি —তুমি আবার এখানে এলে যে আজই? কান্তি, কান্তি কোথায়?'

'কান্তি তো কলকাতাতে।' আশ্চর্য হয়ে বলে অভয়পদ, 'সেখানে পৌঁছে রতনের জিম্মা ক'রে দিয়ে তবে এসেছি। তার ঘর তাকে দেখিয়ে দিয়েছি, ঠাকুর ভাত দিচ্ছিল, খেয়ে গেছে বলে সে খেলে না—তবু মোক্ষদা ঝি জোর ক'রে জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। সে বেশ আছে, তার জন্যে ভাববেন না। কালই তাকে ওরা ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে। এই যে একটা চিঠিও দিয়েছে—'

এক টুকরো কাগজ বার ক'রে শ্যামার সামনে ফেলে দেয় অভয়পদ। শ্যামা সাগ্রহে তুলে নিয়ে পড়ে, কান্তিরই গোটা গোটা গোল গোল হরফ, 'প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং (শ্যামাই এসব শিখিয়েছে ছেলেমেয়েদের) মা, আমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। ভাল আছি। আপনি ভাবিবেন না। সকলকে আমার প্রণাম জানাইবেন, আপনিও জানিবেন। ইতি—সেবক কান্তি।'

কিন্তু চিঠিটা ভাল ক'রে শ্যামাকে পড়বারও অবকাশ দেয় না অভয়পদ। অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আমি এসেছি অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। বাড়ি কিনবেন?'

চমকে কেঁপে ওঠে শ্যামা। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে যায়। কান্তি কি লিখেছে তা সবটা পড়াও হয় না বোধ হয়।

সে কি ভুল শুনছে?

না কি অভয়পদ ঠাট্টা করছে তাকে?

এত ধৃষ্টতা হবে তার! সে তো সেরকম ছেলে নয়! অথচ আর কীই বা হতে পারে—মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া?

অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ পরে সে উচ্চারণ করে, 'কী বললে? কী কিনব?'

'বাড়ি। আমি বাড়ির কথা বলছি। এই কাছেই—আঁতুলে একখানা পাকা বাড়ি খুব সুবিধেয় বিক্রি হচ্ছে। লোকটা দায়ে ঠেকেছে তাই অত সস্তায় বেচতে চাইছে। প্রায় তিন বিঘে জমি, তার মধ্যে বারো কাঠা আন্দাজ জলকর—পুকুরটাও বেশী দিনের কাটানো নয়—পাকা বাড়ি। একটা ঘর দালান আগাগোড়াই পাকা, আর একটা ঘরের ভিত পর্যন্ত আছে। বৈঠকখানা ঘরটা সব পাকা নয়—পাকা দেওয়াল খড়ের চাল। মেটে রান্নাঘরও একখানা আছে এ ছাড়া।... যাই হোক, আপনাদের ভাল রকমই সম্পুষ্যি হবে!'

'কত দাম?' অসম্ভব জেনেও প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় শ্যামার মুখ দিয়ে।

'দেড় হাজার টাকা চাইছে—যে রকম গরজ, বোধ হয় বার-তের শোতেও রাজী হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তা হলে আমাকে আর ওকথা বলতে এসেছ কেন বাবা? এ কি ঠাট্টা করছ? আমার অবস্থা জান না?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শ্যামার কণ্ঠস্বর। জামাইকে সমীহ ক'রে কথা বলা উচিত—এটাও তার মনে পড়ে না।

কিন্তু এ ভর্ৎসনাতে অভয়পদর মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হ'ল না। তেমনি শান্ত ভাবে কিছুক্ষণ মৌন থেকে সে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি জানি সামান্য কিছু টাকা আপনার হাতে জমেছে। ঠিক কত জমেছে বলুন তো!'

শ্যামা এতখানি নিশ্চিত অনুমানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে অস্বীকারও করবার চেষ্টা করলে না। এটুকু সে বুঝেছে যে আজ সারা পৃথিবীতে এই জামাইটির মত হিতাকাঙ্ক্ষী তার কেউ নেই। সেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ছ'শো কুড়ি টাকা। তোমার কাছে মিছে বলব না— হেমের শিশিবোতল বেচা টাকা—এই জন্যেই জমিয়েছিলুম—হাজার দুঃখেও হাত দিই নি কিন্তু সে তো অর্ধেকেরও কম বাবা!'

অভয়পদ একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে ছাতাটি তুলতে তুলতে বললে, 'তা হলে সামনের রবিবার বাড়িখানা দেখে আসবেন চলুন। যদি পছন্দ হয় তো বাকী টাকার জন্য আটকাবে না। ও টাকাটা অম্বিকের কাছ থেকে চেয়ে আমিই ধার দিতে পারব।'

শ্যামা কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে? কানে শুনেও যে বিশ্বাস হয় না। দু কানের মধ্যে যেন কত কী কোলাহল! এ কি ওর রক্তস্রোতেরই গুঞ্জন?

তবু ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলে, 'তার পর? এখানকার নিত্যসেবা ছাড়লে খাব কি? ইট কামড়ে তো পেট ভরবে না! আর দু-এক ঘর যজমান এখানে আছে—'

'বাড়ি কেনামাত্র যে এখনই এসব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে হচ্ছে তার মানে কি? তা ছাড়া ও সম্পত্তিটারও আয় আছে। উনিশটা নারকোল গাছ, গোড়া কুড়ি সুপুরি গাছ আছে। পুকুরে মাছের ডিম ফোটালেও মন্দ আয় হবে না। সে তখন পরে দেখা যাবে।'

অভয়পদ ছাতিটি বগলে চেপে চলে গেল। বোধ করি এই-ই প্রথম ওকে কিছু জলখাবার দেবার কথা শ্যামার মনে পড়ল না।

উনিশটা নারকেল গাছ!

এখানে একটা নারকেল পড়লে সরকারদের সঙ্গে কী নিদারুণ টানাটানি, প্রতিযোগিতা! কত কৌশলে সেটি চুরি ক'রে আনতে হয়। তিনটি কিংবা দুটি পয়সা মিলবে বিক্রি ক'রে, তারই জন্যে যেন প্রাণপণ!...

অত কষ্টের অর্জিত পয়সা থেকে যেন মরীয়া হয়েই একটা বার ক'রে দেয় শ্যামা—এক পয়সার বাতাসা আনায়।

খাড়া খাড়া হরির লুট দেবে সে।

খবরটা—প্রস্তাবটা আসার জন্যই। জামাই অতগুলো টাকা ধার দিতে চেয়েছে যখন—এখানে না হোক, অন্য কোথাও হবেই।

এতখানি সৌভাগ্য—তার কি হবে সত্যি-সত্যিই? মনে করতেও ভয় করে। তার যা কপাল!

আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে সারারাত জেগে বসে কাটিয়ে দেয় শ্যামা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রবিবার যখন সত্যি-সত্যিই জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ি দেখতে গেল শ্যামা, তখন তার নিজেরই অবাক লাগছিল। এই আশাতীত কল্পনাতীত ঘটনা যে তার জীবনে সত্যিই ঘটবে -এ কে ভেবেছিল! একটা আশা যে কোথাও ছিল না তা নয় কিন্তু সে সুদূর, সে আশাকে নিজের মনেও স্বীকার করতে ভয় করত, লজ্জাবোধ হ'ত। এ দিন যে তার এত তাড়াতাড়ি আসবে তা সে কখনও স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে নি বোধ হয়! যখন রওনা দিচ্ছে তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটাকে তাই অবাস্তব দিবাস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে, এমন কি এমনও এক-আধবার মনে হচ্ছে যে জামাই তাকে নিয়ে একটা তামাশা করছে না তো?

তার পর এক সময় আঁতুল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে বাজার পেরিয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডাইনে রেখে যখন সে সত্যিই সহদেব দাসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন তার দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। বাড়িটার দিকে ভাল ক'রে তাকাতে শুধু যে সাহস হচ্ছে না তাই নয় শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে।

কত দিনের কত লাঞ্ছনা, কত হতাশ্বাস, কত দুর্ভাগ্য মনে ও মাথায় ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী পর পর আশাভঙ্গের ইতিহাস ও বেদনা। বিশেষ ক'রে গত এই দুটো বছরের শ্বাসরোধকারী দুর্ভাগ্যের মিছিল। চারিদিক থেকে চেপে ধরেছে তাকে—একটার পর একটা।

এর মধ্যে বাড়ি! তার নিজস্ব বাড়ি! পরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না আর!

কিন্তু বাড়ি তো তাদের ছিল। পাকা বাড়ি। বাগান জমি, পুকুর সব দেখেই তো তার মা তাকে দিয়েছিলেন। ভোজবাজির মত চকিতে সব উড়ে চলে গেল কোথায়, নিঃশ্বাস ফেলতেও তর্ সইল না যেন। আবারও যদি তেমনি যায়!

বাড়িটা ভাল ক'রে দেখবার আগেই প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আবার যদি সব বেচে খায় ঐ হতভাগাটা?—'

'হতভাগা—?' ঈষৎ বিমূঢ় ভাবেই তাকায় অভয়পদ, তার পরই তার

ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'ও আপনি ওঁর কথা—মানে বাবার কথা বলছেন? না তা পারবে কেন? বাড়ি তো আপনার নামে কেনা হবে!'

শ্যামাকে অনায়াসে 'মা' বলে ডাকলেও নরেনকে 'বাবা' বলতে আজও সংকোচ বোধ হয় অভয়পদর– তা শ্যামা এই বিহ্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করে।

শ্যামা বলে, 'আমার নামে? বাড়ি আমার নামে কেনা হবে? মেয়েছেলের নামে বাড়ি কেনা যায়?...নয় তো না হয় হেমের নামেও কিনলে হয়, ও তো এখন সাবালক!'

'না না', দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানায় অভয় 'বাড়ি আপনার নামেই কিনুন। ছেলের নামে কেনার অনেক ঝুঁকি। বিয়ের পর ছেলে কেমন দাঁড়াবে কে বলতে পারে?...মন না মতি!...তখন যদি অন্য ভাইদের ফাঁকি দেয়? যদি একন আপনাকেই তাড়িয়ে দেয়? আপনার নামে বাড়ি থাকলে ছেলেরা চিরদিন আপনার দাপে থাকবে।'

তা হলে আমার নামেই কেনা হবে বলছ? অবশ্য যদি কেনা হয় শেষ অবধি!'

কেমন একটা ছেলেমানুষের মতই উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে শ্যামা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আপনি বাড়িটা দেখুন ভাল ক'রে।'

অভয় যেন মৃদু ধমক দেয় একটা।

শ্যামা আঁচল দিয়ে রোখ রগড়ে দৃষ্টিটাকে পরিষ্কার ক'রে নেয়।

তা বাড়িটা অবশ্য ভালই। অভয়পদ যা বর্ণনা দিয়েছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, বরং আরও বেশী ভাল। ঘরটা বেশ বড়, সরকারদের যে ঘরে তারা কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে—তার চেয়েও বড়। তার সঙ্গে ঘেরা দরদালান, সেও তো আর একখানা ঘরই। ওপাশে এই ঘর আর দালানের মাপেই 'আদ্‌রা' করা রয়েছে, ঘর তুলতে বেশী সময় লাগবে না। বৈঠকখানা ঘরটায় গোলপাতার ছাউনি বটে—কিন্তু শোবার ঘরের চেয়েও বড়। তার সামনে আবার বাঁধানো রোয়াক। শুধু এই ঘরখানা পেলেও সে বর্তে যেত।

বাড়ি, বাগান, পুকুর সব খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে শ্যামা। নারকেল সুপারি গাছ একটি একটি করে গুনে নেয়। তিন ঝাড় কলা আছে। সহদেবের বৌ বললে, সব ভাল কালী-বৌ কলার জাত। সজনে গাছ, ডুমুর গাছ তো অগুন্তি। চালতা গাছেরও একটি চারা উঠেছে। তিনটে আম, একটা

কাঁঠাল। আম সবই দেশী - কিন্তু একটায নাকি খুব মিষ্টি ফল হয়। এ ছাডা পুকুরপাড়ে একটা আমড়া গাছ আছে—সহদেবের বৌ বলল, 'আম ফেলে আমডা খেতে হবে মাঠাকরুন, যেমন সোযাদ, তেমনি সৌগন্ধ।…কী বলব, সব শখ ক'রে গাছপালা আর্জানো মা, নিজে এক কোশ পথ হেঁটে বোনের বাড়ি থেকে ঐ আমডাব চাবা এনেছিলুম। এ কী বেচবার জিনিস? কী বলব, মিন্‌সেব পোড়া কপাল তাই -আর আমারও।'

ডাব পাডানোই ছিল, সহদেবের স্ত্রী ডুজনকে ডুটো কেটে দিলে। অন্তত আডাই ঘটি কবে জল এক একটাব। তুর্বাব লোভে শ্যামার চোখ ডুটো জ্বলতে লাগল, আগ্রহে আশঙ্কায অধীবতায মাথা ঝিমঝিম ক'বে উঠল।

বাড়ি থেকে বেবিয়ে পাডার ডু-চারজনেব সঙ্গে আলাপ পরিচয় কবে মা সিদ্ধেশ্বরীব মন্দিবে বুক চিরে রক্ত দেবার মানসিক করে যখন আবাব পদ্মগ্রামের পথ ধবলে শ্যামা, তখন তার আব, 'কেনা হবে কি-না শেষ পর্যন্ত, টাকাপয়সার ব্যবস্থা হবে কিনা'—এ প্রশ্ন করবাব সাহস নেই। হবে না— সে তো জানা কথাই, সুতবং যতক্ষণ পর্যন্ত মনের গোপন কোণে এই ক্ষীণ আশাটুকু থাকে, থাক না। মিছিমিছি এই সংশয়েব সুখটুকু নষ্ট ক'রেই বা লাভ কি?

অবশেষে কতক্ষণ রুদ্ধ-নিশ্বাস প্রতীক্ষাব পর অভয়পদই প্রশ্ন কবলে, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হ'ল তা হলে?'

'এ কথা আব কেন জিজ্ঞাসা কবছ বাবা! ঘুঁটেকুডুনীর রাজপ্রাসাদ ভাল লাগবে না এ কি হতে পারে? যে অবস্থায় আছি, তার হক্কে এ তো ইন্দ্রভুবন।'

'আশপাশে সব কী বললে?'

'ঐ যে যাকে বললে অর্জুনের বৌ—ঠিক পাশেই যে, সে বলছিল যে জমির কী সব নাকি গোলমাল আছে। পুকুরে নাকি ওদের অংশ আছে একটা। এ নিয়ে নাকি মামলা-মকদ্দমাও হতে পারে।'

'হুঁ। ওরা তো ভাংচি দেবেই। ওরা আটশো টাকা দাম দিয়ে বসে আছে যে! আর কে কি বললে?'

'নিবারণ দাস বলছিল যে বাড়ির ভিত তেমন ভাল নয়—তা ছাড়া ও ভিটেয় নাকি কী সব দোষ আছে, কারুরই সয় না।'

'নিবারণ দাসের কাছেই বাড়িটা বন্ধক আছে যে। চারশো টাকা ধার

দিয়েছে—সুদে আসলে মোটা হলে একদিন ঐ টাকাতেই বাড়িটা নিতে পারবে, এই ওর মতলব !'

'কী জানি বাবা। ও সব তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়ে কী করব !···আসল কথা এখন—'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। আসল কথাটা যেন মুখে উচ্চারণ করতেও বেধে গেল। সশঙ্কিত আগ্রহে উৎসুক হয়ে জামাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

কিন্তু অভয়পদর নির্বিকার মুখে কোন উত্তরই ফোটে না। সে যেমন উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে হাঁটছিল, তেমনিই হাঁটতে থাকে।

শ্যামাকেও অগত্যা নিঃশব্দে পথ চলতে হয়। কিন্তু আশা ও আশঙ্কার এই দ্বন্দ্ব যেন আর সয় না। পথ চলার পরিশ্রম তার কাছে নতুন নয়—কিন্তু এখন যেন পা দুটো ক্রমশ পাথর হয়ে আসে, বার বার শাড়ির আঁচলে কপাল মোছে কিন্তু পরক্ষণেই অজস্রধারে ঘাম গড়িয়ে দুই চোখ ঝাপসা ক'রে দেয়।

অবশেষে পথের ধারের একটা গাছতলায় গিয়ে সে বসেই পড়ে।

'আমি—আমি একটু বসি বাবা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি আর চলতে পারছি না।'

বিনা বাক্যে অভয়পদও একটু দূরে আর একটি গাছতলায় নিজের বিবর্ণ ছাতাটি পেতে বসে। না জানায় শাশুড়ীর এই অবস্থার জন্য কোন উদ্বেগ, না করে কোন প্রশ্ন। এমন কি অযথা দেরি হওয়ার জন্য এতটুকু অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করে না। শুধু চাদরের খুঁটে নিজের মুখটা মুছে নেয় একবার।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে, এক রকম মরীয়া হয়েই প্রশ্ন করে শ্যামা, 'তা হলে কি হবে বাবা এখন ?'

'কিসের কী হবে ?' অভয়পদ নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় শ্যামার, জামাইয়ের এই নিরাসক্তিতে। কোনমতে মনের ভাব দমন করে বলে, 'ঐ—মানে বাড়িটার ? গাছে তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নেবে না তো ?'

অভয়ের মুখে এবার কোন প্রায়-অদৃশ্য হাস্যরেখাও ফোটে না। সে তেমনি অনাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'এখনও তো ঠিক বলা যাচ্ছে না, বায়না করে একটা সার্চ করাতে হবে। উকিলকে দেখাতে হবে কাগজগুলো, যদি কোন গোলমাল সত্যিই থাকে তো নেওয়া চলবে না !'

'কিন্তু যদি গোলমাল না থাকে—'

অদ্ভুত একটা আর্তনাদ কি ফোটে শ্যামাব কণ্ঠে ?

হে মা সিদ্ধেশ্বরী, স্থানে থেকে কানে শুনো মা।

'তা হলে আব কি।'

'টাকা ?' দাঁতে ঠোঁট চেপে অসহ একটা উষ্মা দমন করে শ্যামা।

'সে হযে যাবে। পবশু ভাল দিন আছে, আপনি একষট্টিটা টাকা ঠিক কবে রাখবেন। একান্ন টাকা বাযনা—আব উকিলকে আপাতত দশটা টাকা দিয়ে রাখতে হবে। আবও লাগবে অবিশ্যি—যদি বাড়ি কেনাই সাব্যস্ত হয।'

আবও কী বলতে থাকে অভয কিন্তু শ্যামার কানে এক বর্ণও যায না তাব। যেন সহস্র মন্দিবা তার কানেব কাছে ঝন্‌ঝন্ কবে ওঠে, সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অযুত খঞ্জনীব ঝঙ্কার ওঠে—কিছু কানে পৌছয না চোখ আসে ঝাপসা হযে।

হে ঠাকুব, হে মা সিদ্ধেশ্বরী, অবশেষে কি মুখ তুলে চাইলে মা ?

সে গাছেব গুঁড়িটায ঠেস দিযে অবসন্নভাবে চোখ বোজে।

তার পর অনেকক্ষণ পবে যেন বহুদূর থেকে একটা পবিচিত কণ্ঠ ক্ষীণ অস্পষ্ট ভাবে কানে এসে পৌছয, 'এবাব তা হলে উঠুন মা, অনেক দূব যেতে হবে।'

চোখ খুলে একেবাবে উঠে দাড়ায শ্যামা।

'হ্যাঁ বাবা, চল যাচ্ছি।'

পা দুটোয আব কিছু মাত্র ভাববোধ হচ্ছে না -আশ্চযরকম ভাবে হাল্‌কা হয়ে গেছে

॥ ২ ॥

উঠোনে পা দেবাব অনেক আগে থেকেই দাপাদাপি ও চেঁচামেচির শব্দ কানে আসে। কে করছে তা আব বলে দিতে হয না কাউকেই—আব কি জন্য, সে প্রশ্ন তো নিরর্থক।

নরেন এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সারা উঠোনটায় যেন নেচে বেড়াচ্ছে সে।

ঐন্দ্রিলা এখানে নেই—দিনকতকের জন্যে মাসীর বাড়ি গেছে। তরু একা। সে ছোট ভাইটাকে নিয়ে ভয়ে ঘরের দোর দিয়ে বসে আছে, পিঁটকীর

ছেলেমেয়েগুলো আর মঙ্গলা ঠাকরুনের নিজের ছোট ছেলেমেয়েরা ওপাশের দরজায় ভিড করে এসে দাঁড়িয়েছে। কারুর চোখে কিছু ভয়, কারুর চোখে শুধুই কৌতুক।

'শেষ করে দেব, বুঝলি? গোরবেটার জাতকে এক কোপে শেষ করে দেব আজ। ঝাড়ে-বংশে শেষ। কাউকে রাখব না। ছেরাদ্দ মাখতেও একটাকে আস্ত রাখব না।'

এ সবই অতি পুরাতন, তবু যেন জামাইয়ের সামনে অপমানে মাথা কাটা যায়। তারই মধ্যে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় সে, তরুর বুদ্ধির জন্য। কে জানে, ঘরে ঢুকে নিরিবিলি থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত সেই জমানো টাকাটার সন্ধান পেত কি না।

আর তা হলে বাপ রে!—ভাবলেও সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়। অতি কষ্টে যখন সে আশা করতে শুরু করেছে সবে—দুরাশা হলেও সেই সুবৃহৎ দুরাশার মূলে এমনভাবে ঘা পড়লে হয় সে পাগল হয়ে যেত, নয়তো তাকে আত্মহত্যা করতে হত!

'কী হয়েছে কি? ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করে সে।

'এই যে মহারাণী সযাব ক'রে এলেন!···বল্ মাগী, আমার ছেলেকে কেন সেই বেশ্যে মাগীটার কাছে পাঠিয়েছিস! কেন, কেন পাঠিয়েছিস বল্ আগে?···কত বড় বংশের ছেলে সে তা তুই কি জানবি? ওর ঠাকুরদা শুদ্দুরের বাড়ি পা ধুতো না—আর তাকে তুই পাঠিয়েছিস খানকীবাড়ির ভাত খেতে!'

'তার ঠাকুরদা তো শুদ্দুর বাড়ি পা ধুতো না—কিন্তু তার সেই ঠাকুরদার ছেলে কি! বংশের পরিচয় দিতে লজ্জা করে না!'

'চোপরাও মাগী! আমি কি সে আমি বুঝব। তুই এখন বার কর ছেলেকে যেখান থেকে পাস্। নেকালো—আভি নেকালো হামারা লেড়কাকো!'

আরও এক পাক যেন নেচে নেয় সে।

'চুপ কর বলছি। ছেলে! ছেলের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না?··· ছেলেকে খাওয়াবার বেলা আমি, লেখাপড়া শেখাবার বেলা আমি—আর কত্তাত্তি করবার বেলায় উনি!'

'ফের মাগী মুখ নাড়ছিস!···মুখ ভেঙে দেব তা জান না! ডাণ্ডা মারকে

মাথায়—তবে তুমি জব্দ হবে। বল্ তুই কেন আমার ছেলেকে পাঠিয়েছিস সেখানে কী এক্তিয়ারে পাঠিয়েছিস তুই? জানিস আমি তার গার্জেন, পুলিস কেস করতে পারি তা জানিস? তোকে সুদ্ধ পুলিপোলাও খাওয়াতে পারি?'

'জানি। খুব জানি। আর মুখ নাড়তে হবে না। তোমার মুরোদ আমার আর জানতে বাকি নেই। পুলিসের ত্রিসীমানায় যাবার সাহস আছে তোমার? যাও না দেখি—কত মুরোদ।'

'বটে! আচ্ছা! মরবার পালক গজিয়েছে—বুঝেছি। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। অনেকদিন গোবেড়েন খাও নি বটে। সপুরী এক গাড় করব আজ—সব কটাকে কেটে দুখানা করে ফেলব—তবে আমি কল্পনা বাঁড়ুয্যের ছেলে। গোবরেটার জাতকে এক কোপে কেটে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তবে আমার আর কাজ।'

এতক্ষণ বোধ করি সে অভয়পদকে দেখতে পায় নি। সব ঝালটাই তাই পড়ছিল শ্যামার ওপর।

হঠাৎ এইবার জামাইয়ের কাছে এসে হাত পা নেড়ে বলে ওঠে, 'এই যে কম্মকত্তা খোদও আছেন সঙ্গে। বলি নিজেদের বংশের কেলেঙ্কার নিয়ে সব বংশ না জজালে বুঝি চলছিল না বাবাজী? তোমাদের ও আদিখ্যেতা তোমাদেরই থাক—এখন আমার ছেলেকে এনে দাও। ওকে প্রাচিত্তির করিয়ে ঘরে তুলতে হবে।·· তোমাদের চামে কাটা বংশের ওতে লজ্জা-ঘেন্না হয় না—কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও ও কাজ করে নি—বুঝলে? ভিক্ষের ভাত খেয়েছি—তাই বলে বেশ্যের ভাত! চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় ওতে—'

অভয়পদ নির্বিকার। কিন্তু শ্যামা এইবার ক্ষেপে উঠল একেবারে। সামনে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বীভৎস একটা ভঙ্গী করে বললে, 'বলি থামবে—না জ্যান্ত মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব! এর চেয়ে বিধবা হলেও আমার ঢের ভাল ছিল যে।···ফের যদি একটা কথা কও তুমি তো ঐ আঁশবঁটি দিয়ে কেটে তোমাকে দুখানা করে ফেলব বলে দিচ্ছি। তাতে আমার ফাঁসি হয় সেও ভাল। তবু ধরার ভার হরণ করে তো যেতে পারব।'

এই ধমকেই যেন কাজ হয় খানিকটা। নরেনের দাপাদাপি অনেকটা কমে আসে। সে যেন একটু ভয়ে-ভয়েই দু পা পেছিয়ে গিয়ে বলে, 'হুঁ—খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে! বিধবা হলে খুব চার হাতে খাবে—নয়? খাওয়াচ্ছি তোমায়! বেশ আমি চললুম সেইখানেই—দেখি কে ঠেকায়।

নিজেই নিজের ছেলেকে নিয়ে আসব—তার জন্যে থানাপুলিস করতে হয় সেও ভাল !'

হঠাৎ যেন দুষ্ট সরস্বতী ভর করে শ্যামার রসনায়। কী বলছে তা বোঝবার আগেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'বেশ তো, যাও না। তার কাছ থেকে ঠকিয়ে টাকা এনেছ মনে নেই ? সেও দারোয়ানদের বলে রেখেছে—দেখলে সে-ই তোমাকে পুলিসে দেবে !'

অকস্মাৎ জোঁকের মুখে নুন পড়ল। নরেন সত্যিসত্যিই কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে কেমন একরকম আলগা ভাবে বললে, 'কে, কে বলেছে এ কথা, সেই মাগী বলেছে ? তার চোদ্দ পুরুষের পুণ্যি যে বামুনে তার টাকা ছুঁয়েছে। ভারি তো কটা টাকা—তার জন্যে—হুঁ !'

তার পরই, সম্ভবত এতক্ষণের দাপাদাপির ফলস্বরূপই, অবসন্ন ভাবে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে বলে, দে, একটু তামাক দে দিকি।'

কথাটা যখন বলে ফেলেছিল শ্যামা, তখন সে সুদূর কল্পনাতেও এ কথা ভাবে নি যে নরেন কোনদিন সত্যি-সত্যিই মেয়ের ননদের বাড়ি গিয়ে—বিশেষত সমাজের বাইরের, অপাংক্তেয় সেই মেয়েটার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে পারে। ঠিকানাই তো জানার কথা নয় তার। কিন্তু আন্দাজী ঢিল এইভাবে অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌছতে অপমানে ও ক্ষোভে যেন দিশাহারা হয়ে গেল সে…এমন কি অভয়ের সেই পাথরের মত মুখেও একটু বিস্ময় ও উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল।

শ্যামা দ্রুত একেবারে নরেনের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বেরোও, বেরোও বলছি, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। নইলে সত্যি-সতিই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করব বলে দিলুম।…আমার মুখখানা আর কোথাও পোড়াতে বাকি রাখলে না, সেখানে পর্যন্ত! ‥ তাই তোমার বংশের আর বামুনাইয়ের এত ভড়ং, তাই এত চেঁচামেচি দাপা-দাপি ! ওকে তামাক দেবে—! ঐ তামাকের আগুন মুখে গুঁজে দেব।…কৈ, উঠলে ? বেরোও বলছি, এই দণ্ডে এখান থেকে চলে না গেলে আমি অনর্থ করব।'

নরেন একবার ভয়ে ভয়ে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কী দেখলে সেখানে কে জানে—কিন্তু তার পর একটা কথাও কইতে সাহস করলে না—এতটুকু স্পর্ধার সুর আর তার কণ্ঠে ফুটল না। কেমন যেন হতচকিত বিহ্বল

ভাবেই আস্তে আস্তে উঠে পা পা করে বেবিযে গেল সে। গামছায় পুঁটুলি বেঁধে কোথা থেকে কী এনে দাওযাবই এক কোণে রেখেছিল—যাবাব সময় সেটার কথাও তার মনে রইল না।

উঠোন পেরিয়ে বাগানে পড়ে সেই প্রাযান্ধকাব অপরাহ্ণেব আলোতে এক-সময় দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সে।

এই প্রথম নবেনের সম্পূর্ণ পবাজয ঘটল তাব বহুদিনেব উৎপীডিত অত্যাচাবিত স্ত্রীব কাছে।…

মঙ্গলা ঠাকরুন ছেলেমেয়েগুলোকে সবিয়ে এবাব সামনে এলেন, 'সত্যিসত্যিই এই অবেলায় ভাতাবটাকে তাডিয়ে দিলি বামনী। হাজার হোক বামুনের ছেলে, সোযামী।'

কথাটা বোধ হয শ্যামারও মনেব কোণে ইতিমধ্যেই কোথায় খচ্ খচ্ করতে শুরু করেছিল, সে নিজের কপালে জোবে জোবে দুটো ঘা মেবে কান্নায় ভেঙে পড়ল একেবাবে, 'আর যে আমাব সহ্য হয় না মা, আর কত সহ্য করি! আমাব যে মরণও হয না। যমে নিলেও যে রেহাই পেতুম। আমাকে বিষ এনে দাও মা এক ডেলা, তাই খেয়ে ছুটি নিই।'

মঙ্গলা তাকে আর কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না কবে পাশ কাটিযে এগিয়ে এসে তরুকে ডেকে বললেন, 'ওলো তরী দোর খোল্ না, জামাই দাঁডিয়ে রয়েছেন সেই থেকে - দেখতে পাচ্ছিস না?… এসো বাবা এসো—এ কেলেঙ্কার তো নিত্য এদের। তুমি ঘরে এসে বসো, ঠাণ্ডা হও। একটু জল-টল খাও।'

॥ ৩ ॥

নরেনকে তাডিয়ে দিলেও তাব কথাগুলোকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না শ্যামা। কানের মধ্যে কেবলই যেন ঘুরে ফিবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ক্রমশ তিরস্কারের মতই শোনায় সে প্রতিধ্বনিগুলো। এর মধ্যে মঙ্গলারাও রসান দেন। ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলে অর্থাৎ অভয়পদ জলযোগের পর বিদায় নিলে আবার এসে জাঁকিয়ে বসেন মা ও মেয়ে। দুটো একটা একথা সেকথার পর পানের পিচ্ ফেলে আর একটু চুন এবং দোক্তা সেই অন্ধকার মুখবিবরে ফেলে, দিয়ে বলেন, 'তা যাই বলিস বাছা বামনী, লোকটা

পাগলই হোক আর ছাগলই হোক—কথাগুলো যে খুব অনেয্য বলেছে, তা বলে নি। হাজার হোক পুরুত-বামুনের ছেলে, গুরুবংশ—তাকে কি উচিত ঐ সব জায়গায় পাঠানো? যা জানলুম বাপ রে গা ঘিটঘিটে উঠে। তোর [illegible]

বলে কিনা আমার মেয়ের ননদের বাড়ি পাঠিয়েছি। ছি ছি, খুব বুদ্ধি বাপু—বলতেই হবে।'

লজ্জায় মাথা কাটা যায় শ্যামার। একটু আশঙ্কাও হয়। কে জানে এ কিসের ভূমিকা? মা-মেয়েতে দল বেঁধে এল কেন? কী বলতে চায়?

আর একবার পিচ্ ফেলে বলেন মঙ্গলা, 'না – সে না হয় হ'ল। ননদের কথাটা সত্যিও হতে পারে। বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়েরা কি আর বেরিয়ে যায় না, এমন তো আক্‌ছার।...তবে সম্পর্ক যাই হোক্—একবার যে নষ্ট হয়েছে—তার সঙ্গে আর সম্পর্কই বা কি, আর তার জাতই বা কি।.. না বাপু, কাজটা ভাল করিস নি বামনী! যা হয় দু মুঠো তো তোদের জুটছিল। মিছিমিছি নষ্ট মেয়েমানুষের অন্নদাস করে দেওয়া—কথায় বলে অন্নপাপ মহাপাপ!'

না না, মা—সে তো বামুনের রান্না ভাতই খায়। বামুনে রাঁধে যে!'

'ওলো তা জানি। পরকে যে বসিয়ে খাওয়াতে পারে—এত পয়সা সে [illegible]

তোদের দিয়ে পুজো-আচ্চা করাত? এখন সে সব আর নেই—সমাজও নেই, শাসনও নেই—তাই!'

কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু কথাটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝে শ্যামার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল সে। একে তো হেমের চাকরি নেই—তার ওপর যদি এই নিত্যসেবার বাঁধা বরাদ্দটুকু ঘুচে যায়, তা হলে তো শুকিয়ে মরতে হবে! ...এই যে এখন—মনে মনে সেই কথাটাই খচখচ করছে সেই থেকে—বাড়ি কেনা হলেও সেখানে গিয়ে হয়তো বাস করতে পারবে না, সে তো এই নিত্য-সেবাটুকুর জন্যেই। এ ছাড়াও এখানে যা দু-চার ঘর যজমান আছে, সরকাররা ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে তারাও হেমকে দিয়ে পুজো করাবে কি না সন্দেহ। এক

কথায় দাঁড়িয়ে সর্বনাশ! নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়া মানে নতুন গাঁ—নতুন পাড়া। যজমানি জুটবে কি না—জুটলেও কতদিনে জুটবে তার ঠিক কি? সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের ভরসায় নিশ্চিতকে ছাড়া—না, সে সম্ভব নয়। হেমের যদি একটা দশ-বারো টাকার চাকরিও জুটত তা হলেও সে একবার দেখত ভরসা ক'রে বেয়েছেয়ে। নতুন বাড়ির উনিশটা নারকেল গাছ আর কুড়িটা সুপুরি গাছ থেকে বাকিটা চলত।

সারা রাত ঘুমোতে পারে না শ্যামা। এক দিকে জীবনের সুদুর্লভ আশা-পূরণের সম্ভাবনা মাত্র দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিকে এ কী দুর্দৈব! একেবারে ভাত-ভিক্ষেয় টান।...বাড়ির আয়-পয়ও তো খুব দেখা যাচ্ছে! কেনবার প্রস্তাবেই এই, কিনলে না জানি কী হবে!...

পরের দিন ভোরবেলাই হেমকে দিয়ে খবর পাঠালো শ্যামা জামাই যেন ছুটির পর যত রাতই হোক একবার আসেন। হেম পৌছতে পৌছতে অবশ্য অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল, মহাশ্বেতার কাছে বলে এল সে।

মহাশ্বেতা চোখ দুটোকে যত দূর সম্ভব বিস্ফারিত করে, চুপিচুপি বলবার প্রাণপণ চেষ্টায় প্রায় সবাইকে শুনিয়েই ফিস্‌ফিস্ করে ভাইকে প্রশ্ন করলে, 'ব্যাওরাটা কি বল্ দিকি? তোদের জামাই ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, আবার রবিবার নাকি মাকে সঙ্গে নে কোথায় গেছল, অচলি ঠাকুরঝির দেওর রঘু পথে দেখতে পেয়েছে। কী হচ্ছে রে?'

ছেলেমানুষের মত উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে সে।

'ব্যাওরাটা তাকেই তো জিজ্ঞেস করলে পারিস।' একটু চুপ করে থেকে সাবধানে জবাব দিলে হেম।

'তবেই হয়েছে!' ঠোঁট উল্‌টে বলে মহা, 'সে যা মানুষ! মানুষ কি পাথর সন্দ হয় মধ্যে মধ্যে। সাতবার হয়তো একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তবে জবাব মেলে—তাও হাঁ হুঁ—একটা কথার জায়গায় দুটো কথা নয়।...জিজ্ঞেস তো করেছিলুম, বলে কি—জেনে কি হবে? তুমি তো কিছু কাজে আসবে না! যখন জানবার আপনিই জানতে পারবে।'

'ঠিকই বলেছে।' বলে হেম চলে এল।

মহাশ্বেতা খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে আপন মনেই বলে উঠল, 'মুয়ে আগুন! মুখপোড়ারা সবাই সমান!'

অভয়পদ কিন্তু রাত্রে এসে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলে।

শ্যামা সারাদিন ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারে নি উদ্বেগে।

জামাই এলে তাকে ঘরে বসিয়ে, তরুকে বাইরে পাহারায় রেখে খুবই চুপিচুপি বলেছিল কথাটা—আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে। কিন্তু অভয়পদ গায়েই মাখলে না যেন। বললে, 'এই কথা! এখনও তো কিছু বলে নি, এরই মধ্যে এত ভাবছেন কেন?'

'যদি বলে?'

'বলে তো ছেলেকে আনিয়ে নেবেন—প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই হবে। এখনও পৈতে হয় নি কি কিছু বলতে সাহস করবে না।'

'সাহস! এতে আবার সাহসের কি আছে বাছা?'

প্রিয় কথাই যে বলতে চায় না—অপ্রিয় কথা বলতে তার দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে অভয়পদ উত্তর দিলে—'সকলেরই কিছু না কিছু ঢাকবার থাকে মা। মিছিমিছি আপনার কাছে আর সে সব কেচ্ছা বলতে চাই না। তবে আমারও কিছু জানতে বাকি নেই। সরকাররা ওদিকে ঢিল মারতে এলে পাটকেল খেয়ে যাবে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সে প্রশান্ত মুখেই উঠে দাঁড়ায় একেবারে।

'আপনার টাকাটা তা হলে দিয়ে দিন, কালই বায়নাটা করে ফেলি। এদিকে এসে আবার আঁতুল যাবার সুবিধে হবে না।'

'এই যে বাবা দিই!' শ্যামা জামাইয়ের অবিচলিত মুখের দিকে চেয়ে যেন ভরসা পায় খানিকটা।

টাকাগুলো গুনে দেখে নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হয় অভয়পদ। অফিস থেকে প্রায় ক্রোশখানেক হেঁটে বাড়ি ফিরেই মহার মুখে খবর পেয়ে এই ছাঁকা দু ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এখানে এসেছে। আবার সেই দু ক্রোশ রাস্তা ভেঙে বাড়ি ফিরবে এখন। বাড়ি ফিরে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাস ওর কোনকালে নেই—সকাল করে একেবারে ভাত খেয়ে নেয়। আজ সে অবসর হয় নি। সব জেনেও ওকে একটু জল খেয়ে যাবার কথা বলতে মনে রইল না শ্যামার। রাত্রে শুতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় সেই অন্ধকারেই এতখানি জিভ কাটল সে।

॥ ৪ ॥

তা বাড়ির পয় ভালই বলতে হবে। বাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই আরও এক দিকে সুরাহা হয়ে যায়।…

বায়না থেকে শুরু করে রেজেস্ট্রি পর্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সব চুকে গেল। বায়নার পরই বাড়ি খালি করে দিয়েছিল সহদেবরা—বিক্রির দিন আদালতে চাবি দিয়ে কাগজ-কলমে দখল দিয়ে দিলে। এরা কোর্টের ফেরত গিয়ে 'বাঁশগাড়ি' করে এল সকলে মিলে, অর্থাৎ সে তালা খুলে নিজেরা ঘরে-দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

এত দিন পর্যন্ত কথাটা সকলের কাছেই চেপে রাখা হয়েছিল কিন্তু আর রাখা গেল না। কারণ 'দাঁড়া' হরির লুট মানা ছিল। সেই হরির লুটের বাতাসা দিতে গিয়েই কথাটা জানাতে হ'ল। ছেলের চাকরি হয় নি, সদ্য-বিধবা মেয়ে বুকের ওপর বসে—হরির লুট কিসের ?

শ্যামা মঙ্গলার হাত দুটো ধরে বললে, 'মা, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই - যা হ'ল বলতে গেলে তোমার দয়াতেই হ'ল।…একটা মাথাগোঁজার জায়গা করে ফেললুম মা!'

'মাথা কি—কী বললি? ও—বাড়ি?' মঙ্গলার হাঁ-করা মুখ বুজতে বেশ একটু দেরিই হয়, 'বাড়ি কিনলি?…ও, তাই এত ঘন ঘন জামাইয়ের আসা-যাওয়া, গুজগুজ ফুসফুস? আমি ভাবি না জানি কী! তা ভালই তো! কিন্তু এব এত লুকোছাপার কী আছে?'

'না মা। লুকোছাপা নয়।' ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবেই বলে শ্যামা, 'এ তো আমার আশার অতীত, হবার কথাও নয়। তাই না আঁচালে বিশ্বাস করি কী করে বল। নিহাত জামাই দয়া করলেন বলেই তাই, মোটা টাকাটা অভয়পদই ধার দিলেন তো!'

'বুঝেছি বুঝেছি।' অপ্রসন্ন মুখে উত্তর দেন মঙ্গলা, 'আমার কাছে অত শাক দিয়ে মাছ না ঢাকলেও চলবে। জামাই তোমার ভারি তালেবর রহমান কিনা। মোটা টাকা ধার দিলেন!…এ বাড়ির আনাজ ফল যে কোথায় যায় তা আমরা কি আর জানি না! কাজেই টাকা কোথা থেকে এল তা আমাকে বিস্তার করে না বললেও চলবে।'

পিঁটকী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'ধন্যি চাপা মেয়েমানুষ

বটে তুমি বামুনদি ! বাব্‌বা, তোমার পেটে পেটে এত !…কেন, আগে বললে কি আমরা টাকাটা কেড়ে নিতুম—না ভাংচি দিতুম ?'

এক রকম মাথা হেঁট করেই নিজের ঘরে ফিরে আসে শ্যামা। অভয় এ ঘর থেকে সবই শুনেছিল, সুতরাং সে সব কথার পুনরুক্তি না করে ম্লান একটু হেসে বললে, 'শুনলে তো বাবা।'

'ও তো একটু হবেই মা। এত কাল যে পায়ের নিচে ছিল সে মাথা তুলতে গেলে একটু প্রাণে লাগবে বৈ কি !…ও সবে কান দেবেন না !'

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠেই উত্তর দেয় অভয়।

'তার মানে এই শত্রুপুরীতে বাস তো !'

'দেখা যাক !' বলে উঠে দাঁড়ায় অভয়।

'তা হলে কবে গৃহপ্রবেশ করবেন ? সামনে চান-পূর্ণিমের দিনটা ভাল শুনছি।'

'তাই যা হয় কর বাবা। সে তো আবার একগাদা টাকা খরচা। একটু সিন্নিও দিতে হবে, সিদ্ধেশ্বরীর পুজো মানত আছে—'

'সে এক রকম করে যোগাড় হয়েই যাবে।' অভয় ছাতা বগলে করে উঠে দাড়াল।

'কিন্তু বাবা একটা কথা—', কুণ্ঠিত ভাবে বলে শ্যামা।

না ফিরেই শুধু দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে অভয়, 'কী বলুন।'

'বলছি যদি গৃহপ্রবেশ হয় তো—কান্তিকে তো আনাতে হবে, অন্তত দুটো দিনের জন্যে—আনন্দের দিনে বাছা আমার থাকবে না ?'

'কেন থাকবে না—দু দিন আগেই বরং আনিয়ে নেবেন। তবে আমার শেষ পর্যন্ত সময় হবে কিনা—বরং হেমকেই পাঠিয়ে দেবেন।…গৃহপ্রবেশের কথাটা আর বলে দরকার নেই—পুজো-আচ্চার নাম করে আনিয়ে নেবেন।'

দু পা এগিয়ে গিয়ে এবার অভয়পদ নিজে থেকেই থামে আবার।

'বরং—বরং হেম যদি যায় তো রতনকেও বলতে পারে একবার চাকরির কথাটা। ওর তো অনেক জানাশুনো—'

কথাটা ভাল করে শেষ না করেই সে বেরিয়ে গেল।

হেম রতনদের বাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন তার চোখ থেকে যেন বিস্ময় যেতে চায় না। ঐশ্বর্য যে সে দেখে নি তা নয়—এত কাল শহরে আনাগোনা করছে ঐশ্বর্যের বাহ্য চেহারাটা ভাল করেই দেখা আছে—কিন্তু এত

কাছে থেকে আগে কখনও দেখে নি। এত প্রাচুর্য যে সত্যিই থাকতে পারে—এসব যে নিতান্ত গল্প-কথা নয়, তা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হওয়া শক্ত।

রতন বেশ সস্নেহেই গ্রহণ করলে ওকে। মোক্ষদাকে ডেকে জলখাবার দিতে বললে, রাত্রে খেয়ে যাবার অনুরোধ জানালে।

তার পর বললে, 'আপনিই তা হলে কান্তির দাদা? বড় ভাল ছেলে আপনার ভাইটি, সত্যিই বড় ভাল ছেলে। ও খুব উন্নতি করবে দেখবেন। তা নিয়ে যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে যাবেন, ওর ওপর যেন বড্ড মায়া পড়ে গেছে।'

একথা সেকথার পর প্রাণপণে সংকোচ কাটিয়ে চাকরির কথাটা পেড়ে ফেলে হেম। বহুদিন ধরে বেকার বসে আছে সে, কোথাও কিছু হচ্ছে না। পনেরো-কুড়ি টাকারও একটা চাকরি পেলে বেঁচে যায়। শেষে অভয়পদর কথাও বলে, 'তিনিই আরও বলে দিলেন—'

'আমাকে বলতে বলেছে অভয়দা, বাঃ বেশ তো। আমি কি বেটাছেলে, যে আমার হাতে চাকরির খোঁজ থাকবে?'

বলে বটে কিন্তু একটুখানি চুপ করে ভুরু কুঁচকে বইয়ের আলমারিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে ওঠে, 'আচ্ছা থিয়েটারে চাকরি করবেন? গেট-কীপারি? দেখুন তা হলে—ওঁর বন্ধু রমণীমোহনবাবুর থিয়েটার আছে, বোধ হয় তাঁকে লিখে দিলে কাজ হবে।'

করবেন। এ প্রশ্নও করে মানুষ?

হেম সাগ্রহে বলে, 'আমি এখন যা পাব তাই করব। শুধু দয়া করে একটু বলে দেন যদি—'

'বাড়িতে আপত্তি করবে না? মা আছেন তো। তিনি দেবেন এ চাকরি করতে? বড্ড খারাপ জায়গা ওটা।'

'কিছু বলবেন না মা। আমার ওপর সেটুকু ভরসা তাঁর আছে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা—'

'তা হলে বরং আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এখনই একবার দেখা করে আসুন। এই কাছেই তো—গোয়াবাগানে থাকেন তিনি। দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যান—বাড়ি চিনিয়ে দেবে।'

সে চিঠি লিখে খামে এঁটে ওর হাতে দিলে। খামেই ঠিকানা লেখা ছিল—তবু দারোয়ানকেও ডেকে সঙ্গে যেতে বলে দিলে রতন।

সৌভাগ্যক্রমে তখনও বাড়িতে ছিলেন রমণীমোহনবাবু, রতনের দারোয়ানকে দেখে বেশ প্রফুল্লমুখেই বললেন, 'কী ব্যাপার গো শিউনন্দন—কী হুকুম ওঁর ?'

'এই যে—বাবুর হাতে চিঠি আছে।'

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ মালিকজনোচিত মুখ করে ফেললেন বাবু। এমনিতেই প্রকাণ্ড রাশভারী চেহারা ভদ্রলোকের, তার ওপর মুখ গম্ভীর করে থাকলে রীতিমত ভয়ই হয়। হেমের বুকটা দুব-দুব করে উঠল। ভয়ে ও আশাভঙ্গের আশঙ্কায়।

কিন্তু রমণীবাবু বার-দুই আপাদমস্তক ওকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি তো নিতান্তই ছেলেমানুষ দেখছি, আর নিরীহ। পারবে থিয়েটারে কাজ করতে? ভারি বদ জায়গা!'

হেম আর কী উত্তর দেবে, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ঘামে শুধু।

রমণীবাবুই আবার বলেন, 'আর যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ। যত জানাশুনো লোকই রাখি, দু দিন পরে সব শালা চোর হয়ে দাঁড়ায়।...ভ্যাখো বাপু, এক কথায় চাকরি দিচ্ছি, নিমকটা রেখো। নইলে এক কথায় তাড়াতেও আমার দেরি লাগবে না। কলকাতায় থাকবার জায়গা আছে তো?'

'আছে—মাসীর বাড়ি।'

'বেশ, তা হলে পয়লা তারিখ থেকে কাজে লেগে যাও। কুড়ি টাকা করে মাইনে পাবে—আর হোল-নাইট শো হলে খাবার।...রাজী থাক তো মাসকাবারের দিন দেখা করে জেনে যেও কটায় আসতে হবে!'

হেম মনের আনন্দে হেঁট হয়ে রমণীবাবুকে একটা প্রণামই করে ফেললে। রমণীবাবুরা বিশুদ্ধ কনৌজী ব্রাহ্মণ, তা সে আগেই শুনেছিল রতনের মুখে।

একে থিয়েটার—কল্পলোকের সুখস্বর্গ, শুধুমাত্র ধনীলোকের প্রমোদ-বিলাসের অধিকার সেখানে—এ-ই জানত, তায় চাকরি। আনন্দে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে এল হেম। রতনকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে স্রেফ মনের আনন্দেই বিশেষ কিছু বলতে পারল না। মাকে সংবাদটা না দিতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারছে না সে।

কিন্তু শ্যামা খবরটা শুনে খুব খুশী হতে পারল না। থিয়েটারের অনেক কাহিনী শুনেছে সে বাপের বাড়ি থেকে—বহু কেচ্ছা। জোয়ান ছেলেকে সেই সাতশো রাক্ষসীর খপ্পরে পাঠাতে মন চায় না তার, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে 'না'ও বলতে পারলে না। শুধু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল।

হেমের এ খুঁতখুঁতুনি ভাল লাগে না। তার মন আনন্দে কল্পনাকাশে পাখা মেলেছে তখন! সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'বেশ তো, এখন কিছু দিন করি না— এধারেও তো পাঁচজনকে বলে রেখেছি, একটা কিছু পেলে এ কাজ ছাড়তে কতক্ষণ?'

অগত্যা। শ্যামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

মা সিদ্ধেশ্বরী যদি এইভাবে মুখ তুলে চান, হেমের ভাল একটা চাকরি হ'তেই বা কতক্ষণ?

আবারও বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেবে না হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্বশুরবাড়ির মধ্যে একদা প্রমীলাকেই সব চেয়ে পছন্দ ছিল মহাশ্বেতার। তেমনি এখন যেন আর সে দুটি চক্ষু পেড়ে' দেখতে পারে না ওর এই পাকা-গিন্নী 'জা'-টিকে। এক দিন সহজেই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল— সেই মেনে নেওয়াটাই যেন ওর কাল হয়েছে। যে আসনে সে স্বেচ্ছায় নিজেই তাকে বসিয়েছে, এখন সেখান থেকে টেনে নামানো ওর সাধ্যাতীত। কেমন করে কোথা দিয়ে যে সবাইকে ডিঙিয়ে প্রমীলাই সংসারের গৃহিণী হয়ে বসেছে—তা মহাশ্বেতা এতটুকু বুঝতে পারে নি। এখন সে দেখছে—প্রথম দিনটিতেও সে যেমন এ সংসারে পরমুখাপেক্ষী ছিল, আজ এত দিন পরেও —এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও তেমনিই আছে। কোথাও ওর মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে নি।

এর জন্য আত্মগ্লানির শেষ থাকে না আজকাল ওর। মনে মনে কেবলই আপসোস হয়—ও যদি গোড়া থেকে একটু শক্ত হ'ত! এতটা 'নাই' যদি না দিত ছোট জাকে!

বেচারী মহাশ্বেতা! ও জানে না যে এক-একজন এ পৃথিবীতে আসে সোজাসুজি বিধাতার কাছ থেকেই কর্তৃত্ব করবার পরোয়ানা নিয়ে। প্রমীলাও সেই বিধিদত্ত সহজাত পরোয়ানা নিয়ে এ সংসারে এসেছে, কর্তৃত্ব করবার সহজ অধিকার তার। মহাশ্বেতার কোন দিনই সাধ্য ছিল না প্রমীলার ওপর অভিভাবকত্ব করবার বা জ্যেষ্ঠত্ব ফলাবার।

এই সত্যটা জানে না বলেই তার এই আত্মগ্লানি মনে হয় প্রমীলাকে সে-ই বুঝি এতটা অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অবশ্য আত্মগ্লানি বা অনুশোচনা থাকলেই যে—যাকে কেন্দ্র করে এই গ্লানি—তার ওপর বিদ্বেষ থাকবে না, এর কোন মানে নেই। বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে মহাশ্বেতার—ওর এই জায়ের ওপর। আড়ালে সে ফাঁক পেলেই গালাগাল দেয়। বলে, 'শতেক্‌খোয়ারী আমার সব্বনাশ করবে বলে এ ভিটেয় এসে সেঁধিয়েছে। আমার সাতজন্মের শত্তুর।···হারামজাদা মেয়েমানুষ। চোদ্দ পুরুষ বদ, ওদের ঝাড়েবংশে বজ্জাত।' ইত্যাদি—

আবার শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'মহারানী! উনি মহারানী, আমি চাকরানী। মহারাজ আর মহারানী! যে যা বরাত করে এসেছে। ওরা এসেছে রাজত্ব করতে—করে যাচ্ছে। আমি যা করতে এসেছি তাই করছি। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটী ঘুঁটেই কুড়িয়ে যাব জীবন-ভোর, আমার কি আর কোনদিন সুখ হবে!'

প্রমীলা শোনে আর হাসে। জানে মহাশ্বেতা ঢোঁড়া সাপ—একটু ফোঁস করবারও শক্তি নেই। ওর সঙ্গে ঝগড়া করাও শুধু শুধু নিঃশ্বাসের অপচয়।

আর ওর এই নিশ্চিন্ত উপেক্ষাই যেন আরও বেশী করে জ্বালাতে থাকে মহাশ্বেতাকে।

কথাটা বড় মিথ্যাও বলে না ও। মহারাজ আর মহারানী।

অভয়পদও যদি একটু মানুষের মত হ'ত (মহাশ্বেতার সেই বড় অনুযোগ)! সবস্ব রোজগার করে এনে মেজভাইয়ের হাতে তুলে দেবার দরকারটা কি? তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে। ভাই যে চিরকাল দেখবে তার কি কিছু লেখাপড়া আছে? সবাই কিনা ওঁর মত সত্যযুগের মানুষ!

'দেখব দেখব! রোজগার যদি কোন দিন তোমার বন্ধ হয় সেইদিন দেখে নেব। অত সহজে আমি মরছি না। ঐ ভাই যদি তখন মুখে নাতি না মারে তো আমি কী বলেছি! উনি কলির রামচন্দ্র-গিরি ফলাচ্ছেন! আগে ত্থাখ্—যার ওপর ফলাচ্ছিস সে লক্ষণ কিনা!'

দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গলায় বলে মহাশ্বেতা, অভয়পদর সামনে বসেই বলে আজকাল। এটুকু সাহস তার হয়েছে।

কিন্তু বলেই বা লাভ কি? এর চেয়ে ঐ ইটের দেওয়ালটাকে বলাও ঢের ভাল। নিজের নিষ্ফল রোষ এবং অর্থহীন সেই রোষের অভিব্যক্তি ফিরে এসে শুধু নিজেকেই আঘাত করে। আরও ক্ষতবিক্ষত হয় সে অন্তরে অন্তরে।

এই যুদ্ধের বাজারে টাকা যে এরা কম রোজগার করে নি, তা মহাশ্বেত এত দিনে বেশ বুঝেছে। প্রথমটা অত ধরতে পারে নি ঠিকই—কিন্তু প্রমীলা চোখ-কান খুলে দেবার পর বুঝতে আর কিছু বাকী নেই ওর। কিন্তু সে টাকা পর্যন্ত সব এনে ঐ ভাইয়ের পেটে পুরেছে বোকা লোকটা। মোট-মোট টাকা। রাত জেগে আড়ি পেতে মহাশ্বেতা দেখেছে অনেক কিছুই। নগদ কাঁচা টাকা ইটের মত করে সাজিয়ে মোটা রাংতা-কাগজে বেঁধে কাপড় দিয়ে সেলাই করেছে অম্বিকাপদ বসে বসে—তার পর ওর ঘরের দেওয়াল থেকে ইট খসিয়ে নিয়ে চুন-সুরকি দিয়ে সেই টাকার ইট গেঁথে রাতারাতি বালির কাজ করে মায় চুনকাম পর্যন্ত করে দিয়েছে নিজের হাতে। সে-ও সারারাত জেগেছে—মহাশ্বেতাও তাই। প্রমীলা অত ধার ধারত না, সে পড়ে পড়ে ঘুমোত। 'ঘুমোবে না কেন, ওর যে বুক-পোঁতা আছে। জানে ওর ঘরের দেওয়ালেই তো গাঁথা রইল।' আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করত মহাশ্বেতা।

শুধু কি টাকা। সোনার বাট কাকে বলে জানত না সে। এবার চোখে দেখলে। সে বাট তো তৈরী করিয়ে নিয়ে এল এই আহাম্মুকটাই। এনে ধরে দিলেন লক্ষ্মণ ভাইকে। উঃ। এর চেয়ে যদি সে একটা মুখ্‌খু মুটে মজুরের ঘরে পড়ত—সেও ঢের ভাল ছিল। এ জগতে সবাই নিজের স্বার্থ বোঝে, কেবল বিধাতা কি বেছে বেছে তার জন্যেই নির্জনে বসে এই মানুষটি গড়েছেন।

অবশ্য হ্যাঁ—এর মধ্যে গয়না ওদের কিছু হয়েছে বটে। দু বৌয়ের সমান ওজনের এক প্যাটার্নের গয়না হয়েছে—যা হয়েছে সবই দু সেট করে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের কম সোনাও যদি অভয় নিজে হাতে করে এনে দিত তো ঢের বেশী খুশী হ'ত মহাশ্বেতা। 'মুখপোড়া মিন্‌সের কি একটা এক কড়ার জিনিসও কোন দিন আনতে ইচ্ছে করে না।' এই সোনার গয়না শুধু দেওরের হাত দিয়ে আসে বলেই বিষ মনে হয় ওর। পরলে যেন জ্বালা করতে থাকে সর্বাঙ্গ। মাঝে মাঝে পরে, আবার একটু পরেই হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আপন মনেই বকে, 'কেন, কিসের জন্যে আমি পরের হাত-তোলায় থাকব? আমার বরই তো বেশী রোজগার করছে, টাকা তো আমার।...ও কলকাতার অফিসে বসে থাকে, এক পয়সা উপরি আছে ওখানে? তবে?...উনি হাত-তুলে দেন—যেন দয়া করে দিচ্ছেন, ভিক্ষে দিচ্ছেন। কেন, কিসের জন্যে? আমার সমান গয়নাই বা ওর বৌ পরবে কেন? এটা হুঁশ থাকে না যে কার ভাতারের টাকা!'

পরাজয় এক দিক দিয়েই নয়—বহু দিক দিয়ে

মাঝে মাঝে এ বাড়ি এসে মনের সব বিষ উজাড় করে সে মায়ের কাছে কিংবা মা'র অনুপস্থিতিতে পিঁটকীর কাছে। বলে, 'মেজ বৌটা আসলে গুণ জানে, বুঝলে! ওর মা-মাগী তো ভীষণ জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ, আমি তাকে দেখেছি। নিশ্চয়ই গুণতুক করে মেয়ের হয়ে। নইলে সবাই ওর হাতের মুঠোয় যায়? যেমন আমি বোকা তেমনি আমার মা। কিছুই করতে শিখলুম না কখনও। সেই জন্যেই আরও আমাকে কেউ গেরাহ্যি করে না। সবাই যেন ওর ভেড়ুয়া। আমার শাশুড়ী মাগী আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে—কিন্তু কৈ এখন বলুক দিকি মেজ বৌকে কিছু! একখানা বললে দশখানা শুনিয়ে দেবে সে। চুপ করে জুজু হয়ে বসে থাকে।'

আবার হয়তো খানিক থেমে কপালে করাঘাত করে বলে, 'কী বলব, আমার ভাতারও যে তেমনি। ওর সুখের কপাল, ভাতার ওর কথায় ওঠে-বসে! আমার একটা কথা কি এ মিন্‌সে শোনে। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি?'

তার পর আরও গলাটা নামিয়ে বলে, 'শিবপুরের দিকে শুনেছি কে এক জন গুণিন আছে, একটু খোঁজ করো না মা। খরচা যা লাগে আমি দেব। যদি একটু ওষুধ-বিষুধ দিতে পারে—'

শিউরে উঠে শ্যামা উত্তর দেয়, 'না মা, খবরদার ওসব করতে যেও না। ঐ চট্টখণ্ডীদের একটা বৌ নিব্‌ড়ের ত্রিগুণা বুড়ীর কাছ থেকে কী ওষুধ এনে বরকে খাইয়েছিল—তার বর তাকে নিত না, কে এক দূর সম্পর্কের মাসীকে নিয়ে পড়ে থাকত, লোক দেখিয়ে ছোঁড়া তাকে বলত মাসীমা অথচ—। যাক তা সে ওষুধ তো খাওয়ালে, ফলও হ'ল—সে মাগীকে ছেড়ে দিলে একদম। কিন্তু তার পরই কি হ'ল, গুম খেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক দিন পাগল হয়ে গেল, একেবারে উন্মাদ পাগল!'

শিউরে ওঠে মহাশ্বেতাও—কথাটা শুনে। শ্যামা সেটা লক্ষ্য করে সমর্থন-সূচক ঘাড় নেড়ে বলে, 'তাই তো বলছি, ওসবে যাস্ নি। কী থেকে কি হয় তা কি বলা যায়! তোর কপালে থাকে—হকের ধন হয়—একদিন পাবিই!'

'ছাই পাব!' মুখটা ভার করে উত্তর দেয় মহাশ্বেতা—'পাব একেবারে কাঠে-খড়ে উঠলে, তার আগে নয়।'

কিন্তু গুণতুকের দিকে যেতে আর সাহসে কুলোয় না ঠিকই।

আরও অসহ্য লেগেছে ওর দুর্গাপদর ব্যাপারটা। ওরও ঐ শ্রীচরণে আত্মসমর্পণটা।

ইদানীং সেও, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রমীলার একান্ত অনুগত হয়ে উঠছে ক্রমশ। এইতে আরও অবাক লাগে ওর।

'মুয়ে আগুন! সব শেয়ালের এক রা! সব কটা ভাই ঐ এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছে গা! জোয়ান হয়েছিস, ডবকা হয়েছিস—তাই বে-থা কর! নয় তো এদিক ওদিক চনমন করে বেড়া, তা নয় বয়সে-বড় দিদির-বয়সী বৌদির আঁচলে আঁচলে ঘুরছেন। এ আবার কি! আমার হয়েছে জালার ওপরে জ্বালা। এ যেন গোদের ওপরে বেঁজি! আচ্ছা, কী ছাপে ওর মধ্যে এরা বলতে পারিস? কী আছে ওর? গায়ের রং আমার চেয়ে অন্তত তিনপুরু ময়লা। মুখচোখ গড়ন-পেটনও এমন কিছু ভাল নয়। ঐ তো মদ্দাটে মদ্দাটে চওড়া চওড়া গড়ন, আর মদ্দাটে ভাব, এই গাছে উঠছে, এই জলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে—আর যখন তখন হি-হি হাসি। তাইতেই সবাই যেন মজে আছে।...যেমন ভাতার, তেমনি ছোট দেওর।..আমার এক এক সময় সন্দ হয় কী জানিস খেঁদি, তোর দাদাবাবুও ঐতেই মজেছে। ওকেও নিশ্চয় গুণতুক করেছে ছুঁড়ি। নিহাত ভাসুর-ভাদ্দরবৌ সম্পক্ক, তাই হাতে হাতে যথাসব্বস্ব ওকে তুলে দিতে পারে না, ওর ভাতারের হাতে দেয়। ও আমাদের সকলের সব্বনাশ করবে বুঝলি, স-পুরী এক গাড় করবে একেবারে। ও আস্ত রাক্কুসী, হাড়মাস চিবিয়ে খেতে এসেছে সক্কলকার।'

ঐন্দ্রিলা হয়তো হেসে জবাব দেয়, 'তোমার তো খুব বুদ্ধি দিদি, দেওর-ভাজে যদি না সম্পক্কে আটকায়, ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কি সেই জন্যেই আটকে আছে? বলি ভাসুর ভাদ্দরবৌতে কেলেঙ্কার কি কখনও শোন নি কোথাও?'

কিছু-পূর্বের কথাও ভুলে গিয়ে অমনি সগর্বে জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তেমন বান্দা তোর দাদাবাবু নয় বুঝলি! কখনও কোন মেয়েছেলের দিকে চেয়ে দেখে না। ওদিকে ওর খেয়ালই নেই। বলে, যে কখনও এক দিনের তরে ভাল খেলে না, ভাল পরলে না, বিছানায় শুল না—সে করবে মেয়েছেলে নিয়ে কেলেঙ্কার! তা করলে তো বুঝতুম। যেন আমার কপালেই কোথায় এই গেরস্ত সন্নিসী তৈরী হয়ে বসে ছিল। সন্নিসীরও মন টলে—এর তাও টলবে না বুঝলি! শিবের ও কলঙ্ক হতে পারে—এর হবে না কোন দিন।'

'তবে আর মজেছে বলছিস কেন?' হাসে ঐন্দ্রিলা।

'কে জানে!' মুখটা বিকৃত করে কাঁধটা হেলিয়ে উল্টো জবাব দেয় মহাশ্বেতা, 'তবে আর গুণতুকের কথা বলেছে কেন! ওষুধ-বিষুধ মন্তর-তন্তরে কী না হয়—বল্!'

সত্যিই দুর্গাপদর আচরণটা দিন দিন দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। দিনরাতই দেওর-ভাজে গুজগুজ, ফষ্টিনষ্টি। চাপা হাসি, চোখে চোখে কৌতুক। অন্ধকার বাইরের বাগানে বাঁশবনে ঘোরাফেরা। দুর্গাপদর ইদানীং চাকরি হয়েছে, অভয়পদই বলে-কয়ে রেল অফিসে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছে—সেই জন্যেই দিনরাত থাকতে পারে না বাড়িতে—কিন্তু চাকরির সময়টুকু ছাড়া আর এক দণ্ডও দুর্গাপদ বাড়ির বাইরে কাটায় না। ওর বন্ধুবান্ধব আড্ডা সব গেছে, এখন দিনরাতই বাড়িতে থাকে, মায় ছুটির দিনও। ছোট ননদের বিয়ের পর ওরা বাড়ির পাট পালা করে নিয়েছে। একজন ছড়া-ঝাঁট দেয়, গোয়াল কাড়ে—আর একজন বাসন মাজে, রান্নার যোগাড় করে। প্রমীলার যেদিন ছড়া-ঝাঁটের পালা পড়ে, সেদিন ভোর থেকে দুর্গাপদ ওর পেছনে পেছনে ঘোরে, গোবরছড়ার হাঁড়ি এগিয়ে দেয়, নয়তো ঝাঁটাটা খুঁজে আনে, গোয়ালে গিয়ে গরু বাছুর বার করে বেঁধে দেয়। আবার যেদিন ওর বাসন মাজার পালা, সেদিন একটা দাঁতন মুখে দিয়ে গিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে, অথবা তালগুঁড়ির পইটেতে এক ধাপ উঁচুতে বসে প্রমীলার আঁচলটা নিয়ে খেলা করে—ওর অজ্ঞাতে আঁচলে ঢিল বেঁধে দেয়, অথবা চুলে কাঁটাফল আটকে দেয়। অজ্ঞাত কিন্তু থাকে না কোন দিনই, গোড়া থেকেই অবহিত থাকে প্রমীলা, কাজেই ঠিক ঘটনাটির মুখেই হাতে-নাতে ধরে কৃত্রিম তর্জন করে, দুজনেই হেসে খুন হয়।

এ সবই দেখে মহাশ্বেতা, আর জ্বলে জ্বলে মরে।

'বুড়ীও কি দেখতে পায় না এসব!' শাশুড়ীর উদ্দেশে বলে সে, 'না কি ছোট ছেলের দোষ দেখতে গেলেই দুটি চোখ কানা হয়ে যায় কানীর!…এমন ঢলাঢলিও চোখে পড়ে না, আশ্চর্য!'

পাড়াতে কানা-ঘুষো হয় বৈকি।

আশপাশেই জ্ঞাতিদের বাড়ি, সেখানেও গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু এরা নির্বিকার। যেমন মা তেমনি ছেলেরা।

সব চেয়ে বিস্মিত হয় মহাশ্বেতা অম্বিকাপদর আচরণে।

ওর দাদা না হয় চিরদিনই নির্বিকার, উদাসীন, পাথরের ঠাকুর। তা ছাড়া তার প্রত্যক্ষ ক্ষতির কোন ব্যাপার নয়, অন্তত তার নিজের গায়ে তত জ্বালা ধরাবার মত ঘটনা নয়—কিন্তু ও চুপ করে থাকে কী করে? তবে কি ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে সবাই পাথর?

মায়ের কাছেই মনের কথাটা বলতে পারে খুলে, 'তুমি যে বল মা! ঘেন্নায় 'ঘেন্নায় আমি পাথর হয়ে গেলুম, কিন্তু ওদের ঘেন্নাপিত্তি হায়া কি কিছু নেই? গণ্ডারের চামড়া, এ কি কোন পুরুষে সহ্য করতে পারে? অন্য বাড়ি হলে এতদিনে খুনোখুনি হয়ে যেত।'

শ্যামা বলে, 'ওলো খুনোখুনি ওদেরও হ'ত, যদি না দুগ্‌গো মাস মাস মাইনের সমস্ত টাকাটি এনে ধরে দিত ঐ মেজ ভায়ের হাতে। ও কি অমনি সহ্য করে? টাকাতে সব সয়ে যায় মা—সব সয়। কত লোকে টাকার জন্যে ঘরের মাগ পরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে, তা জানিস না।'

মহাশ্বেতার কথাটা তত পছন্দ হয় না। টাকার এতটা মূল্য নিজের জীবন দিয়ে সে অনুভব করতে পারে নি এখনও। তাই খানিক চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে বলে, 'উহুঁ তুমি যাই বল বাপু, ওর মা-মাগী অনেক কিছু জানে, আসলে গুণ করেছে সবাইকে। ঐ যে কী সুপুরী খাওয়ায় না কি, তাই খাইয়েছে নিশ্চয়। শাশুড়ী, ভাসুর মায় ভাতার সুদ্ধ এত বড় অসৈরন চোখ বুজে সহ্য করে—এ অমনি হয় না মা! আমি তোমাকে বলে দিলুম, একদিন এ কথাটা বাজারে বের হবেই, দেখে নিও। ঐ মা-মাগীর কাজ এসব। সব গুণতুক্!...কী বলব তুমি ভয় দেখিয়ে দিলে, নইলে আমিও একটা গুণিনের কাছে যেতুম। একটা ভাল গণক্কারের সন্ধান পেলে আমি চার-পাঁচ টাকাও খরচ করতে রাজী আছি।'

শ্যামার 'টাকা' সম্বন্ধে সদা-জাগ্রত কান খাড়া হয়ে ওঠে, 'জামাই তো তোকে কিছুই দেয় না বলিস, তবে টাকা পাস কোথা থেকে?'

'আমি যে আজকাল সরাই ওর পকেট থেকে। এসে হাত-মুখ ধুয়ে গিয়ে তবে তো বসে দু ভাই। সে যা বাহার! ওধারে ওরা হয়তো রান্নাঘরে, নয় তো পালা না থাকলে, বাইরের দাওয়ায় মুখোমুখি--এধারে এঁরা মেজকর্তার ঘরে দোর দিয়ে মুখোমুখি। দু দলই গুজগুজ ফুসফুস!...তা সেই মুখ-হাত ধোবার ফাঁকেই আমি যা পাই হাতিয়ে নিই। ছায়ও মধ্যে মধ্যে দু-একটা টাকা, আজকাল আমি মুখ ধরেছি তো, চেঁচামেচি করি, তাই হাত-খরচ বলে দু-এক টাকা ঠেকায়। বাকী হাত-সাফাই! তবে টের পায় ও, ওর গোনাগোনতি হিসেবের টাকা, এক পয়সা ইদিক-উদিক হবার উপায় নেই বাবা—বলে, ঢোলা ঢোলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের গোনা গাঁথা! টের পায়, তবে কী ভাগ্যি কিছু বলে না। আগে আগে বোধ হয় ওধারে গিয়ে অপ্রস্তুত হ'ত

—এদান্তে তাই পকেট থেকে বার করে আগে গুনে নিয়ে যায়। পেথম পেথম বুক টিব্ টিব্ করত, সরে যেতুম সামনে থেকে। এখন সোজা দাঁড়িয়ে থাকি। বলি অত ভয় কিসের ? এ তো আমারই হক্কের টাকা। তা কম দেখলে একবার চেয়ে ছাখে শুধু, একটু মুচকি হাসে, কিছু বলে না।···তবে কি আর বেশী নিতে ভরসা হয়—সিকিটা আধুলিটা দু আনিটা ! টাকা—সে দৈবে সৈবে !'

শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'তা কত জমালি !'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় যেন মহাশ্বেতা, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'কত আর ! ছাই জমিয়েছি। ব্যাঙের আধুলি !'

শ্যামা অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'থাক। বলতে হবে না। তবু যে বুদ্ধি হয়েছে, নিজেরটা বুঝতে শিখেছিস—এইতেই আমার সুখ। আমি কি আর তোর টাকা নিতে যাচ্ছি—না চাইছি !'

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায় মহাশ্বেতা, তবু যে সংবাদটা শোনবার জন্য শ্যামা সাগ্রহে ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট করে—সে সংবাদটা কিছুতেই সে দেয় না। সংসারের শিক্ষাই এমন যে কিছুদিন সেখানে পাঠ নেবার পর অতি বড় নির্বোধও খানিকটা সতর্ক হয়ে যায়, স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ঘা খেয়ে খেয়ে আত্মরক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

কথাটা অবশেষে একদিন মহাশ্বেতাই পাড়ে শাশুড়ীর কাছে। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার সামনে অন্ধকার দালানে পা ছড়িয়ে বসে নিঃশব্দে মাতগুড় আর নারকোলকোরা দিয়ে মাখা চালভাজার গুঁড়ো খাচ্ছিলেন ক্ষীরোদা—মহাশ্বেতা এসে কাছে বসল। সংসারের কাজ সারা হয়ে গেছে, মায় কাল ভোরের জন্যে উনুনে কলা-বাসনা, সুপুরির বেলদো পর্যন্ত সাজানো, চাল ধোয়া—সব তৈরী করে রেখে রান্নাঘরে চাবি দিয়ে এসেছে। রাত এগারোটা বেজেও গেছে কখন কুণ্ডুদের ঘড়িতে। রোজই এমনি হয় ওর। যেদিন মেজবৌর পালা থাকে সেদিন দুর্গাপদ অর্ধেক কাজ করে দেয়—ওর তো আর সে সহায় নেই। তবু ভাগ্যি মেয়েটা এখনও পর্যন্ত ওঠে নি। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুমোবে মুখপোড়া মেয়ে আর রাত ঠিক যাই এগারোটা বাজবে অমনি উঠে চিল-চেঁচাতে শুরু করবে। তার পর তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে যায় নাম

একটি ঘণ্টা। আজ এই একটা মহা সুযোগ মিলেছে। আজ কর্তারাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে, মেজবৌ আর দুর্গাপদ উঠেছে ছাদে—আজকাল সিঁড়ি হয়ে এ একটা সুখ বেড়েছে ওদের—এখন আর সহজে নামছে না।

'কী মা।' প্রশ্ন করেন ক্ষীরোদা। একটু বিস্মিতই হন। বড় বৌ ছেলেপুলের মা গিন্নী হবার পর থেকে এ সৌভাগ্য তাঁর বড় একটা হয় না।

'না', এমনিই। খুকীটা আজ ওঠে নি এখনও, তাই বলি যে মা খাচ্ছেন—একটু কাছে গিয়ে বসি একলা বসে খান—তা একটু আলোয় বসলেও তো হয়।'

'কী আর হবে আলো মা—কাঁটা-খোঁচা তো নেই। বুড়োমাগী রাতদুপুরে খাচ্ছি, এ আর এমন দেখাবার মত কী ঘটনা বল? খাবে নাকি মা একটু?'

'না মা, আপনি খান। দুপুরের ছিষ্টি পান্তা পড়েছিল—এক পেট খেয়ে এসেছি—এখন ঐ গুড়মাখা জিনিস খেলেই অম্বলে বুক জ্বলে উঠবে।'

এও এক অপ্রসন্নতার কারণ শাশুড়ীর সম্বন্ধে। প্রতিদিনই জোর করে চাল বেশী নেওয়াবেন। বলবেন, 'গেরস্তবাড়ি থেকে খাবার সময় অতিথ-ভিখিরী ফিরে গেলে বড় অকল্যেণ মা, বড় লজ্জারও কথা। ভগবানের ইচ্ছেয় শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমাদের তো তেমন অভাবও নেই আর—থাক না দুটো ভাত বেশী। ফেলা তো যাবে না। জল দিয়ে রাখলেই চলবে।'

'হ্যাঁ তা তো চলবেই।' মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে মহাশ্বেতা। সে ভাত খেতে হবে ওকেই। অতিথ-ভিখিরী আসে কদাচিৎ কোন দিন—তাও ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আর দেওয়া চলবে না, সে নাকি দিতে নেই। ফলে রোজই সেই পান্তা তুলতে হয় ওকে। মেজবৌ সাফ বলে দিয়েছে, 'ও আমার পোষাবে না। আর তুমিই বা খেয়ে মরতে যাও কি জন্যে? পুকুরে ঢেলে দাও গে না চুপিচুপি! যেমন কে-তেমনি।'

সেইটেই পারে না মহাশ্বেতা—জন্মাবধি দীর্ঘকাল অভাবের সংসারে কাটিয়েছে সে, এক মুঠো ভাতের মূল্য সে হাড়ে হাড়ে বোঝে। জানে যদিও যে, এ পয়সা বাঁচালে তার ঘরে উঠবে না কানাকড়াও, তবু পারে না।

শাশুড়ী এ খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন, অথবা খোঁচাটাই টের পেলেন না। শুধু বললেন, 'অ। তা শুনেছি মা মুড়ি কি চালভাজার সঙ্গে গুড় খেলে নাকি অম্বল হয় না।'

'না মা। আমার হয়। ও আপনি খান। তা ছাড়া পেটে আমার জায়গাও নেই।'

তার পর মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে বসে, 'হ্যাঁ মা, তা ছোট ঠাকুরপোর বিয়ে দেবেন না?'

ক্ষীরোদা কেমন যেন থতমত খেয়ে যান, 'তা কী জানি, কৈ অম্বিকাপদ তো কিছু বলছে না!'

'দেবেন আপনি ছেলের বে, তা মেজকর্তা কি বলবে শুনি? ছেলে আপনার না মেজকর্তার?'

'না—তা নয়।' আরও যেন থতমত খান ক্ষীরোদা, কেমন একটু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলেন, 'তা দিতে হবে বৈকি।...দেখি না হয় একবার মেজবৌকে বলে।'

'হাড় জ্বালা করে মা আপনার কথা শুনলে।' অনেক দিনের নিরুদ্ধ রাগ আর চাপতে পারে না মহাশ্বেতা, দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'বলি গিন্নী কে এ বাড়ির, আপনি না মেজবৌ? আপনি বেঁচে থাকতে ও কিসের গিন্নী শুনি? সব তাইতে মেজকর্তাকে আর মেজবৌকে টানেন কেন? বেশ তো, আপনি না পারেন আমাকে বলবেন—আমি তো হাজার হোক এ বাড়ির বড় বৌ।'

'বেশ তো, তা দাও না বাপু। আমার কি আর অসাধ ছোট ছেলের বৌ দেখা! তা ওরাই সব করে তো—তাই বলি। তা দাও না তুমিই। না হয় ওদেরই বল না একবার, ওরা আবার না কিছু ভাবে।'

সভয়ে সসংকোচে যেন কথাগুলো বলেন ক্ষীরোদা।

'বলবই তো। জোরের সহিত বলব। অত ভয় কিসের?'

এই বলে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে উঠে যায় মহাশ্বেতা।

শাশুড়ী এখনও একা বসেই খাচ্ছেন এবং খুকীও ওঠে নি—এ কথাটাও যেমন মনে থাকে না তার, তেমনি মেজবৌ ও মেজকর্তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে যে ও রাজী হয়ে গেল সেটাও মাথাতে যায় না!

পরের দিন খেতে বসে বলতে গেলে দুম্ করেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'একটা ভাল মেয়ে-টেয়ে খোঁজ কর্ মেজবৌ, ছোট্ ঠাকুরপোর বিয়ে দেব।'

প্রমীলা কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, 'ছোট কর্তার (মহাশ্বেতার থেকে 'কর্তা' কথাটাই এ বাড়িতে চালু হয়ে গেছে) বিয়ে দেবে? তুমি?'

ওর সেই দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সঙ্গে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল কিনা, তা মহাশ্বেতার নজরে পড়ে না—শুধু অকারণ জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—তা তোরা যখন কিছু উদ্যোগ-

সঞ্জুগ করছিস না—তখন আমাকেই দিতে হবে বৈকি !···আর ভাল দেখাচ্ছে না। ···তা ছাড়া সোমত্থ হয়েছে, যা হোক দু পয়সা রোজগারপাতিও করছে, দেব না-ই বা কেন বল্ !'

'তা তো বটেই। দেওয়াই উচিত।' এই বলে মুখ টিপে হেসে বাটিচচ্চড়ির লঙ্কাটা অকারণেই থালার ওপর টিপতে থাকে প্রমীলা। কেন যে আর ভাল দেখাচ্ছে না···সে কথাটাই শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারে না কিছুতে।

সেদিন প্রমীলার রান্নার পালা। দুর্গাপদ অফিস থেকে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে, প্রমীলা বড় জায়ের মতই দুম্ করে বলে উঠল 'শুনছ, বড়গিন্নী তোমার বিয়ে দিচ্ছেন যে।'

আসলে কথাটা আর চাপতে পারছিল না প্রমীলা।

দুর্গাপদ কিছুমাত্র ব্যস্ত হ'ল না। এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বার করে বললে, 'শুনব'খন—এখন চুপিচুপি একটু চা তৈরী কর দিকি !···সেদিনের চিনি একটু আছে না ? নইলে বড় গিন্নীর মেয়ের মিছরি থেকে একটু হাতসাফাই কর।'

এখনও এ অঞ্চলের চায়ের তত রেওয়াজ হয় নি। কলকাতায় চলছে বটে খুব—কিন্তু বড় মেজ দুই কর্তাই হাড়ে-চটা ও অভ্যাসের ওপর, তা দুর্গাপদ জানে। মেজকর্তার রাগটাই বেশি, সে প্রায়ই বলে, 'যাদের লক্ষ্মীছাড়ার দশা, তাদেরই ঐসব বদ্-অভ্যেস ত্যাখ গে যাও! কলকাতার বাবুদের সব ফোতো নবাবি। এধারে অবস্থা তো জানতে বাকি নেই আমার! দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে আছে—নবাবিটুকু চাই ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা! সায়েবরা খায়। আরে তোরা আর সায়েবরা সমান হলি ? তাদের রোজগার আর তোদের রোজগার ? তারা পায় তিন হাজার টাকা মাইনে, তোরা পাস তিরিশ টাকা। তাদের যা সাজে তা কি তোদের মানায় ?'

হয়তো ছোট ভাইয়ের 'ফোতো নবাবি'র দিকে এক-আধটু টানের আভাস পেয়েই কথাগুলো বলে অম্বিকাপদ, কে জানে!

তাই লুকিয়ে-চুরিয়েই চালাতে হয়। যেদিন প্রমীলার পালা না থাকে, সেদিন সুবিধা হয় না। মেজ বৌকেও ধরিয়েছে সে জোর করে। মেজ-বৌ অবশ্য রোজই আপত্তি করে। বলে, 'নেশা কি একদিন অন্তর করলে চলে! তার চেয়ে আমার পানদোক্তাই ভাল। কেউ বলবার নেই!'

দুর্গাপদও ছাড়ে না। বলে, 'না বাপু, চা আবার একা একা খেয়ে সুখ হয়

না।...একটু খাও, নইলে মৌতাত জমবে না!...রোস না—একটু সইয়ে নিই ব্যাপারটা, তাব পব ডোন্‌টো কেয়ার—সামনেই খাব।'

আজ কিন্তু প্রমীলার কাছে এ সব ব্যাপার তুচ্ছ হয়ে গেছে। সে জল চডাবার কিছুমাত্র আয়োজন না করে, ছোটকর্তার মুখের দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ কবে বলে, 'ঠাট্টা নয—সত্যি বলছি। বড গিন্নী বড্ড ব্যস্ত হয়ে পডেছে।'

'ব্যস্ত হওয়াচ্ছি!...বড গিন্নীর কি, আমি বিয়ে করি না-করি? বলে এক গাঁয়ে ঢেঁকি পডে ভিন্ গাঁয়ে মাথাব্যথা।...আমার জন্যে এত দরদ উথলে উঠল কেন হঠাৎ!'

'এর আর দরদ উথলে ওঠা-উঠির কি আছে।' একটা ছোট বাটি করে কাঠের উনুনের আঙরার ওপর জল চড়াতে চডাতে বলে প্রমীলা, 'সত্যিই তো, বিয়ের কি আর বয়স হয় নি তোমার? সে বড, তার একটা কর্তব্য আছে তো? আর তার কথাই বা বলি কেন—আমারও তো কর্তব্য। এখন কি বকম মেয়ে পছন্দ তাই বল?'

'নাও নাও—সারাদিন পরে বাড়ি এলুম, এখন ওসব বেয়াড়া ঠাট্টা ভাল লাগছে না।...ছুটো অন্য কথা বল।'

'ঠাট্টা কিসের?' প্রমীলা যেন অকস্মাৎ জ্বলে উঠল, 'ঠাট্টাটা কিসের দেখলে? আমরা তোমার গার্জেন নই? বিয়ের কথায় আবার ঠাট্টা এল কোথায়? আমরা বলছি, বিয়ে করবে।'

'ওসব হবে-টবে না। বিয়ে আমি করতে পারব না। এই সাফ বলে দিলুম। বেশী ঘাঁটিয়ো না আমাকে। শেষ অবধি একটা কেলেঙ্কার করব!'

'কেন? কেন করতে পারবে না শুনি?'

'পারব না, ব্যস্। তার আবার অত কৈফিয়েত কি?'

তার পর কতকটা যেন অর্ধ-স্বগতোক্তি করে—'ন্যাকা!'

'ত্যাখো—এই আমিও সাফ্ বলে দিলুম—ওসব ঢ্যাটাগিরি ছাড়। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আর ভাল দেখাচ্ছে না। বয়স হয়েছে—রোজগারপাতি করছ, এখনও বিয়ে না দিলে পাঁচজনে পাঁচকথা কইবে।'

'তা বলুক। পাঁচজনের কি ধার ধারি আমি!'

জল ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। এখনই হয়তো কে এসে পড়বে। তাই সামান্য বুজকুড়ি কাটতেই কাগজের মোড়ক থেকে চা পাতাটুকু ঢেলে দিয়ে একটা রেকাব চাপা দেয় প্রমীলা, তারপর বলে, 'তুমি না ধারো, আমরা তো ধারি!

আমরা মুখ দেখাব কি করে ?···বেশ বিয়ে না করতে চাও করো না—তবে এও বলে দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে আর তা হলে কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমি অন্তত আর কথা কইব না তোমার সঙ্গে। এইখানেই ইতি !'

দুর্গাপদ এবার রীতিমত হকচকিয়ে যায় যেন। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঐ নাও ! যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর।'

মেজবৌ কাঁসার গেলাসে দুধ চিনি ঢালতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে বসল এদিকে। দুই চোখে তার আগুন। বললে, 'তার মানে ? তার মানে তুমি আমার জন্যে বিয়ে করতে চাইছ না ?···তার মানে কি ? লোকে একথা শুনলে কি বলবে?...কী বলতে চাইছ পষ্ট করে খুলে বল দিকি !'

আর কিছুক্ষণ সেই প্রজ্বলন্ত মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবার পর দুই হাত জোড় করে দুর্গাপদ বললে, আমার ঘাট হয়েছে। তোমার যা খুশি তাই কর। আমি আর কিছু বলব না।'

'ঘাটই তো। একশো বার ঘাট হয়েছে।'

প্রমীলা চা ছেঁকে প্রায় ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে জোরে জোরে উনুনে ফুঁ পাড়তে থাকে। শুকনো কলার বাস্না ঠেলে দেয় তারই ফাঁকে—দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে উনুনটা।

দুর্গাপদ আর সাহস করে কিছু বলতে পারে না। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখে নেয় যে বাটির তলায় একটু চা অবশিষ্ট আছে। প্রমীলা নিজেই রেখেছে।

আশ্বস্ত হয় কতকটা। ভাগ্যিস্ নিজেই রেখেছে তাই, নইলে অন্যদিনের মত পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না ওর।

॥ ৩ ॥

বিয়ের কথাটা আগেই তুলুক, আর ওর নিজের ভাষায় 'জোরের সহিত'ই তুলুক—শুধু ওঠার অপেক্ষা, তার পরই মহাশ্বেতা তার যথাস্থানে অর্থাৎ পিছনে পড়ে গেল। প্রমীলাই সহজে এবং অনায়াসে কর্ত্রী হয়ে বসল এ ব্যাপারেও।

সে-ই হাঁক-ডাক করে পাড়ায় সবাইকে বলে এল মেয়ে খুঁজতে, আত্মীয়স্বজনদের চিঠি লিখতে বসল। এক কথায় তোলপাড় তুলল চারিদিকে।

ওর এ ব্যবহার মহাশ্বেতার বুদ্ধির অগম্য। তবে কি তার সন্দেহটাই ভুল ?

—আসলে মেজবৌর মনের ভেতরটা পরিষ্কার? 'কে জানে বাপু—বুঝি না!' ·· আপনমনে হতাশ ভাবে শুধু বলে বার বার।

ওর এত দূর কর্মক্ষমতাও নেই। বিয়ের কথা সে তুলেছিল বটে, তাই বলে তার জন্যে যে এত করতে হয় তা সে জানত না।

যথাসময়ে চারিদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল হু-হু করে। ওদের এখন অবস্থা ভাল, ছেলে সুপুরুষ, রেল অফিসে চাকরি করে—এ পাত্র দুর্লভ।

ক্ষীরোদা একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তা পাড়ার নীরো ঘটকীকে একবার খবর দিলে না কেন মেজবৌমা?'

প্রমীলা তাতে উত্তর দিয়েছিল, 'না মা। ঘটকীর সম্বন্ধে ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না। খোঁজখবর কিছু জানি না, যাকে তাকে এনে কি বাড়িতে ঢোকানো ভাল?··· জানাশোনা ঘরের মেয়ে চাই, যাদের বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা যাবে—তবে না!'

তার পর একটু থেমে মুচকি হেসে বলেছিল, 'চাই কি তা হলে আমরাও দেখে পছন্দ ক'রে আসতে পারি।'

ক্ষীরোদা চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ওমা সে কি, মেয়েরা আবার পরের বাড়ি ছুট্ করে মেয়ে দেখতে যাবে কি?'

'সেই জন্যেই তো একেবারে নিষ্পরের বাড়ির মেয়ে আনতে চাইছি না মা। আপ্ত-কুটুম্বের বাড়ি যাব, তার আর কথা কি, সে তো এমনিও যেতে পারি।'

'তাই বুঝি যাচ্ছে আজকাল সব? কে জানে বাপু। আমরা তো জানতুম মেয়েদের এসব কথায় থাকতে নেই!'

'কলকাতায় তো হামেশা যাচ্ছে। একেবারে অজানা-অচেনা লোকের বাড়িতেও যাচ্ছে। শাশুড়ী-ননদের মেয়ের বাড়ি গিয়ে কনে দেখা খুব চল হয়ে গেছে মা, আপনি ওসব খবরও রাখেন না!'

'তা হবে।' মিটমিট করে তাকান শুধু ক্ষীরোদা, তার পর বলেন, 'তবে যে শুনেছি ঘটকী এলে মেয়েরা ঘিরে ধরে তাকে, হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে, কনে কেমন যদি একটু শুনতে পায় এই লোভে!'

'ও কবেকার কথা বলছেন মা! ওসব ছিল আপনাদের আমলে। সে সব দিন আর নেই।'

অগত্যা ক্ষীরোদা চুপ করে যান। কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয় না—কিন্তু ভরসা ক'রে প্রতিবাদও করতে পারেন না।

কুটুম্বদের ঘর থেকেই সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল শেষ অবধি।

ক্ষীরোদারই বড় মেয়ের মামাতো ভাসুরের শালার মেয়ে।

অত দূর-কুটুম্বদের বাড়ি যাওয়া চলল না বটে, কিন্তু প্রমীলা বুদ্ধি করে মেয়েকে ননদের বাড়ি আনাবার ব্যবস্থা করলে। মহাশ্বেতা আর ও গিয়ে দেখে এল অম্বিকাপদকে সঙ্গে করে। দেখে আর কারুর মত না নিয়েই একেবারে পাকা কথা দিয়ে এল। মহাশ্বেতার সামনেই দিলে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা বা সবাইয়ের সামনে নিজের জাকে তিরস্কার করা উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে আর মহাশ্বেতার কিছুই করা হয়ে উঠল না। একথা সেকথার মধ্যে একসময় বিদায়ের সময় হয়ে এল।

ফেরবার পথে মহাশ্বেতা কথাটা তুলল অবশ্য, 'তুই যে হুট্‌ ক'রে কথা দিয়ে এলি, শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলি না, কারুর মত নিলি না, কাজটা কি ঠিক হ'ল? বাড়িতে ফিরে একটু সব দিক ভেবে দেখা উচিত ছিল না?'

'তুমি থাম দিকি দিদি! মেয়ে দেখলুম আমরা, শাশুড়ী কি বলবেন তাই শুনি? তা ছাড়া আমরা দুই বড় জা মত করলুম, এর ওপর আর কথা কি? আমরাই তো ঘর করব—না বেটাছেলেরা ঘর করতে আসবে?'

দুই জা যে একমত হয় নি, অন্তত মহাশ্বেতা যে মত দেয় নি, সংকোচে এটুকু কিছুতেই বলতে পারল না মহাশ্বেতা। কথাটা ঘুরিয়ে বলল 'তা এত মেয়ে দেখে এই কষ্টিপাথরের মত কালো মেয়ে তুই পছন্দ করলি কেন?'

'শুধু বুঝি রংই দেখলে? কালো তো আমরাও—উনিশ আর বিশ। গড়ন-পেটন ভাল, কেমন একটা লক্ষ্মীছিরি, এসব দেখলে না? রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? মেয়েটার কথাবার্তা চালচলনও বেশ ভাল, কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। শুধু রূপ দেখে উগ্রচণ্ডা মেয়ে এনে বাড়িতে ঢুকিয়ে পোড়াশান্তি হোক আর কি!'

'তা হোক বাপু, এ যেন বড্ড কালো। ছোটকত্তার অমন সাহেবদের মত রং, তার পাশে এই কয়লার বস্তা, লোকে কি বলবে বল দিকি!'

'সেই তো ভাল। বলি কালো মেয়েগুলোও তো পার হওয়া চাই। তারা যাবে কোথায় বল দিকি? তা ছাড়া ছেলেমেয়ে হলে বাপের অত রংয়ের কিছুও তো পাবে—অত কালো থাকবে না। কালোর সঙ্গে কালোর বিয়ে হলে ছেলেমেয়েগুলো যে আবলুস কাঠ হ'ত একেবারে!'

'সে যাদের ঘরে হ'ত তাদের ঘরে হ'ত, আমাদের কি?' মহাশ্বেতা অপ্রসন্নকণ্ঠে বলে।

'দেখব দেখব, বলি তোমারও তো মেয়ে হয়েছে, বাপের ধাতে তো যায়

ি। এমন কি মায়ের রং-ও পাবে না, তখন পার কর কি করে বুঝব!'

কথাটা এই প্রসঙ্গে এসেই শেষ হয়ে যায়। মহাশ্বেতার যে এ মেয়েতে অমত, সেটা কিছুতেই স্পষ্ট করে জানাতে পারে না।

বাড়িতে ফিরে শাশুড়ীকে বুঝিয়ে দেয় প্রমীলা, 'রংটা একটু চাপাই হ'ল মা, কিন্তু সব দিক তো দেখতে হবে। শুধু কটা চামড়া নিয়ে কি করব? বংশটা খুব ভাল। ঠাকুরঝি বললে, ওদের সবাই অমনি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, খুব মিষ্টি স্বভাব। আমাদেব ঘরে ও-ই ভাল। নইলে বাপু ঘব করতে পারতুম না।… বৌ আসতে না আসতে তিন ভাই তিন ঠাঁই হওয়া কি ভাল? তা ছাড়া বেশ গোলালো গোলালো গড়ন, মুখচ্ছিরিও মন্দ নয়। সব দিকে ভেবে ও আমি মত দিয়েই এলুম। এখন দেনাপাওনা আপনারা বুঝুন।'

'তা ছাখো তোমাদের যা মত হয়।…তোমরাই ভেবে ছাখো, যা ভাল বোঝ সবাই। আমি আর কি বলব। অম্বিকাপদ যদি মত করে—'

তিনি ঐখানেই থেমে গেলেন। প্রমীলা শেষের কথাটার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে কবলে না।

অগত্যা রাত্রে স্বামীব কাছেই কথাটা পাড়লে মহাশ্বেতা, 'কালো কুচকুচে, কয়লার মত রং। তোমাদের মেজগিন্নী গিন্নীমো কবে একেবাবে কথা দিয়ে এল। আমাকে একবার জিজ্ঞেস নেই, বাদ নেই, তুটি ঠোট ফাঁক কবতে দিলে না। …এর পর যেন তুষো না আমাকে!'

অভয়পদ একটা পুরনো হ্যারিকেন লণ্ঠন সারাচ্ছিল বসে বসে প্রদীপের আলোতে; বাড়িতে কেরোসিনের আলো ঢুকেছে বহুদিন, কিন্তু এ ঘরে তা জ্বালতে দেয় না অভয়পদ। বলে, 'অত চড়া আলোয় চোখ খারাপ হয়।' সে কাজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'তুজনে দেখতে গিয়েছিলে, মত দিয়ে এসেছ। আমরা এ-ই জানি। তোমার যদি এতই অমত ছিল, সেখানে বল নি কেন? মার কাছেও তো বলতে পারতে। আমাকে বলে কি হবে?…তা ছাড়া, কালো রং এইটেই বড় আপত্তির কারণ বলে আমিও মনে করি না।' তার পর একটু থেমে, অনেকদিন পরে একটু মুচকি হেসে (কাজ থেকে মুখ না তুলেই অবশ্য) বললে, 'তোমার রং যতই হোক, আমার চেয়ে তো ঢের নিরেস, কৈ তাতে তো তোমাকে পছন্দ করতে আটকায় নি আমার! মা'র মেজবৌমা ও কথাটা ঠিকই বলেছেন, বৌ আনতে হয় বংশ দেখে, ঘর দেখে—শুধু রূপটাই বিচার করতে নেই।'

সম্ভবত বার বার নিজের রং সম্বন্ধে ইঙ্গিত হতেই মহাশ্বেতা ক্ষেপে গেল

একেবারে। বাল্যকাল থেকেই এটা তার বড় দুঃখ, মা-ভাই-বোনদের মধ্যে তার রংটাই সব চেয়ে নিরেস, এখানে এসেও স্বামীর কাছে নিজেকে বড়ই ময়লা লাগে। (এত অযত্নেও মিন্‌সে'র গায়ের রং যেন অন্ধকারে জ্বলে।) সে প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'বেশ বেশ, মেজ বৌমা যখন বলেছেন তখন তো বেদবাক্যি হবেই—ঐ মেয়েই নিয়ে এস এবে-বেরে। আমারই ভুল হয়েছিল মহারানীর কথার ওপর কথা কইতে যাওয়া। এই নাক-কান মলছি, আর যদি কখনও এমন অন্যায় করি। তোমরা তিনটি ভাই যে এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছ তা তো জানিই, বোকা বলে তাই আবার গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাই।'

বলতে বলতে সে ঘুমন্ত মেয়েটাকেই সজোরে ঘুম পাড়াবার ভঙ্গিতে চাপড় মারতে থাকে, ফলে সেটা জেগে উঠে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। এইবার সব রাগটা গিয়ে পড়ে তার ওপর, সজোরে তার গালটা মুচড়ে দিয়ে বলে, 'মুয়ে আগুন! হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে একেবারে। মর্ মর্, শত্তুরের দল যত সব।'

অভয়পদর কিন্তু এসব কিছুতেই শান্তিভঙ্গ হয় না, সে আপনমনেই ভাঙা লণ্ঠনটা মেরামত করে যায়। মেয়েটা যে অকস্মাৎ কেন অমন ক'রে একেবারে ককিয়ে কেঁদে উঠল, সে কারণটাও জিজ্ঞাসা করে না।

ওর মুখ থেকে সব শুনে পিঁটকী মন্তব্য করেছিল, 'ওলো, ইচ্ছে ক'রে কালো মেয়ে আনছে, বুঝলি? পাছে সোন্দর মেয়ে এলে ওর ওপর থেকে সোহাগ কমে যায়—এই ভয়ে।'

কিন্তু প্রমীলার অন্য আচরণে সে মনোভাবটা খুঁজে না পেয়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে মহাশ্বেতা।

পাত্রী-পক্ষের কাছে এঁরা চেয়েছিলেন নগদ টাকাই বেশী। অর্থাৎ বিয়ের খরচটা যাতে ঘর থেকে বার করতে না হয়। অনেক দর-কষাকষির পর আটশো এক টাকা নগদ ও পঁচিশ ভরি সোনা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু প্রমীলা বেঁকে বসল, 'তা হবে না। আমাদের দুই জায়ের যা গহনা আছে ওরও তাই সমান হওয়া দরকার। তা নইলে খারাপ দেখাবে।'

ফলে আরও প্রায় দশ ভরি সোনা ঘর থেকে বার করতে হ'ল। তার ওপর আবার মেজ বৌ ধরে বসল, 'আর তো সবাই পার হয়ে গেছে, মা'র এই শেষ কাজ, ছোটকত্তার বিয়েতে রসুন-চৌকি বসাতে হবে।'

'পাগল নাকি, সে যে অনেক খরচ।'

'কী আর খরচ? আমি খোঁজ নিয়েছি, দশটা টাকা হলেই হয়ে যাবে।'

অম্বিকাপদ অবশ্য আর বিশেষ আপত্তি করে নি, শুধু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'এটা তো তোমাদের তুই জায়ের কারুর বেলায়ই হয় নি, তবে এটা করতে চাইছ কেন?'

তার জবাবে মেজবৌ বুঝিয়েছিল, 'তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা সমান হ'ল? গয়না তো বরং আরও বেশী দেওয়া উচিত ছিল, সে সব চেয়ে ছোট, আমাদের আদরের জিনিস।...বুঝতে পারছ না, একসঙ্গে ওঠা-বসা, একসঙ্গে ধর নেমন্তন্ন যাওয়া, সেই সময়টাই বড় দৃষ্টিকটু লাগে। আমরা বড়, আমরা পরে যাব, আর ও পরবে না—খারাপ লাগবে না? সবাই জানে যে এ বাড়িতে যে যার সে তার গয়না গড়ায় না—যা হয় সংসার থেকেই হয়। তখন তো সবাই বলবে যে ছোট ভাইটাকে ছেলেমানুষ বলে ঠকাচ্ছে এরা।'

এর পর অম্বিকাপদ কথা বলে নি। কিন্তু শানাইয়ের প্রস্তাবটা অভয়পদ এক কথায় নাকচ করে দিলে। মেজভাইকে ডেকে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'কী শুনছি, মেজ বৌমা নবৎ বসাতে চাইছেন? ওসব করতে যেও না। পাড়াঘরে সবাই ভাববে, এদের খুব পয়সা হয়েছে। এমনিতেই কানাঘুষো হয়। শেষ অবধি ডাকাত পড়বে।'

ভাসুরের কথার ওপর কথা খাটবে না, প্রমীলা তা ভাল ক'রেই জানে। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হয়।

কিন্তু শানাই ছাড়া ঘটা করবার আর যা যা ব্যবস্থা আছে, কোনটারই ত্রুটি ঘটল না। প্রতিবারেই 'ভেতো-যজ্ঞি' হয়, অর্থাৎ বৌভাতের হাঙ্গামাটা দুপুরে সেরে নেওয়া হয়, এবারে মেজবৌ লুচির ব্যবস্থা করলে, লোকও নিমন্ত্রিত হ'ল অনেক বেশী। তা ছাড়া আয়োজনটা হ'ল এবার রাত্রে। প্রমীলা বললে, 'পাতা পেড়ে বসে খেয়ে যাওয়াই ভাল। সেই জনাজাত ছাঁদা তো দিতেই হয়, মিছিমিছি দুপুরে বলে লাভ কি? আপিসের সময়, সবাই আসতে পারে না, কিছু না!'

অভয়পদ একবারই আপত্তি করেছিল, আর কোন ব্যবস্থাতে প্রতিবাদ জানায় নি, তবু মহাশ্বেতা তাতেই খুশী। মেজবৌর 'দপ্প' যে চূর্ণ হ'ল, এই আনন্দে সে পরবর্তী এত সমারোহের সব জ্বালা ভুলে গেল। অবশ্য খুব বেশী একটা ঈর্ষা ছিলও না।...তার বেলা যেমন হয় নি, তেমনি মেজবৌর বেলাও তো হয় নি, সেটাই কি কম সান্ত্বনা! ও ছোট, ওর বেলা হয় হোক।...শুধু মেজবৌর মনের ভাবটাই বুঝতে পারছিল না বলে মনে মনে ছট্‌ফট্ করছিল।

বিয়ের সব ব্যাপারেই প্রমীলা শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে গিন্নী হয়ে

বসল। এমন কি বরণের সময় সে যে বড় জাকে ডাকল, এটাও যেন মহাশ্বেতা আশা করে নি। কতকটা কৃতার্থ ভাবেই ছুটে এগিয়ে গেল সে। এতটা দাপট যে মহাশ্বেতা আর এক জন্ম ঘুরে এলেও দেখাতে পারত না, সেটা মনে মনে সে-ও স্বীকার করে।

'ওরই সাজে, সত্যি! কেমন পারে ও।' আপন মনেই বলে।

মহাশ্বেতা কেন, ক্ষীরোদা মরে' গেলেও যা পারতেন না, প্রমীলা সেটাও পারে অনায়াসে। বৌ আসবার সময় হতে উপস্থিত কুটুম্বিনীদের বেশ হেঁকেই শুনিয়ে দেয়, 'বৌ আসছে বাপু কালো; তা আগে থেকেই শুনিয়ে দিচ্ছি। কেউ যেন না তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিপ্‌টিনি কেটে কোন কথা বলে। আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমি তা হলে কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলব না!'

ওর এই দুঃসাহসে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন কি সেটা নিয়ে আলোচনা করারও যেন শক্তি থাকে না কারুর! মৃদু গুঞ্জন একটা ওঠে বটে, তবে সে অনেক পরে।

॥ ৪ ॥

বৌভাত নির্বিবাদে চুকলেও ফুলশয্যাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা এ পাড়াঘরে কেন, কলকাতাতেও কেউ কখনও কল্পনা করেছে কিনা সন্দেহ।

ক্ষীর-মুড়কি এবং হাতের সুতো খোলার পালা শেষ হবার পর, হঠাৎ দেখা গেল মেজবৌ নেই।

সামান্য একটু খোঁজাখুঁজির পরই সবাই চলে গেল ঘর থেকে। সকলের মুখেই একটু চাপা হাসি। অর্থাৎ মেজবৌয়ের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কারুর তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই। কারণটা সকলেই অনুমান ক'রে নিতে পারে।

দেখা গেল সকলের সঙ্গে ছোট কর্তারও ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় নি। সবাই চলে গেলে দুর্গাপদ তড়াক ক'রে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে, তার পর হেঁট হয়ে তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বার করলে কালো-কাপড়-মুড়ি দেওয়া প্রমীলাকে। এই গরমে পুঁটুলির মত বসে থেকে আধসেদ্ধ হয়ে গেছে সে।

খুব একচোট হাসাহাসি হ'ল বৈকি!

এমন কি কনে-বৌও ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে।

টেনে বাইরে এনেও আসামীকে শক্ত ক'রে ধরে ছিল দুর্গাপদ; বেঁকেচুরে এক

াস হাত ছাড়িয়ে দরজাব কাছে পৌছল প্রমীলা, 'বেশ ভাই বেশ, আপদবালাই ›ললুম, মনেব সুখে পীরিত কর – হ'ল তো ?'

কিন্তু দুর্গাপদ তারও আগে গিয়ে বন্ধ কপাটে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল।

'উঁহু তা হবে না। ছিলে যখন, এখানেই থাকতে হবে।'

ছাড় ছাড়, কী ইয়ার্কি হচ্ছে।'

'ইয়ার্কি আবাব কি ? থাকই না।'

হ্যা, তোমাব ফুলশয্যেয আমি কাঁটা হ্যে থাকি আর কি। ছোট বৌ ়মন্দি দিক শেষে।'

'ফুলে তো কাঁটা থাকেই, এ আব এমন নতুন কথা কি ? না হয় কাঁটাই হযে ›লে।'

এই ছাড, সত্যি। লোকে কি বলবে ? ছোট বৌই বা কি মনে করবে। ›য্যেব বাত বলে কথা, এ তো আব জীবনে দুবাব আসবে না।'

'লোকে আবার কি ভাববে। আব একজন মানুষ তো আছে। এসো সবাঃ ধ ল গল্প ক'রে কাটিয়ে দিই। কতটুকুই বা বাত বাকী আছে। এসো, এসো।'

এক রকম জোর ক'রেই হাত ধবে বিছানাব কাছে টেনে আনে দুর্গাপদ। ়া প্রমীলাও শেষ পর্যন্ত খুব জোব দেখায না। ছোট বৌকে মাঝখানে ়ল দিযে এক পাশে শুয়ে পড়ে সত্যি-সত্যিই।

ার পর ওরা দুজনে বেশ গল্প জমিয়ে তোলে। এটা-ওটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ া। বিয়ে-বাড়িতে সমাগত আত্মীয়-কুটুম্বিনীদের বিচিত্র আচবণ নিয়ে হাসিঠাট্টাই ়শী। মনে হতে লাগল, ওদেব মাঝখানে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে-শুয়ে-থাকা আব কটি মেয়ের অস্তিত্ব ওরা ভুলেই গেছে।

বাইরে যারা আড়ি পাতবার আশায় ছিল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে তারাও। এমন ভাবনীয় কাণ্ড আর এমন প্রচণ্ড দুঃসাহস স্মরণকালের মধ্যে কেউ কখনও নেছে বলে কারও মনে পড়ে না। আড়ি পাতবার মজাটা না হওয়ায় াদব আক্রোশ আরও বেশী। কিন্তু সে শুধুই ব্যর্থ আক্রোশ, মেজ বৌকে যে াদব কোন আঘাত কখনও লাগবে না, তা তারা জানে।

ছোট বৌ তরলার ঠিক কি অনুভূতি হচ্ছিল, তা বলা শক্ত। দুঃখ বা বেদনার ়যেও বেশী যেটা, সেটা বিস্ময়! এক রকমের নাম-না-জানা আতঙ্ক-মিশ্রিত বিস্ময়

পনেরো বছর বয়স হ'ল তার; এর মধ্যে বহু মেয়ের ফুলশয্যার বহু বিবরণ সে নেছে, কৈ কোনটার সঙ্গেই তো মেলে না এ অভিজ্ঞতাটা! এ তার কী হ'ল ?

অবশ্য মেজ বৌ সকাল পর্যন্ত রইল না ওদের ঘরে। হাসিগল্পের মধ্যেই দূরের চটকলে চারটের ভোঁ বাজা শুনতে পেয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এক লাফে উঠে, দুর্গাপদ ব্যাপারটা কি বোঝবার বা বাধা দেবার আগেই, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কপাটটায় শেকল তুলে দিলে।

তার পর এক মুহূর্ত সেইখানে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করল। মেজ কর্তা নিশ্চয় দোর দিয়েই ঘুমোচ্ছে, ডাকাডাকি করতে গেলে বাড়িসুদ্ধ জেগে উঠবে। এত হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই, ওপাশের দালানে বিছানা ক'রে ওর বড় ননদ ঘুমোচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত সেইখানেই গিয়ে এক পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রতনের বাড়ি কান্তি সুখেই আছে বলতে হবে, কিন্তু শান্তিতে নেই। অথচ কেন যে শান্তিতে নেই, কেন যে সে সর্বদা একটা অস্বস্তি বোধ করে—তা সে নিজেও কেমন ভাল করে বুঝতে পারে না।

রতনদি তাকে খুবই যত্ন করে অবশ্য। পাছে আশ্রিত মনে ক'রে ঠাকুরচাকররা অবহেলা করে বা তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত ভাবে এই জন্যে সে ছুটির দিনে দুপুর-বেলায় কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। কারণে অকারণে মোক্ষদাকে উপলক্ষ ক'রে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'দেখিস—কুটুম মানুষ, যত্ন করিস। নিন্দে না হয়।'

রতনদি মানুষ ভাল, খুবই ভাল। এমন মিষ্টি কথাবার্তা, এমন সস্নেহ মধুর ব্যবহার কান্তির কাছে অবিশ্বাস্য। রতনকে দেখে বড়লোক সম্বন্ধে ধারণাটাই তার পালটে যাচ্ছে। বড়লোক বলতে কান্তিরা এত কাল সরকারদেরই জানত, এখানে এসে কান্তি বুঝেছে যে এরা সরকারদের চেয়ে ঢের বড়লোক। কিন্তু তবু তাদের মত একটুও নয় তো! সরকার-বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে ওর মনের মধ্যে বড়লোকত্বের সঙ্গে রূঢ় কর্কশ কথা এবং উদ্ধত অবহেলা অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। তাই, এখানে এসে প্রথম প্রথম এদের, বিশেষত রতনদির কথাবার্তা শুনে, তার সঙ্গে সংসারের চারিদিকে ছড়ানো প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের চিহ্নগুলোকে খাপ খাওয়াতে পারত না। সবটাই যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যেত।

তবু রতনদি যেন কেমন!

ওর মধ্যে যেন দুটো মানুষ আছে।

একটা দিনের বেলা—মানে বেলা আটটার পর থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তার সঙ্গে সদয় মধুর ব্যবহার করে, মিষ্টি কথা বলে, লেখাপড়ার খোঁজ নেয়, কত কি গল্প বলে, ভাল ভাল বই থেকে গল্প পড়ে শোনায়—ওর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখে; কিন্তু রাত আটটা বাজলেই অন্য একটা মানুষ যেন ওর মধ্যে ভর করে। সে যেন একেবারে আলাদা। তাকে দেখে ভয় হয় এবং বলতে নেই—ভাবতে গেলে মনের মধ্যে একটু লজ্জাই অনুভব করে কান্তি—ঘৃণাও হয়।

রতনদিও তা জানে বোধ হয়। সে তেতলার একটা ছোট্ট ঘরে কান্তির থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। এবং প্রথম দিনই বলে দিয়েছে—'সন্ধ্যের পরই তোমার ঘরে উঠে যেও, লক্ষ্মী ভাইটি। বিশেষ দরকার না পড়লে নিচে নেমো না। রাত্রের খাবার যাতে আটটার মধ্যেই হয়ে যায় বামুন ঠাকুরকে বলে দিয়েছি—খেয়েদেয়ে ওপরে চলে যেও—পড়াশুনো ক'রে ঘুমিও। ভয় পেও না, মোক্ষদাকেও এখন থেকে রাত্তিরে ওপরেশু তে বলেছি। তোমার পাশের ঘরেই সে থাকবে— ভয়-টয় পেলে তাকে ডেকো।'

তার পর একটু থেমে ঢোঁক গিলে বলেছে যে—'তোমার ভগ্নীপতি বড় রাগী মানুষ, তা ছাড়া কারণে-অকারণে বড় হৈ-হল্লা করে—তাই হয়তো চেঁচামেচি শুনবে, কিন্তু তাতে ভয় পেও না। নিচে নামবারও দরকার নেই। কী জানি কি মেজাজে থাকবে, কোন দিন কি বলবে-টলবে—সে তোমারও অপমান আমারও অপমান। দরকার কি!'

কান্তি সে নির্দেশ সাধ্যমতই পালন করত অবশ্য। ইস্কুল থেকে ফিরে দোতলায় রতনদির ঘরে বসে একটু-আধটু গল্প করত—তার পর সন্ধ্যে হলেই ওপরে গিয়ে পড়তে বসত। সাড়ে সাতটা নাগাদ মোক্ষদা আসত ডাকতে—'খাবে চল গো দাদা, তোমার খাবার হয়ে গিয়েছে।' একবার গিয়ে খেয়ে আসত নিচে থেকে। তার পরই যে ওপরে এসে ঢুকত—আর বড় একটা নামত না। কেবল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এক আধ দিন নামতেই হ'ত—সে দৈবাৎ, কিন্তু তাতেই সে নিচের একটা বীভৎস জীবনের আভাস পেত। শুধু হৈ-হল্লা চেঁচামেচি নয়—আরও সব কত কি! কী একটা উগ্র গন্ধও পেত, প্রথম দিন সে গন্ধে বমি এসে গিয়েছিল ওর। অনেকদিন পরে মনে পড়েছিল—এই গন্ধ একদিন ও শিবপুর থেকে মা'র সঙ্গে হেঁটে ফিরতে ফিরতে পেয়েছিল। ওদের পাড়ারই পেঁকো মল্লিক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল কেমন একরকম টলতে টলতে—তার গা থেকেও এমনি গন্ধ পেয়েছিল।

মা বলেছিল, 'উঃ, পেঁকো মল্লিক মদ খেয়েছে!' এটাও তাহলে মদের গন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, 'রতনদির বর মদ খায়! ছিঃ!'

একটু দুঃখও হয়েছিল তখন 'ঐ জন্যেই রতনদি নিচে নামতে বারণ করে। লজ্জা পায় বলে। আহা বেচারী!'

কিন্তু যেদিন আবিষ্কার করল যে শুধু রতনদির বর নয়—রতনদিও নেশা করে, ওর সেদিনের দুঃখ ভোলবার নয়।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে, কান্তির দু চোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে। মোক্ষদা অবশ্য শেজ-এর আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ—এটা সারা রাত জ্বলে, কান্তি আসার পর রতনই এ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, বলে, 'ছেলেমানুষ একা শোবে, আলো না থাকলে ভয় করবে'—সুতরাং হাত বাড়িয়ে ওর পড়বার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চোখ বোজাব অপেক্ষা, আর কিছুই করবার নেই। তা-ই করতে যাবে, হঠাৎ নিচে বিরাট একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল উঠল। এসব অবশ্য আজকাল ওর কতকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এমন কি রাশি রাশি কাচের বাসন বা বোতল ভেঙে পড়বার শব্দেও বড় একটা ওর শান্তিভঙ্গ হয় না—তবে আজকের এ হৈ-হল্লাটা যেন বিশেষ রকম। অভ্যস্ত শব্দগুলো আজ একটু বেশী হচ্ছে—তাতেও হয়তো কান্তি এত বিচলিত হ'ত না, কিন্তু—কে কাঁদছে না? আর একটু কান পেতে শুনতেই মনে হ'ল—রতনদিই কাঁদছে।

আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না কান্তি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে নেমে এল। নিচে আসতেই নজরে পড়ল, ওরই ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে রতনদি—কপালটা কাটা, তা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বুকের কাছে কাপড়টা পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ভাঙা ডিশ ও বোতল ছড়ানো। ভেতর থেকে কে একজন জড়ানো জড়ানো গলায় তখনও চেঁচামেচি করছে। ঠাকুর-চাকররা ছুটে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে, আর মোক্ষদা এসে হাত ধরে টানছে রতনদিকে। শুধু- ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দেখে নিলে কান্তি, নিচে কর্তাঠাকুরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে, কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসেন নি।

রতনকে ঐ অবস্থায় দেখে কান্তি আর থাকতে পারলে না, কাচ বাঁচিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, 'কী হয়েছে রতনদি, কেটে গেল কী ক'রে!'

রতন কান্না থামিয়ে উগ্র কণ্ঠে ওকে তেড়ে উঠল, 'তুই কেন রে ছোঁড়া এখানে? একশো বার বলেছি না নিচে নামবি না। [illegible] চোড়ে-পাকা হয়ে

উঠেছে এরই মধ্যে? বালামচালের ভাত* পেটে পড়তে না পড়তেই পিপুল পেকে গেছে? ..যা বেরো—ওপরে যা! ফের যদি ডেপোমি করতে আসবি তো দূর ক'রে দেব—যেখানে ছিলি সেখানে!'

ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পা পা ক'রে পিছিয়ে গেল কান্তি। কিন্তু তবু তারই মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য ক'রে গেল—রতনদির মুখেও সেই বিশ্রী গন্ধটা। তারও পা টলছে।

তা হলে রতনদিও।

চোখের ঘুম কোথায় চলে গেল ওর। বহু রাত্রি পর্যন্ত ছাদে জেগে বসে রইল কান্তি। প্রথমে অপমানটাই খুব লেগেছিল ওর, ওরও কান্না পেয়ে গিয়েছিল—দাসী-চাকরের সামনে এ কী অপমান! সে যে আশ্রিত, সে যে অন্নদাস, নিরুপায়—যে কথাটা রতনদি নিজেই এতদিন ঢাকবার চেষ্টা করত, সেইটেই প্রচার ক'রে দিলে নিজেই! এর পর ওরা কী চোখে ওকে দেখবে—কি করুণা ও বিদ্রূপের চোখে—সেইটে কল্পনা ক'রেই ওর কান মাথা গরম হয়ে উঠল, চোখ ফেটে জল এল। অপমান ও লাঞ্ছনা ওদের নতুন নয়—কিন্তু এখানে এসে এত আদরযত্ন এত সম্মান পাবার পর এ আঘাতটা যেন বড় বেশী বাজল!

নিচের গোলমাল শান্ত হয়ে এসেছে। মোক্ষদা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সরাচ্ছে আস্তে আস্তে—নিচে রান্নাঘরে সামান্য খুটখাট আওয়াজ, ঠাকুর দ্রুত কাজ সেরে নিচ্ছে তার একটু পরেই ওদেরও খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবে—বাড়ি শান্ত ও ও নিস্তব্ধ হয়ে আসবে।

তবু ঘুম এল না কান্তির। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর নিজের অপমানের জ্বালাটা গেছে, কিন্তু রতনদির কথাটা ভুলতে পারছে না। কান্নার ফলে রগের পাশ দুটো দপ্‌দপ্ করছে, মাথাটা ধরে উঠেছে—তবু ঘুম নেই।

আর একটু পরেই মোক্ষদা শুতে এল। হাতে অভ্যস্ত কেরোসিন তেলের পাত্র। শোবার আগে হাজায় দিতে হয় ওর। কিন্তু কান্তিকে দেখে আর ঘরে গেল না, সেইখানেই পা ছড়িয়ে বসল পায়ে তেল দিতে।

'ওমা, এখনও ঘুমোও নি বুঝি দাদাবাবু? আহা, দিদির ব্যাপারটা বড্ড লেগেছে, না? তা তুমি ওসব গায়ে মেখো নি, বুঝলে? ও কি আর ও বলেছে, নেশায় বইলেছে। নইলে মানুষ তো দ্যাখো—ঐ সব কথা বলবার কি মানুষ?...

---

* সেকালে বাখরগঞ্জ বা বরিশালের বালামচাল কলকাতায় খুব বেশী চালু ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এর চলন কমতে থাকে। কিন্তু নাম[illegible] ছিল অনেক দিন।

এই বাপু তোমাকে বলা রইল, নিচে যাই হোক না কেন, অক্তগঙ্গা কি পেলয় কুলুখেত্তর ঘটে যাক—তুমি নিচে নেমো নি।'

কান্তি আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে মোক্ষদার পাশে এসে বসে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা রতনদি ঐসব ছাইভস্ম নেশা করে কেন মোক্ষদাদি? ওতে যে শুনেছি শরীর খারাপ হয়ে যায়। মানুষ আর মানুষ থাকে না!'

'করে কেন! আ আমার কপাল!' ফিস ফিস ক'রে বলে মোক্ষদা, 'ও কি আর সাধ ক'রে করে? ওকে যে জোর ক'রে করায়! কী করবে বল! আগের যে বাবু ছেল সে ছেল দেবতা। আসত যেত কাকে-পক্ষীতে টের পেত নি! আত নটার পর আসত, ওদিকে আত থাকতে থাকতেই চলে যেত।...কপাল খারাপ তাই সে বাবু গেল।...তা কি দুটো দিন নিস্তার আছে, কি একটু খোঁজখবর ক'রে বেছেবুছে নেবার জো আছে? ঐ যে দত্যিদানা আছে ঐ নিচের ঘরে শুয়ে—মুয়ে আগুন, মাক্কণ্ডির পেরমাই নিয়ে এসেছে যেন, মরণও নি। না ওর না ঐ মাগীর—বসে বসে মেয়ে-বেচা পয়সায় খাচ্ছে, তবু মরবার নাম নি।...ঐ মিন্‌সে গো—ঐ কত্তাবাবু কি চোখে-কানে দেখতে দিলে আত না পোয়াতে পোয়াতে নিজে কক্করে দুটি হাজার টাকা গুনে নিয়ে এই মিন্‌সেকে জুটিয়ে দিলে। এ কি মানুষ, আক্কস! নিজে পিপে পিপে মদ গিলছে, মেয়েটাকে সুদ্দু মাতাল ক'রে ছাড়ছে! নইলেই মেজাজ, ভাঙবে চুরবে মারধোর করবে—যাচ্ছেতাই কাণ্ড, বেলেল্লাগিরির একশেষ। তবে হ্যাঁ—দুটো গুণ আছে, পয়সা ঢালে অজচ্ছল, একটা ভাঙলে তিনটে পাঠিয়ে দেবে পরের দিন আর ভোরটি হবে, দুটি কাপ চা গিলবে পর পর—তার পরই পালাবে। মেয়েটার ছুটি, পরের দিন আত আটটার আগে আর টিকি দেখাবে নি। ছুটির দিনেও দোপরে আসে না। সেখানে নাকি এক খাণ্ডারনী আছে, তাকে ও ভয় করে খুব শুনেছি।'

মোক্ষদা বোধ করি নিঃশ্বাস নেবার জন্যেই থামল একটু।

কান্তির তখন মাথা ঘুরছে যেন। এসব কথা ওর কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, জটিল।

'বুড়োকত্তা' অর্থাৎ রতনদির বাবা একজন আছেন বটে—শুনেছে, ঠাকুরের আর মোক্ষদার কাছেই শুনেছে, বড্ড বদ্‌মেজাজী রাগী—সেই জন্য তাঁর ত্রি-সীমানায়ও যায় না কান্তি। আর বুড়ো-মত মেয়েছেলেও একজন আছেন—তিনিই নাকি রতনদির মা—রোগা ক্ষয়া-ঘষা একরত্তি। তাঁকে এক দিন মাত্র দেখেছিল, তিনি নাকি ঠাকুরঘরের বাইরে বেরোন না। তিন-চার দিন অন্তর সামান্য হবিষ্যি

থান। মোক্ষদা বলে, 'বেরোয় না তাই বেঁচে গিয়েচ। যা ছুঁচিবাই, মাগো, তাইতেই আমার এই হাতেপায় ঘা ধরে গেছে। নিত্যি বেরোলে তো পাগল হয়ে যেতুম!'

কান্তির কানে গেল মোক্ষদা কেরোসিন তেল পায়ে ঘষতে ঘষতে তখনও বলে চলেছে, 'তেমনি জব্দ হয়েছে মিন্‌সে। আগে ওঁরও অমনি ছিল, কথায় কথায় আগ, কথায় কথায় দম্বষিয্যি, থালাবাসন ছোঁড়াছুঁড়ি—এ বাবু আসবার পর একেবারে কেঁচোটি। এক দিন কি করেছিল চেঁচামেচি, অমনি তেড়ে নিচে গিয়ে বলে দিলে, "ভ্যাখো, চুপচাপ থাক তো থাক, নইলে দারোয়ান দিয়ে বার ক'রে দেব। মেয়ের পয়সায় খাচ্ছ, অত আবার মেজাজ কিসের? নজ্জা ক'রে না?"—সেই দিন থেকে একেবারে ঠাণ্ডা! থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়েছে তো!...বেশ হয়েছে। মুয়ে আগুন। অমন বাপের মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয়।'

কান্তির কিন্তু এসব কথায় তত কান ছিল না। তার মনের মধ্যে যে সমস্যাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেইটেই আর চেপে রাখতে পারলে না। আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা মোক্ষদাদি, আগের বাবু এ বাবু কি আলাদা?...মানে রতনদির কি দুটো বিয়ে?'

'বে!' মোক্ষদা যেন থতমত খেয়ে যায়, 'হ্যাঁ তা বে-ই বলতে পার।...আমার হয়েছে যেন মরণদশা, কি বলতে যে কী বলে ফেলি। মুয়ে আগুন, বুড়ো হয়ে মরতে চনুম্ এখনও হস্তিদীগ্যি জ্ঞান হ'ল না। মুখে লাগাম এল না।...হেই দাদাবাবু এসব কথা যেন ঘুর্ণাক্ষরে বলো নি কাউকে—তা হলে আমার চাকরি থাকবে না। মরে যাব একেবারে। সাত দোহাই তোমার!'

মোক্ষদা কেরোসিনের হাতেই কান্তির হাত দুটো চেপে ধরে।

তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়ে সে বলে, 'ছি! কী ভাব আমকে তুমি মোক্ষদাদি! আমি এসব কথা কাকে বলতে যাব? তুমি নিশ্চিন্তি থাক, আমি কাউকে বলব না!'

'দেখো বাপু!' তার পর নিজের গালে নিজেই দুই চড় মারে মোক্ষদা, 'এই, এই!...এই নাককান মলা খাচ্ছি।...তবু যদি চৈতন্যি হয়!'

তার পর নীরবে আর কিছুক্ষণ পায়ে তেল ঘষে মোক্ষদা প্রচণ্ড একটা হাই তুলে বলে, 'যাই, আবার তো সেই ভোরে উঠে চাদ্দ বাটি চা দেওয়া। বলি দাসী-চাকর তো পঞ্চাশ গণ্ডা! অথচ যা কিছু সবই তো এই মুকী ছাড়া চলে না! দেখছ তো নিজের চোখে?'

॥ ২ ॥

কিন্তু শুধু রাত্রেই নয়, সকালেও স্নানের আগে পর্যন্ত রতনদির মেজাজ যেন কেমন থাকে। কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কান্তি। সাতটায় ওঠে, বিছানা থেকেই চা খেয়ে আটটা নাগাদ কলঘরে ঢোকে, বেরোয় পুরো দেড় ঘণ্টা পরে। তখন একেবারে নতুন মানুষ। কিন্তু বিছানা থেকে ওঠবার পর আর কলঘরে ঢোকার আগে অবধি মেজাজ যেন চড়েই থাকে। যাকে সামনে পায় খিঁচোয়, ঝি-চাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে, তুচ্ছ কারণেও রেগে আগুন হয়। এক দিন সেই সময়টা নিতান্ত প্রাকৃতিক কারণেই কান্তিকে নিচে নামতে হয়েছিল, ওর সামনে পড়তেই যেন তেড়ে মারতে এল, 'এই ছোঁড়া, দিন নেই রাত নেই তুই যখন-তখন নিচে ঘুরঘুর করিস কেন বল্ তো? পড়াশুনো নেই তোর? মা এই করতে পাঠিয়েছে এখানে?'

কান্তি তো আড়ষ্ট। প্রথমটা ভয়ে কথাই বেরোয় না, অতিকষ্টে বললে, 'না —আমি তো মানে এই আজই—'

'আজই!' ভেঙিয়ে বলে রতন, 'আজই! যেদিন দেখি সেইদিনই আজ! না? যা পড়তে বস গে যা!'

প্রাকৃতিক কাজটা মাথায় তুলে ফিরে আসতে হয়েছিল কান্তিকে।

কিন্তু একটু পরেই রতন কলঘরে ঢুকল। মোক্ষদাকেও রোজ প্রথমটা ঢুকতে হয় ওর সঙ্গে, তারই মধ্যে এক ফাঁকে সে ওপরে উঠে বলে গেল, 'যাও গো দাদা, এবার নিচোয় চলে যাও। আর কিছু বলবে নি, চান ক'রে যখন বেরোবে—তখন দেখো নতুন মানুষ!'

সত্যিই তাই। স্নান ক'রে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম সেরেই রতন ওর ঘরে এসে দাঁড়ায়, 'কান্তি কিছু মনে করিস নি ভাই।' বলে হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুটো আঙুলে ক'রে ওর দাড়িটা তুলে ধরতেই কান্তি আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ওর চোখে জল এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে রতন নিজের মূল্যবান ধোপদস্ত ফরাসডাঙ্গার শাড়ির আঁচল দিয়েই ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'এই দ্যাখো… পাগল! একেবারে চোখে জল এসে গেল!…ওরে তখন বড্ড মাথা ধরেছিল, কী বলছি কী করছি—সে কি জ্ঞান ছিল কিছু?…রাগ করিস নি লক্ষ্মীটি!'

আরও অনেক মিষ্টি কথা বলে চলে গিয়েছিল রতন।

না। কান্তির কাছে এ আচরণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু বুঝিয়ে দেয় মোক্ষদাই—
তিনি সন্ধ্যেবেলা এক ফাঁকে এসে হঠাৎ পা ছড়িয়ে বসে বলে, 'সকালে বুঝি গিন্নী

এসে আবার তোমার কাছে ঘাট মেনে গেল? দেখলে? আমি বলি নি তোমাকে যে চান করে বেরোবে নতুন মনিষ্যি!'

'আচ্ছা অমন কেন হয় মোক্ষদাদি?' প্রশ্ন না ক'রে পারে না কান্তি।

'ওরে বাবা, সকালে যে মাথা ধবে থাকে। পেচণ্ড মাথাধরা, ও আমি জানি যে।...দিনকতক আমাব মানুষও ঐসব ছাইভস্ম ধরিয়েছিল কিনা...ঐ ছ্যাখো আবার কি বলতে কী বলে ফেলি। মবণদশা আমার!'

'রোজ মাথা ধরে থাকে?'

'ওজ। পেত্যহ।...আসল কথা খোঁযাড়ি ভাঙে না তো! আবার যদি সকালে একটু ঢুকুঢুকু চালাত তো চাঙ্গা। তা তো চালায় না। ঐ চান করে দেড় ঘণ্টা ধরে, কলের নিচে মাথা পেতে বসে থাকে—অন্তত দশ-পনেরো মিনিট—তবে ছাড়ে। তখন আবার মনিষ্যিজন্ম ফিরে আসে!'

একটু চুপ ক'রে থেকে কান্তি বলে, 'আচ্ছা অতক্ষণ ধরে জলে থাকেন, অসুখ করে না?'

'অব্যেস? তবে আর অব্যেস বলেছে কেন? অব্যেসে সব হয় রে ভাই!

'ওঁব সঙ্গে তুমিও থাক কেন?'

'ওমা তেল মাখাতে হয় যে! চান করার কত পব্ব তা তো জান না। ঐ যে দেখছ মাছি-পিছলে-পড়ছে ভেলভেট সাটিংয়ের মত মোলাম চামড়া, ওকি অমনি হয় নাকি? কত ছেলাবত ওর, অমন ছেলাবতে থাকলে আমাদের চামড়াও অমনি হ'ত! শোন, পেথম তো আমি সুদ্দ কলঘরে ঢুকে তেল মাখাতে বসব—অমন একটি ঘণ্টা ধরে চুপচুপে ক'রে তেল মাখবে, ঐ যে কলঘরে বড় সাদা পাথরের জলচৌকি আছে, দেখেছ তো? ওটা শুধু তেল মাখবার জন্যেই। তার পর বেসম দিয়ে সেই তেল আবার তুলতে হবে। তার পর তো আমি বেরিয়ে আসব, উনি তখন বেশ ক'রে সাবান মাখবেন। তার পর চান-টান সারা হলে গা মাথা মুছে গন্ধ-তেল মাখা হবে। গায়েও সেই তেল পড়বে, তবে আল্‌তো। তার পর আবার দু-চার ঘটি জল গায়ে ঢেলে গা মুছে তবে বেরোবে। ছ্যাখ না—যখন বেরিয়ে আসে কেমন ভুরভুর করে খোসবো—গা থেকেও অমনি খোসবো বেরোয়!'

তার পর উঠে যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কতকটা স্বগতোক্তিই করে মোক্ষদা, 'যে ব্যবসার যা! নইলে পয়সা আসবে কেন?'

সত্যিই—রতনদির গায়ের চামড়া একটা দেখবার মত—ভাবে কান্তি, তার মাও [illegible] ফরসা, মেজদির তো কথাই নেই, কিন্তু অমন চামড়া কারুর নয়।

…ঐ জন্যেই অত বড় কলঘর লাগে রতনদির—ঐ কলঘরে রতনদি আর জামাইবাবু ছাড়া কারুর যাবার হুকুম নেই। এক দিন শুধু ঢুকে দেখেছিল কান্তি। কী বড়—একেবারে একটা শোবার ঘরের মত। এক দিকে চৌবাচ্ছা, ঝাঁঝরি কল, তার মধ্যেই এক কোণে একটা চেয়ারের মত—ঐটে নাকি পাইখানা। জলচৌকিই আছে দুটো। একটা কলের নীচেই—আর একটা শ্বেতপাথরের চৌকি, কিছু দূরে। এক ধারে তাকে সাজানো সার সার তেল সাবান—আরও কত কি, শিশিতে শিশিতে কৌটোয় কৌটোয়। একটা মানুষের এত কি লাগে চান করতে ভেবে পায় না কান্তি। তার মা-দিদিরা তো মাথার মাঝখানে একটু তেল থাবড়ে দিতে দিতে ছোটে পুকুরঘাটে। তাই মেজদির কি মেঘের মত এক ঢাল চুল।…

মোক্ষদার শেষ কথাটা ভাল বুঝতে পারে না কান্তি—ওটা কি বলে গেল? মোক্ষদাদিটা আস্ত পাগল!

॥ ৩ ॥

কিন্তু ক্রমশ একটু একটু আঁচ পায় বৈকি।

আশপাশের বাড়িগুলোও যেন কেমন কেমন। দিনের বেলা সব নিথর—চুপচাপ। রাত হলেই জেগে ওঠে। ঘরে ঘরে আলো, হাসি-তামাশা, মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাড়ি থেকে গানবাজনারও শব্দ আসে। কিন্তু আবার সকাল হলেই ভোঁ ভোঁ, নিবান্দাপুরী। সেই রূপকথার ঘুমন্ত দেশের মত। তা ছাড়া কোনো বাড়িতেই যেন পুরুষ নেই—থাকলে দু একজন। পুরুষ বলতে চাকর—তাও ঝিই বেশী। তারাই বাজার করে, তারাই দোকানে যায়, সব। এক-একটা বাড়িতে বোধ হয় অনেক ঘর ভাড়াটে থাকে, এক ঝিই কিন্তু সব ভাড়াটের বাজার করে। সে এক মজার কাণ্ড, কত দিন ইস্কুল যেতে যেতে দেখেছে কান্তি, ওধারের বড় রাস্তায় কারুর রকে বসে হিসেব মিলোচ্ছে। একটা ঝি তো পেয়ে বসেছে তাকে, দেখতে পেলেই ডাকবে, 'ও খোকা শুনে যাও, নক্ষীদাদা আমার—হিসেবটা একটু বুঝ্‌ ক'রে দিয়ে যাও না!' আসলে সবার বাজার থেকেই চুরি করে—কান্তি হিসেব 'বুঝ্‌ করতে' গিয়েই বুঝে নিয়েছে। পাছে ওখানে গিয়ে হিসেব গোলমাল হয়ে যায় তাই রাস্তা থেকে হিসেব বুঝে চুরির পয়সা আলাদা পেট-কাপড়ে বেঁধে নেয়। যা ফেরত পয়সা হবে তাও আলাদা নেয়, তার পর বাড়ি ফিরে সেই নতুন হিসেব বুঝিয়ে দেয়। এক-এক দিন কান্তির মুখের দিকে

চেয়ে হেসে ফেলে বলে, 'দুটো পয়সা এই থেকে না সরালে খাব কি বল দাদা ? পেটটা চলা চাই তো ! মাইনে যা দেয় তা তো বুঝতেই পাব। তা থেকে আর কত পয়সা জমে ! বলি গতর যতদিন আছে ততদিনই, তার পর কি আর কেউ পুছবে, না বসিয়ে খাওয়াবে ? তখন খাব কি ?…তাই কী আর এমন হয়, এখন সব স্যায়না হয়ে গেছে। আর বাজারও তো ভাবি, চার গণ্ডা পাঁচ গণ্ডা পয়সার বাজার জনাযাতের—তা থেকে দুটো পয়সা রাখতেই কষ্ট হয়।'

তবু পাড়াটায় যে কোন বিশেষ 'চিহ্ন', আছে তা কান্তি বুঝতে পারে নি অনেক দিন। এক দিন হঠাৎ কী কথায় কথায় ওর ক্লাসের একটা ছেলে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তুই কোথায় থাকিস রে কান্তি ?' কান্তি সরল ভাবেই পথটার নাম বললে। অকস্মাৎ আশেপাশে যারা ছিল—পাঁচ ছ জন ছেলে বেশ জোরে হেসে উঠল। তার পর কেমন একটা যেন নতুন কৌতূহলে চেয়ে রইল ওর দিকে, তখনও তাদের চোখের কোণে ঈষৎ কৌতুকের হাসি।

সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের এক মাস্টারমশাই ধীরেনবাবু, বিরাট গোঁফ, প্রথমটা দেখলেই ভয় করে—কিন্তু ভারি ভালমানুষ—তিনি যেন বাতাসে কি একটা অঘটন টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে রে জগু ?'

জগু মুচকি হেসে বললে, 'কিছু না স্যার। এই কে কোথায় থাকে, তাই জানা হচ্ছিল। কান্তি স্যার রামবাগানে থাকে।'

'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, এঁচোড়ে-পাকা ডেঁপো ছেলে সব। ফের যদি এইসব প্রাইভেট কথা নিয়ে আলোচনা শুনি তো পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব এক-একটার বেতের চোটে।'

তখনকার মত সবাই চুপ ক'রে গেল—কিন্তু কান্তির পিছনে যে তাই নিয়ে আরও অনেকক্ষণ হাসাহাসি এবং গুজগুজ চলল তা কান্তি বেশ টের পেলে।

টিফিনের সময় ধীরেনবাবু ওকে এক ফাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ বাড়ির ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস করে তুমি আসল ঠিকানা বলো না।'

'কেন' সে কথাটা আর জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'ল না কান্তির। সে কেমন ক'রে যেন বুঝল যে এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। শুধু বলল, 'তা হলে কী বলব ?'

'যা হোক ব'লো—বিডন স্ট্রীট, কি মানিকতলা স্ট্রীট, যা হয় বলো। ঠিক পথটার নাম বলো না !'

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ভাবল কান্তি, কথাটা রতনদিকে বলা উচিত হবে কিনা। আপনা-আপনিই মনে হ'ল ওর, হয়তো এর মধ্যে লজ্জার কোন কারণ আছে, রতনদি হয়তো দুঃখিত হবে। কিন্তু চেপেও রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা রতনদি ছাদে এসে ওকে কাছে ডেকে যখন আকাশের তারা চিনিয়ে দিচ্ছেন—তখন ভয়ে ভয়ে—সংকোচের সঙ্গে হলেও, কথাটা বলেই ফেললে।

সব শুনে রতনদির মুখটা যে ম্লান হয়ে গেল তা সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারেই টের পেলে কান্তি। মনে মনে অনুতাপের শেষ রইল না ওর। কিন্তু তখন আর উপায় কি? রতন খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মাস্টারমশাই ঠিকই বলেছেন ভাই, কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলো ঐ হেঁদোর কাছে থাকি, নিতান্ত কেউ ঠিকানা জানতে চাইলে মানিকতলা স্ট্রীটই বলো। এ পাড়াটার একটা দুর্নাম আছে ভাই। সেই জন্যেই তো তোমাকে অত দূরের ইস্কুলে ভর্তি করেছি। কাছাকাছি না থাকাই ভাল।'

কান্তি চুপ ক'রে যায়। কিসের দুর্নাম সেটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারে না। মনে মনে বোঝে যে রতনদি তাতে আরও অপ্রস্তুত হবেন।

আরও নানা কারণে কান্তির এখানটা খাবাপ লাগে।

এক দিন ইস্কুল থেকে ফিরছে, দারোয়ান ডেকে বললে, 'ও খোকাবাবু, শোন তোমার বাবা এসেছিল!'

বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল ওর। বাবা এখানে!

কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না—অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ওর, শুধু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল।

দারোয়ান যা বললে তার সরল অর্থ হচ্ছে—ওর কাছ থেকে নরেন চার আনা পয়সা ধার নিয়ে গেছে। বলে গেছে যে, 'দিদিবাবুকে বলবার দরকার নেই, এই বাড়িতে আমার ছেলে থাকে, কান্তি—তার কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে। বলো যে তার বাবার বিশেষ দরকার পড়েছিল, নিয়ে গেছে। মানে আত্মীয়ের মধ্যেই তো—মিছিমিছি এই সামান্য কটা পয়সার জন্যে তোমাদের কত্তাবাবু কি দিদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না!'

শুনে পাথর হয়ে গেল কান্তি। মুহূর্তে ঘেমে উঠল সে। বয়স যতই কম হোক—এর মধ্যে যে অপমানটা আছে তা বোঝবার শক্তি ওর হয়েছে। খানিকটা আমতা আমতা ক'রে বললে, 'কিন্তু আমি তো—আমার কাছে তো কিছুই পয়সা

নেই দারোয়ানজী, আমার কাছে তো থাকে না।'

প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা তার।

দারোয়ান নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে কিছু ... । এ আমি দিদিবাবুকে বলতেও যাচ্ছি না। কটা বা পয়সা, দিলাম না হয় ... মনকে। তুমি ভেবো না, যাও। যখন তুমি লিখাপটি করবে, দক্‌তরে নোকরি করবে, তখন আমাকে গোটা এক টাকা দিয়ে দিও, কেমন?'

সে পিঠ চাপড়ে ভেতরের দিকে ঠেলে দিলে কান্তিকে।

অতিকষ্টে চোখের জল সামলে কান্তি শুধু বললে, 'কিন্তু তুমি আর কোন দিন ...নি দিও না দারোয়ানজী।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।'

নিজের বাবার সম্বন্ধে এমন কথা বলা আরও লজ্জার, তবু না বলাও অনুচিত, মনে মনে বোঝে কান্তি।...প্রকৃতিই কতকগুলো শিক্ষা দিয়ে দেয় মানুষকে।... জন্যে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না।

কিন্তু নরেন অত সহজে ছাড়ে না। আর এক দিন ইস্কুলে যাবার মুখে বড় রাস্তার মোড়টাতে দেখা।

'এই যে ভাল হয়েছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে—দে দিকি গণ্ডা-চারেক পয়সা।'

আজও যেন চোখে জল এসে যায় কান্তির, রাগে, দুঃখে, অপমানে—মুখচোখ ...ল হয়ে ওঠে ওর। তবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে বলে, 'আমার কাছে পয়সা থাকে না। পয়সা আমি পাব কোথায়?'

'সে কি রে? অত বড়লোকের বাড়ি থাকিস, হাতে পয়সা নেই? জল-খাবারের পয়সা দেয় না?'

'না। সঙ্গে জলখাবার দিত—অত ছেলের সামনে খেতে লজ্জা করে বলে নিয়ে যাই না। তার পর পয়সা দিতে এসেছিল, আমি নিই নি। ইস্কুল থেকে ... ড ফিরে দুপুরের ভাত থাকে—খাই। আমার জলখাবার দরকারই হয় না—অতবার খাওয়া তো আমার অব্যেস নেই।'

'হুঁ। তা এদিক-ওদিক হাতাতে পারিস না কিছু? তবে আর ওখানে পড়ে থাকবার মানে কি?...ওখানে তো পয়সা গড়াগড়ি যায় শুনেছি।'

যাক্ গে। আমি কি চোর নাকি?'

দুঃসহ রাগে সাহস বাড়ে কান্তির, আবারও বলে, 'আপনি খবরদার ওখানে ... যাবেন না অমন ক'রে চাকর-বাকরের কাছে পয়সা ভিক্ষে করেন কেন?

আমি বারণ ক'রে দিয়েছি, এবার আর চাইলেও পাবেন না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। কস্‌বী-বাড়ির ভাত খেয়ে খুব ট্যাকটেঁকে কথা শিখেছেন—লেখাপড়া যত হোক না হোক। চড়িয়ে গাল লাল ক'রে দেব একেবারে, আমাকে তো চেনো না।'

কিন্তু কান্তি আর ভয় পায় না। আশেপাশে লোক জমে যাচ্ছিল তাইতেই যা লজ্জা।

সে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ফেলে, 'ফের যদি আপনি কোনদিন ওখানে যান -আমি মা আর দাদাকে বলে দেব। দাদা কলকাতাতেই থাকে।'

নরেনের রুষ্ট ভাব নিমেষে বদলে যায়, 'ও কলকাতাতেই থাকে বুঝি? চাকরি হয়েছে তা হলে? কোথায় থাকে রে? আপিসটা কোথায়?'

'জানি না।' বলে কান্তি হন হন ক'রে এগিয়ে যায়।

যেতে যেতেই শোনে, পিছনে দাঁড়িয়ে তার বাবা দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলছে, 'উঃ, কলের জল আর বালামচাল পেটে পড়ে বড্ড তেল হয়েছে। তেল বার করছি। গোরবেটার জাতকে যেদিন ধরব, সেদিন একেবারে শেষ ক'রে দোব।...আমাকে তো চেনো না।'

দাদাকে বলে দেবার ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত কে জানে কেন, বলতে পারে না। এর পরে যেদিন হেম ওর সঙ্গে দেখা করতে এল, মাঝে মাঝে আসে আজকাল, শুধু বললে, আমার কি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হয় না দাদা? এখানে—এখানে আমার ভাল লাগে না থাকতে। এরা অবিশ্যি যত্ন করে খুবই, কিন্তু তবু—কেমন যেন—'

হেম কি বুঝলে কে জানে, হয়তো কোন অপ্রিয় কথা শোনবার ভয়েই কিছু প্রশ্ন করলে না, খুব যত্ন করা সত্ত্বেও কেন ভাল লাগছে না সেটা জানতে চাইলে না। শুধু বললে, 'কী আর উপায়, দেখছি না তো। আমার যা মাইনে—তাতে তো কিছুই হয় না। মাসীর ওখানেও আর থাকার উপায় নেই। আর কিছু দিন কাদায় গুণ ফেলে থাক—একটা পাকা চাকরি-বাকরি না হলে কোথায় নিয়ে যাব বল্।'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম মুখে যাই বলুক, এ চাকরি ওর খুব ভাল লাগছে। মাইনে অবশ্য খুবই কম। আলাদা মেসে থাকতে হলে মাকে আর কিছু পাঠাতে পারত না। নিহাত বড় মাসীর কাছে আছে তাই। মাসে পাঁচ ছ টাকা দিলেই চলে যায়। মাসী কিছু নিতে চান না—শ্যামারও ইচ্ছা নয় যে ওখানে কিছু খোরাকি দেয় হেম—উমা রোজগার করছে, বলতে নেই গোবিন্দও যা হয় আনছে—আবার ওখানে ঘুষ দেবার দরকার কি? কিন্তু হেমের লজ্জা করে বড্ড, এদের অবস্থা তো নিজেই দেখছে। গোবিন্দর বিয়ে হবার পর আর একটা ঘর ওদের নিতে হয়েছে। সেও খুপ্‌রির মত, তবু দুটো ঘর মিলিয়ে আট টাকা ভাড়া। তাও ওঁরা সুবিধেই ক'রে দিয়েছেন বলতে হবে। বাড়িওলারা খুব একটা লোক খারাপ নয়। হেমকে ওঁরা রাত্রে ওঁদের বৈঠকখানা ঘরে শোবার অনুমতি দিয়েছেন। তার জন্য কিছু নেন না। অবশ্য ওঁদের জামাই-টামাই এলে ছেড়ে দিতে হয়। তখন ভেতরের রকে শোয়। যাই হোক—কিছু না দিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়। আয় এবং ব্যয় দুটোই চোখের ওপর দেখছে। মাছ আসে কদাচিৎ কখনো। ডাল, বড়াবড়ি আর পোস্ত-চচ্চড়ি এই তো ভরসা। দেওয়া নেওয়া দুই-ই লজ্জার ব্যাপার বলে হেম নগদ টাকা হাতে ক'রে দেয় না, পয়সা-কড়ি এলে একদিন বড়বাজার গিয়ে পাইকিরী দরে কিছু কিছু ডাল-মশলা-পোস্ত এনে দেয়। কুলোলে কোন মাসে এক-আধ সের ভাদুয়া ঘিও নিয়ে আসে। কমলা আপত্তি করে মুখে কিন্তু খুশীই হয়।

পয়সা-কড়ি এলে কথাটার অর্থ আছে বৈকি।

মাইনে তো ঐ সামান্য—তাও সবটা একসঙ্গে পাওয়া যায় না। কেশিয়ার-ম্যানেজার বাবুর কাছে (দুই-ই এক ব্যক্তি) গিয়ে মাথা চুলকে দাঁড়াতে হয়, 'কিছু খরচা দেবেন?' হেম গোড়াতে অবাক হয়ে গিয়েছিল, হকের পাওনা—তার আবার 'খরচা' কি? কিন্তু এখানের নাকি এ-ই চাল। কোন দিন ম্যানেজারবাবু সে খরচা দেন, কোন দিন দেন না। দিলেও চার-পাঁচ টাকার বেশি একসঙ্গে পাওয়ার উপায় নেই। ফলে সে টাকাতে আয় দেয় না। তবু ওরই মধ্যে যে মাসে যা পারে—সাত-আট টাকার বেশী হয়ে ওঠে না প্রায় কোন মাসেই—একদিন গিয়ে মাকে দিয়ে আসে। মা কি-বারই গজগজ করে কিন্তু সে গজগজানি গায়ে মাখতে গেলে হেমের চলে না।

শ্যামা শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে নিজের বাড়িতেই চলে এসেছে। আধ সের চাল বাঁচাতে গিয়ে এ বাগানের ফসল যাবে– হয়তো দরজা-জানলাই কে খুলে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া ওখানে বাস করার লাঞ্ছনাও যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। ফলে কিন্তু কষ্টের সীমা নেই। নিত্য-সেবার চাল দুধ বন্ধ, এদিকেও হেম যজমানি ক'রে যা দু-চার পয়সা আনত, তাও আসে না। আয় বলতে তো হেমের ঐ ক-টা টাকাই। আনাজপাতি অবশ্য কিছুই কিনতে হয় না। অভাব এক আলুর - তা হেম কলকাতা থেকে নিয়ে এলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এক আধটা ক'রে খরচ করে। নারকেল-সুপুরি থেকে কিছু আয় হয়—এ ছাড়া পেঁপে আছে কলা আছে। হেম এখন মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করায় কিছু সুবিধা হয়েছে। বড় বড় নারকেল আর পেঁপে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় শ্যামা। এখানে নারকেল বাইশ টাকা হাজার। কলকাতার বাজারে অনেক বেশী দাম মেলে। তাও এখন আর হেমকে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে হয় না। উমা ওদের অবস্থা বুঝে সে ভার নিজের হাতে নিয়েছে। প্রথম কথায় কথায় ছাত্রীদের বাড়ি কথাটা পেড়েছিল—তাঁরা সাগ্রহে নিতে চান অনেকেই। ফলে এখন সব বোঝাটাই তার ঘাড়ে চেপেছে অবশ্য, কিন্তু সত্যিই দামে অনেক তফাত হয়। বড় বড় নারকেল শ্যামার বাগানের—এক-একটা পাঁচ-ছ পয়সা দরে বিক্রী করে উমা। এমন কি খুব বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত দাম ওঠে। পেঁপের তো কথাই নেই, দু আনা দশ পয়সায় এক-একটা বিক্রী হয়। হয়তো বাজারের থেকে দাম কিছু বেশীই পড়ে, তবু তাঁরা পছন্দমত জিনিস দেখে তাতে আপত্তি করেন না। সাত-আট দিন অন্তর হেম যেদিন বাড়ি যায় - এক-একবার দু টাকা আড়াই টাকা পর্যন্ত জমে যায়। তবে ফেরার সময় তেমনি বোঝা বইতে হয়। ইদানীং শ্যামা লোভ পেয়ে কলার কাঁদিও চালান করতে শুরু করেছে। বড় বড় কালী-বৌ ওদের, যে খাবে সে ভুলতে পারবে না, এ জোর তার মনে আছে। যেমন বড়, তেমনি মোলায়েম আর তেমনি মিষ্টি।

তবু অভাবও তো কম নয়। এখন ঐন্দ্রিলা আর তার মেয়ে এসে ঢুকেছে, তরু আছে, একটা রুগ্ন বাচ্ছা ছেলে আছে। বাজার না করুক, চাল তেল নুন তো কিনতেই হয়। হপ্তায় পাঁচ ছটাকের বেশী তেল কেনে না শ্যামা ঠিকই—কিন্তু মাথায় দেবার এক ছটাক নারকেল তেল কিনতে হয়। এ ছাড়া একটু-আধটু গুড় আছে, লঙ্কা ফোড়ন আছে—কাপড়-গামছা তো আছেই। বাড়ির চৌকিদারি, সেস্ এগুলোও না দিলে নয়। প্রাণপণ কার্পণ্য ক'রেও শ্যামা পারত

না—যদি না অভয়পদ কিছু কিছু সাহায্য করত। কেরোসিন তেল তো তার ওপর দিয়েই চলে, এটা নাকি সে অফিস থেকে পায়। এ ছাড়া মাসকাবারী ডাল-মশলাও কিছু কিছু দিয়ে যায়। ওদের নিজেদের জিনিস যখন কেনে—তখনই এদের জন্যে খানিক খানিক সরিয়ে রাখে। আগে এদের বাড়িতে সে পুঁটুলিটা ফেলে দিয়ে নিজের বাড়িতে যায়।

এ দেওয়ার কথা অভয়পদ কাউকেই বলে না অবশ্য। সে নিজে ছাড়া এ ইতিহাস কেউ জানতে পারে না-এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। তেমন দেখলে কোন কোন দিন একখানা বা এক জোড়া কাপড় কি গামছাও দিয়ে যায়। কিছুই বলে না, হাতে করে এসে বসে, অন্য কথা বলে, যাবার সময় ফেলে রেখে চলে যায়। শ্যামাও প্রশ্ন করে না। জামাইয়ের কাছ থেকে হাত পেতে নেবার লজ্জা এখনও তার আছে—সেটা জামাইও জানে তাই কোন কথা না বলেই শুধু রেখে যায়। যেদিন ডাল মশলা কি কেরোসিন তেল নিয়ে আসে সেদিনও এসে তত্ত্ব খোঁজ করে—'কৈ গো ছোড়দি কোথায় গেলে, এগুলো তুলে রাখো।' কিংবা বলে, 'এগুলো আজড়ে নাও গো ছোড়দি, ঝাড়নে আমার কাজ আছে।' কোন দিন এ কথা শাশুড়ীকে বলে না।

তবু এও এক রকম ভিক্ষা বৈকি।

জামাইয়ের কাছে সাহায্য নেওয়া পরের কাছ থেকে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি লজ্জার। জামাই পারতপক্ষে কাউকে জানতে দেয় না সত্যি—কিন্তু লজ্জা তো তার কাছেই।

হেম তা বোঝে। তার যে উঠে পড়ে লেগে একটা ভাল চাকরি অন্তত বাঁধা মাইনের কাজ একটা যোগাড় করে নেওয়া দরকার—তা বড় গেলে প্রত্যেকবারই অনুভব করে। মনে মনে সেজন্য লজ্জা ও আত্মগ্লানির শেষ থাকে না। কিন্তু এখানে এলেই সে সব যেন চাপা পড়ে যায়, আর। কোন উদ্যম থাকে না।

এ কি শুধুই আলস্য, শুধুই উদ্যমহীনতা?

নিজেকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পেত হেম যে এর মূলে আছে এই নতুন তার কাছে একেবারে অপরিচিত—এই জগৎ, এই থিয়েটারটা।

অনাবিষ্কৃত জগতে প্রথম পদক্ষেপের মতই সে দিশাহারা, রোমাঞ্চিত, বিস্ময়-বিহ্বল।

সত্যিই এ একটা আলাদা জগৎ।

মনে আছে ওদের হেড্ গেট-কীপার (এবং সাট ও পার্ট লেখকও* বটেন—হাতের লেখা ভাল বলে) দক্ষিণাবাবু প্রথম দিনই বলেছিলেন, 'দূর থেকে যা ভাব ছোকরা—তা নয়। দুটো দিন ভেতরে থেকে ছাখো, রস ছুটে যাবে, ঘেন্না হয়ে যাবে একেবারে।'

তার পরই নিভে-আসা বিড়িতে একটা শেষ টান দিয়ে বলেছিলেন, 'তবে ছাড়াও পাবে না বাবা—এ চিটে গুড়ের আটা, পাখা জড়িয়ে যাবে, নট্ নড়ন নট্ চড়ন নট্ কিচ্ছু।'

কথাটা মিথ্যে নয। রস ছুটে, স্বপ্ন ভেঙে ঘেন্না হয়ে যাবারই কথা—তবু যেন কোথায় একটা টান থাকে, একটা মোহ থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত।

সে তো নতুন, বয়সেও কাঁচা, তার মোহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণাবাবুর বহুদিন কাটল এখানে, বয়সেও ওর চেয়ে ঢের বড়—তবু তিনি মুক্তি পান কৈ? সত্যিই যেন তাঁর পাখা আটকে গেছে এখানের চিটেগুড়ে।

বিচিত্র লোক দক্ষিণাবাবু।

বাড়িতে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও আছে চার-পাঁচটি। তাদের খরচ চালাতে পারেন না। নিহাত একান্নবর্তী সংসার বলেই তারা বেঁচে আছে, এবং ছেলে-মেয়েগুলোও কোনমতে লেখাপড়া করছে কিছু কিছু। তাদের কথা যে চিন্তা করেন না দক্ষিণাবাবু তাও নয। কিন্তু তবু অন্য কোন চাকরি খোঁজা বা অপর কোন উপার্জনের পথ ধরার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না।

অথচ এখানে পা দিলে পুরুষের যেটা সর্বাগ্রে হবার কথা সে দোষ অর্থাৎ চরিত্র-দোষ তাঁর নেই। মেয়েরা—থিয়েটারে যারা সখী সাজে, যাদের 'সখীরা' বা 'ছুঁড়ীরা' বলে উল্লেখ করা হয় সাধারণত—তারা সবাই ওঁকে দাদা বলে—আর বড় অভিনেত্রীদের উনি দিদি বলেন—পদবী এবং বয়স নির্বিশেষে। সখীদের 'তুই তোকারি' করেন, ধমক দেন যখন-তখন, মধ্যে মধ্যে আদি-রস-ঘেঁষা রসিকতা করতেও ছাড়েন না—আবার সাধ্যমত উপকারও করেন, যার যা প্রয়োজন হয়, ওঁর নিজের দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ক'রে দেন। আর বড় অভিনেত্রীদের ফাই-ফরমাশ

*মুদ্রিত নাটক ও অভিনীত নাটকে অনেক রকম তফাত থাকে। নাট্য-অধিকর্তার মর্জি ও প্রয়োজন-মাফিক ছাঁটকাট অদল-বদল হয় প্রায়ই। শেষ পর্যন্ত যেমনটি দাঁড়ায়—প্রম্‌প্‌ট্ করার সুবিধার জন্য খাতায় লিখে নেওয়া হয় বড় বড় হরপে—তাকেই বলে সাট।

যেন দক্ষিণাবাবুর জন্যেই তোলা থাকে, যার যত কিছু বেগার দেওয়া দরকার, সবই তিনি। তার ফলে তাঁরাও স্নেহের চোখে দেখেন।

কিন্তু এ স্নেহ বা প্রীতিতে পেট ভরে না। মাইনে তো বাড়েই না—নিয়মিতও পাওয়া যায় না। যখন কিছু আদায় হয় তখন বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। নেশায়-ভেশায় বিশেষ অপব্যয় নেই, সেটা যতটুকু পরের ঘাড়ে চলে ততটুকুই। যখন এমন হয় যে দশ-বারো দিনের মধ্যেও কিছু আদায় হ'ল না, তখন লজ্জায় গা ঢাকা দেন ভদ্রলোক—অর্থাৎ বাড়িতে যান না। থিয়েটারেই কাটান—কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ি কোন বাড়তি জায়গা থাকলে—অথবা কারুর কোন দিন 'বাবু' না আসার কথা থাকলে—তার বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকেন। খাওয়াও ঐভাবে চলে। মেয়েরা এমনিই এটা-ওটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, সারারাত অভিনয় থাকলে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা তো থাকেই।

মেয়েদের বাড়ি, এমন কি—দক্ষিণাবাবু দিব্যি গেলে বলেছেন—তাদের সঙ্গে এক ঘরেও শুয়েছেন, কিন্তু চরিত্রদোষ যাকে বলে তা তাঁর ঘটে নি।

'মাইরি বলছি তোকে, তুই বামুনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, পৈতে ছুঁয়েও বলতে পারি—পিরবিত্তি হয় না। দাদা বলে ডাকে, ভক্তিছেদ্দা করে, বিশ্বাস করে—ওদের মায়েরাও ভরসা ক'রে এক ঘরে ছেড়ে দেয়—সেখানে সে বিশ্বাসটা নষ্ট করা কি ঠিক! না ভাই, ও কাজ কোনদিন করি নি, হলপ করে বলছি!'

এক-একবার এই গা-ঢাকা দেওয়ার সময়টা যখন লম্বা হয়ে পড়ে তখন ওঁর স্ত্রী ধৈর্য হারান। ছেলেকে সঙ্গে ক'রে থিয়েটারে হানা দেন। ভিতরে আসেন না অবশ্য—ওধারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছেলেকে দিয়ে ডাকতে পাঠান, তার পর শুরু হয় জবাবদিহির পালা। দক্ষিণাবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে গিয়ে দাঁড়ান—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে আসেন অনেক কষ্টে। সে লজ্জাও বড় কম নয়, স্ত্রী-পুরুষের চেঁচামেচিতে এক-একদিন রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যায়। থিয়েটার সুদ্ধ লোক এ ইতিহাস জানে, অনেকেই বুঝিয়ে বলে, কেউ কেউ টিট-কিরিও দেয়—তবু দক্ষিণাবাবু এ চাকরি ছাড়তে পারেন না। ওঁর এই দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে কর্তারা ভূতের মত খাটিয়ে নেন, যখন বাড়ি যান না, তখন সারা দুপুর ধরে একা বসে বসে পার্ট লেখেন—এটা তাঁর করার কথা নয়, অন্তত ঐ মাইনেয়, তা দক্ষিণাবাবু জানেন, অবিচারটা অনুভব করেন—তবুও ছাড়তে পারেন না। জায়গাটা ভূতের মতই পেয়ে বসেছে ওঁকে। মাঝে মাঝে বলেন, 'জানিস —উপরি উপরি দু'দিন এখানের এই ভ্যাপসা গন্ধটা নাকে না গেলে হাঁপিয়ে

উঠি। ভূতেই পেয়েছে বোধ হয়। নইলে এমন হয়।'

হেমেরও এক এক সময় ভয় হয়—তাকেও কি এই থিয়েটারের ভূতে পাচ্ছে নাকি? তখনই প্রতিজ্ঞা করে যে এবার উঠে পড়ে লাগবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যম থাকে না। মনকে প্রবোধ দেয়, 'অনেক দিন তো টো টো করে ঘুরলুম। ঘুরলেই কি কাজ হয়!...ভেতরে লোক থাকা চাই। দেখি—।'

সে দেখাটা যে কোথায় এবং কী ভাবে হবে তাও জানে না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর ভেতরে যতই দহরম মহরম থাক—হেমের ভেতরে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে এক আধটা ছোটখাটো ফাইফরমাশের কাজে ভেতরে গেছে, দু-একটা কথা যে দু একজনের সঙ্গে না হয়েছে তাও নয়—কিন্তু তাকে পরিচয় বলে না।

এক দিন হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

সেটা থিয়েটারের দিন নয়। অর্থাৎ সেদিন কোন অভিনয় ছিল না।

হেম এমনিই এসেছিল, মাইনের তাগাদায়। ম্যানেজার বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে—মেজাজ বুঝে ভেতরে ঢুকবে বলে—হঠাৎ স্বয়ং মনিব বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সম্ভবত যাদের খুঁজছিলেন তাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নজর পড়ল হেমের দিকে।

'এই ছোকরা শোন—এদিকে এস একবার।' বলে ইঙ্গিতে ডাকলেন রমণীবাবু।

হেমের বুক দুর দুর ক'রে উঠল। মনিবকে এখানে সকলেই ভয় করে, অকারণেই করে—সেই সঙ্গে হেমও। রাশভারী চেহারা ও গম্ভীর গলা। যদিও শুনেছে সে যে রমণীবাবু লোক খুব খারাপ নন, বরং কর্মচারীরা বিপদে-আপদে পড়লে যথাসাধ্য সাহায্যই করেন তবু বাইরেটা এমন রুক্ষ ও কর্কশ যে ওঁর মুখের দিকে চাইলে কিংবা গম্ভীর গলার আওয়াজ কানে গেলেই বুক শুকিয়ে ওঠে।

আজও তার ব্যতিক্রম হ'ল না—তবে ওরই মধ্যে আড়ে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে যে যদিও ভ্রূ'কুঞ্চিত, মুখভাব রুষ্ট নয়।

ঘরে গিয়ে নিজের চৌকিতে বসে বললেন, 'শোন, কী যেন নাম তোমার, হেম না? একটা কাজ করতে পারবে?'

পারবে! মনিবের মুখে এ কী কথা! হেম একটু অবাকই হয়ে গেল।

ওঁর নাম হুকুম – তাদের নাম তামিল কতকটা তো এই অবস্থা। তবে ?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে সে।

'এমন কিছু নয়, দারোয়ান দিয়েই হয় কিন্তু ব্যাটারা যে গেল কোথায় সব তা জানি না –'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন আবার। কেমন যেন সংকোচ।

তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এক জায়গায় একটা চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, কাউকে বলবে না কি গল্প করবে না। যদি আমার কানে যায় কখনও যে কাউকে বলেছ—সেই দিনই তোমার চাকরিতে জবাব হয়ে যাবে—মনে থাকে যেন।'

এবার চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে কতকটা কটমট করেই চেয়ে রইলেন খানিকটা। তার পর আবার বললেন, 'কম্বুলেটোলা জান? শ্যামবাজারের কাছে ? ঐখানে একটা বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। নাম ঠিকানা সব লেখা আছে। রাস্তার ওপরই বাড়ি, খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। দিয়েই চলে এস। যাও।···দাঁড়াও —এই নাও, দু গণ্ডা পয়সা, বরং ট্রামেই যেও না হয়। এখানে কাজ ছিল কিছু ?'

তিনি পাশের হাতবাক্স খুলে খুচ্‌রো পয়সা বার করতে করতে প্রশ্ন করলেন।

'না, এমন কিছু নয়।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি আর পয়সা নিয়ে সে বলতে গেলে ছুটেই বাইরে বেরিয়ে এল। ট্রামে সে চড়বে না এ তো জানা কথাই—সুতরাং একটু জোরে হাঁটতে হবে বৈকি।

বাইরে এসে খামটার নাম-ঠিকানায় নজর পড়ল। নলিনীবালা দাসী।

নলিনীবালা! ওদেরই তো অভিনেত্রী একজন। খুব একটা উঁচুদরের নয়—তবে বয়স কম, দেখতে শুনতেও ভাল।

হেমের একটা কথা মনে পড়ে যায়। হঠাৎ কিছু দিন আগেই কথাটা উঠেছিল—এই নলিনীরই অভিনয় দেখতে দেখতে একদিন ও হঠাৎ সত্য বলে আর এক গেটকীপারকে বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা, এত বড় পার্টটা হরিভূষণবাবু একে দিয়েছেন কেন বল্ তো, এটা নয়নতারাকে দেওয়াই উচিত ছিল। তার জবাবে সত্য ওর হাতে একটা চিমটি কেটে বলেছিল, 'চুপ কর—শুনতে পেলে চাকরি থাকবে না তোর।'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল হেম, 'কেন বল্ তো—ব্যাপার কি ?'

'তুই যেমন উজবুগ! বাবুর গিন্নী বদল হয়েছে জানিস না ? নইলে ঐ পার্ট ও পায়! ওটা আসলে নয়নতারারই পার্ট!'

'তার মানে ?' কিছুই বুঝতে পারে নি হেম তখনও। কিন্তু কথাটা সেইখানেই বন্ধ করতে হয়েছিল। পাশেই ছিলেন দক্ষিণাবাবু, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেছিলেন সত্যকে।

আজ কথাটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল —এখন হেমের মনে হয়। কারণ আর একটা কথাও মনে পড়ে যায় ওর।

সব মেয়ে যে গাড়িতে যাতায়াত করে—নলিনী তাতে করে না। নলিনীর জন্যে খোদ বাবুর গাড়ি পাঠানো হয়।·· এটা তো কত দিনই লক্ষ্য করেছে ও —অর্থটা বোঝা উচিত ছিল।

যত অল্প দিনই এ জগতে আসুক সে—এর অর্থ না বোঝার কথা নয়। অভিনেত্রীদের প্রায় সকলেরই 'বাবু' আছেন এক-একজন। নলিনীর বাবু তা হলে স্বয়ং কর্তাই।

৩ ॥

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেম একটু ইতস্তত করল। ওর কপালটা একটু ঘেমেও উঠল সামান্য। এর আগে সে এ ধরনের বাড়িতে কখনও আসে নি—অবশ্য এ ধরনটা যে ঠিক কি সে সম্বন্ধেও ওর স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না—তবু নম্বরটা মিলিয়ে পাবার পর বুকটা একটু ছাঁৎ ক'রেই উঠল।

তবে পাড়াটা খারাপ নয়, রতনের বাড়ি যাতায়াতের সময় যে অঞ্চল দিয়ে যেতে হয়, সে রকমও নয়। বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রপাড়া বলেই মনে হ'ল ওর। আর বাড়িটাও আশপাশের বাড়ির মতই—এমন একটা অসাধারণ কিছু নয়। শান্ত নিস্তব্ধ। বরং রাস্তার দিকের দোর-জানলা বেশির ভাগই বন্ধ।

খানিকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে হেম বোধ করি একটু বলসঞ্চয় করেই নিলে মনে মনে। তার পর পকেট থেকে ময়লা রুমালটা বার ক'রে কপাল ও গলার ঘাম মুছে নিয়ে—এক রকম মরীয়া হয়েই কড়া নাড়ল দরজার।

দরজা খুলল হিন্দুস্থানী বেহারা গোছের একজন লোক।

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কী চাই আপনার ?'

'এ বাড়িতে—এ বাড়িতে নলিনীবালা দাসী বলে কেউ থাকেন ?'

যেটুকু ভরসা সে এনেছিল মনে মনে, ওর প্রশ্ন করার ধরনে সেটুকু লোপ পেতে বসেছে তখন।

'হ্যাঁ—থাকেন। কী দরকার তাঁকে?'

'এই—মানে তাঁর নামে একটা চিঠি আছে!'

'কে রে গিরিধারী?' এইবার ওপর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

'কে একজন আপনার নামে চিঠি এনেছে দিদিবাবু।'

'আমার নামে চিঠি? কে দিয়েছে?' সেই ভাবেই প্রশ্ন হ'ল।

গিরিধারী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল হেমের দিকে।

'বল যে আমাদের বাবু, বড়বাবু দিয়েছেন। রমণীবাবু।'

কিন্তু গিরিধারীকে কিছু বলতে হ'ল না। ওপর থেকেই বোধ করি কথাটা শোনা গিয়েছিল—এবার সে মেয়েটি তরতর ক'রে নেমে এল।

'কে রে গিরিধারী -থিয়েটার থেকে কেউ এসেছে বুঝি? ওমা আপনি! আপনি চিঠি এনেছেন? কি হবে!·· কেন শিউরতন কোথা গেল? আমাদের দারোয়ান?'

হেম আরও ঘেমে উঠেছে ততক্ষণে। মাটির দিকে চোখ রেখে জবাব দিল, 'ওরা কেউ ছিল না—তাই বাবু বললেন—আমাকেই দিয়ে যেতে।'

'তা বেশ ভালই হয়েছে। তবু তো আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

'আর ওপরে—মানে এই চিঠিটাই দেওয়ার দরকার ছিল তো—আমি বরং এখন যাই। এই যে চিঠিটা—'

'ওমা, সে কখনও হয়! কখনও তো আসেন না—কোন দিন। আজ প্রেথম দনটা এলেন—এমনি এমনি চলে যাবেন! আসুন, আসুন—একটুখানি অন্তত বসে যান!'

হেমের গলা শুকিয়ে উঠেছে। পা দুটো ওর কাঁপছে বুঝি।

'না—মানে বাবু হয়তো ভাবছেন। ফিরে গিয়ে খবরটা দিতে হবে কিনা।'

'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। আপনি আসুন তো। একটুখানি বসে গেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি অত সংকোচ করছেন কেন—আমরা এক জায়গায় কাজ করি—বন্ধু হলুম তো সম্পর্কে, আপনিও তো ওখানে কাজ করেন—আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। এই গিরিধারী—একটা মিষ্টিজল নিয়ে আয় তো ঠাকুরের দোকান থেকে।'

অগত্যা হেমকে ভেতরে ঢুকতে হ'ল! নলিনীর পিছনে পিছনে ওপরেও যেতে হ'ল।

বাইরে থেকে যতটা নির্জন মনে হয়েছিল বাড়িটা—দেখা গেল ঠিক ততটা জনহীন

নয়। নিচের সব ঘরেই লোক আছে। আর তার অধিকাংশই মেয়ে। মেয়েরা কেউ কেউ ওদের কথাবার্তার শব্দে বেরিয়ে এসেছিল, তারা নীরব কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমকে—সেটা মাথা না তুলেই বেশ বুঝতে পারল সে। ফলে আরও যেন রাজ্যের লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। সিঁড়ি দিয়ে যখন সে ওপরে উঠছে তখন পা দুটো তাব যেন আর স্ববশে নেই, প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে পড়ে যাবে সে হুমড়ি খেয়ে।

ওপরের যে ঘরে হেমকে নিয়ে গিয়ে বসাল নলিনী—সে ঘবটা বেশ প্রশস্ত। রাস্তার দিকে সবটা জুড়ে টানা ঘর একটা। একপাশে প্রকাণ্ড বড় পালঙ্কে পুরু গদিব বিছানা। এছাড়া মেঝেতেও একটা বিছানা পাতা আছে—ওপরের বিছানার চেয়েও এটা বড়। অত পুরু না হলেও, এর তলাতেও গদি আছে। এ বিছানায় মাথার বালিশ বা পাশবালিশ নেই.. শুধুই চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা তাকিয়া সাজানো।

নলিনী ওকে সেই বিছানাটার কাছেই নিয়ে এল, বলল, 'বসুন ভাল হয়ে। আমি আসছি।'

কিন্তু সে বিছানার দিকে তাকিয়ে হেমের স কোচের অবধি রইল না। ফরসা ধপ ধপ্ করছে বিছানা—বকের পালকের মত। সে ওখানে বসবে কি? ক্ষাবে কাচা লাল্‌চে কাপড়-জামা তার, জুতোটা ফুটো হওযাব ফলে পথের ধুলো জমেছে আঙুলেব খাঁজে খাঁজে। বিছানাটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ময়লা হয়ে যাবে। তখন মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয় রাগ করবে—হয়তো কটূক্তিও করবে। হয়তো—

আরও অনেক সম্ভাবনাই মনে হ'ল। এর আগে নিজের বেশভূষার দীনতার জন্য এত লজ্জা আর কখনও অনুভব করে নি। ওর মনে হতে লাগল, ধরিত্রী দ্বিধা হয় তো সে সীতাদেবীর মত তাতে প্রবেশ ক'রে বেঁচে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে—একটা কাচের গ্লাসে লেমোনেড নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল নলিনী।

'ওমা কি হবে, আপনি এখনও ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন? বসুন, বসুন। বেটাছেলের এত লজ্জা কি? না, না—মাটিতে নয়। ছিঃ, মেজেয় কি বসতে আছে? বিছানাতেই বসুন ভাল হয়ে—'

অগত্যা হেমকে বসতে হয়—তবু সে ভরসা ক'রে পুরোপুরি বিছানায় বসতে পারে না। দেহের বেশির ভাগই মেঝেতে রেখে কোনমতে বিছানাটা ছুঁয়ে বসে শুধু।

প্রথমটা মনে হ'ল—বসবার সময়—নলিনী বুঝি ওর হাতটা ধরে জোর ক'রেই বিছানাতে বসিয়ে দেবে, নলিনী এগিয়েও এসেছিল যেন সেইভাবেই, কিন্তু কী ভেবে নিজেকে দমন ক'রে নিলে।

'নিন্ জলটা ধরুন। আপনার আবার যা লজ্জা।'

'এ—এ জল—শুধু জল দিন না।'

'কেন—আপনি বোতলের জল খান না বুঝি?'

'না, মানে কখনও খাই নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে বলে ওসব মুসলমানে তৈরী করে, বামুনদের খেতে নেই।'

'আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি? ভাগ্যি ভাল আমার! ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়ল।...তবে থাক—এ জল খেয়ে কাজ নেই। আপনি বরং এমনি একটু জল খেয়ে যান। গিরিধারীকেই না হয় আনতে বলি—ও ভাল জাতের লোক। দেখুন বাধা নেই তো?'

আরও ঘেমে ওঠে হেম।

'না, না। সে সব কিছু না। দিন না হয় ঐটেই খাই। নষ্ট হবে।'

'না থাক। আমার এখানে একদিন এসেছেন, আপনার জাতটা মেরে দেব কেন? ও আর কেউ খেয়ে নেবে। আমার হাতে জলটা চলবে তো? না কি গিরিধারীকেই আনতে বলব?'

'না, না। খুব চলবে। আপনার চেয়ে কি ঐ খোট্টা বেয়ারা ভাল?'

একটু যেন বেশী ঝোঁক দিয়েই বলে ওঠে হেম—আর বলার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আগুন-বর্ণ হয়ে ওঠে।

নলিনী ওর সেই সুগৌর কপোলের রক্তোচ্ছ্বাস যেন একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে দেখে কিছুকাল। বেশভূষা মলিন, গেট-কীপারের চাকরি করে—এত দিন তাই ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখার কথাও তার মনে হয় নি। আজ সামনা-সামনি কাছ থেকে বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করলে যে হেম রূপবান—বেশ একটু অসাধারণ রকমেরই রূপবান।

অবশ্য তাকিয়ে রইল সে মুহূর্ত দুই এর বেশী নয়—তার পরই আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ ভাল ভাল আসবাব ঘরে। অবস্থা ভালই। অবশ্য থিয়েটারের মাইনেতে এসব হয় না। নিশ্চয় রমণীবাবু দিয়েছেন। আয়না-বসানো আলমারি, বুককেস, পাথর দেওয়া টেবিল তার ওপর কাচের ঢাকায় শৌখিন ঘড়ি, দেওয়ালে

সোনালী ফ্রেমে আঁটা আয়না, বড বড ছবি, আরও কত কি।—

ঘাড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে তখনও, নলিনী একটা আসন আর পাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল আবার। পিছনে গিরিধারীর হাতে একটা রেকাবিতে গোটাকতক রসগোল্লা, সাদা পাথরের গ্লাসে জল।

'নিন, আসুন দেখি। একটু জল খেয়ে নিন।'

'এসব আবার—। না না, থাক, শুধু জল দিন একটু। আমার মানে—একটুও ক্ষিদে নেই। সত্যি বলছি।'

'এসব খাবার ক্ষিদে না থাকলেও খাওয়া যায়। এমন কিছু হাতিঘোডা নয়। শুধু জল খেতে নেই—তাই। আসুন আসুন। কত ভাগ্যিতে পায়ের ধুলো পড়ল, আবার কবে আসবেন—আসবেন কি-না তারও ঠিক নেই। আমি বুঝি অমনি অমনি ছেড়ে দেব? ব্রাহ্মণ-ভোজনের একটা পুণ্যিও তো আছে।… আসুন, উঠুন। হাত ধোবেন? বাইরেই জল আছে। গিরিধারী, জল ঢেলে দে তো একটু।'

অগত্যা উঠে এসে আসনে বসতে হয়।

এমনিই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে হেমের লজ্জা একটু বেশী তার ওপর অপরিচিত মেয়েছেলেদের সামনে বসে একরাশ রসগোল্লা খাওয়া। প্রতি গ্রাসেই গলায় বেধে বেধে যেতে থাকে ওর।

তার ওপর নলিনী সামনে বসে হাওয়া করে।

'থাক থাক।' অতি কষ্টে একবার বললে ও—কিন্তু সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না নলিনী।

'ওমা, একটু হাওয়া করলে কি আমার হাত ক্ষয়ে যাবে? যা গরম আজ। আপনি তো গলগল ক'রে ঘামছেন। অবশ্য গরমের চেয়েও লজ্জাই বেশী—কিন্তু তবু গরমও পড়েছে বাপু। টানাপাখার ব্যায়রাটা আসে রাত্তির বেলা। বাবু থাকেন তো, হাওয়া না হলে ওঁর এক দণ্ড চলে না। দু'বেলা আর কিছু টানাপাখা চালানো যায় না। কী বলেন?'

গলায় আটকে গেলেও হেম কোনমতে জল দিয়ে দিয়ে সেই আটটা রসগোল্লাই গলাধঃকরণ করে। ভাল জিনিস ফেলবার অভ্যাস নেই—তায় এঁটো পড়ে থাকলে ফেলাই যাবে হয়তো, সেই সম্ভাবনার কথাটা মনে ক'রেই আরও জোর ক'রে খায় সে—কষ্ট ক'রেও।

খাওয়া শেষ হলে নলিনী অন্য কথা পাড়ে।

'দেখুন, আমার একটা উপকার করবেন? বাবু লিখে পাঠিয়েছেন বাবুর জন তিন-চার বন্ধু আসবে রাত্তিরে, এখানেই খাবে। আমার গিরিধারী মোটে মাংস মাছ চিনতে পারে না। বাজার করে ঠিকে ঝি—সে আসবে সেই সন্ধ্যের পর। তা ছাড়া সে বিকেলে বাজার করতেও চায় না। আপনি গিরিধারীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় মাংসটা আর মাছটা একটু কিনে দিয়ে যাবেন?'

'তা—না, আর কিছু নয়। দেরি হলে বাবু রাগ করবেন না তো? তিনি হয়তো ভাবছেন—চিঠিটা পৌঁছল কি না।'

'আমার বাজার করে দিয়ে গেছেন শুনলে কিছু বলবেন না।'

বলে মুখ টিপে হাসে একটু নলিনী।

'তা হলে দিন।'

'বাঁচা গেল! পাঁচ পো মাংস আর এক সের ভাল বাগদা চিংড়ি মাছ। দেড়-পোয়াখানেক কাটা-পোনাও। বুঝলেন? বাকী যা দই প্যাজ সে আমি গিরিধারীকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গিরিধারী বাজারের ঝাড় টাকা প্রভৃতি বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এলে হেমের পিছু পিছু নলিনীও নিচে নেমে আসে। দোরের কাছে এসে চাপা গলায় বেশ একটু আন্তরিক ভাবেই বলে, 'আলাপ পরিচয় তো হয়ে গেল, এবার আসবেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে।...এখানে এলেই কিছু লোক খারাপ হয়ে যায় না। আমরা বাঘ-ভালুকও নই।.. তা ছাড়া সবাই এক জায়গায় কাজ করি, বন্ধুর মতই। না কী বলেন? আসবেন কিন্তু। না এলে আমি ভারি দুঃখ করব।'

ওর মত হতদরিদ্র দীনহীন ব্যক্তির জন্য এই আকিঞ্চনে খুশী হবার কথা। হেমও খুশী হ'ল। এই আদর-যত্ন, এই আন্তরিকতা, কণ্ঠে এই মিনতির সুর অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা মধুর রেশ জাগিয়ে রাখল ওর মনে। সব চেয়ে এই সাধারণ সহজ ব্যবহারটাই ওকে মুগ্ধ করেছে বেশী। এই সব মেয়েদের এবং তাদের বাড়ি সম্বন্ধে একটা যে অজ্ঞাত আতঙ্কের ভাব ছিল, সেটাও কেটে গেছে —এখন বরং সে আতঙ্কের জন্য একটু লজ্জাই বোধ করছে মনে মনে।

সত্যিই তো, মানুষ মানুষই—বাঘ-ভালুক তো নয়! এত ভয়ই বা কেন হ'ত ওর?

আর—এক পয়সার মুরোদ নেই যখন তার, তখন পয়সার লোভে তাকে যত্ন করেছে বা ভোলাচ্ছে এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই।

আসলে মানুষটা ভালই। বেশ সরল। বেশ মিষ্টি কথাবার্তা।

আরও খানিকটা পরে ওর মনে হ'ল—নলিনী কেমন দেখতে তাও ভাল ক'রে বলতে পারবে না কাউকে। এতক্ষণের মধ্যে একবারও ভরসা ক'রে চাইতে পারে নি তার মুখের দিকে।

মনে মনে ঠিক ক'লে থিয়েটারের দিন এবার ভাল ক'রে দেখবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দর বৌ কালীতারা বরাবরই খুব সপ্রতিভ—বেশ একটু ভাবিক্কী চালের গিন্নী-বান্নী গোছের মেয়ে। সে সংসার করতে চায়—আর করতে জানেও। বিয়ের পর প্রথমবার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই রান্না করা, জল তোলা, বাসন মাজা—এক কথায় সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। যেমন তেমন ক'রে যে করত তাও না—বরং শাশুড়ীর চেয়েও এসব কাজে তার পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা বেশী ছিল। সংসার ভালবাসে যে সব মেয়ে—কালীতারা সেই দলেরই একজন।

বিনা সম্মতিতে ছেলের বিয়ে হলে প্রত্যেক ছেলের মায়েরই বিদ্বেষটা আগে গিয়ে পড়ে বধূর ওপর। কমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি তবে সহজাত ভদ্রতা ও সুশিক্ষায় সে বিদ্বেষটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি হয়তো। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে মূল আপত্তি এবং সেই চাপা বিদ্বেষটা কাটতেও যে খুব বেশী দেরি হয় নি তার কারণ বোধ হয় বধূর কর্মদক্ষতা। বৌকে নিয়ে সে বেশ সুখীই হয়েছিল। কমলা নিজে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে অবস্থাপন্ন স্বামীর ঘরে গিয়ে পড়েছিল—কাজকর্ম গুছিয়ে করার শিক্ষা বা অভ্যাস কোনটাই উমার মত পাকা হয় নি। সে বেশ অসুবিধাই বোধ করত প্রথম প্রথম নিজে-হাতে কাজ করতে গিয়ে। এখন বৌয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে—অথবা ছেড়ে দিতে পেরে সে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বধূ সম্বন্ধে তাই স্নেহ ও প্রশ্রয়ের অভাব ছিল না তার মনে।

কিন্তু কে জানে কেন গোবিন্দ খুশী হতে পারে নি। অন্তত উমার তাই মনে হ'ত।

তার যে খুব নালিশ করবার মত কিছু ছিল তাও নয়। বরং প্রতিটি প্রয়োজনের জিনিস মুখে মুখে যুগিয়ে কালীতারা তাকে বেশ খানিকটা অকর্মণ্য আর বাবু ক'রেই তুলেছিল। শুধু স্ত্রীর সামনে এলেই গোবিন্দ যেন কেমন একটা

অস্বস্তি অনুভব করত। কালীতারা বোধ হয় তার সমবয়সী—উমা সন্দেহ করত সামান্য একটু বড়ই হবে হয়তো তার ওপর ওর ঐ ভারিক্কী চালচলনে ওকে দেখলেই একটা সম্ভ্রমের ভাব আসত গোবিন্দর মনে—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর সহজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। অথবা বলা চলে স্ত্রীকে সমীহ না' করে পারত না। তাব ওপর দৈহিক গঠনেও কালীতাবা—পূর্ণযুবতী মেয়ের যেমন হওযা উচিত, তেমনিই ছিল, বরং তার যৌবন যেন একটু বেশী প্রস্ফুট বলে মনে হ'ত বাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে। ঠিক মোটা না হলেও, স্বাস্থ্যটা ছিল একটু বেশী রকমের ভাল—তার জন্যও বোধ হয় আচমকা দেখলে নবযৌবনা তরুণী বধূ নয়, পূর্ণযৌবনা নারী বলে মনে হ'ত। আব এই সব কারণেই সম্ভবত গোবিন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মাঝে কালীতাবাকে মনে হ'ত ওর দিদি। ওর নিজের দিদি নেই কেউ - দিদি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাও যে ছিল তাও নয়—তবু ঐ ধরনেরই যে একটা অনুভূতি হ'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কালীতারাও স্বামী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স কাম প্রেমের অনুভূতি থাকলেও প্রচ্ছন্ন ছিল খুবই। যেটা সব চেয়ে স্পষ্ট এবং প্রকট ছিল—সেটা হচ্ছে একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব। বয়স্কা বিবাহিতা দিদিদের অনুজ সম্বন্ধে যেমন হয় তেমনিই। উৎকণ্ঠা উদ্বেগের অভাব ছিল না --বরং হয়তো একটু বেশীই ছিল। কোনদিন গোবিন্দর বাড়ি ফিরতে দেরি হলে প্রকাশ্যেই বিচলিত হয়ে পডত সে, তবু তার মধ্যেও—উমার যেন কেমন মনে হ'ত বাৎসল্যভাবই বেশী।

তখনও দিনের বেলায় কিংবা গুরুজনের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার খুব চলন হয় নি। কডাকডিটা কমেছে—আগের মত বিধিনিষেধের বেড়াটা অত উঁচু নেই - তবু একেবারে সমভূমও হয় নি সেটা। তখনও পাড়াঘরে আশপাশে কিছুটা সংকোচ কিছুটা কুণ্ঠা ছিল, কিন্তু কালীতারা যেন সেটুকুরও ধার ধারত না। প্রয়োজন হলেই অভ্যস্ত ঘোমটাটা শুধু আর আধ ইঞ্চি মাত্র সামনের দিকে টেনে শাশুড়ীদের সামনেই নিঃসংকোচে কথা কইত সে। শুধু কথাই নয়, ওঁদের সামনে ধমক-ধামকও করত অনায়াসে। আর সে ধমক গোবিন্দ মা-মাসীর তিরস্কারের মতই নিঃশব্দে হজম করত। কখনও বা নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অথবা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে কৈফিয়ত পেশ করত।

এসব কোন কিছুই কমলা কোনদিন লক্ষ্য করে নি। অত শত তার মাথাতেও যেত না। সে সবটাই সহজ ভাবে নিয়েছিল। কিন্তু উমা সব লক্ষ্য করত। ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোন অসঙ্গতিই তার চোখ এড়াত না। যেখানেই এতটুকু

বেসুর বাজত, ঘটত এতটুকু ছন্দপতন, সেখানেই সচেতন হয়ে উঠত সে। নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখত ওদের দিকে আর কেমন একটা নাম-না-জানা আশঙ্কা অনুভব করত ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। গার্হস্থ্য সুখের অভাব নেই—সহস্রবিধ আরামে আর সেবায় অভিভূত করে রেখেছে কালীতারা তার স্বামীকে—কিন্তু দাম্পত্যসুখ যাকে বলে তা ওরা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে কি ? ওরা কি পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীর মত ভালবাসতে পেরেছে ? এমনি নানান্ প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে দেখা দিত উমার মনে—কিন্তু তার কোন সদুত্তর কোথাও খুঁজে পেত না সে। শুধু সেই নিরুত্তর সমস্যা তার নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তার মধ্যে আর একটা বোঝার মত চেপে বসে থাকত।

অবশেষে একদিন সে দিদির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল, 'দিদি, বৌমা তো প্রায় দু বছর বাপের বাড়ি যান নি—এবার ওঁকে একবার পাঠানো দরকার।'

'কেন বল্ দিকি ?' কমলা সবিস্ময়ে, কিছুটা সশঙ্কচিত্তেও তাকায় ওর মুখের দিকে, 'বৌমা বলেছেন কিছু ?'

'না, বৌমা বলেন নি আর হয়তো কোন দিন বলবেনও না। কিন্তু আমাদের একটা বিবেচনা আছে তো। ছেলেমানুষ একটানা এতদিন এই দেড়খানা ঘরে আটকে আছে আর কলুর বলদের মত একঘেয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাচ্ছে।'

কমলা কথাটা শুনে খুব খুশী হ'ল না। হবার কথাও নয়। বৌমার আরা যাওয়া মানে সংসারের সহস্রবিধ কাজ নিজেদের ঘাড়ে পড়া। অপ্রসন্ন মুখে বললে, 'ও, আমাদের বিবেচনা! তা সেখানেও তো শুনেছি বেয়াইয়ের অবস্থা ভাল নয়—তার ওপর আবার ঘাড়ে গিয়ে পড়া—'

'অবস্থা এমনও খারাপ নয় যে নিজের মেয়েকে খেতে দিতে পারবে না। সেই বাড়িরই তো মেয়ে!'

'তা বটে।' একটু থেমে বলে আবার কমলা, আমাদের যে এদিকে আতান্তর।'

'এটা বড্ড স্বার্থপরের মত কথা হ'ল না দিদি! ছেলেমানুষ মেয়েটা কি আমাদের সংসারে কেনা বাঁদীর মত খাটতেই এসেছে শুধু ? এতকাল তো চলছিল আমাদের—তেমনিই না হয় চলবে। আমিই চালিয়ে নেব'

কমলা আর কথা কইল না। কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

উমা কিন্তু বেশী দিন চাপা পড়তে দিলে না। আবারও তুললে।

আসলে একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে। এদের নিয়ে একটা নতুন খেলা খেলতে চায়। বিচ্ছেদের বিরহে এদের মনে -অন্তত গোবিন্দর মনে সকাম

তৃষ্ণা বা আবেগ জাগে কিনা তাই দেখতে চায়। যাকে সহজে, না চাইতে হাতের কাছে পাওয়া যায়—তার সম্বন্ধে আমাদের থাকে সহজাত অবহেলা। দূরে গেলে দাম বাড়ে। গোবিন্দর কাছে কালীতারা একটা পুরনো অভ্যাস মাত্র দাঁড়িয়ে গেছে—তাই হয়তো তার সেবাটাও চোখে পড়ে না। সবে গেলে সেই সেবার অভাবটাই হয়তো প্রেম বা তৃষ্ণা জাগাতে সহায়তা করবে।

নিজের দুর্ভাগ্যে উমা এই বিষয়টায় অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই কারণেই কথাটা খুলে বলতেও পারে না সে কাউকে। শুধু কালীতারার বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।

কালীতারার কানে কথাটা যেতে সে-ই প্রতিবাদ করে সব চেয়ে বেশী। আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'ওমা আমি গেলে এখানে চলবে কি ক'রে? মা'র শরীর খারাপ—আপনার তো এই টো-টো ঘোরা চাকরি ঠাকুরপো সুদ্ধ এখানে এসে রয়েছেন—সে কখনও হয়?'

'খুব হয় মা। তুমি যখন ছিলে না তখন কি আর আমাদের সংসার চলত না? আমি তো আছি—চালিয়ে নেব এক রকম ক'রে। তুমি মাসখানেক কাটিয়ে এসো গে অন্তত!'

তবু না কালীতারা আর না কমলা—কথাটা কেউই গায়ে মাখে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো উমাকে শ্রান্ত হয়েই চুপ ক'রে যেতে হ'ত—কারণ আর বেশী পীড়াপীড়ি করলে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠত—কৈফিয়তের হেতু তো হতই। কিন্তু হঠাৎ কালীতারার এক জ্যেঠামশাই কী এক মোকদ্দমার ব্যাপারে কলকাতায় এসে পড়লেন এবং দেখা করতে এসে—পশ্চিমে-বাঙালীর অভ্যস্ত কাঠখোট্টা চালে বলে ফেললেন, 'কী রে তারা, যাবি নাকি আমার সঙ্গে আরায়? যাথ যাস তো চল্। কী বলেনবেয়ান—ছাড়বেন, না কোন অসুবিধা আছে—কাজ-কর্মের?'

সত্য কথাটা বেশী স্পষ্ট ক'রে বললে অনেক সময় রূঢ় শোনায়, এমন কি কমলার কানেও তা শোনাল। সে একটু চাপা রাগের সঙ্গেই বললে, 'আপনাদের মেয়ে কি আমাদের ঝি যে কাজকর্মের জন্যে তাকে আটকে রাখব? ওকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রেই ঘরে তুলেছি বেয়াই- ঝি হিসেবে নয়।...কাজকর্ম ও আসবার আগেও কিছু আটকে থাকত না—এখনও থাকবে না। আমরাই বরং ওকে কত দিন বলছি, অনেক দিন যাও নি—একবার ঘুরে এস দিনকতক। আপনাদের মেয়েই যেতে চায় না!'

বেয়াই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বলেন, 'তা তো বটেই—তা তো বটেই।

না, আমি সেভাবে কিছু বলি নি। নিজের ঘরে নিজের কাজ করবে—সে আর এমন বড় কথাই বা কি। কী রে যাবি নাকি তারা?'

সপ্রতিভ তারা বাজে কথার মধ্যে না গিয়ে দরকারী প্রশ্নটিই করে শুধু, 'তার পর? ফিরব কবে? কার সঙ্গে?'

'কেন জামাই যেতে পারবেন না? বাবাজীও তো যান নি ওখানে অনেক দিন।'

'না, উনি যেতে চান না। যা ব্যাভার তোমরা করেছ ওঁর সঙ্গে।'

মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে কালীতারার জ্যেঠামশাই বলেন, 'আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। না হয় আমরাই কেউ এসে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

আর কোনও পথ খোলা থাকে না কোথাও।

কালীতারা মুখটা গোঁজ ক'রে বলে, 'আমি কিন্তু বেশী দিন থাকব না। তা বলে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। দেখেছেন বেয়ান--মেয়েদের যদি বিয়ে হ'ল তো আর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দুটো দিনও বাপের বাড়ি থাকতে চায় না। বিয়ে হ'ল কি পর—না কী বলেন! হা হা-হা!'

তিনি নিজেই জোরে হেসে উঠে আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা ক'রে দেন।

॥ ২ ॥

কালীতারা আর। যাবার দিন পনের পরেই ঘটনাটা ঘটল।

রাত তখন বোধ হয় তিনটে হবে, উমা আর কমলা একসঙ্গেই ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসল বিছানায়।

কী দিদি? কি হ'ল?' প্রশ্ন কর'ল উমাই।

'বড় একটা বাজে স্বপ্ন দেখলুম রে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ! দুর্গা দুর্গা!'

'কি স্বপ্ন দিদি?' উমা ও বিছানা থেকে এ বিছানায় উঠে আসে। কণ্ঠস্বরটাও তার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শোনায়।

'দেখলুম, বৌমা যেন এসে আমার মশারির মধ্যে ঢুকে পা ঠেলে ডাকছেন, বলছেন···মা, ঘরে তো আর ঠাঁই দিলেন না—তবে পায়ের ধুলো দিন—আমি যাই।'

'দুর্গা দুর্গা', শিউরে উঠে উমাও বলে অস্ফুট কণ্ঠে।

'কেন বল্ দিকি? তোরই বা ঘুম ভাঙল কেন?'

'দিদি, আমারও যেন মনে হ'ল বৌমা এসে পা ঠেলে ডাকছেন মশারির মধ্যে। যেন বলছেন একবার উঠুন না মাসীমা, একটু পেন্নাগ ক'রে যাই।'

'সে আবার কি!...তুইও—এক সঙ্গে এক সময়ে! এর মানে কি? কৈ এমন তো কখনও শুনি নি।'

'কে জানে বাছার কী হ'ল। ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচি!'

এর পর আর ঘুম অসম্ভব। দুই বোনই বাইরের রোয়াকে বেরিয়ে আসে। আর বাইরে আসতেই প্রথম নজরে পড়ে রকের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোবিন্দ!

'এমন ক'রে বসে আছিস কেন রে খোকা?'

আর্তনাদের মত শোনায় কমলার কণ্ঠস্বর।

গোবিন্দ শুষ্ক মুখে যা বলে তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, সে এইমাত্র তার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছে—কালীতারা যেন এসে ওকে ঠেলে বলছে, 'ওগো তোমার আপদ-বালাই জন্মের মত বিদেয় হয়ে যাচ্ছি—এখন যাও দিকি, তাড়াতাড়ি নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ি একখানা আর একখান সিঁদুর কিনে আনো দিকি। এক পাতা আল্‌তাও এনো অমনি। সেজেগুজে যাব বাপু বেশ ক'রে—তা বলে রাখছি।'

এবার কমলার অশ্রু আর বাধা মানে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। উমার দুই চোখেও জল ভরে আসে। কালীতারাকে সেও ভালবাসত। তার ওপর তার একটা অপরাধীর কুণ্ঠা আছে মনের মধ্যে—বলতে গেলে সে-ই জোর ক'রে পাঠিয়েছে।

কান্নার শব্দে বাড়িওলারা উঠলেন। হেম অনেক রাত্রে এসে শুয়েছে, তবু তারও ঘুম ভাঙল। তখনই একটা মন্ত্রণা সভা গোছের বসল। বহু আলোচনার পর স্থির হ'ল যে সকালেই স্টেশনে গিয়ে গোবিন্দ আরার গাড়ির খবর নেবে এবং প্রথম ট্রেনেই চলে যাবে। জানাশোনা অফিস, ছুটির জন্য চিন্তা নেই হেম গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না।

আলোচনা করতে করতেই ভোর হয়ে যায়। আর সামনের বিশ্বাসদের বাড়ির তেতলার কার্নিসে উষার প্রথম আভাস লাগার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজায় ঘা পড়ে।

কালীতারার জ্যেঠামশাই।

দোর খুলতেই আছড়ে পড়লেন তিনি।

অতি কষ্টে সেই বুকফাটা কান্নার মধ্য থেকে যেটুকু সংবাদ আহরণ করা গেল তা এই:

আজ তিন দিন থেকে কালীতারা এখানে আসার জন্যে কান্নাকাটি করছিল।

কাল কতকটা জোর ক'রেই সে জ্যেঠার সঙ্গে রওনা হয়। পথে আসানসোল পেরো-বার পরই ভেদবমির লক্ষণ দেখা দিল। দুবার দাস্ত এবং একবার বমি—তার পরই শেষ। রেলের ডাক্তার দেখে বলেছেন এসিয়াটিক কলেরা। মৃতদেহ হাওড়াতেই পড়ে আছে। এরা না গেলে ছাড়বে না বোধ হয়।

মরবার আগে শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেছে কালীতারা—ওর জ্যেঠামশাই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, -লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি আর আলতা-সিঁদুরে যেন সাজানো হয় তাকে শ্মশানযাত্রার আগে আর গোবিন্দ যেন নিজে হাতে সাজায়।

॥ ৩ ॥

মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ কোনটারই অন্যথা হল না। ভাল লালপাড় ফরাসডাঙার শাড়ি এল—সিঁদুর আলতা ফুলের মালা—হেমই চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে নিয়ে এল। উমা ও কমলার কারোরই তখন কিছু দেখবার অবস্থা নয়, উমা মূর্ছাহত, স্তম্ভিত, কমলা আছাড় খেয়ে খেয়ে কাঁদছে—বাড়িওয়ালা গিন্নীই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন, গোবিন্দ অপটু হাতে সাজিয়ে দিল। মায় আলতা পর্যন্ত পরিয়ে দিল সে-ই।

কালীতারার শেষ অনুরোধ।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়ে গেছে সে।

গোবিন্দ যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গেই সে অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু যা করছে সে—যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। আসলে গোবিন্দ যেন কেমন বিমূঢ়, স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ঘটনাটা তার কাছে এখনও কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মত ঠেকছে।

এই বয়সে বিয়েই হয় না কারুর কারুর—সে বিপত্নীক হ'ল।

তা ছাড়া, ক বছরে কালীতারা কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে থাকবে না—কোন দিন সে কোথাও চলে যাবে একেবারে—এমন যেতে পারে—এইটেই তো অবিশ্বাস্য। আর এই আকস্মিক মৃত্যু—এমন সহসা চিরবিচ্ছেদ—এখনও তার স্পষ্ট বিশ্বাস বা ধারণা হচ্ছে না।

হাওড়া গিয়ে নিয়ে আসা থেকে শুরু ক'রে, সাজানো, হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে তোলা, মায় মুখাগ্নি পর্যন্ত সবই তাই কতকটা সে তেমনি স্তম্ভিত ভাবেই করলে। তার পর সেই ভাবেই একটু দূরে এসে বসল সে উদাসীন নিস্পৃহবৎ।

তার এই বিমূঢ় ভাব অনেকেই ভুল বুঝল।

আসবার সময় হাহাকার কান্নার মধ্যেই কমলা হেমকে বলে দিয়েছিল, 'ওকে একটু কাঁদতে বল হেম, কোনমতে ওকে কাঁদিয়ে দে—নইলে বুক ফেটে মরে যাবে যে!'

এখন কালীতারার জ্যেঠামশাইও আবার ভুল করলেন।

আস্তে আস্তে কাছে এসে বসে বললেন, 'বাবাজী—কান্না পাচ্ছে না? একটু কাঁদবার চেষ্টা কর না। এতকাল ঘর করেছ, সতীসাধ্বী স্ত্রী জন্মের মত চলে যাচ্ছে—এর পর আর মাথা খুঁড়লেও দেখতে পাবে না। কথাগুলো ভাববার চেষ্টা কর—কান্না পাবে নিশ্চয়ই। না কাঁদতে পারলে বড্ড কষ্ট পাবে যে বাবা!'

ওঁর কথায় বিস্মিত হ'ল গোবিন্দ। সম্ভবত এই প্রথম তার মাথায় গেল যে ওর এই স্তম্ভিত ভাবটাকে ওঁরা দুঃসহ আঘাতের স্তব্ধতা বলে ভুল করছেন!

এইবার ওর সেই বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবটা—সেই অবিশ্বাসের—স্বপ্নের ভাবটা কেটেও গেল খানিকটা। একটা বিস্ময়ের আঘাতে আর একটা বিস্ময়ের ঘোর বুঝি কাটল। সে এবার নিজের মনের দিকটা তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

কিন্তু সেখানেও নবতর বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্য। বিস্ময় আর তার সঙ্গে সামান্য একটু লজ্জাও।

কৈ, খুব একটা শোকাভিভূত তো সে হয় নি।

খুব একটা কষ্ট তো হচ্ছে না। হাহাকার ক'রে তো তার কাঁদতে ইচ্ছা যাচ্ছে না। বুক ফেটে যাবে এই আঘাতে—এমনও তো মনে হচ্ছে না তার!

বরং লজ্জার সঙ্গে হলেও—বার বার এ বিশ্বাসটা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলেও—এক সময় মানতে বাধ্য হ'ল সে—কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাব, একটা অব্যাহতির ভাবই মনে জাগছে। তার যেন বোঝা নেমে গেল মাথা থেকে, যেন একটা—খুব কষ্টকর না হলেও—বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে সে!

তবে কি কালীতারার কোন স্থান ছিল না তার মনে?

ছিল বৈ কি! সে যে নিত্যকার সহস্র অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। সেই অভাববোধ, শূন্যতা তো আছেই। সেই সঙ্গে একটা বিপন্ন ভাবও।

কালীতারা না থাকলে খুব অসুবিধা হবে তার—যেমন এই কদিন হয়েছে। দৈনিক জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত হবে।

একা-একা থাকাও বড় অসুবিধা।

সারাদিনের পর ঘরে এসে একটু সেবা, একটু স্বাচ্ছন্দ্য— রাত্রে পার্শ্ববর্তিনীর

সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করা, তার নানা কথা শুনতে শুনতে আরাম ও তৃপ্তির স্বাদের মধ্যে তন্দ্রায় চোখটি বুজে আসা—এটা যেন শুধু অভ্যাস নয়, প্রয়োজনও হয়ে পড়েছে তার।

কিন্তু কৈ, খুব একটা কান্না তো পাচ্ছে না।

অথচ কান্নাটাই যে শোভন এবং সঙ্গত সেটা সে বুঝতে পারছে।···

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর চিতার কাছে এসে দাঁড়ায় গোবিন্দ।

পুড়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটা সামনাসামনি দেখে যদি কান্না পায়!

আরও দু-তিনটি চিতা জলছিল। কালীতারার চিতার আশেপাশে।

তাদেরই শবযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন পাশে এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়সী একহারা গড়নের একটি ভদ্রলোক। ব্রাহ্মণ—উত্তরীয়ের মধ্যে থেকে মোটা পৈতার গোছা বেরিয়ে আছে।

'বাবাজীরই বুঝি অর্ধাঙ্গিনী গেলেন?'

একটু অবাক হয়েই তাকাল গোবিন্দ। কিন্তু অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করল লোকটি সম্বন্ধে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সংক্ষেপে বললে সে।

'আহা-হা। কীই বা বয়স, তেইশ-চব্বিশ হ'ল বোধ হয়—না হয় সামান্য একটু বেশীই হবে। এই বয়সে—বড়ই অসুবিধে, সত্যি!'

এ কথার উত্তর নেই, অগত্যা চুপ ক'রেই থাকে গোবিন্দ।

'আমার দেখুন না—সংসারের নানা ঝক্কিতে তিত বিরক্ত হয়ে দুটো দিন শ্বশুরবাড়ি জুড়োতে আসা—তা এসে পড়ে এই বিভ্রাট। শালার ছেলেটি—বললে বিশ্বাস করবেন না। বাবা, সাতদিনের জ্বরে! কে আর জানে বলুন, খবর তো পাই নি, হঠাৎ এসে পড়েছি—বলি শহর-বাজার জায়গা, তাও শহরের মত শহর—কলকেতা। কদিন একটু আরাম ক'রে আসি গে। তা এসে দেখি এই কাণ্ড! কাল এসেছি, আজই এই—!'

এই পর্যন্ত বলে চুপ ক'রে যান ভদ্রলোক। গোবিন্দও চুপ করে থাকে। এমনিতেই সে খুব আলাপী নয়—তা ছাড়া এই মানসিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কী কথা কইবে তাও ভেবে পায় না। শোকের সংবাদ—সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাকেই কে সান্ত্বনা দেয় তার ঠিক নেই—সে অপরকে কী দেবে?

অনেকক্ষণ পরে—বোধ করি কোন কথা খুঁজে না পেয়েই প্রশ্ন করে, 'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'দেশে থাকি বাবা। নিকটেই দেশ।' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক, 'খুব একটা দূর কোথাও নয়। বি. এন আর লাইন দিয়ে যেতে হয়, নতুন ইস্টিশান হয়েছে আবাদা—তার কাছেই মানিকপুর।...আমরা ব্রাহ্মণ, শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্তী আমার নাম, ঠাকুর ছিলেন ঈশ্বর জানকী চক্রবর্তী। মানিকপুরের চক্কোত্তি-বাড়ি ডাকসাইটে—এককালে দোল-দুর্গোচ্ছব দুই-ই হ'ত। এখন আর কি, আসলই নেই—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া সাপ হয়ে বসে আছি, কিছুই আর হয় না, পাল-পাব্বন বলতে আর কিছু নেই। কোনমতে দিন গুজরান করা। তবু গুপী চক্কোত্তী বললে ও অঞ্চলের সবাই চিনবে। ইস্টিশানে নেমে জিজ্ঞেস করলে কানাও দেখিয়ে দেবে আমার বাড়ি।'

তার পর যেন দম ফেলবার জন্যেই কতকটা থেমে বললেন, 'আপনারাও তো ব্রাহ্মণ দেখছি, সবাইকার কাঁধেই সুতোটা ঝুলছে—তা আপনাদের পরিচয় ?'

গোবিন্দ সংক্ষেপে নিজের নাম বলে।

'থাকা হয় কোথায় ? সিমলে ? কলকাতার সিমলে ? ও তো ধরুন আমার শ্বশুরবাড়িরই পাড়া। আমার শ্বশুরবাড়ি হ'ল ভালুকবাগান। নিজের বাড়ি ? ভাড়া—? তা কলকাতায় আর কটা লোকেরই বা বাড়ি আছে! সবই তো ভাড়া। কত তা-বড় তা-বড় লোক ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে দিলে সারা জীবনটা! করা হয় কি ? চাকরি ? তবে আর কি ? মাস গেলে যার বাঁধা আয় আছে তার আর বাড়ি-ভাড়াতে ভয় কি ?'

ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে অঙ্গারবর্ণ দেহটা।

ভরা যুবতী কালীতারার পুরন্ত দেহ বহ্নিরূপী রাক্ষসটা যেন লেলিহান জিহ্বা মেলে লেহন করছে—তাতেই ক্ষয়ে যাচ্ছে সেটা একটু একটু ক'রে।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে যেন অবাক লাগে, ভয়-ভয়ও করে।

হেম গিয়ে হাত ধরে অল্প টান দেয়—

'এদিকে সরে এসে বসো না বড়দা।'

'হ্যাঁ বাবাজী, তাই চল। এসব দৃশ্য না দেখাই ভাল, বুঝলে না ? কাঁচা বয়স—এখন কি আর এসব দেখার কথা—না দেখা উচিত ? এসো এসো।'

তার পরই সামান্য একটু জিভ কেটে বলেন গুপী চক্কোত্তী, 'ঐ যা! তুমিই বলে ফেললুম। অবিশ্যি তাতে দোষই বা কি, তোমার ডবলের ওপর বয়স আমার—

তবে নাকি আজকালকার ইয়ং বেঙ্গলরা আবার রাগ করে শুনেছি।'

উত্তর না দিলেও গোবিন্দ তাঁকে এড়াতে পারে না—কারণ সে তাঁর পাশে গিয়ে না বসলেও গোপীবাবুই এসে বসেন।

'তা কতকাল ঘর করলে বাবাজী মায়ের সঙ্গে?'

গোবিন্দ উত্তর দেয় না। এবার ও যেন কেমন ক্লান্তি বোধ করছে—সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাও। কিন্তু তাতে গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহ কমে না। তিনি বলেন, তা বছর পাঁচ ছয় হ'ল নিশ্চয় কী বল? ইস—তা হলে তো বড্ড কষ্ট লাগবে। ফাঁকা লাগবে—তা লাগুক, কিন্তু অসুবিধে হবে, কষ্ট হবে, সেইটেই বড় কথা। তেল, তামাক, বৌ—এসব অভ্যেস হয়ে গেলে ছাড়া শক্ত। তোমার তো দেখছি বাবাজী অবিলম্বে আবার সংসার করতে হবে।'

গোবিন্দ এবারও চুপ ক'রে থাকে—কিন্তু কথাটা শুনে যতটা বিরক্তি বোধ করার বা চমকে ওঠবার কথা ততটা কিছু লাগে না ওর। বরং নিজের মনের অবচেতনে যে অনুভূতিটা সুপ্ত আছে, প্রকাশের পথ খুঁজছে—গুপী চক্কোত্তীর কণ্ঠে সেইটের প্রতিধ্বনি শুনে কেমন একটা বল পায় মনে মনে, অনুভূতিটা স্বীকার করতে যে সংকোচ বোধ করার কথা—সে সংকোচের কারণও দূর হয়ে গিয়ে স্বস্তি অনুভব করে।

গুপী চক্কোত্তী একটু থেমে মেরজাইয়ের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করেন।

'বাবাজী কিছু মনে করো না—এখানে বসেই স্বার্থের কথা তুলছি—কিন্তু আর তো সময়ও পাব না, এখানেই যখন ভগবান দেখা করিয়ে দিলেন তখন এটাকে বিধাতারই যোগাযোগ মনে করতে হবে। আমার একটি ভাগ্নী আছে বাবা, বিধবা বোনের মেয়ে, সে মেয়ে ইস্তক সমস্ত আমার ঘাড়ে—তা ঘাড়ও তো আমার এই—পল্‌কা, কখন মট্‌কে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই—কিন্তু যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো আমাকেই দেখতে হবে। বয়স ঠিক যেমনটি মানানসই হয়—বারো পূর্ণ হয়েছে—ফা-রি ফুটফুটে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর তেমনি বুদ্ধি, ব্যাটাছেলে হলে জজ-মেজেস্টার হতে পারত। কী বলব বাবা, এ মেয়ে রাজা-রাজড়ার ঘরেই মানায়। তা আমায় তো বুঝতেই পারছ, না অর্থবল না লোকবল। সম্বন্ধ করছেই বা কে, আর বেস্তর জোরই বা কোথায়। তা একবার দেখবেন না কি বাবা? মেয়েটাকে? মাইরি বলছি : দেখলেই পছন্দ হবে।'

হেম পাশেই বসে ছিল। সবই শুনেছে। মানুষ যে এত হৃদয়হীন হতে পারে তা তার ধারণার অতীত। সর্বাঙ্গ রাগে রি-রি করতে লাগল তার।

কিন্তু গোবিন্দর কাছ থেকে এ প্রস্তাবের যে প্রতিক্রিয়া আশা করছিল সে—তার কিছুই দেখতে পেল না। যে কড়া উত্তর গোবিন্দর দেওয়া উচিত ছিল—যা হেমের গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল প্রকাশের জন্য, তা অমুক্তই রয়ে গেল। গুপীর কথায় যতটা অবাক সে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হ'ল, যখন শুনল যে গোবিন্দ ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছে, 'এ সব কথা আমাকে বলে কী লাভ বলুন, বরং যদি কথা পাড়তে চান তো মা'র সঙ্গে দেখা করবেন। মা আছেন মাসী আছেন—তাঁরাই আমার গার্জেন!'

কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না হেমের, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে যে কথাগুলো ঠিক গোবিন্দর মুখ থেকেই বেরোচ্ছে না আর কারুর—কিন্তু গুপী চক্কোত্তীর উৎসাহের অবধি থাকে না। তিনি প্রায় গোবিন্দর মুখের কথা কেড়ে নেন, 'বটেই তো, বটেই তো। আমারই ভুল ওটা। তা ভুল তো সব মানুষেরই হয় বাবা—ইংরেজরা নাকি বলে। তাঁদের কথাই খোঁজ করা আমার আগে উচিত ছিল। তা তাঁদের ঠিকানাটা বাবাজী—? মানে তোমারই ঠিকানা ধর। মাসীমা ওখানেই থাকেন! তোমাদের সঙ্গে? বিধবা নাকি?'

অসহ্য ক্রোধ সামলাতে না পেরে হেম বলে বসে, 'অত কথায় আপনার দরকার কি? এখনই হাঁড়ির খবর না নিলে চলছে না? আগে দেখুন তাঁরা এখন ছেলের বিয়ে দেবেন কিনা—এখন থেকেই অত আত্মীয়তা করছেন কেন?'

গুপী চক্কোত্তী কয়েক মুহূর্ত তাঁর শান্ত কোটরগত চোখ দুটি মেলে মিট্‌মিট্‌ ক'রে তাকিয়ে রইলেন হেমের মুখের দিকে—যেন ওর সমস্ত পরিচয় ও মনোভাব একসঙ্গে সেই এক নজরেই জেনে নিলেন, তার পর বললেন 'ঠিক বলেছ বাবা, আমারই অন্যায়। আসল কথা কি জান—বুড়ো হলে সব জ্ঞানগম্যি লোপ পেতে থাকে।...তা ঠিকই হয়েছে—তোমার কথাটা বলা কিছু অন্যায় হয় নি। শিক্ষার বয়সও নেই। বয়স হলে সন্তানদের কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। ধর না কেন—শাস্তরেই তো বলেছে যে স্বয়ং বেম্মাও তাঁর সন্তানদের কাছে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সনৎকুমার না কে যেন ধমক দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছিল তাঁকে।... তা সে কিছু নয়। এখন তোমার ঠিকানাটা শুধু দরকার। কাগজ প্যান্সিল কারুর কাছে কিছু আছে? নেই? কাগজ এক টুকরো বোধ হয় হবে—কিন্তু উট্‌প্যান্সিল একটা চাই যে! দাঁড়াও খুঁজে নে আসছি—কারুর কাছ থেকে চেয়ে!'

এই বলে—আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে প্রায় লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন এবং বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কোথা থেকে একটা পেন্সিল সংগ্রহ

ক'রে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন।

তার পর পকেট থেকে কাগজ বার ক'রে পেন্সিলসুদ্ধ গোবিন্দর শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বেশ গোটা গোটা ক'রে লিখে দাও দিকি বাবাজী ঠিকানাটা আমার আবার চশমা নেই কিনা!'

॥ ৪ ॥

দিন তিনেক পরেই গুপী চক্কোত্তী এসে হাজির হলেন।

বিকেলের দিক পুরুষরা কেউ বাড়ি নেই, উমাও পড়াতে গেছে। খবরটা নিয়ে এসেছিল নীলা—বাড়ীওলার ছোট মেয়ে। তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে কমলা বললে, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে? বুড়োমত বেটাছেলে? দূর পাগলী—খোকাকে খুঁজছে নিশ্চয়। বল্ গে যা গোবিন্দবাবু বাড়ি নেই, রাত আটটার পর দেখা হবে।'

'উঁহু—সে আমি বলেছিলুম। লোকটা বলছে, আমি গোবিন্দবাবুর মা'র সঙ্গেই দেখা করতে চাই। বিশেষ দরকার আছে।'

কমলার এখনও অপরিচিত পুরুষের সামনে বার হতে বিষম সংকোচ বোধ হয় —এখনও পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় নি সে। ছেলের বন্ধুরা কেউ বাড়ি এলে একগাল ঘোমটা টেনে বসে থাকে।

সে বিপন্ন কণ্ঠে বললে, 'আমার সঙ্গে কী দরকার—না না বল্ গে যা কথাবার্তা যা আছে যেন গোবিন্দবাবুকেই বলেন।'

গুপী চক্কোত্তীর কান খুব সাফ্। বাইরের দালান থেকেই কমলার অনুচ্চ কণ্ঠ তাঁর কানে গেছে। তিনি সেখান থেকেই হেঁকে বললেন, 'ওঁকে বল খুকী যে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আমার হয়ে গেছে—এখন দরকার ওঁয়াকেই। বল যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহু দূর থেকে এসেছি, বিশেষ প্রয়োজনেই। তোমার সঙ্গেই উনি একটিবার বাইরে এসে পায়ের ধুলো দিন, তোমার মারফৎই কথাবার্তা চলতে পারবে।...কিংবা এ বাড়িতে যদি আর কোন ছেলেপুলে থাকে তাকেই সঙ্গে ক'রে আসুন না হয়!'

অগত্যা কমলাকে বাইরের দালানে আসতে হয়।

তার আগে জানলার ফাঁক দিয়ে মানুষটাকে দেখে নেয়—নিতান্তই সাধারণ চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। খাটো মেরজাইয়ের মধ্য থেকে পৈতের গোছা ঝুলছে, পাত্লা উড়ুনির ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটা।

না, লোকটাকে খুব ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে না গুণ্ডা বদমাইশের মত চেহারা নয়।

নীলাকে দিয়ে একটা আসন পাতিয়ে দিয়ে—নিজে একটু দূরে মেঝেতেই বসল কমলা। নীলাকে টেনে কোলের কাছে বসিয়ে তার একটা হাত ধরে রইল। সাত বছরের মেয়ে হলেও সে ই এখন যেন ওর প্রধান ভরসা ও অবলম্বন।

কিন্তু অতঃপর গুপী চক্কোত্তী মশাই যথোচিত ভূমিকা ক'রে যে প্রস্তাবটি পাড়লেন —আর যাই হোক সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না কমলা। হেম কিছুই বলে নি—হয়তো বলবার মত কথা নয় বলেই বলে নি অথবা এত তাড়াতাড়ি গুপীবাবু এসে হাজির হবেন তা সে কল্পনা করে নি। সুতরাং কমলার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আর সেই অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়ের প্রবল আঘাতে স্থানকালপাত্রের হিসেবে ভুলে গেল সে—নীলাকে মধ্যস্থ ক'রে কথা বলবার সংকল্পটাও মনে রইল না। সে তার বিস্ফারিত চোখ সোজা গুপীবাবুর দিকেই মেলে প্রশ্ন করল, 'গোবিন্দ রাজী হয়েছে। সে নিজে ঠিকানা দিয়েছে। না না, এ কী বলছেন আপনি?'

'আজ্ঞে মিছে কথা কি আর বলছি? আর এসব ক্ষেত্রে মিছে কথা কতক্ষণ বজায়ই বা থাকবে বলুন? ছেলে বাড়ি ফিরলেই তো সব জানতে পারবেন। তা ছাড়া বাবাজী না বললে আমি আপনার ঠিকানাই বা জানব কি ক'রে। দেখুন না কেন তার নিজের হাতে লেখা ঠিকানা। তার হাতের লেখাটা আমি পাব কি ক'রে? তার হাতের লেখা তো চেনেন।'

মেরজাইয়ের পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার ক'রে সগর্বে মেলে ধরেন গুপী চক্কোত্তী। সামান্য একটু বিজয়ের হাসিও বুঝি ফুটে ওঠে ওঁর মুখে।

হাতের লেখাটা সত্যিই গোবিন্দর। সেদিকে একবার মাত্র চেয়েই বুঝতে পারে কমলা। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কমলা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, 'তা তার সঙ্গে যখন সব কথাই হয়ে গেছে, তখন আর মিছে আমার কাছে এসেছেন কেন? বাকী যা কথা তার সঙ্গেই শেষ করবেন।'

দুঃখের চেয়ে অভিমানই যেন বেশী ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে এতখানি জিভ কেটে দু কানে হাত দেন গোপীনাথ চক্রবর্তী। 'বাপ্ রে। তাই কখনও হয়? সে ছেলে আপনার নয়—বলেই দিয়েছে যে মাথার ওপর মা আছেন, মাসী আছেন, তাঁরাই গার্জেন। আপনাদের ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। তবে তার অমত নেই—এই হ'ল কথা।...

কী জানেন বেয়ান ঠাকরুন—বেয়ানই বলি, মেয়েটার অদেষ্টে থাকে এমন শাশুড়ী পাবে—না পায় তবু সম্বন্ধটা পাতিয়ে রাখতে ক্ষেতি কি—অনুগ্রহ ক'রে যখন কথাই কইলেন আত্মীয় ভেবে –কী জানেন—বিধবা বোনের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে বেশী দায়িত্ব, তা ছাড়া আমার সাধ্যি তো এই—কাজেই দিনক্ষণ সময়-অসময় বিচার করতে গেলে আর চলে না। শ্মশানেই কথাটা পাড়া যে আমার উচিত হয় নি তা কি আর জানি না—না কি এই অশৌচের মধ্যেই এখানে আসা যে কত অন্যায় তাও বুঝি নি! কী বলব, নিরুপায়। কাল ভোরের টেরেনে দেশে ফিরব, এখন আর হযতো আসার যোগাযোগই হবে না কত কাল। তবে যদি আপনার দয়া পাই তো—এই জন্যেই আসব। খরচাপত্তর ক'রে শুধু শুধু আসবার মত আমার অবস্থা নয় বেয়ান!'

কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় ও বলবার সেই একান্ত দীন ভঙ্গীতে নরম হয়ে আসে কমলা। মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা আমিও তো এখন কিছু পাকা বলতে পারব না চক্কোত্তী মশাই—বোন আছে, এক বোনপো আছে। তারা আসুক, ছেলেও আসুক—তার সঙ্গে কথা কই, পরামর্শ করি, তবে তো। এখন কোন কথা দিতে পারব না আপনাকে।'

'ব্যস্! ব্যস্! এই ঢের! এইটুকু যে দয়া করেছেন এতেই আমি কৃতার্থ। নারাজ হন নি একেবারে, এইটেই বড় কথা। তবে আজ আমি উঠি—এধারেও আপনাদের অশৌচটা চলে যাক দিন দশেক পরে একেবারে এসে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করব। আপনারা তো আর সে ধাধ্বাড়া গোবিন্দপুরে যেতে পারবেন না—এখানেই আমার শ্বশুরবাড়িতে এনে দেখাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। চাই কি বলেন তো এখানে এনেও দেখাতে পারি, একেবারে আপনার শ্রীচরণের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি। তবে আসি, প্রণাম হই!'

অনেকগুলো বিপরীত মনোভাবের সংঘাতের মধ্যে সাধারণ ভদ্রতা ও লৌকিকতারই জয় হয়। কমলা ইতস্তত ক'রে বলে 'অশৌচ চলছে, এখানে তো - মানে আপনাকে কিছু খেতে-টেতে বলতে পারলুম না—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুপীবাবু বলেন, না না, সে কি কথা! খাওয়াদাওয়ার ঢের সময় মিলবে। কুটুম্বিতে যদি হয়—তখন আপনার কাছে চেয়ে প্রসাদ পেয়ে যাব।...মেয়েটার কি এমন ভাগ্যি হবে—আপনার মত দেবীকে শাশুড়ী পাবে!... তবে কি জানেন, ভগবান এক কূল ভাঙেন এক কূল গড়েন। বোনটাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, মেয়েটার একটা ভাল হিল্লে ক'রেও দিতে পারেন!'

স্মিত প্রসন্ন মুখে বিদায় নেন গুপীবাবু।

থিয়েটারের দিন নয় শুধু একটু আড্ডা দিতে আর অভ্যাস মত বাকী মাইনের তাগাদা করতে যাওয়া—হেম সকাল ক'রেই ফিরল, প্রায় গোবিন্দরই সঙ্গে।

কমলা গোবিন্দকে সোজাসুজি প্রশ্ন না ক'রে হেমকেই নিয়ে পড়ল, 'হ্যাঁরে হেম, গুপী চক্কোত্তী মশাই লোকটা কে—কৈ তুই তো কিছু বলিস নি!'

হেম নিমেষে জ্বলে উঠল, 'এসেছিল নাকি সেই বদমাইশ বাস্তুঘুঘুটা? লোকটার সাহস তো কম নয়। পাজীর পাঝাড়া বেটা!…কী বললে? ইস্—আমি থাকলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম।'

'ছিঃ বাবা, ভদ্রলোককে অমন ক'রে বলতে নেই। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, তায় গরীব—ওদের কি আর অত ভাবতে গেলে চলে! বিপদে পড়ে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান হারিয়েছে। ওর দোষ কি?…তা ছাড়া খোকার মত না থাকলে—সে ঠিকানাই বা দিলে কেন?'

শেষের কথাগুলো বলবার সময় আড়ে একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায় কমলা।

গোবিন্দ রাঙা হয়ে ওঠে—সেটা হ্যারিকেনের আলোতেও টের পাওয়া যায়। সে জড়িয়ে জড়িয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, বা রে তা আমি কি করব—জোর ক'রে বললে ভদ্দরলোক—আর সত্যিই তো—গার্জেন আছে মাথার ওপর তাই বলেছি। এমন তো কিছু—'

হেমও গোবিন্দর কথা সমর্থন করে।

'সত্যিই তো—দাদার কি দোষ। যা ছিনে-জোঁক লোকটা! তা ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে তখন কী আর কথা-কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করে?…তা তুমি তাকে একেবারে হাঁকিয়ে দিয়েছ তো?'

'বেশ বাবা তোমরা। ছিনে-জোঁককে তোমরা বেটাছেলে হয়ে ছাড়াতে পারলে না—আমি ছাড়াব! কিছুই বলি নি, এখন এসব কথা আলোচনা করা যাবে না—শুধু এইটুকুই বলেছি। সেও পরে আসবে বলে চলে গেছে।

'আসাচ্ছি! উঃ—কী স্বার্থপর লোকটা! এই শোকের সময়—এখনও বোধ হয় সে মানুষটার চিতে জুড়োয় নি!'

কমলা তখনকার মত কথাটা বন্ধ ক'রে দিলে অন্য প্রসঙ্গ পেড়ে। এই আলোচনার সময় কিন্তু গোবিন্দর কণ্ঠে বা মুখের রেখায় যে কোন প্রতিবাদ বা

বিতৃষ্ণা ফোটে নি একবারও—এটুকু তার চোখ এড়াল না।

সারাদিনের পর ক্লান্ত উত্ত্যক্ত হয়ে ফেরে উমা—সাত-আট ঘণ্টা বকে বকে তার মাথা ঠিক থাকে না—এটা সবাই জানত। তাই উমার সামনে প্রসঙ্গটা কেউই তুললে না। কমলা ওকে খবরটা দিলে একেবারে রাত্রে—বিছানায় শুয়ে।

কিন্তু সে যতটা আশা করেছিল উমা অতটা উত্তেজনা প্রকাশ করলে না। বরং শান্ত ভাবেই প্রশ্ন করলে, 'তা তুমি এখন কি করবে ভাবছ? যা শুনছি, সে লোক তো শ্রাদ্ধের দিন গুনছে। কটা দিন গেলে মেয়ে নিয়েই এসে হাজির হবে।'

একটুখানি চুপ করে থাকে কমলা। বোধ হয় একটু সংকোচই অনুভব করে। তার পর বলে দেখিই না মেয়েটা যদি সত্যিই ভাল হয়—। বিয়ে তো দিতেই হবে। এই বয়স থেকে তো সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারে না ছেলে।'

তা থাকতে পারে না ঠিকই—', কণ্ঠে তিক্ততা আর চাপা থাকে না উমার, 'তবু দিদি, মনুষ্যত্ব বলে একটা কথা আছে। সে মেয়েটা তোমার সংসারে ক'বছর কেনা বাঁদীর মত খেটেই গেল শুধু—না পেলে এদিকের কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর না পেলে স্বামীর তেমন ভালবাসা। তোমার সংসারের ভাবনাতেই সে বাপের বাড়িতেও যেতে চাইত না—চায়ও নি শেষ পর্যন্ত—সেই মেয়েটা অমন বেঘোরে মারা গেল, তার জন্যে ছটা মাসও তোমরা অপেক্ষা করতে পারছ না। অশৌচটা কাটতেও তর সইল না। লোকে কি বলবে। মানুষের চামড়া আছে তাই যে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

কমলা অপ্রতিভ হয়, একটু বিরক্তও হয়। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'বলছে বলেই যে এখনই হচ্ছে তও তো নয়। মেয়ে দেখে পছন্দ হলেও তো আমরা দু মাস চার মাস সময় নিতে পারি। তা ছাড়া সত্যিই তো, সংসারেরও তো লোক চাই। আর খোকারও হাতে হাতে পান-জল কাপড়জামা কে যোগায়। হরেক রকম তোয়াজ ওর—আমার তো বয়স বাড়ছে দিন দিন—না কি কমছে?'

'সবই ঠিক দিদি—তবু মানুষ পারে না এটা। ভাব দিকি—যদি তোমার মেয়ে হ'ত?'

কমলা চুপ ক'রে যায়। খানিকটা পরে অসংলগ্ন খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'স্বামীর ভালবাসা পেলে না—এ কথা বললি কেন? গোবিন্দ তো বৌমাকে কোনদিন অযত্ন করে নি!'

'অযত্ন না করলেই ভালবাসা হয় না দিদি। আমাদের তো চোখ আছে—গোবিন্দ একদিনের জন্যেও মনেপ্রাণে বৌ বলে নিতে পারে নি তাকে···তুমিও কি আর তা লক্ষ্য কর নি।'

কমলা এ কথার কোন জবাব দেয় না।

গলির প্রান্ত থেকে তেরছা ভাবে একফালি গ্যাসের আলো এসে পড়েছে ওদের ঘরে—সামনের বুককেসটার ওপর। কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যায় ওপর ওপর সাজানো—বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া লাল কাপড়ে বাঁধা ওর স্বামীর তন্ত্রের পুঁথিগুলো। এগুলো তাঁর বুকের হাড় ছিল বলে কমলা প্রাণ ধরে ফেলতে পারে নি। ছেলেকে বলে রেখেছে, 'আমি মলে এগুলো গঙ্গায় দিস। তোর তো কোন কাজেই লাগবে না—আর ও কাজে লেগে দরকারও নেই।' এখন চুপ ক'রে সেই দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে আপনিই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন! এসব কথা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতেই বা হবে কেন!

॥ ৫ ॥

গুপী চক্রবর্তী বোধ হয় সত্যিই দিন গুনছিলেন। কালীতারার শ্রাদ্ধ মিটে যাবার ঠিক পরের রবিবারটিতেই তিনি একেবারে পাত্রী নিয়ে এসে হাজির হলেন।

পাত্রী আর তার সঙ্গে তার বিধবা মাও। আটঘাট বেঁধেই কাজ করতে অভ্যস্ত গুপীবাবু।

তখন বেলা তিনটে। সকলেই বাড়িতে আছে। সম্ভবত গুপীবাবু সেটাও হিসেব ক'রেই এসেছিলেন। গোবিন্দ তখনও ঘুমোচ্ছে—হেম উঠে বসে গল্প করছে মাসীদের সঙ্গে, আর একটু পরে সে থিয়েটারে যাবে। উমা ও কমলা অনন্ত চতুর্দশীর সলতের সুতো কাটছে টেকোতে।

বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হয়েছিল—কিন্তু সেদিকে কেউ কান দেয় নি। কারণ ছুটির দিন এ গলিতে গাড়ি আসা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। সামনের বাড়ি, পাশের বাড়ি—এ বাড়িতেও বাড়িওয়ালার আত্মীয় কুটুম আসতে পারে। কিন্তু গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই যখন গুপী চক্কোত্তীর ঈষৎ মেয়েলী ধরনের গলাটি নিখাদে বেজে উঠল—'কৈ গো বেয়ান ঠাকরুনরা, দরজাটা খুলবেন দয়া ক'রে?'—তখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

কমলা বিস্ময়-উদ্বিগ্ন মুখে প্রথমেই একবার উমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল—

দেখল ব্যাপারটা অনুমান করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হয় নি এবং সমস্ত চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছে। আর সে রক্তিমার কারণ যে আর যাই হোক লজ্জা নয়—তাও বুঝতে বাকী রইল না কমলার।

কিন্তু তখন আর সেদিকে তাকাবার অবকাশ নেই।

অর্ধাবগুণ্ঠিতা বিধবা এবং তার পেছনে একটি কিশোরী মেয়ে উঠান পেরিয়ে রোয়াকে এসে উঠেছে। অগত্যা অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যেতেই হয়। উমাকে কিছু বলবার সাহস নেই—কমলাই উঠে তাড়াতাড়ি মাদুর এনে বিছিয়ে দেয়।

গুপী চক্রবর্তী সময়ের মূল্য বোঝেন। গাড়োয়ানের সঙ্গে তকরার করলে আরও দু আনা বাঁচত কিন্তু সে দু আনার চেয়ে বর্তমানকালের একটি মিনিটের দাম অনেক বেশী। তিনি নির্বিবাদে হাওড়া থেকে আসার ভাড়া আট আনার জায়গায় পুরো দশ আনাই দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকলেন এবং অপেক্ষাকৃত চাপা অথচ তেমনি তীব্র নিখাদে নির্দেশ দিলেন, 'করছিস কি নিস্তার, পায়ে পড়, পায়ে পড়—এমন পা আর পাবি না। সাক্ষাৎ মা দয়াময়ী—ওঁর দয়া হলে তোর রাণীর আর কোন ভাবনা থাকবে না। রাণী তোর সত্যিই রাজরাণী হবে—।'

নিস্তার অর্থাৎ নিস্তারিণীও প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তিনিও আর কালবিলম্ব করলেন না, সত্যিসত্যিই কমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে আর্দ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বড় জ্বালায় জ্বলে শীতল হতে এসেছি দিদি, আপনি তো আমার মতই দুঃখী, দুঃখীর ব্যথা বুঝবেন। মেয়েটাকে পায়ে ঠাই দিয়ে আমায় বাঁচান। ইহজীবনে আর কোন সাধ-আহ্লাদ নেই—ওর সদ্‌গতি হলেই আমার সব হ'ল। এখন আমার এই ধ্যানজ্ঞান, এই চিন্তা। আমাকে রক্ষা করুন দিদি—করতেই হবে। নইলে এ পা আর ছাড়ব না!'

কিন্তু এ নাটকের সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না। ততক্ষণে নিস্তারিণীর পশ্চাদ্‌বর্তিনী সেই কিশোরী মেয়েটির দিকে চেয়ে এরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

রাণী যেন সাক্ষাৎ রাধারাণী।

বুঝি বা এই কিশোরীকে দেখেই সাধক মহাজনরা পদাবলী রচনা করেছিলেন—ভগবানের কিশোরীভজন লীলা কল্পনা করেছিলেন।

শ্বেতপদ্মের মত ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্র বর্ণ, পদ্মের পাপড়ির মতই বিশাল বিস্ফারিত চোখ, তার সঙ্গে মানানসই টিকলো নাক, সুকুমার চিবুক। বারো তেরো বছরের মেয়ে—যৌবনের সুঠামতা এখনও লাভ করে নি তার তনু-দেহ—কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কী হবে, তা কী হয়েছে দেখেই বোঝা যায়।

ছিপছিপে অথচ গোলালো গড়ন, ছোট ছোট বক্তাভ হাতে চম্পক-কোরকের মত আঙুল, কৃষ্ণনগরের মূর্তির ধাঁচে ঈষৎ বেঁকে আছে। শুধু রূপ নয় মনটিও যে নির্মল, এখনও কাঁচা—গুপী চক্রবর্তীর আওতায় থেকেও অকালে পাক ধরে নি তত—বোঝা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মা'র কীর্তি দেখে—সম্ভবত পথে আসতে আসতে মামার রিহার্স্যাল কল্পনা ক'রেই—মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। আর তাতে দেখা গেল দাঁতগুলিও তার মুক্তার মতই সাজানো—এমন কি শিল্পী বিধাতা সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে টোলটি দিতেও ভুল করেন নি।

নিস্তারিণী মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় জ্বলে উঠলেও সে উম্মা বাইরে প্রকাশ করলেন শুধু এক হ্যাঁচকায় মেয়ের হাত ধরে টেনে এনে চাপা তর্জন ক'রে উঠলেন, প্রণাম কর হতভাগী—স্বর্গের দেবতা এঁরা—এঁদের পায়ে হাত দিবি এ তোর জন্মান্তরের পুণ্যি।'

ততক্ষণে মেয়েটিও নিজেকে সামলে নিয়েছে। ছেলেমানুষ হলেও এই রকম ক্ষেত্রে তার পক্ষে হাসাটা যে উচিত নয়—সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি তার হয়েছে। সে এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কমলাকে প্রণাম করতে গেল।

কিন্তু কমলা তাকে পুরোটা হেঁট হতেই দিল না—তার আগেই তাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে সুগভীর স্নেহে বলে উঠল, 'তোমার আর পায়ে হাত দিতে হবে না মা, তুমি যে আমার মা-জননী।'

তার পর উমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'এঁকেও প্রণাম কর মা—আমার বোন।'

উমাকে প্রণাম করে মেয়েটি অবশিষ্ট উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে হেমকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কমলা তাকে ধরে ফেলে বললে, উঁহু—উঁহু, ওকে প্রণাম করতে হবে না, ও যে সম্পর্কে তোমার দেওর হবে মা।'

ভাবের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এরা সকলেই ভাসছে তখন—কে কি বলছে, কী আচরণ করছে কারুরই তখন সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা নেই। কমলারই যদি এই রকম মুগ্ধ অবস্থা হয়—হেমের যে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। মুখের কাছে যে কড়া কড়া কথাগুলো তৈরী হয়েছিল গুপীবাবুর উদ্দেশে—সেগুলো যে কখন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে তা হেম বুঝতেই পারে নি। এই ত্রয়োদশী কিশোরীর রূপের মোহ জাদু বিস্তার করেছে তার মনে মস্তিষ্কে চৈতন্যে—সে বিহ্বল হয়ে গেছে। কী করা উচিত, কী বলা উচিত কিছুই বুঝতে না পেরে ঘেমে লজ্জায় রাঙা হয়ে বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। রাণী তাকে স্পর্শ করে নি—কিন্তু তাকে প্রণাম করতে, স্পর্শ করতে আসছিল—এইটে অনুভব ক'রেই অকারণে কণ্টকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গুপীবাবুর বুদ্ধি, দৃষ্টি কিংবা শ্রুতিশক্তি কিছুমাত্র আচ্ছন্ন বা মুগ্ধ হবার কারণ ঘটে নি। তিনি এই সুযোগ মুহূর্তকালের জন্য নষ্ট হতে দিলেন না, কমলার মুখের কথার শেষটুকু শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয় মা ব্রহ্মময়ী, জয় গৌর আনন্দময়। ব্যস্—জবান পেয়ে গেছি, আর কিছু ভাবি না বেয়ান, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে ভিক্ষাটি দিলেন আর এই অনাথা বেওয়া বিধবাকে—এর জন্যে মা আনন্দময়ী আপনার প্রাণ পুরে মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। নিস্তার কার মুখ দেখে উঠেছিলি আজ, তোর মেয়ের হিল্লের মত হিল্লে হয়ে গেল।'

বিচার শুরু হবার আগেই যদি আসামী অপরাধ কবুল ক'রে বসে থাকে, তা হলে পরে আর সওয়াল জবাব জমে না। মামলা চলারও আর কারণ থাকে না।

এক্ষেত্রে কমলারও হ'ল তাই।

কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে এমন কথাই বেরিয়ে গেল যে পরে আর কোন ওজর আপত্তি ওঠাবার অবসর রইল না। গুপীবাবু এবং তাঁর উপযুক্ত বোন নিস্তারিণী দুজনে পালা ক'রে এমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করলেন যে এ পক্ষে আর কেউ কোন কথা কইবার বিশেষ ফাঁকও পেলে না। তাঁরা বিবাহের প্রতিশ্রুতি তো নিয়ে গেলেনই—এক দিন ঠিক করা ছাড়া বলতে গেলে আর কোন কথাবার্তাও বাকী রইল না। কমলা বা হেমের পক্ষ থেকে সামান্য একটু দ্বিধার ভাব দেখাবার ক্ষীণতম চেষ্টাও কোথায় উড়ে চলে গেল এঁদের আন্তরিকতার প্রবল বাতাসে। দেনাপাওনার কথাও তোলা গেল না,—এঁরা বিশেষ কিছুই চাইবেন না এক রকম এই কথা আদায় করেই নিয়ে গেলেন গুপীবাবু। বাকী রইল শুধু দিনটা ঠিক করা—সেটা গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ক'রে ঠিক হবে—এই স্থির রইল, অর্থাৎ শোভনতার জন্য কতটা অপেক্ষা করা যায় সেইটে ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া —কমলা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল—হয়তো আর্থিক প্রশ্নও উঠবে, গোবিন্দকে ওর বন্ধু-মনিবের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা ধার করতেও হবে।

সে কথাটাও এখন সারতে পারলে গুপীবাবু খুশী হতেন কিন্তু মানুষের কোন সার্থকতাই পরিপূর্ণ ভাবে দেওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়—তাই সেটা আর হয়ে উঠল না। এঁরা আসাতেই গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—সে ওধারের দরজা দিয়ে প্রায় তখনই সরে পড়েছে।...

উপযুক্ত জলযোগের পর গুপীবাবুরা বিদায় নিতে কমলা উমার মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ পেল। বড় রকমের একটা ঝড়ই সে আশঙ্কা করেছিল সেদিক থেকে, কিন্তু প্রাথমিক রোষরক্তিমা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে যে

একটা ভাবলেশহীনতা ফুটে উঠেছিল—তার আর কোন পরিবর্তন হ'ল না। অভদ্রতা করার মানুষ সে নয়, নিস্তারিণীর দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর ভদ্রভাবেই দিয়েছে—তবে সেটা কমলার কাছে খুব বড় আশ্বাস নয়। সে সারা সন্ধ্যাটা বার বার ভয়ে ভয়েই তাকাতে লাগল উমার মুখের দিকে, কিন্তু সেখানে কোন বৈলক্ষণ্য টের পাওয়া গেল না। তার শান্ত উদাসীন মুখভাবে বা সহজ আচরণে কোথাও এতটুকু রূপান্তর ঘটল না।

তবু কমলার ভয় সবটা যায় নি—রাত্রে শুতে গিয়ে একান্তে হয়তো কথাটা উঠবে এ আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু রাত্রেও সহজ ও স্বাভাবিক দু-চারটে কথাবার্তার মধ্যেই উমা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নিজে থেকে বিকেলের কথাটা তুলবে এত সাহস কমলার হ'ল না—তবু এইবার সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'ল।

মনকে সে আশ্বাস দিলে, আর যাই হোক—কোন বড রকমের তুফান আর উঠবে না।

এর পর মাস দুই কাটল নিরাপদেই। এর মধ্যে গুপীবাবু বারকতক এসেছেন, দিনও ঠিক হয়ে গেছে, বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়েছে। সামনের অঘ্রানেই বিয়ে। কমলার মনে যেটুকু আশঙ্কা ছিল সেটুকুও আর নেই। বিবাহের আয়োজনে উমা কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি বটে কিন্তু তার তরফ থেকে কোন অসহযোগেরও আভাস পাওয়া যায় নি।

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই একেবারে প্রথম সে আভাস পাওয়া গেল পাকা-দেখার হাঙ্গামাও মিটে যাওয়ার পরের দিন—বিবাহের যখন আর মাত্র সাতটি দিন বাকী আছে।

উমা সহজভাবেই সন্ধ্যার পর পড়িয়ে ফিরে—আহ্নিক করতে যাবার আগে দিদির কাছে কথাটা পাড়লে, 'দিদি, আমার এক ছাত্রী থাকে এই কাছেই, ক্রিশ্চানদের হোস্টেলটার পেছনে—তারাও ব্রাহ্মণ, দু-তিনটি বিধবা আছেন বাড়িতে। তাঁরা একটা ছোট ঘর ভাড়া দেবেন—বাড়ির মধ্যে, ভাড়াও খুব কম—মনে করছি এই মাসের পয়লা থেকে আমি সেখানে গিয়েই থাকব।'

খুব স্বাভাবিক ভাবে, একান্ত শান্তকণ্ঠে কথাগুলি বললে উমা,—কিন্তু তাতেই আরও দুর্বোধ্য ঠেকল কমলার কাছে। সাধারণ শব্দেরও যেন অর্থ গ্রহণ করতে পারলে না সে—হাঁ করে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে যখন ওর কণ্ঠে কথা ফুটল, তখন শুধু বিহ্বল ভাবে এই প্রশ্নটুকুই

করতে পারল, 'তুই—তুই একলা থাকবি? আলাদা ঘরভাড়া ক'রে? কী বলছিস?'

'দোষ কি? আর অন্তত আমার স্বভাব-চরিত্রের দোষ কেউ দেবে না। দশ বাড়ি মেয়ে পড়িয়ে খাই, সে দোষ দিলে এত কাল ঢের দিতে পারত। তা ছাড়া সে বয়সও আর নেই।'

'কিন্তু তার দরকারটা কি পড়ল···সেইটেই তো বুঝছি না।'

'সব কথা সবাই বুঝতে পারে না দিদি!···সে মেয়েটাকে আমিই একরকম জোর ক'রে পাঠালুম, আমি না পাঠালে সে হয়তো যেত না—মরতও না। সেজন্যে তার কাছে চিরদিন আমি অপরাধী হয়ে থাকব।···তার বড় সাধের সংসার—সংসার করবারও তার বড় শখ। তার জায়গায় এই ঘরে এই সংসারে তার সতীন এসে ঢুকবে—তিন মাস না যেতে যেতে—এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। মনে হবে আমিই তাকে খুন করেছি—এই মতলবে। তার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে স্বর্গ থেকে। না দিদি, মাপ কর আমাকে—এখানে আর আমি থাকতে পারব না। এ ঘরে আর একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দেখলে এখানে আমার মুখে অন্ন রুচবে না।' বলতে বলতে, নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও উমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সম্ভবত সেই আসন্ন চোখের জল গোপন করতেই সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে নিজের পুজোর আসনে গিয়ে বসে চোখ বুজল।

ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের অশ্রুর মধ্যে অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির অশ্রু আত্মগোপন করতে পারবে—সুলভ ভাবাবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ার লজ্জায় পড়তে হবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কথাটা কেমন ক'রে রাষ্ট্র হয়ে গেল তা হেম বুঝতে পারলে না। সম্ভবত কম্বুলে-টোলা থেকে ফিরে এসে রুষ্ট এবং উৎকণ্ঠিত রমণীবাবুকে যখন দেরি হওয়ার কৈফিয়ত দিচ্ছিল, সেই সময়ই কেউ শুনে থাকবে।

বাবু বেশ একটু তেতে ছিলেন, আর তাতাই স্বাভাবিক—সেটা হেমও মনে মনে স্বীকার করে। বাড়িটা সে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে কি না—চিঠিটা ঠিকমত

পৌঁছল কিনা—সে সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা বোধ করবারই কথা, কারণ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু যাবেন তাঁর সঙ্গে, তাঁদের আতিথেয়তার দায়িত্ব আছে। কিছু জরুরী কাজও ছিল—খবরটার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে সময় পার হয়ে গেল, কাজটা নষ্ট হ'ল। সুতরাং ঝাঁজটা অনেকক্ষণ থেকেই মনের ভেতর জমা হয়েছে, তার ফলে চাপা গলায় কথা কইবার অর্ধ আন্তরিক ক্ষীণ চেষ্টাটা প্রথম দুটো-চারটে শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় ভেসে চলে গেল—বেশ চড়া গলাতেই কথা শুরু করলেন। নিজের কাজ পণ্ড হওয়ার তিক্ততা, ওর নির্বুদ্ধিতার জন্য বিরক্তি এবং সবটা জড়িয়ে অতিরিক্ত একটা উষ্মা—গলার আওয়াজে একসঙ্গে উপচে বেরিয়ে এল যেন।

বাবু প্রচণ্ড রাশভারী মানুষ। তাঁর এই উষ্ণ কণ্ঠস্বরের সামনে বহুদিনের পুরনো কর্মচারীদেরই মাথার ঠিক থাকে না—হেম তো সেদিনের লোক। তাঁর চাপমুখের চেহারা দেখেই এক নিমেষে ঘেমে উঠেছিল—এখন ধমক খেয়ে গলাতে যেন আওয়াজটাই জড়িয়ে গেল, প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিলম্ব হওয়ার কারণটা গুছিয়ে বলতে পারলে না। ফলে যে কৈফিয়তটা এক মুহূর্তে দেওয়া যেত সেইটে বলতেই তার বহু সময় লাগল এবং ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা চড়া চড়া ধমক খেতে হ'ল।

যাই হোক—বিলম্বের কারণটা শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তার সেই জড়ানো গলার আওয়াজ এবং উল্‌টো পাল্‌টা কথার মধ্যে থেকে উদ্ধার করে বাবু খুশীই হলেন। আরও খুশী হলেন হেমের এই অহেতুক ভয় দেখে। কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রীতি বা শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়টাই তাঁর বেশী পছন্দ। তাঁর দাপট আছে, তাকে ওরা যমের মত ভয় করে—এইটে জানলে তিনি খুশী ও নিশ্চিন্ত হন।

আজও তাঁর মুখ প্রসন্ন হতে দেরি হ'ল না। তবু প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসমিশ্রিত মৃদু ধমকের সুরেই বললেন, 'এই তো—এই কথাটা এতক্ষণ বলে ফেললেই তো হয়ে যেত। বাজারটা ক'রে দিয়ে এসেছ—কাজটা তো কিছু অন্যায় কর নি। তার জন্যে এত ভণিতা কেন? তা মাছ-টাছ বেশ ভাল দেখে কিনে দিয়ে এসেছ তো? …পচা-পাচ্‌কো হলে খুব মুশকিল হবে কিন্তু—বড় বড় লোক সব যাবে, দুজন ব্যারিস্টার, একজন হাকিম। সাবধান! দেখো বাপু, আমাকে ডুবিও না যেন।'

এ কণ্ঠস্বরে খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল হেম। মাথা হেঁট ক'রেই জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না—টাটকা দেখেই কিনেছি। জিনিস কোনটা খারাপ হবে না।'

'বেশ বেশ—তা হলেই হ'ল।' তার পর জামাটা উল্‌টে ট্যাঁক থেকে একটা আধুলি বার ক'রে ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো—বাড়ির জন্যে মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও।'

পকেটে মনিব্যাগ থাকে, তাতে টাকারও অভাব নেই—তবু সর্বদা ট্যাকে কিছু রেজগি রাখা রমণীবাবুর অভ্যাস। বলেন 'একশো বার ব্যাগ বার ক'রে পয়সা দেওয়া বড় হাঙ্গাম! তা ছাড়া কেউ তুলে নিলে তো সব গেল - একটা পয়সার আজীর!'

দুখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও রমণীবাবু হামেশাই ট্রামে যাতায়াত করেন—সুতরাং পকেটমারের ভয় থাকাটা স্বাভাবিক।

সেই চেঁচামেচির ফলে দু-চারজন বাবুর ঘরের বাইরে এসে জমাটা আশ্চর্য নয়—আর দুজনের কথাবার্তা থেকে ঘটনাটা অনুমান করতেও কারুর অসুবিধা হবার কথা নয়।

তার ফলে হেমেরই প্রাণান্ত। একটা ঘাড়ে কারও দুটো মাথা নেই যে বাবুর সামনে রসিকতা করবে। আড়ি-পাতার ইতিহাসটাও তাঁর জানার সম্ভাবনা ছিল না— কারণ তাঁর বাইরে আসার আভাস মাত্র পেয়েই সবাই পালিয়েছিল। হেমও প্রথমটা তাই বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলে একেবারে যখন চারিদিক থেকে বাক্যবাণ বর্ষিত হতে শুরু হ'ল—তখনই।

প্রথমেই শুরু করল নন্দ— ওরই এক সহকর্মী গেট-কীপার।

চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বললে, 'আর কি হেমচন্দর—তোমার কপাল তো খুলে গেল—দেখো বাবা, সুসময়ে গরীবদের কথা একটু মনে রেখো—একেবারে পায়ে ঠেলো না!'

ওরা যে কেউ অপরাহ্নের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানে—এ অনুমান হেমের স্বপ্নের অগোচর। সে বিহ্বল হয়ে খানিকটা নন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'তার মানে?'

'না—তাই বলছি!', আবারও মুচকি হাসে নন্দ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানাই এসে পড়ে।

'বাবা ডুবে ডুবে জল খাও—ভাবো শিবের বাবা টের পাচ্ছে না! হুঁ-হুঁ—সবাই বলে পাড়াগেঁয়ে মেড়া, ভূত, বোকা। আমি চিরদিন বলে এসেছি পাড়াগাঁয়ের লোকেরা আমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। তা ভাল ভাল—নিজের আখের দেখবে বৈ কি। তবে একটু সাবধানে চ'লো ধন—একদিকে মেয়েমানুষ আর একদিকে বড়লোক। দুই-ই সমান। লোকে কথায় বলে—বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষ্যাণে হাতে দড়ি ক্ষ্যাণেকে চাঁদ!...আর মেয়েমানুষ?

আরও সাংঘাতিক—ও হ'ল শাঁখের করাত, যেতেও কাটে আসতেও কাটে।'

হেম আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে। একটা অস্পষ্ট ঝাপসা-মত সন্দেহ যে মনের কোণে উঁকি না মারে তা নয়—তবু সে অবাকই হয় সত্যি-সত্যি। বলে, 'কী যে তোরা বলছিস—বুঝতেই পারছি না!'

'ইল্-লো!' কানাই ওর দাড়িটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলে. 'কচি খুকী একেবারে! কিচ্ছু জান না!···অত বড় ঘুঘু কনট্রাক্টারকে ঘায়েল ক'রে তার মেয়েমানুষের দিকে হাত বাড়িয়েছ—তুমি কিছু জান না! ন্যাকা!'

'এই কেলো - কী করিস। চুপ কর্।' সতর্ক ক'রে দেয় নন্দ।···

একটু পরে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনিও মুখ টিপে হাসেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'দেখো হে ছোকরা, সাবধান!···বেশী বাড়াবাড়ি করতে যেও না যেন। ও হ'ল নৈবিদ্যির মোণ্ডা - কুকুরের ওতে মুখ দিতে নেই!'

লাল হয়ে ওঠে হেম—লজ্জাতেও বটে, অপমানেও বটে। কিন্তু এতকাল এখানে থেকে এইটুকু বুঝেছে যে এ ধরনের কথা নিয়ে বাদানুবাদ বা তর্কের ক্ষেত্র এটা নয়। পাঁকে নাড়া দিলে, পাঁকই ঘুলোয় – পরিষ্কার জল মেলে না তাতে।

সে শুধু আস্তে আস্তে বলে, 'কী বলছেন দক্ষিণাদা তা বুঝছি না – মনিব হুকুম করেছিলেন—তামিল না ক'রে উপায় ছিল না। এতে এত টিটকিরির কী আছে তাও বুঝি না!'

দক্ষিণাবাবু আর কথা বাড়ান না, ওর পিঠে গোটা দুই মৃদু চাপড় মেরে বলেন, 'রাগ হয়ে গেল অমনি! ঠাট্টা করছিলুম রে!···তবে ভাই সাবধানে থাকিস একটু। এখানে অনেক বছর কাটল তো—অনেক দেখলুম।'

কিন্তু এধারে যতই যা রাষ্ট্র হোক—হেম নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই দেখতে পায় না। বরং উল্টোটাই দেখে।

কৃতজ্ঞতা সে আশা করে নি—কী-ই বা সে করেছে কৃতজ্ঞতা পাবার মত? তা কিছু নয়—তবে পরিচয়ের স্বীকৃতিটা অন্তত আশা করেছিল! কিন্তু দিন-তিনেক পরেই কী একটা কাজে ভিতরে যাবার দরকার হতে এবং (হয়তো নিজের সচেতন মনের অগোচরে সে রকম একটা চেষ্টাও ছিল) নলিনীবালার সামনে পড়ে যেতেও, সে অবাক হয়ে দেখলে, সামান্যমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের দীপ্তিও ফুটল না তার চোখে। যেমন সাধারণ ভাবে অন্য দিন নির্লিপ্ত স্মিতমুখে চেয়ে বসে থাকে—তেমনিই রইল নলিনী।

শুধু অবাক হ'ল না হেম—আহতও হ'ল।

এতটা সে আশঙ্কা করে নি। হলেই বা বাবুর প্রেয়সী—তা বলে চিনতে পারবে না, এত অহঙ্কার কিসের।

অপমান-বোধ, ক্ষোভ অথবা উষ্মা—কারণ যা-ই হোক, হেমের কান দুটো আগুনের মত গরম হয়ে উঠল। বিশেষ ক'রে তার মনে হ'ল চারিদিক থেকে অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলে সম্পূর্ণ অকারণেই, নলিনীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে বোকার মত হেসে বললে, 'এই যে, ভাল আছেন ?'

নলিনী একটু যেন বিস্মিত হয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকালে, তার পর তেমনি থতমত ভাবেই বললে, 'ভাল—হ্যাঁ—তা—। অ, আমাদের হেমবাবু! পোড়া কপাল আমার। সেদিন বুঝি বাবুর চিঠি নিয়ে গিছলেন! ঠিক বটে। হ্যাঁ ভাই, বেশ ভাল আছি। আপনার খবর ভাল সব ? আহা, আপনি সেদিন কষ্ট না করলে বড় বিপদে পড়তে হ'ত।'

এই বলে চারিদিকে একবার বিচিত্র অমায়িক ভঙ্গীতে তাকিয়ে নিয়ে পাশের আর এক অভিনেত্রীর দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি লা নেডী তোর ডিবেটা—আমার চাকরটা আজ আবার এমন ঝাল পান এনেছে, মোটে মুখে দিতে পারছি না।'

হেম তখন পালাতে পারলে বাঁচে—শুধু এখান থেকে নয়—এই থিয়েটার থেকেও। মনে হচ্ছে আরও উপহাস এবং টিটকিরি নির্বোধের মত সেধে নিজের ওপর টেনে আনল সে।

অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে একটা উইংস-এর পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছে—কানের পাশ থেকে হিস্ হিস্ ক'রে উঠল দক্ষিণাদার কণ্ঠস্বর, 'ইস্টুপিড্। সেধে অপমান হতে না গেলে বুঝি চলছিল না ? ঐটুকু কথা কয়ে কী স্বগ্‌গ লাভ হ'ল তাই শুনি।...নিজেও মরবি ঐ ছুঁড়ীটাকেও মারবি যে—এটাও বুঝিস না ?'

আরও বিস্মিত হ'ল হেম—কিন্তু তবু ওঁর এই মন্তব্যের অর্থ টা জিজ্ঞাসা করতে পারল না দক্ষিণাদাকে। অপমানে লজ্জায়, কেমন এক ধরনের অবর্ণনীয় গ্লানিতে কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল—গলা দিয়ে একটু স্বরও বেরোল না।

॥ ২ ॥

দক্ষিণাবাবুর কথাগুলোর অর্থ বুঝল হেম—আর কদিন পরে।

সেদিন বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে

—আর নয়! চাকরি করতে গেছে, চাকরিই করবে। বাইরে তার কাজ—বাইরে থাকাই ভাল—কোন দিন কোন ছুতোয় সে ভেতরে যাবে না, কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কথাও কইবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রইল না—দিন পনেরো পরেই আবার এক অপরাহ্নে বাবু ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

ভয়ে ভয়েই গেল হেম—যদিচ অনেক ভেবেও এমন কোন অপরাধের কথা তার মনে পড়ল না যাতে ভয় পাবার কারণ থাকে—কিন্তু বাবু ডাকলেই বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে। এইরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সকলের।

যাই হোক—ঘরে ঢুকে দেখলে বাবুর মুখ অনেকটা প্রসন্ন। নিজের ডেস্কের সামনে বসে একটা কাগজ মেলে আগের দিনের হিসেব দেখছিলেন কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসেছ? দাঁড়াও।' তার পর হিসেবটা দেখা শেষ হতে ওর দিকে খানিকটা নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বললেন, 'ও, হ্যাঁ—তোমাকে ডেকেছিলুম বটে। কী যেন তোমার নাম—হেম না?···তা শোন, একটা কাজ করতে পারবে? সেদিন যে বাড়িটায় গিছলে, মনে আছে তোমার?···আজও একবার সেখানে যেতে হবে।···মানে—আজও কজন লোক খাবে, একটু বাজার দরকার। সেদিন নাকি তুমি বেশ ভাল বাজার করেছিলে—অনেক সস্তায়ও। সাজার-ঝিকে দিয়ে বাজার করানো—সে বেটি দু' হাতে চুরি করে; তা পারবে বাজারটা ক'রে দিতে?'

প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে পড়ে বৈকি!

তবুও মনিবের মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'পারব।'

'বেশ, বেশ। এই তো চাই, কোন কাজেই না বলতে নেই। আমি—আমাকে আজ এই দেখছ। একদিন গামছা কাঁধে ক'রে ফিরি করেছি এই কলকেতার রাস্তাতেই, মেড়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আজও—লাখ লাখ টাকার ঠিকেদারি করি বটে—কিন্তু নিজে ছাতি মাথায় দিয়ে রোদে জলে দাঁড়িয়ে মিস্তিরি খাটাই।··· তোমার উন্নতি হবে।···এই নাও ফর্দ। দু-রকম মাছ, একটু মাংস—আর আদা পেঁয়াজ টকদই, আলু হিসেব-মত। সবই লেখা আছে, এই দশটা টাকাও ধর—বেশ ভাল দেখে জিনিস কিনো—বিশিষ্ট ভদ্দর-লোকেরা খাবেন।'

তার পর কী ভেবে ট্যাঁক থেকে আরও দুটো টাকা বের ক'রে দিয়ে বলেন, 'এটাও রাখো—যাচ্ছ যখন তখন অমনি তিনকড়ি ময়রার দোকান থেকে দই-সন্দেশও কিনে নিয়ে যেও—দশে বোধ হয় কুলোবে না, আরও লাগবে।'

হেম ফর্দটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এত বাজার নিয়ে যাব কী করে? ঝাড়ন কি গামছা একটা—। ও বাড়িতে কি আগে যেতে হবে?

গিরিধারীকে সঙ্গে নেব ?'

'তোমার তো খুব মনে থাকে হে ছোকরা ! গিরিধারীর নামটাও মনে ক'রে রেখেছ ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকান রমণীবাবু ওর মুখের দিকে, 'না তার দরকার নেই। একেবারে এই নতুন বাজার থেকে বাজার ক'রে একটা ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যেও।...কতই বা নেবে—চারটে পয়সা বড় জোর।. তার জন্যে আর দোকর আসা-যাওয়া ক রে লাভ কি ? নতুন বাজারে মাল কিনলে কিছু ওয়ারাও পাওয়া যাবে তাতেও মুটের পয়সাটা উসুল হবে।'

মুটের পয়সা ওর ট্রামভাডাতেও উসুল হবে, মনে মনে গজগজ করতে লাগল হেম, মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে কিছু ট্রামে যেতে পারবে না। মাঝখান থেকে ওব পয়সাটা মাটি।

কিন্তু সেটা মুখে বলা সম্ভব নয়। 'যে আজ্ঞে' বলে কোঁচার খুঁটে টাকা কটা বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে পডতে হ'ল তখনই।

করতেই হবে—তাই করা। কিন্তু মনটা অপ্রসন্ন হয়ে রইল সারাক্ষণ। আবার নলিনীর সামনে গিয়ে দাঁডাতে হবে—এই ভেবেই আরও বিশ্রী লাগছিল।

মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে, নিজের দু হাতে দইয়ের খুলি আর সন্দেশের হাঁডি নিয়ে ভাদ্রের খর-রৌদ্রে হেঁটে যেতে যেতে বার বার নিজের মনকে শাসাল, 'খবরদার, আর কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা করা নয়।...দোরের কাছ থেকে গিরিধারীকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েই চলে আসতে হবে। বসতে বললেও বসব না !'

কিন্তু বাডিতে পৌছে কড়া নাডতে দোর খুলে দিলে গিরিধারী নয়—নলিনী স্বয়ং।

'আসুন, আসুন। আপনার জন্যেই সেই থেকে নিচে বসে আছি হা-পিত্যেশ ক'বে। আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। যা রোদ আজ বিকেল অব্দি !'...

হেম এ আত্মীয়তায় ভিজবে না—সে শুকস্বরেই বলবার চেষ্টা করলে, 'থাক, আমি আর এখন ভেতরে যাব না। জরুরী কাজ আছে একটা—আপনি গিরিধারীকে ডাকুন—মালগুলো নামিয়ে নিক্। এই ফর্দ বাবু দিয়েছিলেন, মিলিয়ে নেবেন—'

'আচ্ছা আচ্ছা ! হয়েছে। অত রাগ করতে হবে না। দয়া ক'রে ভেতরে আসুন দিকি। ঘাট হয়েছিল আমার, গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইছি।...নিন্—কী অবস্থা হয়েছে বলুন তো—এই ভাদ্দরের রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল—তা একটা ছাতাও কি নিতে নেই ? অবিশ্যি ছাতা থাকলেই বা কি হ'ত—দু হাত

বাঝাই।...বাবুর যেমন কাণ্ড! এখানে এসে গিরধারীকে ডেকে নিয়ে গেলেও হ'ত। আসুন।'

অগত্যা ভেতরে আসতে হয়।

দইয়ের খুলি আর সন্দেশের হাঁড়ি নলিনীই নামিয়ে নেয় হাত থেকে।

'কৈ রে কোথায় গেল—অ গিরিধারী। এই নে, এগুলো ধর—ভাল ক'রে চাপা দিয়ে রাখ গে যা মা'র ঘরে।...দেখিস বেড়ালে না খায়। মুটেটাকেও অমনি নিয়ে যা; রান্নাঘরে মালগুলো নামিয়ে রাখ সাবধানে।...ওকে চারটে পয়সা দিয়ে দিস—'

'না, না, ওর পয়সা আমার কাছে আছে।'

থাক গে যাক।' গলা নামিয়ে বলে নলিনী, 'এই ঠেকো রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন—ট্রামভাড়া বলেও তো বাবু কিছু দেয় নি। ওটা আপনিই রাখুন।'

তার পর গলাটা আরও নামিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে গিরিধারী, মা ঘুমোচ্ছে তো—না?'

'না তো দিদিবাবু—মা তো মাসীমার ওখানে বেড়াতে গেছে!'

'যাক নিশ্চিন্তি—তা হলে সন্ধ্যের আগে আর এ-মুখো হচ্ছে না। আসুন আসুন, ওপরে আসুন।'

আপত্তি এবং প্রতিজ্ঞা যেন কোন্ বহু দূর অতীতের কথা, এরই মধ্যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। মানুষটার সহৃদয়তা শুধু নয়—অন্তরঙ্গতা এবং আত্মীয়তাই—মুগ্ধ করল হেমকে। সে ওর পিছু পিছু অভিভূতের মতই উঠে গেল।

সে-ই পূর্ব-পরিচিত ঘর। মেঝেতে একটা মাদুর বিছানো রয়েছে—তার সঙ্গে একটা ছোট বালিশও কার শোবার চিহ্ন বহন করছে—সম্ভবত গরমের জন্যে নলিনীই এখানে শুয়েছিল। হেম সেই মাদুরেই বসতে যাচ্ছিল, নলিনী খপ ক'রে একেবারে হাত ধরে ফেললে।

'না-না, ওখানে নয়। ভাল হয়ে বসুন—বিছানায়।'

এক রকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গিয়ে ঢালা বড় বিছানাটায় বসাল সে।

হেম আরও অভিভূত। সুগৌর মুখ তার অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করেছে, ঘামে সমস্ত দেহটার অবস্থা হয়েছে ভিজে গামছার মত—কিন্তু সে কতটা ভাদ্রের রৌদ্রে আর কতটা এখন লজ্জায় সংকোচে—তা বলা শক্ত। বার বার নিজের ছোট ময়লা রুমালটা দিয়ে মুখ মোছবার চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা ইতিমধ্যেই ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে বলে তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

নলিনী এতক্ষণ ওর মুখের দিকেই চেয়েছিল—কেমন এক রকমের মুগ্ধ দৃষ্টিতে

—এখন রুমালের বদলে কোঁচার খুঁটে ঘাম মোছবার চেষ্টা করতেই তাব সংবিৎ ফিরে এল—সে তাডাতাডি আলনা থেকে একটা ফরসা তোয়ালে টেনে নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিযে বললে, 'এইটে নিন। একেবারে ধোপদস্ত—কাচা। আমাদেব কারুর ব্যাভার করা নয়।···ইস্ কী হয়েছে মনে হচ্ছে যেন বালতি ক'রে কে জল ঢেলে দিয়েছে। লোকটা মানুষ নয়, চামার—চামার।· কেন, আব একটু রোদ পডলে পাঠানো যেত না।'

সে একটা পাখা এনে জোরে জোবে হাওয়া করতে লাগল। তাতে হেম আরও বিব্রত বোধ করল—হাত বাডিয়ে পাখাটা টেনেও নিতে গেল একবাব, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডান হাতটা সবিযে নিযে বাঁ হাতে ওব হাতটা চেপে ধরল নলিনী, 'অত কিন্তু হচ্ছেন কেন বলুন তো। ব্রাহ্মণ মানুষ, একটু সেবা করলুমই বা—কত পাপ করেছিলুম গেল জন্মে, তাই এই সব ঘবে জন্মেছি, আবাব এজন্মে ব্রাহ্মণকে দিযে ব্যাগার খাটিযে পাপে ডুবব। একটু সেবাও কবি—যদি সেই পুণ্যে পাপটা খণ্ডায়।'

ইতিমধ্যে সাদা পাথবেব গ্লাসে কী একটা পানীয় নিযে প্রবেশ করে গিবিধারী। সম্ভবত প্রস্তুতই ছিল।

'দাঁড়া, ওখানে রেখে যা। ঘামটা আব একটু মরুক। বেশী কবে বরফ দিয়েছিস তো?'

গিরিধারী কিছু দূরে গ্লাসটা রেখে চলে যেতে নলিনী বললে, 'এ মোচলমানের জল নয় ঠাকুর। আমি নিজে মিছবি ভিজিযে শরবত ক'রে রেখেছিলুম। বলা ছিল আপনি এলেই বরফ আনিযে দিযে যাবে।· ·নিন্—এবার বরং খেয়ে ফেলুন। রোদ্দুরেব তাতটা কমেছে বোধ হয একটু। তাতের ওপর ঠাণ্ডা খেলে সর্দিগর্মি হয় শুনেছি।'

শুধু শববত নয—একটু পবে এক থালা ফল এবং সন্দেশ-রসগোল্লাও বসে খেতে হ'ল ওকে। কিছুতেই ছাডলে না নলিনী। এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জোর-জববদস্তি করতে লাগল যে চেষ্টা ক'রেও এডাতে পারল না হেম।

সমস্তটাই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ওর। এই ঘর, এই শয্যা, শ্বেত পাথরেব রেকাবে এমন দেবভোগ্য জলযোগের আয়োজন, এমন একটি মেয়ে বসে বাতাস করছে, সবটাই অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, স্বপ্নের মত। তবু—হয়তো অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলেই, ক্ষণেক পরে রূঢ় বাস্তবে নেমে আসতে হবে বলেই—এই ক্ষণিক সুখস্বপ্নটুকুর মায়া কাটাতে পারে না হেম। তার অদৃষ্টে কোনদিনই তো এসব জুটবে না—যদি

স্বপ্নেও এটুকু ভোগ ক'রে নিতে পারে তো মন্দ কি !···

অবশ্য বেশীক্ষণ বসে থাকতে সাহসে কুলোয় না। স্বাভাবিক সংকোচ তো আছেই, বাবু হয়তো ওর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করছেন সেদিনের মত। বাজারে যতটা দেরি হতে পারে—তার সমস্ত কাল্পনিক সীমা ছাড়িয়ে এসেছে বহুক্ষণ। এমনিতেই এখন ট্রামে ফিরতে হবে—নইলে অশোভন হয়ে পড়বে।

'চললেন? আচ্ছা আসুন আজকের মত। আবার আসবেন কিন্তু - এ তো আমি অছিলে ক'রে ডেকে আনলুম। বাজারের সুখ্যেত ক'রে, দাম কমের কথা বলে—কত কাণ্ড ক'রে। নইলে তো আসতেন না! দুপুরে দুটোর পরে—মানে মা খেয়ে ঘুমোলে (গলার স্বরটা নামিয়ে আনে নলিনী, হয়তো অকারণেই) যে কোন দিন চলে আসবেন। তার পর এই পাঁচটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তি। বেলা দুপুর থেকে থিয়েটারেই বা গিয়ে পড়ে থাকেন কেন? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে আসবেন—এখান থেকে বরং থিয়েটারে যাবেন।'

তার পর জোর ক'রে একটু কেশে, গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে—কণ্ঠস্বরটা আরও নামিয়ে বলে, 'সেদিন খুব রেগে গিয়েছিলেন—না হেমবাবু?·· আপনি যে বড্ড ছেলেমানুষ!···নইলে এসব কথা কি আর বুঝিয়ে বলতে হয়।···ওখানে—ওখানে আলাপ-পরিচয় মাখামাখি না করাই ভাল, বুঝলেন না? সাতশো রাক্কুসীর ঘর বলি বলতে গেলে। নৈবিদ্যির কলা—সবাই টেঁকে বসে থাকে - একবার একটা ছুতো পেলেই হ'ল। লাগিয়ে ভাঙিয়ে মন ভারী করতে কতক্ষণ···? বেশী কথা কি বলব, আমার মা-টিই অষ্টপ্রহর গোয়েন্দাগিরি করছে। তার ভয় আমি যদি এমন বাবুটা ক্ষইয়ে বসি!···এসব লজ্জার কথা—বলতেও ঘেন্না হয়—তবে আপনি জানেন না বলেই···একটু সাবধান ক'রে দিলুম।···মোদ্দা আসবেন আবার।···আমায় কথা দিচ্ছেন তো? বলুন আসবেন?'

হেমের কানের ডগা থেকে কি পেছনের ঘাড়টা পর্যন্ত যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কোনমতে মাথা নামিয়ে ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বলে একরকম ছুটেই বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। বাবু কী ভাবছেন কে জানে! আজ আবার কী মূর্তিতে থাকবেন!

॥ ৩ ॥

একেবারে রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে দিনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে রোমন্থন করবার অবসর মিলল। সন্ধ্যাবেলাটা খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিছু ভাববার

সময় বা সুযোগ পায় নি—তবু মনটা যে খুব খুশী-খুশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন বিকেলের কথাটা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হ'ল—আসলে অনেকদিন পরে একটা মানুষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পেয়েছে বলেই মনটা এত খুশী আছে। এইটেই তো তার জীবনে একটা অসাধারণ অননুভূত অভিজ্ঞতা। না—মেয়েটা যে ভদ্র খুব তাতে কোন ভুল নেই। খুবই ভাল। হেম এ কদিন তাকে ভুলই বুঝেছিল।

ক্রমে ক্রমে সেই ঘর, মেয়েটির সেবা, সমস্ত পরিবেশ—স্মৃতির পটে পরিষ্কার ফুটে উঠল। যতই সবটা পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে, ততই যে শুধু ঐ প্রত্যয়টা দৃঢ় হ'ল তাই নয়—কেমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যেও মনটা আবিষ্ট হয়ে উঠল।

এক এক সময় গোপনবাসী কোন এক সত্তা তাকে সতর্ক ক'রে দেবার চেষ্টাও করল বৈ কি! মনে হল শেষ পর্যন্ত এটা গরীবের ঘোড়া-রোগেরই সূচনা নয় তো। কিন্তু সে অন্তরের সুদূরতম প্রান্তের কথা—তা ভাল ক'রে শোনাও গেল না—তার আগেই সে হেসে উড়িয়ে দিল সম্ভাবনাটাকে। একটা মানুষ একটু ভদ্র ব্যবহার করেছে—তার ভাল লেগেছে। এর ভেতর আর এত মাথা ঘামাবার মত আছেই বা কি।

এবং শেষ পর্যন্ত এক সময়—নিজের অজ্ঞাতসারেই—আবার করে ভদ্রভাবে, নিজের তরফ থেকে কোন অশোভন ঔৎসুক্য প্রকাশ না ক'রে ওর বাড়ি যাওয়া যায়, এই চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে উঠল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে বার বার নিজেকে এই কথাটাই বোঝাতে লাগল যে অত ক'রে অনুরোধ করেছে যখন—তখন এক-আধবার যাওয়া যেতে পারে। তাতে এমন কিছু অশোভনতা প্রকাশ পাবে না।…

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও মনটা বেশ প্রসন্ন আছে। অকারণেই খুব খানিকটা হৈ-চৈ করল, যেচে বাজারে গিয়ে নিজেরই পয়সাতে (গত বিকেলে সামান্য যা লাভ হয়েছিল তাইতে) বড় মাসীর জন্য করলা এবং গোবিন্দর জন্য মৌরলা মাছ কিনল। সেটা ওর কামাবার দিন নয়—সাধারণতঃ দু'দিন অন্তর কামায় আর আগের দিনই কামিয়েছে—তবু পরিপাটী করে দাড়ি কামাতে বসল, এবং সেদিন দুপুরবেলা রিহার্স্যাল হবে মনে পড়ে যাওয়াতে খাওয়ার পরই থিয়েটারে ছুটল।

কমলা জিজ্ঞাসা করল, 'এমন সময়ে বেরোচ্ছিস যে!'

'কাজ আছে একটু—এই এই—এক জায়গায় একটা কাজের সন্ধান আছে, তাই যাচ্ছি!'

এমন সময় থিয়েটারে যাবার কোনও কৈফিয়তই দিতে পারবে না বুঝে মিথ্যার আশ্রয় নিল। রিহার্স্যাল আছে বলা চলবে না—'রিহার্স্যাল তো তোমার কি ?' এখনই এই প্রশ্ন উঠবে।

রিহার্স্যালের সময় যেমন ওদের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না—তেমনি নিষেধও ছিল না। অনেকেই আসত এমন,—যারা থিয়েটারে কাজ করে থিয়েটারের বাইরে তাদের জীবনটা কোথাও যেন খাপ খেতে চায় না—তাই তারা সকালে দুপুরে যখন তখন এখানে আসে। ওকে দেখে সেজন্য কেউ বিস্মিতও হ'ল না, কোন কারণও জিজ্ঞাসা করল না—অকারণে এমন সময়ে আসবার।

হেম প্রথমটা একটু ভয়ে-ভয়েই ছিল—পাছে সহকর্মীদের জেরায় পড়তে হয়। কিন্তু কেউই যখন বিশেষ প্রশ্ন করল না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল এবং পেছন দিকের একটা কোণ থেকে রিহার্স্যাল দেখতে লাগল।

রিহার্স্যাল নলিনীরও ছিল। থাকার কথাই—কারণ আজকাল ও বড় বড় পার্ট পায়।

অবশ্য হেমের রিহার্স্যালে তত মন ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও নলিনীকেই ভাল ক'রে দেখল। আর দেখতে দেখতে এক সময় মনে হ'ল—সাজলে গুজলে নলিনীকে ভালই দেখায়।

তন্ময় হয়েই দেখছিল—হঠাৎ কানের কাছে দক্ষিণাদা যেন হিস হিস ক'রে উঠলেন, 'এরই মধ্যে লট্‌কেছে! ইস্—এরা একেবারে কাঁচা-খেগো।...ওরে ছোঁড়া তোর কি প্রাণের ভয় নেই?...গরীবের ছেলে - মরবি যে।'

ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল হেম। দক্ষিণাদার কথাগুলো আদৌ ভাল লাগল না। বড্ড ছোট মন ভদ্রলোকের। সব তাতেই খারাপটা আগে দেখেন—

সে কোন উত্তর দিল না, তেমনি আর দাঁড়ালও না। বাইরে বেরিয়ে নন্দরা যেখানে বসে জটলা করছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এবং সাধারণত যেটা কোন দিন ওর নজরে পড়ে না—আজ সেইটেই পড়ল—নন্দ বেশ চুনোট-করা কোঁচানো দেশী দামী ধুতি পরে এসেছে। সে আর থাকতে না পেরে—কী বলছে তা বোঝবার আগেই—বলে উঠল, 'মাইরি—থিয়েটারে গেটকীপারি ক'রে এত পয়সা পাস কোথা থেকে নন্দ!'

'কেন—পয়সার কি দেখলে বাবা! খাচ্ছি তো এক পয়সায় দশটা বিড়ি!'

'না তা বলি নি। দামী দামী ধুতি পরছিস আজকাল—তাই বলছি।'

হো হো করে হেসে উঠল নন্দ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসল। তার পর বললে,

'এই কাপড় দামী ! ওরে মুখ্খু—এ যে হেটো ধুতি ! হাওড়ার হাটের ধুতি—এক টাকা দু আনায় একখানা !'

'যাঃ !' অবিশ্বাসের হাসি হাসে হেম, 'আঠারো আনায় দিশী ধুতি—কী যে বলিস ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস নাকি ?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে। তুই যে এত আনাড়ী তা জানতুম না। এ কী তোর ফরাসডাঙার ধুতি ? দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না ?'

কানাই এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, সে বলে উঠল, 'অত কথায় কাজ কি বাবা, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আজই তো মঙ্গলবার, হাটবার—চ তোকে হাটটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি ! কাপড় কিনেই নে একখানা, তা হলে তো সন্দেহ ঘুচবে।'

আঠার আনায় এমন কুচ্কুচে কালাপাড় ধুতি !

তবু আঠারো আনাও কম নয় তার কাছে—চৌদ্দ আনার ধুতিতেই বেশ চলে যায়।

মুখ ফুটে বললেও কথাটা, 'কী দরকার ভাই আমার অত নবাবীতে—এই সাত সিকে জোড়ার কাপড়েই তো আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে !'

'তা যাচ্ছে বটে। তবে কী জানিস, তোর ও মিলের কাপড়ের চেয়ে এ ঢের বেশী দিন যাবে।'

হেম ঠোঁটটা চেপে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে অনেকক্ষণ।

দু পয়সা এক পয়সা ক'রে জমিয়ে তোরঙ্গের তলায় টাকা-দুই সে সরিয়ে রেখেছে। কেন রেখেছে তা অবশ্য অত ভাবে নি—নিজের কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে—এই ভেবেই জমিয়ে রেখেছে হয়তো ! কিন্তু—

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ মন স্থির ক'রেই ফেলল হেম—বললে, 'তোদের কারুর কাছে একটা টাকা হবে ? তা হলে না হয় যাই ! বাড়িতে আছে, কাল দিতে পারব।'

'খুব মক্কেল ধরেছ বাবা। আমাদের বলে ট্যাঁক গড়ের মাঠ—সদাসর্বদাই··· । তবে দাঁড়া—একবার হোটেলটা দেখে আসি, যদি রঘুদা থাকে তো দেবে—তুই কাল দিবি তো ঠিক ?'

কানাই দোতলায় উঠে গিয়ে হোটেলওয়ালার কাছ্ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এল। তিন চার আনা পয়সা হেমের পকেটে আছে। সুতরাং এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে হাওড়ার পথ ধরল।···

বাড়ি ফিরে আবারও মিথ্যে কথা বলতে হ'ল কমলাকে।

কাপড়খানা দেখে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি রে, কী ব্যাপার! হঠাৎ একেবারে দিশী কাপড় কিনে হাজির করলি যে! আলটপকা টাকা এল নাকি কোথাও থেকে?...নাকি তোর মা তোর বের সম্বন্ধ করেছে কোথাও? পাকা দেখায় বসবার কাপড় নিয়ে এলি!'

মুখ টিপে একটু হাসলও সে।

হেম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে জবাব দিল, 'কী যে বল মাসী—তোমার যেন আজকাল কি হয়েছে!...এটা হয়েছে কি—ছাখো না, ঐ আমাদের থিয়েটারের কানাই—ওর কে জানাশোনা তাঁতী ওকে জোর ক'রে এক জোড়া কাপড় গছিয়েছে। তা ওরও তো আমারই মত অবস্থা—একেবারে দুখানার দাম কোথায় পাবে—তাই ও আবার আমাকে গছালে একখানা।'

'তা তুই-ই বা কোথায় পাবি?'

'না—' আরও অপ্রতিভ, আরও বিব্রত হয়ে পড়ে যেন হেম, 'না—মানে সাত-আট আনা আছে আমার কাছে, তুমি যদি আর আট আনা ধার দাও তা হলে ওর দামটা চুকিয়ে দিতে পারি। দামটা কমই—কী বল? সেইজন্যেই আরও—। যোগে-যাগে যদি একখানা ভাল কাপড় হয়ে যায় এমনি করে—এই আর কি!'

এর আগে এদের বহু প্রয়োজনে কাঠ হয়ে থেকেছে সে, তোরঙ্গের কাগজের নিচে জমানো পয়সার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি কাউকে। তাই আজও সে কথা বলা চলল না। একটা মিথ্যা ঢাকতে বহু মিথ্যার অবতারণা করতে হ'ল। প্রয়োজন-মত কেমন একটার পর একটা মিথ্যা মুখে এসে গেল ভেবে হেমের নিজেরই খুব অবাক লাগল।

॥ ৪ ॥

এর পর চার-পাঁচটা দিন হেম যেন কতকটা ছট্‌ফট ক'রে বেড়াল। খেয়ে বসে কিছুতেই যেন তার স্বস্তি নেই, কারুর সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছা হয় না। বিশেষ ক'রে থিয়েটারে সহকর্মীদের সঙ্গ যেন আরও অসহ্য। ওদের সেই সব অর্থহীন রসিকতা এবং নিরন্তর একঘেয়ে আড্ডা যেন বিষ মনে হতে লাগল। অথচ ওখান ছেড়েও কোথাও থাকতে পারে না সে। বরং ঐ নন্দ-কানাইদের মতই সেও যখন-তখন থিয়েটারে যেতে শুরু করল।

তার এই অস্থিরতা আর ভাবান্তর ক্রমে এতই প্রকট হয়ে উঠল যে কমলার মত শিথিল স্বভাবের মানুষও তা লক্ষ্য না ক'রে পারল না। সে এক দিন সোজা-

সুজিই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তোর কী হয়েছে বল্ তো হেম ? অমন করে মুখ শুকিয়ে দিনরাত কি ভাবিস ?'

'কৈ, কী আবার ভাবব !' বলে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু কেন কে জানে—তার কানের ডগাগুলো সুদ্ধ যেন লাল আর আগুন হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে দক্ষিণাদার কাছেও। তিনি শুধু ওকে দেখে মুখ টিপে হাসেন আর হাতের বিচিত্র একটা ভঙ্গী করেন। কখনও হয়তো একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন 'নিয়তি !' কিন্তু ঐ হাসিটাই অসহ্য বোধ হয় হেমের। সে আজকাল প্রাণপণে ওর সংসর্গ এড়াবার চেষ্টা করে।…

বিকেলের দিকে কদিন সে কারণে-অকারণে বার বার মনিবের ঘরের সামনে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু এর মধ্যে এক দিনও তাঁর আর ওকে স্মরণ করার দরকার হ'ল না। এমন কি একদিন ঘর থেকে বেরোবার মুখে ওর সঙ্গে চোখোচোখিও হ'ল, কিন্তু রমণীবাবু ওকে চিনতে পারলেন বলেও মনে হ'ল না। এমন কি যেন ওর দিকে চেয়েই চোখটা সরিয়ে নিলেন।

অবশেষে রবিবার দিন সে এক কাণ্ড ক'রে বসল। কেন করলে তা সে নিজেও জানে না, আর কেউ জানতে চাইলেও বলতে পারত কিনা সন্দেহ। সে অভিনয়ের মধ্যেই এক সময় স্টেজের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কাজটা যে খুব ভাল করে নি তা হেমও জানে। কর্তাব্যক্তি কারুর সামনে পড়লে ধমক খেতে হবে। ম্যানেজারবাবু জানতে পারলে তো কথাই নেই—লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। হয়তো খোদ বড়কর্তার কানেও উঠবে কথাটা। অথচ দেবার মত একটা জুতসই কৈফিয়তও ওর ছিল না, আগে থাকতে কিছু ভেবে নিতেও পারে নি। হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথাতেই ঢুকে পড়েছিল।

যাই হোক—ভাগ্যটা সেদিক দিয়ে সেদিন ভালই ছিল। তেমন কারুর সামনেই পড়ে নি। উইংসের আশেপাশে, পর্দার পেছনে দু-চারজন ক'রে জটলা যে না করছিল তা নয়, কিন্তু তারা কেউ ওকে লক্ষ্যও করল না। এক পাশে কতকগুলো অল্পবয়সী মেয়ে বসে গুলতানি ও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল, তারা কেউ কেউ একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল—এক-আধজন বোধ হয় কিছু মন্তব্যও করলে। কিন্তু হেম জানে যে ওরা ধর্তব্যের মধ্যে কেউ নয়। ওরা নিতান্তই—দক্ষিণাদার ভাষায় 'ছুঁড়ীরা' এবং কেশিয়ার বাবুর ভাষায় 'সখীরা'। সে ওদের গ্রাহ্য না ক'রেই এগিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যাবে তাই যে ও জানে না। কেন ঢুকেছে সেটাও তো স্পষ্ট নয় ওর কাছে

তা ছাড়া দিনের বেলার স্টেজ একরকম। সবটা খোলা থাকে। রাত্রে, বিশেষত অভিনয়ের সময়, ও বিশেষ কখনও ঢোকে নি এর ভেতর। এ যেন গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। একটু পরেই হাঁফিয়ে উঠল, ভয়-ভয়ও করতে লাগল। এবং সেই—কতকটা দিশাহারা অবস্থাতেই সে ওদিক দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়ে খোদ দানীবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার সামনের আর একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নলিনী।

মুহূর্তে ধড়াস করে উঠল ওর বুকের মধ্যেটা। আগেই এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে ঘামতে শুরু করেছিল—এখন যেন একেবারে নেয়ে উঠল এক নিমেষের মধ্যে।

কিন্তু আজ আর নলিনী অপরিচয়ের ভান করল না। সম্ভবত এদিকটা কেউ ছিল না বলেই। মধুর হেসে বরং একটু এগিয়েই এল ওর দিকে, বললে, 'এই যে হেমবাবু, কৈ গেলেন না তো আমাদের ওদিকে আর এক দিনও।...আমি বলে রোজ দুপুরবেলা আপনার আশায় হা-পিত্যেশ ক'রে জেগে বসে থাকি!'

অভিমানে-আবদারে-সোহাগে-মেশা সে নারীকণ্ঠ সেই মুহূর্তে হেমের কাছে একান্ত মোহনীয় এবং দুর্নিরোধ্য বলে মনে হ'ল। সে কোন উত্তরই দিতে পারল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

কিন্তু নলিনীর তখন আর অপেক্ষা করলে চলবে না। সে আর একটু কাছে এসে এক হাতে ওর একটা বাহুমূল ধরে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'কবে আসবেন বলুন ঠিক করে। কথা দিন। এবার কিন্তু একটা দিন বলতে হবে—আমি আর কোন কথা শুনব না।'

হেম কোনমতে ঢোঁক গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'দেখি—কাল কি পরশু—এর ভেতর এক দিন—'

'না না। ওসব দেখি-টেখি আমি শুনব না। কালই আসুন তা হলে। আসবেন তো? লক্ষ্মীটি—'

এই বলে ওর হাতের যেখানটা ধরা ছিল সেখানটায় একটু চাপ দিয়ে ব্যস্তভাবে স্টেজের দিকে চলে গেল সে।

এর পর আর ইতস্তত করবার কোন কারণ রইল না। যে দ্বিধা সংকোচ এবং শোভনতা-বোধ পথ রোধ ক'রে ছিল এ ক'দিন, সে সবই কালকের সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মিনতিতে সরে গেছে। এতটা আন্তরিকতা যেখানে, সেখানে আর না যাবার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। এখন আর অন্তত তাকে লোভী বা 'হ্যাংলা' মনে করার কোন কারণ নেই।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আগের সেই অস্থিরতা ও অন্যমনস্কতা অনেকটাই কমে গেল। বাড়ল একটু অধীরতা। সে রাত্রিটা ভাল করে ঘুম হল না—ওধারেও ভোর না হতে ঘুম ভেঙে গেল। সে সেই সাত-সকালেই উঠে আগে গোবিন্দর চটিটায় কালি মাখিয়ে চকচকে করলে। ওর নিজের জুতোটার প্রায় শতছিন্ন অবস্থা, কয়েকটা তালি তো পড়েইছে, আরও গোটাকতক পড়া দরকার। তার চেয়ে গোবিন্দর নতুন চটিটাই ভাল। একটু বড় হয় ওর পায়ে—কিন্তু সেটা তত চট ক'রে ধরা পড়বে না। ছুটির দিন না হলে গোবিন্দর চটির দরকার হয় না। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে স্নান করতে করতেই তার সাড়ে আটটা বেজে যায় নটায় বেরোতে হয়। চটি পায়ে দিয়ে আর কোথায় যাবে।

শার্টটা ফরসাই ছিল, মাত্র শনিবারই সাবান দিয়েছে তবু সেটায় আর একবার সাবান বুলিয়ে নিলে। কমলা ওর ধরন-ধারণ দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, 'ব্যাপার কি বল্ তো? কোথায় যাবি আজ যে সকাল থেকে এত সাজগোজের ঘটা?'

উত্তর প্রস্তুতই ছিল, এক কথায় জবাব দিয়ে দিলে, 'আজ এক জায়গায় যেতে হবে—একটা আপিসে চাকরির খোঁজ আছে।'

কমলার পক্ষে এই উত্তরই যথেষ্ট। কিন্তু গোবিন্দ একটু বিপদে ফেললে, ঘরের মধ্যে থেকেই হেঁকে হেঁকে প্রশ্ন করতে লাগল 'কী আপিস রে? কাদের ফার্ম? কী চাকরি?'

অতি কষ্টে—তাড়াতাড়ি অন্য কী একটা প্রসঙ্গ এনে কথাটা চাপা দিলে হেম।...

সব চেয়ে কষ্টকর হচ্ছে খাওয়ার পর ত্বটো অবধি অপেক্ষা করাটা। এগারোটার মধ্যেই ওদের বাড়ির ও-পাট চুকে যায়। তার পর এতখানি সময় কী করে? ঘুমোতে সাহস হ'ল না- যদি বেশী ঘুমিয়ে পড়ে? তা ছাড়া দুপুরে ঘুমিয়ে ওঠার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখচোখ ফুলে থাকে, বিশ্রী দেখায়।...

কোনমতে বেলা একটা পর্যন্ত ছটফট ক'রে—একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল সে। নতুন কেনা ধোয়া দেশী ধুতিটা বার করল আজ। তার সঙ্গে অবশ্য সাবানকাচা শার্টটা ঠিক মানাল না—মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল একটু—কিন্তু সে আর উপায় কি? তবু অন্য দিন বিছানার নিচে চাপা দিয়ে রেখে ইস্ত্রির কাজ সারে—আজ নিজে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেই হালসীবাগানে ওদের ধোপানীর কাছ থেকে ইস্ত্রি করিয়ে এনেছে।

সবে একটা; এখনই কিছু যাওয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে এসে হেঁদোতে বসল খানিকটা। কিন্তু সেখানেও বসে থাকতে পারল না বেশীক্ষণ। ওখান

থেকে উঠে, থিয়েটারের সামনেটা এড়াতে রামবাগানের ভেতর দিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে সে আবার কোম্পানির বাগান। তাও—একটা দোকানের ঘড়িতে দেখল দেড়টার ... হয় নি তখনও। কোনমতে আরও দশটা মিনিট সেখানেই কাটিয়ে এবার সোজা কম্বুলেটোলার পথ ধরল। আস্তে আস্তে গেলে ঠিক দুটোতেই পৌঁছতে পারত। কিন্তু এই চড়া রোদে হেঁটে গেলে ঘামে ভিজে জামাকাপড়ের যে অবস্থা হবে তা অনুমান ক'রে আজ ট্রামেই চড়ে বসল। তিনটে পয়সা খরচ হবে—তা হোক। বড্ডই রোদ আজ।

॥ ৫ ॥

কড়া নাড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আজও নলিনী নিজেই এসে দোর খুলে দিলে। সম্ভবত ওর জন্যে চলনটাতেই বসে অপেক্ষা করছিল সে।

'আসুন আসুন। কী ভাগ্যি আমার!…আপনি যে সত্যিসত্যিই কথাটা মনে ক'রে আসবেন শেষ পর্যন্ত—এ ভরসা আমার ছিল না। আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয়ই ভুলে বসে থাকবেন।'

'না না। তা কেন? এরই মধ্যে বা!' এমনি ধরনের কতকগুলো কী ... বোকা কথা বললে হেম—তা তার নিজের মাথাতেও গেল না। নলিনীও অবশ্য তার উত্তরের জন্য বিশেষ অপেক্ষা করল না, ওর একটা হাতে একটু টান দিয়ে বলল, 'ও কি, তা বলে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন-চলুন, ওপরে চলুন।'

হেম অভিভূতের মতই ওর পিছু পিছু চলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের বারান্দায় পড়েতে গলাটা একটু নামিয়ে নলিনী বলল, 'একটু আস্তে আসুন ভাই, মা আবার বেছে বেছে ঠিক আজকের দিনটিই পাড়া বেড়াতে বেরোল না, ঘরে শুয়ে আছে।'

আজ আর ঘরে মাদুর পাতা ছিল না। গৃহকর্ত্রীর শোবার প্রয়োজনই হয় নি সম্ভবত। হেম সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে প্রথম দিনকার মত বিছানার ধার ঘেঁষে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল, নলিনী 'ও আবার কি হচ্ছে, ভাল হয়ে বসুন,' বলে হাত ধরে জোর করেই নিচের ঢালা বিছানাতে বসিয়ে দিলে। তার পর একটা হাতপাখা নিয়ে নিজে ওর গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে হাওয়া করতে লাগল।

'ইস, কী ঘেমেছেন আপনি! বড্ড কষ্ট হয়েছে, না? সত্যি, এই ঠেকো রোদ্দুরে মানুষকে ঠিক-দুপুরবেলা আসতে বলাই অন্যায়!'

হয়তো এই মৃদু অনুশোচনার সুরের জবাবে প্রবল প্রতিবাদ করাই উচিত ছিল, কিন্তু হেম কিছুই করতে পারল না। তার কণ্ঠ, এমন কি তালু শুদ্ধ যেন শুকিয়ে

উঠেছিল—নির্বাক হয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল। যে ঘাম এড়াতে সে নগদ তিনটে পয়সা খরচা ক'রে ট্রামে এল—সে ঘাম কিছুতেই এড়ানো গেল না। এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কে বালতি বালতি জল গায়ে ঢেলে দিতে আরম্ভ করেছে। জামা-কাপড় সব যেন গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। সে অসহায় ভাবে রুমাল দিয়ে বার বার কপালটা মোছবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না।

নলিনী হাওয়া করতে করতেই সেটা লক্ষ্য করেছিল। বললে, 'জামাটা খুলে ফেলুন না। এ পাখার হাওয়া তো আর ঐ মোটা জামা ভেদ করে গায়ে পৌছচ্ছে না। তাতেই অত ঘাম হচ্ছে। জামাটা খুলুন—বেশ আরাম করে বসুন।'

জামা খুলবে! সর্বনাশ! হেমের ঘাম আরও বেড়ে গেল। ভেতরের গেঞ্জিটার যা অবস্থা! ভদ্রসমাজে সেটা প্রকাশ করা যায় না কোনমতেই।

কিন্তু নলিনী ততক্ষণে নিজেই ওর জামার বোতাম খুলতে শুরু করেছে। 'নিন নিন, অত লজ্জা করবার মত কিছুই নেই। জামাটা খুলে দিন, আলনায় মেলে রাখছি। ও কি, জামা চেপে ধরছেন কেন? ও, গেঞ্জিটা ময়লা বুঝি? তাতে আর কি হয়েছে? ও আমরা জানি।'

এর পর আর বাধা দেওয়া যায় না। হাতটা ছেড়ে দিতে হয়। নলিনী জামাটা বলতে গেলে নিজেই খুলে নিয়ে গিয়ে আলনায় মেলে দিয়ে আসে। তার পর হঠাৎ নিজের আঁচল দিয়েই ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে।

এর ভেতর বহু কথা হতে পারত। কিন্তু হেমের কণ্ঠ ভেদ ক'রে যেন আজ একটা কথাও বেরোতে চাইছে না। তার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, হাত-পায়ে বল নেই। এমন অবস্থা তার কখনও হয় নি এর আগে। এক সময় তার মনে হ'ল যে তার শরীরটাই নিশ্চয় খারাপ হয়ে পড়েছে, এখানে থাকলে হয়তো আরও খারাপ হয়ে পড়বে। আর হয়তো সে যেতেই পারবে না।

সে সহসা—যেন মরীয়া ভাবেই সোজা হয়ে বসল। প্রাণপণ চেষ্টাতে কথাও ফুটল, বললে, 'আমি যাই আজ—'

'ও মা! সে কি! এই পাঁচ মিনিটের জন্যে বুঝি এত কাণ্ড ক'রে আনালুম!'

'না—শরীরটা—শরীরটা যেন কেমন করছে।'

'বুঝেছি। ও অমন হয়।' মুখ টিপে একটু হাসে নলিনী। সে হাসি যেন কেমনধারা—হেমের ভাল লাগে না। আর সেটা বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে

সামলে নেয় নলিনী। বলে 'এই রোদে এতটা এসেছেন তো।...দাঁড়ান, ডাব আমি আনিয়েই রেখেছি। এবার দিতে বলি। তা হলেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। বসুন—ততক্ষণ নিজে নিজেই হাওয়া খান।'

সে ত্বরিত লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং আজ আর গিরিধারী মারফৎ নয়, মিনিট কয়েক পরে নিজেই পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া ডাবের জল নিয়ে ঢুকল। তার পর দরজাটা একেবারে ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বলতে গেলে ওর গায়ের ওপর বসে মুখের সামনে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললে, 'নিন, এবার এটা খেয়ে নিন তো। জলখাবার কিন্তু এখন আনলুম না। এখন খেতেও পারবেন না—যাবার সময় বরং খেয়ে যাবেন, কেমন?'

হেম প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে বলতে গেল, 'না না। রোজ রোজ খাওয়া কি? আর আমি এই তো খেয়ে এলাম। ওসব—'

নলিনী আবারও মুখ টিপে হেসে বললে, 'এখন এটা তো খেয়ে নিন। ওসব লৌকিকতা পরে হবে'খন। ডাবের জলে বাতাস লাগতে নেই।'

ঠাণ্ডা ডাবটা খেয়ে সত্যিই কিছু প্রকৃতিস্থ হ'ল হেম। কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। তা ছাড়া সহজ ভাবে কথা বলতে না পারাতেই যেন আরও অস্বস্তি। কি যে হয়েছে আজ, কথা কইতে গেলেই ভেতরে ভেতরে যেন গলা কেঁপে যাচ্ছে, ঠিকমত কথা যোগাচ্ছেও না।

নলিনী কিন্তু অনর্গল বকে যেতে লাগল। ওর বাড়ির কথা, মায়ের কথা, ভাড়াটেদের কথা, থিয়েটারের কথা। এই বাড়িতে এক কালে ও-ও ভাড়াটে ছিল, এই মোটে গত সন বাড়িটা কিনে নিয়েছে। বাবুই টাকা দিয়েছেন। বাবু বলেছেন আরও একটা বাড়ি কিনে দেবেন। ওর ইচ্ছে এবার কাশীতে একটা বাড়ি কেনে, তা হলে মাকে সেখানে রাখতে পারবে; ইত্যাদি—এমনি কত কি!

হেম কিন্তু কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হতে পারল না। তার বুকের মধ্যে আজ যেন কী করছে! শরীরটা বড়ই দুর্বল ঠেকছে। নিজের নাড়ীর চাঞ্চল্য যেন সে নিজেই টের পাচ্ছে।

অবশেষে এক সময় সে আবারও উঠতে যায়। কোনমতে প্রাণপণে বলে, 'আজ তা হলে আমি উঠি!'

"না, না, এরই মধ্যে উঠবেন কি? বা রে, এই তো এলেন! এখনও এক ঘণ্টাও হয় নি।'

'না, মানে একটু কাজ আছে কিনা—এই সাড়ে তিনটেতেই—'

কথাগুলো মুখের মধ্যেই যেন কেমন এড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও বলে—থেমে থেমে, ঢোঁক গিলে গিলে।

'থাক গে কাজ। কাজই বুঝি এত বড়! কাজ নিয়ে এলেন কেন?…তা তো নয়, আমার সঙ্গে বসে কথা কইতেই ভাল লাগছে না আসলে, এই তো? সেইটেই পষ্ট ক'রে বলুন না।'

'না না। এ কী বলছেন। আপনি এমন বলেন যা-তা!'

হেম ওঠবার চেষ্টা ত্যাগ ক'রে বসে পড়ে।

নলিনী পাখাটা নামিয়ে রাখে। তার পর কণ্ঠে আশ্চর্য রকমের অভিমান ঢেলে দিয়ে বলে, 'তবে কেন আপনি এসে এস্তক উঠি-উঠি করছেন? দু দণ্ড বসলে কি হয়?'

এবং হেম সেই অননুভূত অভিজ্ঞতার বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই সহসা সে নিবিড় ভাবে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে ওর চোখের দিকে কেমন একরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দেব না। কিছুতেই না। কৈ যাও দিকি, কেমন ক'রে যাবে!'

তার সেই দৃষ্টিতে আর সেই কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যায় হেমের। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তার পর কখন যে এক সময় এই মোহিনী নারীর জাদু তাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে—তা সে বুঝতেও পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

তরুর বিয়ে যে আর না দিলেই নয়, সেটা শ্যামাও বোঝে, কিন্তু কী ক'রে যে কি করবে সেইটেই বুঝতে পারে না। পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন অবশ্য তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে এতটুকুও অনবহিত নন—তাঁরা প্রথম প্রথম শুধু কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিংবা মৃদু অনুযোগ ক'রে ক্ষান্ত থাকতেন, এখন গঞ্জনা ও ধিক্কার দেন। তার বেশি তাঁদের কাছ থেকে কীই বা আশা করা যায়? শ্যামা তা করেও না—শুধু যখন নিজের বিপুল দুশ্চিন্তার মধ্যে কেউ এসে পড়ে টিপ্পনী কেটে কেটে কথা বলে—তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না, সেও বেশ চারটি কথা শুনিয়ে দেয়।

বলে, 'বলি পাত্তর কি আমার বাড়িতে জাওয়ানো আছে তবু আমি মেয়ের বে দিচ্ছি না! নাকি তোমরা পাঁচ-সাতটা পাত্তর এনে কথা বলছ—আমি কানে তুলো দিয়ে বসে আছি! না ন শো পঞ্চাশ টাকাই কেউ দিয়ে রেখেছে! আমি মেয়েছেলে একা—বলতে গেলে অবীরে—পাত্তরটাই বা খুঁজে দেয় কে আমার হয়ে—আর কোমর বেঁধে দাঁড়ায়ই বা কে? টাকাও তো চাই এতটি—শুধু হাত তো আর মুখে উঠবে না? তোমাদের আর কি বল না—বলেই খালাস। যাকে এ বাজারে মেয়ের বে দিতে হয় সে-ই জানে। বলে কত তালেবর তালেবর লোকই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে—তবু তো তারা পুরুষ, তাদের কোমরের জোর আছে। ...আর আমি কি? সোয়ামী থেকেও নেই—ছেলে সেও এক রকম বলতে গেলে খরচের খাতায় লিখে রাখা। রোজগার করে কি করে না ভগবান জানেন—আমি তো তার কিছু চোখে দেখতে পাই না! দৈবে-সৈবে পাঁচ-সাতটা টাকা ভিক্ষের মত ফেলে দেয় এই পর্যন্ত। বলে আছে গরু না বয় হাল—তার দুঃখ সর্বকাল! তোমরা তো বলেই খালাস—আমি কি করব কেউ বলে দিতে পার?'

তবু—বাইরে যতই মুখসাপোট করুক, এত কাল যে বিশেষ কিছু চেষ্টা করতে পারে নি বা করে নি—তা শ্যামাও জানে। করে নি তার প্রধান কারণ অর্থাভাব। অনেকগুলি টাকা লাগবে। সংসার চালিয়ে বাড়ির দেনা শোধ করতেই তার প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। হেম যা দেয় তাতে তার চালটাও পুরো কেনা হয় না। ভরসার মধ্যে তো ঐ কটা গাছের নারকোল আর সুপুরি। পেঁপেও দু-চারটে পাওয়া যায় বটে—তবে সব সময় তা বেচা যায় না—কারণ লোকাভাব। হেম বাড়ি আসে বহুদিন অন্তর। নারকোল সুপুরি জমিয়ে রাখা যায় কিন্তু কলার কাঁদি বা পেঁপে পাকলে রাখা যায় না। তারা শ্যামার সময় হিসেব ক'রেও পাকে না। এখানে বাজার আছে, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েছেলে বাজারে গিয়ে বসে কলা পেঁপে বেচতে পারে না। কান্তিও নেই যে তাকে পাঠাবে। অনেক সময় ঘরেই খেতে হয়—কিন্তু এগুলো বেচে কত পয়সা আসতে পারত সেকথা ভেবে পাকা কালী-বৌ কলার বা বড় পেঁপের অমৃত-স্বাদও বিষ লাগে তখন।

দেনা অবশ্য বাইরের কিছু আর নেই—যা আছে জামাইয়ের কাছে, তাতে সুদ লাগছে না এটাও ঠিক—তবু তা দেনাই। তা ছাড়া সেটা শোধ না হলে আর চাওয়াও যাবে না তার কাছে, এটাও বড় কথা। সুতরাং পাত্র দেখেই বা লাভ কি।

ঐ মিলাটা যদি ঘাড়ে না চাপত তো এত ভাবনা ছিল না। খরচ বেড়েছে—কিন্তু আয় বাড়ে নি। কুটি ভেঙে দুটি করবে না মেয়ে। কত মেয়ে আজকাল ঠোঙা গড়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করছে—সে কথা ওর কাছে তোলবারই জো নেই! এমন কি, নারকেল পাতাগুলো গাদা হয়ে পড়ে আছে পচে মাটি হয়ে যাচ্ছে বলে একবার বলতে গিয়েছিল—'পাতা-কটা চেঁচে রাখবি মা?' তাতে সাফ জবাব দিয়েছিল—'ওসব উঞ্ছ কাজ আমার দ্বারা হবে না!' আবার তেজ কত--বলে, 'গতর খাটিয়েই যদি খাব তো তোমার কাছে বিনি মাইনেয় খাটব কেন মা, অপর জায়গায় কাজ করলে পেট-ভাতা ছাড়াও মাইনে মিলবে।' একবার শ্যামার মনে হয়েছিল বলে- ঠোঁটের কাছে জবাবটা এসেও ছিল—'তাই যা না, কোথায় ঐ বাচ্ছা মেয়ে সুদ্ধ তোকে কাজ দেয় আর দুটো পেট ভরিয়ে আবার বাড়তি মাইনে দেয় দেখি!' কিন্তু সাহস হয় না বলতে; যা তেজ মেয়ের, হয়তো সত্যিই চলে যাবে। যাবে আর কোথায়—দিনকতক পরেই ফিরে আসতে হবে তা জানে শ্যামা—তবে রূপের খাপ্‌রা মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়ে কী কেলেঙ্কারি ক'রে আসবে—তখন ভুগতে তো হবে শ্যামাকেই। ও মেয়ে এক দিনও চোখের আড়াল ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না যে!

আয়ের দিক তো দেখেই না—ব্যয় সম্বন্ধেও সচেতন নয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বড়মানুষী মেজাজ নিয়ে এসেছে। রান্নার দিকটা অনায়াসে দেখতে পারে—আর তাতে খুব আপত্তিও নেই হয়তো -কিন্তু হলে কি হবে—গরীবের সংসারের হিসেব একেবারেই মাথাতে ঢোকে না। একদিন রাঁধতে বললে এক সপ্তাহের তেল কাবার ক'রে বসে থাকে। কাজেই পাতা কুড়িয়ে, বাগানের কাজ ক'রে এগারোটা-বারোটায় এসে আবার রাঁধতে বসতে হয় শ্যামাকে। অত বড় মেয়ে শুধু নিজের মেয়েকে আদর ক'রে সাজিয়ে নাচিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কাজ না থাকলেই যা হয়--খুনসুটি ক'রে বেড়ায় সবাইয়ের সঙ্গে। মুখ তো নয়—ক্ষুরের ধার একেবারে। সব চেয়ে আক্রোশ যেন তরুটার ওপরই। ওকে হাতে পেলে দুখানা ক'রে কাটে যেন। দিনরাত ঝগড়া আর ঝগড়া—কাক-চিল বসতে পারে না। অথচ এই মেয়েটাই—রূপে না হোক গুণে গর্ভের সেরা মেয়ে শ্যামার। মুখ বুজে গাধার খাটুনি খাটে—বাসনমাজা, জলতোলা, ঘরের পাট, ক্ষারকাচা সবই এখন তরুর ঘাড়ে। শুধু রাঁধতে দেয় না শ্যামা ইচ্ছে ক'রেই—আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কাঠের বা পাতার জালে রান্না, হাতের লোম পুড়ে যায়, আঁচ লেগে লেগে কর্কশ হয়ে ওঠে হাতের চামড়া। [illegible]কেই তো রুটা

ওব হয়েছে মহাশ্বেতার মতই মাজামাজা—মা বা ঐন্দ্রিলা তো নয়ই—এমন কি হেম বা কান্তির রঙও পায় নি। গড়নপেটনও খুব যে একটা স্বাকারা তাও নয়। সুতরাং যেটুকু বাঁচানো যায় বাঁচিয়ে চলে শ্যামা। তবু রান্নার সময় এটা ওটা যোগাড় তো তরুই দেয়। ঐন্দ্রিলাকে ডাকতে সাহস হয় না শ্যামার—কাজ যা করবে বাকি্য শুনতে হবে তার ষোল গুণ। তার চেয়ে দূরে থাকে সেই ভাল

তবু এক সময় সক্রিয় হয়ে উঠতেই হয়। এক ভরসা অভয়পদ—তাকেও বলে মধ্যে মধ্যে। পাড়া-ঘরেও দু-চারজনকে বলতে হয়। চট্টখণ্ডীরা মল্লিকরা চৌধুরীরা অনেক ঘরই ব্রাহ্মণ আছে, তাদের ঘরে যে ছেলে নেই তাও নয়, কিন্তু তারা কথাটা শুনেও কান দেয় না। কারণ জানে এখানে একেবারে শুধু-হাতে মুখে তুলতে হবে, মেয়েও এমন কিছু আহা-মরি নয়। শ্যামা কলকাতাতে চিঠি লেখে গোবিন্দর কাছে। হেমকে বলে যে কিছু হবে—এমন মনে নেয় না, ও আজকাল সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, নেশাখোরের মত ভাবভঙ্গী হযেছে ওর– যে-কোন কথাই শ্যামা বলুক না কেন, মনে হয় যেন ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই ওর ওপর ভরসা না ক'রে এক পয়সা খরচ ক'রে একটা পোস্ট কার্ডই ফেলেছে শ্যামা। কিন্তু গোবিন্দ তো উত্তরও দেয় নি—সেখানে যে কিছু সুবিধে হবে এমন ভরসা পায় না।

এই যখন অবস্থা– হঠাৎ একদিন মনে পড়ে গেল মঙ্গলার কথাটা। বলতে গেলে দুটো মেয়ের বিয়েই মঙ্গলা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছেই যাওয়াটা উচিত ছিল। এখানে চলে আসার পর,– প্রথম প্রথম মঙ্গলা আসতেন মধ্যে মধ্যে, কিন্তু এখন আর আসতে পারেন না। অক্ষয়বাবু শরীর খারাপ বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন—ভরসার মধ্যে বড় ছেলের রোজগার—সে এমন কিছু নয়। পিটকীর ছেলেরা কেউ কিছু করে না - তাই নিয়ে নিত্য অশান্তি। ভাইয়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় পিঁটকী কিন্তু সেখানেও টিকতে পারে না। এত কাল তাদের অগ্রাহ্য শুধু নয়, অবজ্ঞা ক'রে এসেছে—এখন তারা শোধ তুলতে ছাড়বে কেন? কাঁদতে কাঁদতে যায়, আবার কাঁদতে কাঁদতে আসে। ভায়েরা আরও পেয়ে বসে, বলে, 'সধবা মেয়েকে চিরকাল বিধবা মেয়ের মত পুষে এসেছেন বাবা—সে তাঁর পয়সা তিনি যা খুশি করেছেন—এখন আর কেন? ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে—এত পুষতে আমরা পারব না। যেখানকার জিনিস সেখানে চলে যাক

মঙ্গলা হয়তো ক্ষীণকণ্ঠে বলতে যান, 'তোরা কি পুষছিস? এখনও তো সে-ই পুষছে। কত রোজগার করিস তোরা দু'শ পাঁচশ টাকা শুনি—।'

তারা আরও জোরে জবাব দেয়, 'সেই জন্মেই তো আরও তাড়ানো দরকার। বাবার তো রোজগার নেই, কলসীর জল ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে কত দিন থাকবে? আমাদের চলবে কিসে? আমাদের হক্কের ধনে ওদের ভাগ বসাতে দেব কেন?'

এ ঝগড়ার শেষ হয় না। মেয়ের জন্মেই মঙ্গলাকে আরও বেশী ক'রে খাটাতে হয়—গতরে খেটে যতটা খরচা কমাতে পারেন। তার ওপর বিষম শুচিবায়ু বেড়েছে তাঁর। এক কাজ দশবার করেন। পঞ্চাশবার পুকুর-ঘর করতে হয়। তাতেই আরও সময় পান না।

সুতরাং তাঁর ওপর ভরসা ক'রে থাকলে চলবে না। শ্যামা নিজেই এক দিন কোলের ছেলেটার হাত ধরে হাঁটা দেয়। বুড়ো বয়সে এই এক পাপ —তিন বছরের ছেলে কোলে। ফল-টানেই শুধু বাড়ি আসে যেন। নইলে আর খসরটা পর্যন্ত থাকে না। তার ছেলেমেয়ে—অথচ যত বোঝা বইতে হয় ওকেই। যেতে যেতে স্বামীর কথাই ভাবে শ্যামা। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখে এবার অনেক দিন বাড়ি আসে নি। কে জানে কী হ'ল। এত দিন তো কখনও দেরি করে না। কে জানে কোথাও রোগে পড়ে আছে কিনা। কিংবা হয়তো বা— ভাবতেই শিউরে ওঠে শ্যামা। নিজের লোহা আর শাঁখার দিকে চায়। না না, অমন বেঘোরে মরবে না কখনও। এত পাপ শ্যামা কিছু করে নি—। ভাবতে ভাবতেই হাঁটে সে। কেমন যেন একটু মন-কেমনই করে নরেনের জন্য।

॥ ২ ॥

মঙ্গলাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারল সেখানে একটা ধুন্ধুমার ব্যাপার চলেছে। চেঁচামেচির অন্ত নেই। একসঙ্গে সবাই যেন চিৎকার করছে। কী একটা ব্যাপার নিয়ে সবাই কটু-কাটব্য করছে কোন-একজনকে। কিন্তু যে কোন উপলক্ষেই হোক না কেন—সব চেঁচামেচিতেই যার গলা সর্বাগ্রে শোনা যায় আজ তার গলা শোনা যাচ্ছে না কেন? তবে কি মঙ্গলা বাড়ি নেই? একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বাড়িতে ঢুকল শ্যামা। কিন্তু উঠোনে পা দিতেই কারণটা বোঝা গেল—এক্ষেত্রে আসামী খোদ মঙ্গলাই। তাঁকেই উপলক্ষ ক'রে চারিদিক থেকে এত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা বর্ষিত হচ্ছে।

কারণটাও জানতে বেশী দেরি হ'ল না। শ্যামাকে দেখেই আর এক দফা সকলে চেঁচিয়ে উঠল। ওকেই মধ্যস্থ মানলে সবাই—'বামুনদিই বলুক, এ মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা চলে! একে খাঁচায় পুরে রাখা ছাড়া আর কী উপায়!'

চিৎকারটা একটু থিতিয়ে আসতে ব্যাপারটা বোঝা গেল। আগের দিন অক্ষয়বাবু কলকাতা থেকে সালু কিনে এনে নতুন লেপ তৈরী করিয়েছেন আসন্ন শীতের জন্য। যেহেতু মুসলমান ধুনুরী লেপ সেলাই করেছে এবং বাইরের বাগানে ফেলে তৈরী হয়েছে - সেখানে কুকুর-বেড়ালের বিষ্ঠা থেকে শুরু করে মাছের কাঁটা এবং পাঁঠার হাড় কী নেই—সেই হেতু গতকাল বা আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে দুপুরবেলা চুপিচুপি সকলে শুয়ে পড়লে সেটাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলেছেন, পরিতৃপ্তি ক'রে কেচেওছেন—কিন্তু তারপর আর টেনে তুলতে পারেন নি। বেগতিক দেখে এসে পিঁটকীর শরাপন্ন হয়েছেন কিন্তু সেও মায়েব এ কাজটা সমর্থন করতে পারে নি। তার ফলে এই জানাজানি ও চেঁচামেচি।

শ্যামারও কষ্ট কম হ'ল না খবরটা শুনে। পয়সার অভাবে কত কাল তারা একটা বাঁদিপোতার লেপও গায়ে দিতে পারে নি। ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা গায়ে দিয়ে শীত কাটাচ্ছে। সে কাঁথাও স্থানাভাবে গরমের দিন বিছানায় পেতে রাখতে হয়--তার ফলে শুধু যে কতকগুলো ছাৎপোকার বাসা হয় তাই নয় আট মাসের চাপে আরও ভারী হয়ে ওঠে এবং চিপ্‌টান খেয়ে যায়। অমন সালুর লেপখানা ছুঁচিবাইতে নষ্ট ক'রে দিলে! কত খরচ পড়েছিল কে জানে!

যাই হোক শ্যামা গিয়ে পড়ার জন্যই সে-যাত্রা মঙ্গলা অল্পে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। সম্ভবত নিজে বাড়ি ক'রে চলে যাওয়ার জন্যই—এখন এ বাড়িতে শ্যামার কিছু আদর হয়েছে, পিঁটকী মেয়েকে এক ঘটি পা ধোবার জল আনতে বলে তাড়াতাড়ি ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসালে, একটা পাখাও এনে দিলে।

মঙ্গলাও এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়েছেন—অবশিষ্ট অল্প কয়েকটি পান-দোক্তা-খাওয়া দাঁত মেলে হেসে বললেন, 'তার পর বামনী, কী মনে ক'রে?'

'কী মনে ক'রে আবার! কেন শুধু অমনি দেখতে আসতে নেই? মা না হয় খোঁজ নেয় না—তাই বলে মেয়ে কি ভুলে থাকতে পারে?' শ্যামা একটু হাসবারও চেষ্টা করে।

'ওমা এখনও তোর এমনধারা মিষ্টি মিষ্টি বাক্যি আসে! তাই তো বলি পিঁটকীকে যে মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখাতিস তো তবু কাজ হ'ত। আজকাল

ইস্কুলে-পড়া মেয়েদেরই কদর। দেখিস না, বামুন-মেয়ে কীই বা দু পাতা লেখাপড়া শিখেছে—তারই জোরে কেমন গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে। আমরা যে ষাড়ের নাদ হয়ে রইলুম। থাকত পেটে একটু কালির আঁচড়, তা হলে দেখতুম কে মুখের সামনে দাঁড়ায়। তা হলে কি আর ভাতারেরই কথা সহ্য করতুম, না ছেলেদেরই হাতে এমন খোয়ার হতে পারত? কী বলব অদেষ্ট মন্দ তাই অত বড় ঘরে জন্মে এই নাথি-ঝাঁটা খাচ্ছি।'

বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় মঙ্গলার।

শ্যামা বেগতিক দেখে পিঁটকীকে ধরেই কুশল প্রশ্ন করে। পিটকীও আলতো আলতো জবাব দেয়। বেশ একটু বাঁকা বাঁকা তার বলবার ভঙ্গিমা। একটু পরে তার কথাও অস্বস্তিকর পথ ধরবে বুঝে শ্যামা সোজাসুজি নিজের কথাই পাড়ে। ওদের পারিবারিক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ওর আদৌ নেই। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, পিঁটুকী আর তার ছেলেমেয়েদের দুর্গতিতে সে মনে মনে খুশীই।

সে মঙ্গলার দিকে ফিরে বললে, 'মা, যা হোক ক'রে তো দুটো মেয়েকে পার করলেন—এবার এটার একটা গতি করুন—নইলে জাতধর্ম্ম থাকে না আর।'

'গতি! ও তরুর বের কথা বলছিস? ওমা, এখনও কিছু করিস নি বুঝি? মেয়ে যে ধাড়ী হয়ে গেল। সময়ে বে হলে তিনটে চারটে নেণ্ডি-গেণ্ডি হয়ে যেত। আমি ভাবি এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, এই বুঝি নেমন্তন্ন আসবে, তা মূলেই হাবাত।'

'আমি কি করব মা! জানেনই তো। ওর তো ঐ গতি। ভরসা এক ছেলে—তা তারও চাকরি-বাকরির কিছু হ'ল না—থিয়েটারে পড়ে আছে, কী পায় আর কী পায় না তা তো বুঝি না—আমি তো কোন মাসে পাই সাতটি কোন মাসে পাই আটটি টাকা। যে মাসে খুব পেলুম—সে মাসে দশটি টাকা। তার চেয়ে এখানে থেকে যদি চালকলা বাঁধত তো বেশী রোজগার হ'ত। টাকা কোথায় যে বে'র কথা ভাবব? ঐ তো কটা গাছের ফলফুলুরি ভরসা। তা থেকে সংসার চালাব, না ধার শোধ করব?'

'তা তবু তা থেকেই কিছু জমিয়েছিস বল—তাই য্যাদ্দিন পরে পাত্তরের সন্ধান করতে বেরিয়েছিস! ধন্যি মেয়েমানুষ তুই বামনী! তোর ক্ষুর-ধোয়া জল পেলেও আমার মেয়েটা বর্তে যেত।'

কেমন এক রকম ধূর্ত ভাবে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে হা-হা করে হেসে ওঠেন

মঙ্গলা। তাঁর সেই পানদোক্তা খাওয়া কালো বিরাট মুখগহ্বর আর পাকা উচ্ছেবীচির মত কয়েকটা অবশিষ্ট দাঁতের হাসিটা কেমন বীভৎস মনে হয়।

শ্যামা তাড়াতাড়ি বলে, 'টাকা জমাব' কী বলছেন মা—এখনও জামাইয়ের দেনাই শোধ করতে পারি নি। তবু আর তো রাখা যায় না—তাই। আবারও ধারই করতে হবে নইলে ভিক্ষে। তাই বলছিলুম আপনার সন্ধানে যদি কিছু থাকে—'

মঙ্গলা ভ্রূটা কুঁচকে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবেন খানিকটা, তারপর বলেন, 'আড়গোড়ের ঘোষালদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবি? মানে ওদের নয়—ওদেরই ভাগনাগুষ্টি। একটা ভাল ছেলে আছে। রেলে কাজ ক'রে, এখনই প্রায় চল্লিশ টাকার মত মাইনে পায়—'

শ্যামা ওঁর কথা শেষ করতে দেয় না—হাত জোড় করে বলে, 'রক্ষে করুন মা—ওদের সংস্পর্শে আর আমি যাব না। তার চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেব সেও ভাল।'

'দিবি নি? তাই তো? আর কোথাও তো কিছু মনে পড়ছে না। হ্যাঁ—একটা সম্বন্ধ আছে বটে—কে যেন বলছিল সেদিন—নিবড়েতে একটা খুব ভালো পাত্তর আছে। চাকরিতে ঢুকেছে সবে—মা-বাপ কেউ কোথাও নেই, বুড়ী ঠাকুমা আছে, অগাধ বিষয়। অন্তত পাঁচ বিঘের ওপর ভদ্রাসনটাই। তবে একটা কথা—নি সতীন আছে।'

'সতীন!'

'না—না, সতীনকে নিয়ে ঘর করতে হবে না। তাকে ত্যাগ করেছে যেন দু বিঘে জমি তাকে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ঠাকুমা মাগী তার বাবাকে দিয়ে নিয়েছে যে আর কোন দিন সে ফিরে আসবে না, আসতে চাইবে না এক ঘটি সম্পত্তিতেও তার কোন কেলেম্ থাকবে না!'

'কিন্তু তাকে ত্যাগ করেছে কেন?' নতুন নয়।

'সে অনেক পব্ব। কী সব মনান্তর হয়েছিল তত্ত্বতাবাস নিয়ে—বুড়ী বা বড় বৌ পাঠাব না। পাঠায়ও নি পুরো দুটি বছর। তার পর তার বড় ভেয়ের আসতে মেয়ের বাবা এসে হাতে-পায়ে ধরলে, পাঠালে না। এধারে মা আছড়ে পড়ল—তাদের ঐ একটা মেয়ে, সে না এলে বড় ছেলের বিয়ে হবে না। তখন বেগতিক দেখে—আর বাপেরও প্রাণ তো—থানা থেকে পুলিশ এনে মেয়েকে নিয়ে গেল সে। তাইতে বুড়ীর বড্ড অপমান হয়েছে, সে আর ও বৌ ঘরে তুলবে না! তা ছাড়া সে মেয়েটাও নাকি ভাল ছিল না। তবে—নিজে যখন

দেখি নি, জানি না, তখন বদ্‌নাম একটা দেওয়া ঠিক নয়।…এই ব্যাপার, ছাখ্ দিবি তো দে!'

'অমন দজ্জাল দিদিশাশুড়ী—দেওয়া কি ঠিক হবে? যদি আমার সঙ্গেও অমনি করে—না পাঠায়?'

'ছাখ্ অত বাছতে গেলে কি তোর চলবে! এমন পাত্তর একবরে হলে শুধু-হাত মুখে উঠত না। এ তোর বেশী পয়সা খরচা হবে না। তা ছাড়া বার বার এমন করতে সাহস করবে না। দুর্নাম হয়ে যাবে যে।…আর বুড়ীই বা কদিন—পেরায় চারকুড়ি হতে চলল বয়েস।…না পাঠায় না-ই পাঠাল—তুই-ই বা কত এরে-বেরে মেয়েজামাই আনতে পারবি? এইখান থেকে এইখানে, ছেলেরা গিয়ে দেখে আসবে এখন। আমার তো মনে হয়—একবার এই কাণ্ড হয়ে গেছে, এখন সাবধানে চলবে।…ছাখ্ দিস তো কথা তুলি—ওরা একটু ডাগর-ডোগর মেয়েই চাইছিল, হয়তো নগদ কিছু দিতে হবে না। দানসামিগ্‌গিরও চাপ দিয়ে কমিয়ে নেওয়া চলবে।'

চুপ ক'রে থাকে শ্যামা। উত্তর দিতে পারে না। 'না' বলতেও ভয় করে—'হ্যাঁ,' বলতেও বাধে।

মঙ্গলা একটু অপেক্ষা করে থেকে বলেন, 'বেশ তো—একটু ভেবেই ছাখ না।
বুঝি? ঘরের জোর থাকে অন্য পাত্তর ছাখ—নইলে এটা মন্দ নয়।…না হয় হেমের
হয়ে যেত ও একটু পরামর্শ কর্ না।'
তা মুলো 'হেম!' অকস্মাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে পিঁটকী। সে উঠে গিয়েছিল
'আ দের জন্যে জলখাবার আনতে। একটা পেতলের সরায় করে মুড়ি, বাতাসা,
ছেলে—তা নাড়ু এনে শ্যামার সামনে নামিয়ে রেখে ছেলেটার হাতে একটা নারকোল
আর কী পায় দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়ল পিঁটকী।
পাই আটটি টা তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখ বামুনদি। বলে আগ-ন্যাঙলা
এখানে থেকে যায়, পেছ-ন্যাঙলাও তেমনে যায়। বাপের বেটা তো! গত মাসে
বে'র কথা বাড়ি গিছলুম, শুনে এলুম—তোমার হেম আজকাল কম্বুলেটোলার কোন্
চালার মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছে—নিত্যি দুপুরবেলা যায় সেখানে। আমার দেওর দেখেছে, দেওরেরও সেই বাড়িতেই বাঁধা রাঁড় আছে—শুনেছিল তার মুখেই—এক দিন হঠাৎ দুপুরে গিয়ে পড়ে নিজের চোখে দেখেছে!'

কাঠ হয়ে যায় শ্যামা। কতক্ষণ জবাবই দিতে পারে না।

'না না, এ হতে পারে না পিঁটকী। মেয়েমানুষ রাখতে গেলে টাকার জোর চাই। সে বড়লোকেরা রাখতে পারে। তোমার ভাওর তো কোন ছোঁসের

মুচ্ছুদ্দী না কি বলেছিলে! সে যা পারে আমার হেম তাই পারবে? কাকে দেখতে কাকে দেখেছে—'

'না গো—এ পয়সা দিয়ে রাখা নয়। বেশির ভাগ বাজারের মেয়েমানুষেরই—যারা বাঁধা থাকে কোন বাবুর কাছে – একটা-তুটো করে শখের পত্তি থাকে। বলি তাদেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে—মনের মানুষ দরকার! হেমও তেমনি হয়েছে তার—বুঝলে না? নইলে তুপুরে যাবে কেন—লুকিয়ে-চুরিয়ে?'

এর পর আর মুড়ি বাতাসা গলা দিয়ে নামে না শ্যামার। চুপ ক'রে জন্তুর মত বসে থাকে। যেন কিছু ভাবতেও পারে না।

'নে নে—মেয়ের কাণ্ড ছ্যাখ্—দিদি বামনীকে ভাবনা ধরিয়ে! তুই ভাবিস নি বামনী—বড় জামাইকে ডেকে বল্—তার পায়ে মাথা খোঁড়—ঠিক একটা সায়েববাড়ির চাকরি জুটিয়ে দেবে। তার পর ছেলেকে ও পেঁশের চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। নইলে আগেই নিয়ে আয়। কী হচ্ছে তোর ঐ সাত-আট টাকায়? ঘরে বসে বাগান দেখলে ওর চেয়ে বেশী রোজগার করবে। ঘণ্টা না হয় নাই নাড়লে—যদিও ওতে খুব রোজগার। বাপের দেখে বোধ হয় ও-কাজে ঘেন্না হয়ে গেছে।...তা ছাড়া—সত্যিই কাকে দেখতে কাকে দেখেছে ওর দেওর তাই বা ঠিক কি! তু-একদিন এখানে কাজকম্মের বাড়িতে দেখেছে হয়তো—অমনি তাইতেই কি আর এত চিনে রেখেছে? তুই মিছে এখন থেকে অত ভাবিস নি বামনী, ওঠ্—মুখে জল দে। আবার এতটা পথ যাবি।'

মঙ্গলা বেশ গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলাতে শ্যামা সত্যি-সত্যিই যেন খানিকটা বল পায় মনে মনে।

তবু খেতে ইচ্ছে করে না কিছুই। কোনমতে তুটো নাড়ু মুখে পুরে এক ঘটি জল খেয়ে আবার বাড়ির পথ ধরে।

কোলে ছেলেটো আছে—কিন্তু এমন ভার বওয়া আর হাঁটা ওর নতুন নয়। এর চেয়ে ঢের বেশী হেঁটেছে ও। তবু কে জানে কেন—আজ যেন পা তুটো বড় ভারী বোধ হয়।

॥ ৩ ॥

ফেরবার পথে সিদ্ধেশ্বরীতলাতে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে আর মাথা কুটে এসেছিল শ্যামা। একটা মানতও ক'রে ফেলেছিল বড় গোছের। হেম ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে এসে বসলে—তার সুবুদ্ধি হলে—আর তার কোথাও একটা ভাল পাকা চাকরি হলে—প্রথম মাসের মাইনে থেকেই সোনার বিল্বপত্র গড়িয়ে বুক

চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেবে। প্রার্থনাও অনেকখানি অবশ্য—কিন্তু মানসিকও তার পক্ষে সাধ্যের অতীত প্রায়। কল্পনাতীত রকমেরই অনেকখানি।

হয়তো বা ওর মানসিকের জোরেই—হেম ফিরে এল।

অথবা ওকে ফিরতে হ'ল। কিন্তু সেও ঐ মানসিকেরই জোরে হয়তো।

কারণ—হেমের ফেরার মূল কারণটা যেমন তুচ্ছ, তেমনি হাস্যকর।

নলিনীর ভাড়াটেদের মধ্যে ক্ষীরি বলে একটি মেয়ে ছিল। তার ভাল নাম একটা আরও ছিল—আশালতা, কিন্তু নলিনীর মা তাকে ছোটবেলা থেকে ক্ষীরি বলেই জানত—তাই ঐ নামটাই এখানে চালু। ক্ষীরির বাবু পূর্ববঙ্গের লোক, ব্রাহ্মণ। নিমতলার দিকে কাঠের গোলা আছে—অবস্থা মাঝারি। কিন্তু ক্ষীরিরও রং কালো—গোলগাল, অতি সাধারণ চেহারা—এর চেয়ে ভাল বাবু তার পাওয়া মুশকিল। সুতরাং সে ঐতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে—সেই ভট্‌চায বাবুটিও ইদানীং প্রায় আসছে না ডুব মারছে। সম্ভবত তার প্রাণের পাখী অন্য কোন আকাশে উড়তে চাইছে, এ দাঁড়ে আর থাকতে চাইছে না। হয়তো কিছু দিন পরে একেবারেই শিকল কাটবে। ক্ষীরির এজন্যে দুঃখ আর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না।

কিন্তু দুঃখ-দুশ্চিন্তা ছাড়াও বেদনার অন্য কারণ ছিল।

এ বাড়ির সব মেয়েই ক্ষীরির বাঙাল বাবু উপলক্ষ করে ওকে খেপাত। বরাবরই খেপিয়ে এসেছে। তাতে ওর এত দিন রাগের কারণ থাকলেও আঘাতের কারণ ছিল না। ইদানীং ওর মনে আঘাত লাগতেও শুরু করেছে। ওর কেমন মনে হয়—সত্যিসত্যিই তারা ওকে একটু কৃপার চোখে দেখে—ওর বাবু বাঙাল এবং সাধারণ ব্যবসায়ী বলে। এখন আরও একটু কৃপার চোখে দেখছে। হয়তো ওর এই দুর্গতিতে তারা মনে মনে উল্লসিত—হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বেশ একটু কৌতুকই উপভোগ করছে।

এই রকম মনোভাব থাকলে সাধারণ সহানুভূতিকেও লোক বিদ্রূপ বলে মনে করে।

ক্ষীরিও তাই মনে করত।

কার ঘরে বাবু এল কিংবা এল না—সে খবরটা রাত্রে জানা না গেলেও সকাল-বেলা টের পাওয়া যায়।

সুতরাং—'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি?' এ প্রশ্নটা আজকাল প্রায়ই শুনতে হয় ক্ষীরিকে এবং এটাকে সে রীতিমত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত

(অপমানের বা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য) বলে মনে করে। ফলে অতি সাধারণ প্রশ্নও তার কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে। কথাগুলো শোনামাত্র তার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরে।

তবু মানুষ এক রকম। তার সঙ্গে যদি ইতর প্রাণীও যোগ দেয়,—সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বৈকি।

সেদিন ভোররেলা সবে বেচারী দোর খুলে ঘরের বাইরে এসেছে—(টাকাকড়ির টানাটানিতে ঠিকে ঝিয়ের বিলাসও ত্যাগ করতে হয়েছে ওকে, আর সেই কারণেই ভোরবেলা উঠে অন্য ভাড়াটেদের ঝি আসবার আগে কাজ সেরে নেয়। নইলে তাদের কাছেও অপমান - ভাড়াটেদের কাছে তো বটেই)—দোতলার বারান্দায় ঝোলানো খাঁচা থেকে নলিনীর পোষা ময়নাটা পরিষ্কার প্রশ্ন ক'রে বসল, 'হ্যালা ক্ষীরি, ভট্‌চায বুঝি কালও আসে নি ?'

একেই সেদিন নিয়ে পর পর চার দিন অনুপস্থিত ভট্‌চায—নিয়মিত টাকা দেওয়া তো প্রায় পাঁচ-ছ' মাসই বন্ধ করেছে, এলে জোর-জবরদস্তি ক'রে যা দু-এক টাকা আদায় হয়—তাও চার দিন হয় নি, সকালে হাঁড়ি চড়বে কি ক'রে এই দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমোতে পারে নি বেচারী, তার ওপর সকালবেলা ঘর থেকে বেরোতেই এই অপমান- মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘার মতই বাজল।

দুঃসহ রাগে ক্ষীরির আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। সেদিন ওরই সিঁড়ি এবং উঠোন ধোয়ার পালা বলে—ঘর থেকে বেরিয়েই উঠোন-ধোয়া খ্যাংরাটায় হাত দিয়েছিল সে—সেইটে হাতে করেই ওপরে উঠে গেল এবং দুদ্দাড় মারতে শুরু করলে।

'তবে রে হারামজাদা পাখি! তোমার এত বড় সাহস! এত আস্পদ্দা! এই! এই! এই!'

বকতে বকতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত খাঁচাটার গায়েই খ্যাংরা চালাতে লাগল সে।

খাঁচার ওপরেই খ্যাংরাটা পড়ছিল অবশ্য, পাখির গায়ে লাগে নি। তবু তাতে খাঁচাটা দুলছিল বিশ্রী রকম। সেই দুলুনিতে আর ঝাঁটার আস্ফালনে পাখিটা ভয় পেয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে লাগল।

ক্ষীরির চীৎকারে ও পাখিটার আর্তনাদে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল—সেই সঙ্গে নলিনীর মা কিরণেরও। দৈবক্রমে সেদিন নলিনী ছিল না, আগের দিন রমণীবাবুর কোন্ এক ব্যারিস্টার বন্ধুর বাগানে বাবুর সঙ্গে মাইফেল করতে

গিয়েছিল—কথা ছিল সেদিন সকালে ফিরবে। কিন্তু তাতে ক্ষীরি অব্যাহতি পেল না। কিরণ বলতে গেলে সম্প্রতি বাড়িউলীর মা হয়েছে—সামান্য এক একতলা ঘরের ভাড়াটে—বিশেষ ক'রে যে ভাড়াটের কাছে প্রায় তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে—তার এত ধৃষ্টতা কিরণের সহ্য হল না। সে একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে নেমে এল তেতলা থেকে।

'বলি তোমাব আস্পদ্ধা তো কম নয় বাছা! আজ শনিবার, সাতসকাল বেলা আমাব নলুব শখের ময়নাকে তুমি খ্যাংরা মাবতে এসেছ? এত সাহস কিসের তোমার? দোতলাতেই বা তেড়ে উঠেছ কিসের জন্যে? ভেবেছ কি? নলু বাড়িতে নেই বলে কি সাপের পাঁচ-পা দেখেছ নাকি?'

চারিদিকের দোর খুলে যাওয়ায়—এবং অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে তাদের বাবুরাও বেরিয়ে আসায়—ঝাঁটার আস্ফালনটা অনেকক্ষণই বন্ধ হয়েছে ক্ষীরির কিন্তু তাব আক্রোশটা তখনও যায় নি।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল, 'কেন, কেন ও পাখি অমন ক'বে বলবে আমাকে? কেন বলবে তাই শুনি? পাখির এত বড আস্পদ্দা, ও সুদ্ধ আমাকে অপমান করবে! আমার ঘরে আমার বাবু আসে নি তা বাড়িসুদ্ধ ভালখাগীদের কি? আমার পেছনে না লাগলে কি চলে না তাদের? আবার পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দেওয়া!'

কিরণের কর্কশ কণ্ঠে ক্ষীরির গলা ডুবে যায়।

'আ মর ছুঁড়ী! বলে কিনা পাখিকে সুদ্ধ শিখিয়ে দিয়েছে! লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই- ওকে অপমান করবার জন্যে সবাই যুক্তি করেছে!...একটা অবোলা পাখি—তার ওপর এত আক্রোশ? বলি অত যদি তোর মান মর্যোদাজ্ঞান তো তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যা না! অত বড় মহামানী রাজা দুর্যোধন, আমাদের এ গরিবের বাড়ি থাকবার দরকার কি!'

'যাবই তো। চ'লেই যাব। যাব না তো কি থাকব? অত কিসের! কেন, ঘর কি আর নেই?'

'তাই যাও না বাছা। আজই চলে যাও। আমি তোমাকে এই এখনই নোটিশ দিয়ে দিলুম।...কে তোমার আছে চোদ্দপুরুষের নাউখোলা--যে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে- তার কাছে যাও। তবু যদি না তিন-চার মাসের ভাডা বাকী পডত! কিছু বলি নে বলে তাই। বলি, মানুষটার দুঃসময় পড়েছে—থাক না, রয়ে-বসেই নেব না হয়। এ[illegible]নের হাল জানি তো—অমন মাঝে মাঝে

ক্যামাঘেন্না করতে হয়। ভগবানের ইচ্ছেয় নলুর আমার যখন কোন অভাব নেই।...তা দয়া কি করার জো আছে! বলে দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত মারে সাত গুণ।...আর কিছু পেলে না তো আমার নলুর পাখিটাকে খুন করতে এসেছে!...তুমি তো সাংঘাতিক মেয়েমানুষ দেখছি, পেলে কোন্ দিন বা আমাদের গলাতেই ছুরি বসাবে।...এমন সব্বনেশে ভাড়াটেতে আমার দরকার নেই। আজই তুমি আমার বাকী ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে তোমার এস্টেট-পত্তর নিয়ে উঠে যাবে বাছা—এই সাফ্ বলে দিলুম।'

'বেশ বেশ। তাই যাব। তাই তো বললেই হ'ত—তার জন্যে সাতগুষ্টি মিলে আমার এত লাঞ্ছনা করবার কী দরকার ছিল?' এতক্ষণে চোখে জল এসে গেছে ক্ষীরির—গলাটা গেছে ধরে—'তবে তাও বলে দিচ্ছি—যেমন বিনাদোষে আমার পেছনে আদাছোলা খেয়ে লেগেছ—তোমাদেরও ভাল হবে না। তিন দিন বাড়িউলী হয়ে বসে বড্ড তেজ হয়েছে তোমাদের মা-বেটির! ও তেজ থাকবে না, তেজের মাথা খাবে শিগ্গিরি—এই বলে দিলুম!'

'ত্থাখ বাছা, সাত সকালে অমন শাপমন্যি দিও না বলে দিলুম, ভাল হবে না। দুগ্গতির শেষ ক'রে ছাড়ব। ঘটি-বাটি নিলেমে তুলব তবে আমার নাম। আমাকে এখনও চেন নি। ভাল চাও তো মুখটি বুজে সহমানে বিদেয় হও।'

কিরণ রুদ্রমূর্তি ধারণ ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে আসে দু পা। মনে হয় বুঝিবা মেরেই বসবে।

কিন্তু ক্ষীরি তাতে ভয় পায় না, সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'তুমিও ভাল চাও তো চোখ রাঙিও না ব্রেথা—এই বলে দিলুম। তুমিও আমাকে চেন নি কিরণ মাসী। ভাল আছি তো আছি—কেনা গোলাম, রাগলে আমি কারুর নই। উঠে যদি যেতে হয় তো তোমার মেয়ের সব্বনাশ ক'রে তবে যাব। সোজা গিয়ে উঠব তোমার জামায়ের কাছে—তোমার মেয়ের কীত্তি-কেলেঙ্কারি সব ফাঁস ক'রে তবে ছাড়ব।'

কিরণ এবার যেন ধেই ধেই ক'রে নেচে নেয় এক পাক।

'বলি অত কি ভয় দেখাচ্ছিস লা! মেয়ের আমার কী কীত্তি-কেলেঙ্কারি ফাঁস করবি তাই শুনি! সে কি আর একটা নাগর করছে?'

'করছেই তো! আর সে কথা এ বাড়ির না জানে কে?' গলায় জোর দিয়ে জবাব দেয় ক্ষীরি, 'জিজ্ঞেস কর না, ঐ তো সব ভালমানুষটি সেজে মুখ বাড়াচ্ছে দোরে দোরে—কী বলে ওরা!' জানতে কারুরই আর বাকী নেই।

…বাবুর মাইনে খাচ্ছেন আর দুপুরবেলা বাবুরই চাকরের সঙ্গে সোহাগ করছেন ঘরে দোর দিয়ে।…বাড়ি ছেড়ে যদি যেতে হয় তো এ হাঁড়ি হাটে না ভেঙে যাব না!'

'কী—কী বললি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? জিবের লাগাম রেখে কথা বলিস না হারামজাদী? যার আশ্রয়ে আছিস তার নামেই মিছে বদ্‌নাম দেওয়া?'

কিরণের মুখের চেহারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কিন্তু বোধ করি অসহ্য ক্রোধেই এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না। অথবা ইতিমধ্যেই একটা কুটিল সংশয় দেখা দেয় ওর মনে—তাইতেই নির্বাক হয়ে যায়।

ক্ষীরি কিন্তু একটুও দমে না, অথবা অত বড় গালাগালিটাও লক্ষ্য করে না। বলে, 'মিথ্যে বদনাম, তা তো বটেই!…নিজে যদি দুপুরবেলায় পাড়ায় পাড়ায় জুয়ো খেলে না বেড়াতে তা হলে নিজেই দেখতে পেতে চোখে—সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি। জিজ্ঞেস কর না তোমার পেয়ারের ঐ সব ভাড়াটেদের, ওরা কি বলে! সবাই তো আর চোখের মাথা খেয়ে বসে নেই তোমার মত!'

কিরণ স্তম্ভিত হয়ে গেল অকস্মাৎ। ঠিক জোঁকের মুখেই নুন পড়ল যেন। ভাড়াটেদের জিজ্ঞাসা করার উপায় ছিল না বটে—কারণ পাছে সাক্ষী দিতে হয় বলে ইতিমধ্যেই—ক্ষীরির কথা শেষ হবার আগেই যে কটি মাথা বেরিয়েছিল বিভিন্ন ঘর থেকে - সে কটি মাথা আবার ঘরে ঢুকে গেছে। কিন্তু বোধ করি আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজনও ছিল না। বহুদিনের লোক কিরণ, ক্ষীরির মুখের চেহারায় আর গলার আওয়াজে সে যে সত্য কথা বলছে সে সম্বন্ধে ওর মনে আর সংশয় মাত্র রইল না।

মিনিট কয়েক তেমান নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্চর্য কোমল কণ্ঠে ও বলে, 'কিছু মনে করিস নি মা ক্ষীরি, বুড়ো হয়েছি—হঠাৎ মাথা গরম হয়ে ওঠে। তুই নিজের ঘরে যা- যা হবার হয়ে গেছে- মনে কিছু রাখিস নি। তোরও বোঝার ভুল, ঠাট্টা তোকে কেউ করে না। কে করবে বল্—এ তো আছেই, আজ তোর কাল আমার। যে নাইনের যা। যা, মাথা ঠাণ্ডা করে বাসি পাট সেরে নিগে যা…আর ছাখ্- আমাকে যা বললি বললি—নলু এলে কিছু বলিস নি, লক্ষ্মী মা আমার।'

হয় এসব ঘটনার কিছু জানতে পারে নি।

তার পক্ষে তখন কোন কিছুই জানতে পারার কথা নয়। চোখের সামনে নান ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও সে ইঙ্গিত সে নিতে পারত না তা থেকে। কানের কাছে মুখ এনে কেউ হুঁশিয়ার করলেও বুঝতে পারত না। চোখ এবং কান দুই-ই তার তখন বন্ধ। সে তখন মধুর মরণে মরছে—পতঙ্গের মত তেজদীপ্ত মৃত্যুর দিকে উড়ে চলেছে দুই পাখা মেলে।

এক কথায় তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। মধুর সাংঘাতিক, আশ্চর্য নেশা। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সে। আর নেশা লাগবারই তো কথা। ভিখারীর সামনে হঠাৎ রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, দরিদ্রের সামনে অবারিত হয়ে গেছে কুবেরের ভাণ্ডার। যা সে কোন দিন কল্পনা করে নি স্বপ্ন দেখে নি—এমন কি যা এই পৃথিবীতে আছে এমন কোন ধারণাও ছিল না—তাই তার জীবনে ঘটছে। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ।

সে সারা সকাল ছটফট করে, সারা সন্ধ্যা থাকে অন্যমনস্ক।

সকাল থেকে মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখে—কখন দুপুর হবে, বেলা একটা বাজবে, প্রতীক্ষিত লগ্ন আসবে। আর বিকাল সন্ধ্যা এবং রাত্রি—দ্বিপ্রহরের সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বপ্ন-রোমন্থনে তন্ময় থাকে। প্রতিটি ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা, সামান্যতম রসিকতার বিনিময়গুলিও মনে ক'রে ক'রে আবার সেই রসটা উপভোগ করতে চায়।

সবটাই তার কাছে আশ্চর্য। ঐ বাড়ি, ঐ শয্যা, ঐ সুশ্রী যুবতী নারী—সবই। ঐ নারী যে তাকে ভালবাসবে, কামনা করবে, যত্ন করবে, সেবা করবে—তা কে জানত। চোখে দেখে, উপলব্ধি করেও বিশ্বাস হতে চায় না তার। বার বার মনকে প্রশ্ন করে—এ কি সত্যি, এ কি সত্যিসত্যিই ঘটছে তার জীবনে—না স্বপ্ন দেখছে।

এ যেন রূপকথার মত। হঠাৎ এক রাজকন্যা আর রাজত্ব পাওয়া।

নলিনী শুধু তাকে ভালো খাওয়ায় না—পয়সাও দেয় মধ্যে মধ্যে।

ভাল দেশী ধুতি দিয়েছে, জামা দিয়েছে,—বিলিতী শাল পর্যন্ত কেনবার টাকা দিয়েছে। সে আরও এক যন্ত্রণা হয়েছে, অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হয়—গোবিন্দ

আব কমলার কাছে। কোনটা ব্রতের পাওনা, কোনটা বন্ধুর উপহার—এই বলে ঢাকতে হয়। কিন্তু বেশী দিন যে ঢাকতে পারবে বলে মনেও হয না। ক্রমশই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে ওরা—বিশেষ ক'রে গোবিন্দর নতুন বৌয়েব নজর বড সাফ, তার সুডৌল ওষ্ঠাধরেব হাসিটাও বড বাঁকা। ওর মিথ্যা কথা যখন সবাই বিশ্বাস করে তখন সে-ই শুধু একটু মুখ টিপে হেসে টোল-খাওয়া গাল ও টেপা চিবুকের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে চলে যায়। তবু তো এ কাপড়জামা পরে'কস্মিন্‌কালেও বাড়ি যায় না হেম—কারণ সে জানে মা কোন কথাই শুনবে না—এমন কাপুড়ে-বাবুগিরি তার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। হয়তো বা এগুলো বেচে টাকা করতে উপদেশ দেবে।

থিয়েটারেও পরে যায না সে। এমনিই তো জানে দক্ষিণাদাব অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। যা সত্য তিনি তা অনেক দিনই অনুমান কবতে পেরেছেন। তবু এও জানে যে দক্ষিণাদা তাব অনিষ্ট যাতে হয় তা করবেন না। কিন্তু বাকী যারা আছে, তারা কোনমতে ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করলেও ছেড়ে দেবে না—জীবন দুর্বহ করে তুলবে। এবং—সব চেয়ে যেটা ভয়—মনিবের কানে উঠবে কথাটা।

তাই যতটা সম্ভব সেখানে সে পূর্বের দীন ভাবটা বজায় রেখেছিল।

কিন্তু সে আরও বিপদ। দুপুরবেলা দু-তিন ঘণ্টা কোথায় কাটিয়ে আসে সাজগোজ ক'রে—রাত্রে বেবোবাব সময় আবার সাজ পাল্‌টায়—এসবের কোন ভাল জবাবদিহি ইদানীং আর খুঁজে পাচ্ছিল না। চাকরির খোঁজে যেতে গেলে একটু ভাল সাজগোজ করে যাওয়া দরকার—এ কৈফিযতটা ইদানীং বড়ই মামুলী ও অর্থহীন হযে পডছিল।

এই যখন অবস্থা—দু দিক নয় তিন দিক সামলাতে গিযে যখন প্রাণান্তকব হয়ে উঠেছে ব্যাপাবটা—তখনই এই ঘটনাটা ঘটল।

হেম কিছুই জানে না। সেদিনও বেলা বারোটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা কোম্পানির বাগানের বেঞ্চিতে কাটিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে দেড়টা নাগাদ কম্বুলেটোলায় পৌছেছে। এটা ওর যাকে বলে নিতান্তই অকারণ কষ্ট পাওয়া—স্বচ্ছন্দে একটু ঘুম দিয়ে বেলা একটাতেই বেরোতে পারে—কিন্তু বেলা এগারোটা-বারোটা নাগাদ এমনই অধীর হয়ে ওঠে সে, যে বাড়ি থেকে না বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন যন্ত্রণা বোধ হয়।

আজও সে আসন্ন মিলন-স্বপ্নে বিভোর হয়েই—প্রতিটি পদক্ষেপ উপভোগ করতে করতে এবং পথের দুধারের ঘড়ি দেখতে দেখতে এসেছিল। কী হবে, কী ঘটবে—তা সে জানে। যে কোন দিনের ঘটনা অল্পবিস্তর অন্য দিনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ছোট্ট ক'রে কড়াটি নাড়লেই গিরিধারী এসে দোর খুলে দেবে। নলিনীর শেখানো আছে তাকে, তার জন্যে মোটা বকশিশ পায় সে - এই সময়টা সে কোথাও যায় না, দরজার চলনে বসে অপেক্ষা করে। · বাড়িতে ঢুকে ওপরে উঠতে উঠতে নলিনীর সঙ্গে দেখা হবে। সে হেসে বলবে, 'আজ আর একটু সকাল ক'রে এলেও ক্ষেতি ছিল না, মা আজ বাবোটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে গেছে!' তার পর—

তার পর তো স্বর্গ· বাস্তব ও কল্পনায় মেশা সুখস্বর্গ। এক দীর্ঘ সুখ-স্বপ্ন।

আজও সে যথাসময়ে এসে স্বর্গের দরজায় পৌছল। আজও গিরিধারী এসে দোর খুলে দিলে, আজও সিঁড়ির মাঝে দেখা মিলল নলিনীর।

নলিনী ওর কাঁধের ওপর থেকে নতুন কেনা জার্মানির শালটা তুলে নিয়ে বললে, 'ইস্, এই রোদ্দুরে এখানা কাঁধে ক'রে এসেছ কী বলে! ছাখ দিকি—অঘ্রান মাস বলেই কি আলোয়ান গায়ে দিতে হবে—শীত না পড়লেও? দরদর ক'রে ঘামছ যে!'

হেম সে কথার জবাব না দিয়ে ওর একটা হাত ধরেই ঘরে গিয়ে পৌছল। জুতোটা নিজেই খুলে ঢুকল বটে, কিন্তু তার পর আর কিছু করতে হ'ল না। জামাটা নলিনীই খুলে নিলে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে। হেম সুখে ও আলস্যে ঢালা বিছানাটার ধারে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ঘরে ঢুকল কিরণ!

কিরণ পাড়া বেড়াতে বেরোলে বেলা চারটের আগে ফেরে না—নলিনী তাই নিশ্চিন্ত থাকে। আজকের সকালের ঝগড়াটা তাকে কেউ বলে নি—কিরণের কড়া শাসন ছিল। সুতরাং সতর্ক হবার সময় পায় নি।

'বলি হ্যাঁ লা ও শতেকক্ষোয়ারী, হায়া-পিত্তি বলতে কি তোর কিছু নেই! রাজ্যেশ্বর জামাই আমার···তার জায়গায় তারই খেজমতের চাকরটাকে বসিয়েছিস? ছি ছি! কী পিরবিত্তি তোর! যদি একথা তার কানে যায়? বলে, পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেধের—বাতাসে কথা ভাসে। কখন কানে গিয়ে পৌছবে তার ঠিক আছে? শত্তুর তো চারিদিকে। যেখানে রাণীগিরি কচ্ছিস, সেইখানেই তো বাঁদীগিরি করতে হবে। আর ঞ্যাটারের চাকরিই কি থাকবে

পাট তো যা করিস অপব জায়গা হলে পঁচিশ টাকাব বেশী মাইনে দেবে না কেউ। অমন তারা তু'পায়ে জড়ো করতে পারে গণ্ডা গণ্ডা ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেডাচ্ছে। না কি বাবুই আবার অমনি পাবি? লোকটাব চোখে লেগেছে তাই। ও বাবু গেলে আব অমন জুটবে না মনে বাখিস। ঐ ক্ষীবির মত গোলাদাব বাবু খুঁজতে হবে।'

প্রথমটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল নলিনীব মন। বহুবাব ঠোঁটের ডগায় এসেছিল কথাটা—'তোমাব কি? আমি যা খুশি তাই কবব। আমার বাড়ি, আমি রোজগাব কবি।' কিন্তু সাহসে কুলোল না। মাকে সে চেনে। কেউ না লাগায় মা-ই গিয়ে লাগাবে। লেজে-পা-পড়া সাপের মত হিংস্র হয়ে উঠবে মা—এত বড় রোজগারটা বন্ধ হয়ে যাবাব সম্ভাবনাতে ক্ষেপে উঠেছে, তার ওপর অপমান কবলে সইবে না। আর বাবুব কানে উঠলে—' মা যা বলছে তা যে কতদূর মর্মান্তিক সত্য তা ওর চেয়ে কেউ জানে না।

পাংশু বিবর্ণ নতমুখে বসে বসে ঘামতে লাগল নলিনী, প্রতিবাদের একটি কথাও বলতে পাবল না।

অবশ্য তাব কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ আশঙ্কাও করে নি কিরণ, সে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই হেমকে নিয়ে পড়ল এবার।

'আব বলি বাছা তুমিই বা কি রকম বেইমান নেমোখারাম হারামজাদা লোক! যার খাচ্ছ পরছ—তারই সব্বনাশ করচ? এ-ও যা, মনিবের ঘরে সিঁদকাটাও তো তাই। এ তো ঘুমন্ত বাপের বুকে ছুরি মারা। আর সাহসই বা কী তোমার? কুকুর হয়ে—ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে মুখ দিতে চাও! বামন হয়ে চাঁদে হাত। পথের ভিখিরীর রাজরাণীতে সাধ! কী বলব তুমি শুনলুম বামুনের ছেলে তাই—নইলে ঐ স্নেৎখানার ঝ্যাঁটা এনে গুনে গুনে সাতবার মারতুম তোমার মুখে।'

এই পর্যন্ত বলে—ঝ্যাঁটা মারবার মত ক'রেই হাতের ভঙ্গী ক'রে বোধ করি বা একটু দম নেবার জন্যই থামল কিরণ।

হেম অভিভূত, বিহ্বল। ভয়ে তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে—হাতে পায়ে কোন জোর নেই—ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। কিছু বলা তো দূরে থাক, ব্যাপারটাই যেন ভাল ক'রে অধিগম্য হ'ল না তার—সে শুধু কিরণের দিকে ক্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

তার সেই বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠল কিরণ, 'নাও

না ও ওঠো—আর অমন ন্যাকাবোকা সেজে চেয়ে থাকতে হবে না। ঢের হয়েছে। শামুন বলেই পার পেলে—কিন্তু বেশী যদি নেই-আঁকড়েপনা কর তো রেযাত করব না এই বলে দিলুম। গায়ে হাত দেবার আগে সবে পড—যদি ভাল চাও তো। আর কখনও এ-মুখো হবার চেষ্টা করো না। কাল থেকে আমি দুপুরবেলা দোরে তালা দিয়ে রাখব। আর ভেবো না বাইরে কিছু ক'রেও পার পাবে। থ্যানেও আমার চোখ থাকবে—মনে করো না যে সেখানে কেউ পাহারা দেবার নেই? যদি শুনি যে আবার এদিকে হাত বাড়িয়েছ তো তোমারই এক দিন কি আমারই এক দিন। কৈ, এখনও উঠলে না, বসে আছ কি জন্যে? দারোয়ান ডাকতে হবে না গলাধাক্কা দেবার জন্যে—তোমাকে আমিই তাড়াতে পারব, এটি মনে রেখো।'

হেম ইচ্ছা ক'রে বসে থাকে নি-বিহ্বল হয়েই বসে ছিল। এবার সে বিহ্বলতা কাটিয়ে ওকে উঠতেই হ'ল। হাত কাঁপছে, পায়ে জোর নেই। তা হোক, আরও বেশী অপমান হওয়ার আগেই যেতে হবে—এটুকু এরই মধ্যে ওর মাথাতে গিয়েছিল। কোনমতে জামাটা হাতে করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আলোয়ানটার কথা মনে রইল না। সেটা এক টানে আলনা থেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে কিরণ।

নলিনী কিছুই বলতে পারল না, ভয়ে অপমানে বেদনায় সেও পাথর হয়েই গিয়েছিল।

প্রতি ঘরে কৌতূহলী, কৌতুকোৎসুক জোড়া জোড়া চোখ তাকে লক্ষ্য করছে তা হেম জানে। এই কটা সিঁড়ি এবং সামান্য রকটুকু—তাও যেন ফুরোতে চায় না। এর চেয়ে এই মুহূর্তে যদি মরে যেত সে তো এর চেয়ে ভাল হ'ত। কত লোকের তো এরকম আঘাতে হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু হয় শুনেছে সে—তার হচ্ছে না কেন?

না। কিছুই হ'ল না। কোনমতে স্খলিতপদে টলতে টলতে বাড়ির বাইরে আসতে হ'ল তাকে। পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত চিরকালের জন্যই। তার উদ্‌ভ্রান্ত বেশভূষা ও কালিপড়া মুখ দেখে মধ্যাহ্নের সেই জনবিরল গলির স্বল্প দু-চারজন পথিকও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে হেম। জামাটাও গায়ে গলিয়ে আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতেই গলিটা পেরিয়ে এল। কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে আর চলতে পারল না, অবসন্নভাবে একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল সে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অনেকক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় বসে থেকে—এখানেও সে ক্রমশঃ বিস্ময় ও কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে—হেম একসময় উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে, পোশাক বদলাতে হবে। থিয়েটারে যাবার সময় হয়ে এল—আজ সন্ধ্যায় অভিনয় শুরু হবে। আগে 'ক্যাণ্ডল লাইট' বলে বিজ্ঞাপন করা হ'ত—তখন সুবিধা ছিল আধ ঘণ্টা দেরি হলেও অত কথা উঠত না। এখন আবার সময় দিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু থিয়েটারে আর যাওয়া কি উচিত হবে ওর?

অবশ্য কথাটা কিছু এখনই বাবুর কানে পৌঁছবে না। নলিনীর মায়ের সে সাহস হবে না নিশ্চয়—কারণ তাতে মেয়েরই বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনা।

কিন্তু—, যদি অন্য কোন ভাবে লাগায়?

যদি—যদি চোর বলে?

এত দিনের থিয়েটার মহলের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক শিক্ষাই তার হয়েছে, অনেক কথাই কানে এসেছে। এই শ্রেণীর মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—এটুকু সে বুঝেছে বেশ।

নলিনী! নলিনীও হয়তো ঐ 'গোড়েই গোড' দেবে!

এই তো সে চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। কেন—তার বাড়ি তার ঘর, একটা কথাও কি সে বলতে পারত না? হ'লই বা মা—মা'র মুখের ওপর কি কোন কথা বলে না সে?

দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে হেম। চলতে চলতেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

নলিনী! নলিনীও তো ঐ দলেরই মেয়েছেলে! তার আর কত ভাল হবে?

উত্তেজনাটা কিন্তু স্থায়ী হয় না। নলিনীর কথাটা মনে পড়তেই তার চেহারাটাও মনে পড়ে যায়—আর তার ফলে জীবনে প্রথম নারীসঙ্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও মনে পড়ে গিয়ে মনটা কোমল হয়ে আসে। ওর দোষ দিলে চলবে কেন? আসলে ভয়ের কারণ তো যথেষ্টই আছে। ভাতভিক্ষা শুধু নয়—প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, শক্তি সবই হারাতে হবে—জানাজানি হয়ে গেলে।

না। নলিনীর পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না।

তরিস্ততেও করতে পারবে না।

রমণীবাবুর কোপবহ্নি থেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও সম্ভব হবে না তার দ্বারা। সে চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীতই হবে।

তা হলে এখন কী করবে সে? যাবে—না যাবে না?

মূল প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে যে।

টাকাও পাওনা রয়েছে অনেকগুলো। একেবারে না বলে ডুব মারলে আর কোনদিনই সে টাকা আদায় হবে না।

ভাবতে ভাবতে কোম্পানির বাগান পর্যন্ত এসে গিয়েছিল হেম। ভেতরে ঢুকে আবারও অবসন্নভাবে বসে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

আরও খানিকটা ভাবলে বসে বসে।

শুধু পয়সার আকর্ষণও নয়—আরও কিছু আছে। মনের মধ্যে অপ্রতিহত আশা আবার মাথা তোলে একটু একটু ক'রে।

বেশ তো! চোখে তো দেখতেও পাবে অন্তত নলিনীকে একবার।

তার পর? তার পর আবার কোথাও কোন রকম সুযোগ-সুবিধা হতে কতক্ষণ? সত্যিই কিছু কিরণবালার গোবরের চোখ নেই।

না—যাওয়াই যাক। দেখা যাক না। চাকরি ছাড়িয়ে দিলে মাইনে দিয়ে ছাড়াতে হবে। বদনাম আর কী দেবে! ওদের যা বাজার-হাট করে মাঝে মাঝে—তাই থেকে চুরি করেছে—এই বলবে বড় জোর। কিংবা বলবে যে 'অমুক জিনিসটা কিনতে টাকা দিয়েছিলুম ফেরত দেয় নি!' বলুক গে। তার জন্যে বড় জোর এখানে আর পাঠাবে না। সে তো এমনিই আর যাবে না। তার আর ক্ষতি কি? আসল কর্মস্থলের বাইরে বেগার দিতে গিয়ে কিছু সরিয়েছে—এ অভিযোগে এখানে তার চাকরি মারতে পারবে না কেউ।

মনকে এমনি প্রবোধ দিয়ে নিজেকে খানিকটা চাঙ্গা ক'রে তুলল হেম।

তার পর দ্রুত বাড়ির পথ ধরল।

অগ্রহায়ণের বেলা ম্লান হয়ে এসেছে, থিয়েটারে পৌঁছতে হবে এখনই।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম দেখা হ'ল গোবিন্দর বৌয়ের সঙ্গে। সে তখন সন্ধ্যা দিতে চলেছে। ভেতরের রকের যে ঘেরা জায়গাটায় ওদের রান্না হয়—তারই এক কোণে, নিচে নামবার পইঠেটার পাশে একটা ভাঙা টবে ওদের তুলসী গাছ থাকে। সেইখানেই প্রত্যহ সন্ধ্যে দেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যেই ছোট্ট একটি পেতলের পিদিমে ঘিয়ের সন্ধ্যা-দীপ জেলে নিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মা-কালীর পটের সামনে

প্রণাম করছিল সে। সামনে হেমকে দেখে অভ্যাসমত মুখ-টিপে হেসে প্রশ্ন করলে, 'কী ঠাকুরপো—এত দেরি? আজ ওখানে যেতে হবে না?'

'হবে বৈ কি। দেরি হয়ে গেল একটু—এমনি—', থেমে থেমে উত্তর দিলে হেম। কারণ কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। তার মনে হ'ল বড় বৌদিকে আজ নতুন দেখলে সে। বাণী সুশ্রী, খুবই সুশ্রী—কিন্তু তার যে এত দীপ্তি তা যেন এর আগে কখনও এমন ভাবে চোখে পড়ে নি। সুন্দর ক'রে পাতা কাটা, শিল্পীর হাতে আঁকা দুই ভুরুর মধ্যে ছোট্ট একটি টিপ, উজ্জ্বল দুটি চোখের ভক্তিতদ্গত দৃষ্টি—সবটা জড়িয়ে সেই গলায় আঁচল দেওয়া মুখখানিকে কম্পমান দীপশিখার আলোকে ফ্রেমে আঁটা ছবির মতই মনে হ'ল। আর সে ছবি যেন টাটকা ফোটা কোন দেবভোগ্য ফুলের।

অন্যমনস্ক, তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় কয়েকটি মুহূর্তের জন্য।

হঠাৎ চমক ভাঙল বাণীরই কথায়, 'তোমার কি হয়েছে বল তো ঠাকুরপো?'

চমকে উঠল হেম, 'কেন, কী আবার হবে?'

'মুখে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে, চোখ লাল—কোথাও মার-টার খেয়ে এলে নাকি?'

'না না। তোমার এক কথা!'

কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে অথচ কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে উত্তরটা দিতে দিতে সেখান থেকে সরে পড়ল সে। সময়ও আর নেই মোটে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার তো যথেষ্টই কারণ রয়েছে।

মেয়েটা বড়ই জ্বালালে। ওর ঐ উজ্জ্বল চোখে যে কিসের কৌতুক, কতটা দেখতে পায় ও—আজ পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না হেম। আর সেই জন্যেই বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

আরও একজনের অস্বস্তিকর দৃষ্টি এড়ানো যায় না। দক্ষিণাদার তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখও বাইরের সব আবরণ ভেদ ক'রে একেবারে যেন মর্মস্থলে পৌঁছয়।

প্রথমটা অবশ্য অবসর মেলে নি কথা কইবার। হেম গিয়ে পড়েছিল একেবারে সময়ে সময়ে। দু-চারজন লোক এর মধ্যেই এসে গেছে, সে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভিড় শুরু হয়ে গেল। নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই তখন। তবুও তার ভেতরেই অনুভব করলে হেম যে দক্ষিণাদার চোখটা তার মুখের ওপর পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল।

সেইটুকুতেই হেম ঘেমে উঠেছিল।

কিন্তু ভয়টা যে মিছে নয় সেটা বোঝা গেল ক' মিনিট পরেই—ঐ ভিড়েরই মধ্যে এক ফাঁকে কানের কাছে চুপি চুপি বলে গেল দক্ষিণাদা, 'প্লে আরম্ভ হলে মিনিট কতক পরে বাইরে আসিস্ একবার, কথা আছে।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল হেম স্থাণুর মতই। প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়ে গেল। দর্শকরা যা আসবার মোটামুটি এসেই গেছে, এর পর এলেও এক-আধজন হয়তো আসতে পারে—তার জন্য হেমের না দাঁড়ালেও চলবে, পাশের গেটের কেউ কাজ চালিয়ে নেবে—এ সবই জানে সে। তবু যেতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকা গেল না, দক্ষিণাদা এসে জামার আস্তিনটা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। একেবারে সোজা বেরিয়ে খাবার জলের বড় চৌকো ট্যাঙ্কটার পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে কি? ধরা পড়ে গেছিস বুঝি?… কে ধরলে, খোদ বাবু না বুড়ী?'

এর পর আর গোপন করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

হেমও সে চেষ্টা করলে না। মাথা হেঁট ক'রে প্রায় সব ইতিহাসই খুলে বললে,—অবশ্য সংক্ষেপে।

'ইস! কত ক'রে বললুম তোকে ইস্টুপিড যে গরীব বামুনের ছেলে এ সবে জড়াস নি, তা তো শুনলি না! তা এখন কি করবি?'

ভয়ে ভয়ে পাল্টা প্রশ্ন ক'রে হেম, 'ও—ও কি বলবে বাবুকে কিছু? বলতে সাহস করবে?'

'মেয়ের দোষ তো দেবে না। দেবে তোরই দোষ—মেয়েও সতীসাধ্বী সেজে ঠিক পার পেয়ে যাবে। মরতে তুই-ই মরবি। এমন একটা কাণ্ড হবে—অপমানের চূড়োন্ত ক'রে ছাড়বে। এসব বাবুরা ঘরের মাগের সতীত্ব ছেড়ে দিয়ে আসে চাকর-বেয়ারার জিম্মেয়, বাইরের মেয়ে-মানুষের সতীত্বর ওপর ওদের কড়া নজর। বুঝলি, কানে গেলে ক্ষেপে উঠবে একেবারে। আর যতই হোক্—ওরা ধনী, ওরা মনিব—ওদের হাতে শতেক ব্যবস্থা। না ভাই, তোর আমি দাদার মত, আর দাদাই তো বলিস—আমি বলছি তুই চাকরি ছেড়ে চলে ‥চয়ে কীই বা হচ্ছে, এ যা রোজগার কচ্ছিস, দেশে গিয়ে শাঁকে ফুঁ দিলেও কারণ বেশী হবে!' ং নিমেষে

হেম মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। তার জ চলে গেল প্রতিধ্বনি তোলেন দক্ষিণাদা সুতরাং উত্তর দেবার মত কোন ক

কিন্তু তাই বলে সায়ও দিতে পারে না ঠিক।

সব আশার সত্যি সত্যি পরিসমাপ্তি করে দিয়ে, এই অত্যন্ত অসময়ে তার প্রথম প্রণয়ের সমাধি রচনা ক'রে চিরকালের মত চলে যেতে হবে? সত্যি-সত্যিই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে তাদের সম্পর্কে?

এ মানতে চায় না তার মন। কল্পনাতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কাছাকাছি থাকলে, সামনাসামনি থাকলে কত সুযোগ ঘটতে পারে। এই তো থিয়েটারের মধ্যেও কত মেয়ে কত কি করে—তা ছাড়া ওর মা ও কোথাও যেতে পারে তীর্থ করতে—বাবু কাজে যান অনেক সময়, বাইরে বাইরে ঘোরেন - কখনও কি ওরা দুজনে একসময়ে বাইরে যাবে না কোথাও। সে সব সুযোগের তো সদ্ব্যবহার করতে পারবে তারা। তরুণ মন হেমের - নিমেষে বহু স্বপ্ন রচনা ক'রে এগিয়ে যায়। বয়স হয়েছে, মরতেও তো পারে নলিনীর মা! বাবুরও তো এ রক্ষিতায় অরুচি ধরতে পারে। তিনি অন্য কাউকে ধরতে পারেন তো! দূরে চলে যাওয়া মানে একেবারেই যাওয়া!

অভিভূতের মত হেম আবার ভেতরে এসে দাঁড়ায়।

এখনই প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য শুরু হবে। এই দৃশ্যে নলিনী বেরোবে প্রথম।

একবার চোখের দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে হেম। অনেক আশার দেখা তাদের অসমাপ্ত থেকে গেছে অপরাহ্নে। মনে হচ্ছে যেন কত কাল দেখে নি সে নলিনীকে। এখান থেকে দেখতে তো দোষ নেই—এই দূর থেকে। এমন তো আরও চার-পাঁচ শ জোড়া চোখ দেখছে তাকে। সেও না হয় দেখল তার সঙ্গে।

ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে সে।

নলিনী আসে। অভিনয় করে সে অন্য দিনের মতই। সহজ স্বাভাবিক আচরণ। তার ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয় না যে তার চিত্তে আলোড়ন জাগবার কোন কারণ ঘটেছে। শুধু—প্রতিদিনই অভিনয় করতে করতে মাঝে মাঝে এদিকে তাকায়—এই গেট্‌টার দিকে। সে জানে হেম এই দুটো গেটের একটাতেই থাকে, তাকায় তাকে দেখবার জন্যই—সেইখানেই যেন তার চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য প্রথমটা

সময়ে সময়ে।' না। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই হেমের। বরং এই না চাওয়াতেই দাঁড়াতে ভিড় বোধ করল সে। এদিকে—তার দিকে চাইলে কষ্ট হবে বলেই ভেতরেই অ[illegible]ভব তো তার প্রেমের, প্রীতির লক্ষণ।

মুহূর্তের জ[illegible] স্থিত ভাবতেই তার অন্তর একটা অবর্ণনীয় আবেগে উদ্বেল হয়ে

ওঠে। বরং বলা যেতে পারে অপরাহ্ণেরই অসমাপ্ত আবেগ। সে যেন আর স্থির থাকতে পারে না। তার পা দুটো ভেতরে ভেতরে কাঁপে একটু, সে কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ সারা দেহেই। একবার ভাল ক'রে ওকে দেখবার জন্য, সামনাসামনি কাছে থেকে দেখবার জন্য, একবার ওকে স্পর্শ করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে সে।

কোনমতে সে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যেকার বিরতিটা কাটায়। অন্যমনস্ক ভাবে—আচ্ছন্ন অভিভূতের মত। ভুল হয় বার বার। ধমক খায় কানাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে যেতে—আর স্থির থাকতে পারে না কোনমতেই। কে যেন অপ্রতিহত বলে ওকে ভেতর দিকে টানে। এই সময়েই সুবিধা তা হেম জানে—এর পরের দৃশ্যটা বেশ বড়, সে দৃশ্যে অনেক চরিত্রই স্টেজে আসে—ভেতরে ভিড় থাকে খুব কম। অথচ নলিনীর প্রথমে যা দু-চার লাইন পার্ট, তার পরেই সে ভেতরে চলে যাবে। সম্ভবত একাই থাকবে। শুধু চোখের দেখা নয়—মুখের কথারও সুবিধা মিলতে পারে।

হেম বাইরে বেরিয়ে এসে আগেই পানের দোকানটার দিকে এগিয়ে যায়। এক খিলি পান তাদের প্রাপ্য প্রতিদিন, যুধিষ্ঠির পানওলা হাসিমুখেই এটা দেয়। এখানে এলে কেউ সন্দেহ করবে না। পান নিতে নিতে একবার চারদিক তাকিয়ে নেয় হেম, সকলেই এ সময়টা ভেতরে, শুধু সত্য বাইরে আছে—তা সে-ও যেন কী একটা পড়ছে গেটের মাথায় ক্ষীণ আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের অলক্ষ্যে যাবার এই পরম সুযোগ।

কোনমতে সত্যর কাছটা সন্তর্পণে পার হয়ে হেম ত্বরিত লঘুপদে স্টেজের দোর পেরিয়ে ভেতরে চলে যায়।

সেই দৃশ্যটা আরম্ভ হয়ে গেছে। নলিনীই পার্ট বলছে এখন। এখনই ভেতরে আসবে। দুরু দুরু কম্পিত বুকে হেম স্টেজ থেকে বেরিয়ে নলিনীর নিজস্ব ঘরে যাবার সরু পথটায় দাঁড়িয়ে থাকে।

নলিনী আসছিলও এদিকে। মাথা হেঁট ক'রে কী একটা ভাবতে ভাবতে আসছিল সে—হঠাৎ সামনে একটা ছায়া দেখেই বোধ করি মাথা তুলে চেয়ে দেখল। আধা আলো আধা অন্ধকার তবু হেমকে চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই, সে অস্ফুট এবং অব্যক্ত কী একটা শব্দ ক'রে দু পা পিছিয়ে গেল এবং নিমেষে যে দাঁড়িয়ে যে সীনটা সাজানো রয়েছে এখন, তার পিছন দিয়ে সোজা চলে গেল ওধারে—যেখানে বসে 'সখী'র দল গুলতানি করছিল।

হেমের মুখের ওপর কে যেন এক ঘা চাবুক মারল সজোরে। ঠিক তেমনি

লাগল তার, তেমনিই জ্বালা করতে লাগল মুখটা। বাবুর 'ঘরণী' হবার পর থেকে নলিনীর এখানে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে—নলিনীর নিজের ভাষাতে 'পোজিশেন'—সে ঐ ছুঁড়ীদের সঙ্গে কথা বলে কদাচিৎ। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোটা তো সম্পূর্ণ অভাবনীয়, কল্পনাতীত। এপার থেকে ওধাবের ক্ষীণ আলোতেও পরিষ্কার দেখা গেল—ওদের দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছেও।

হেম আর দাঁড়াল না। দাডাতে পাবল না। প্রায়-অবশ পা দুটোকে টেনে টেনে কোনমতে বাইরে এসে দাড়াল।

আর যা-ই হোক—নলিনীব কাছ থেকে এ ব্যবহার সে আশা করে নি। ভয়ের কারণ তার যথেষ্ট আছে তা হেমও জানে—কিন্তু সত্যি-সত্যিই কিছু গোবরের চোখ নেই এখানে কিরণের, অন্ধকারে নির্জনে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটা কথা বললে সেটা তখনই কিছু তার কানে উঠত না।

একটা ক্ষমাভিক্ষা করারও কি ছিল না তার? একটা সান্ত্বনার কথা বলাও কি উচিত ছিল না? হেম নিজে সেধে যায় নি—নলিনীর আগ্রহেই গেছে—না-হক যে অপমানটা হ'ল আজ, সে অপমানের পুরো না হোক বেশির ভাগ দায়িত্বই নলিনীব। সে কথাটাও কি একবার ভেবে দেখল না?

একটা অবোধ মূঢ় অভিমানে হেমের চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে মন স্থির ক'রে ফেললে।

এখানে থেকে দিনেব পর দিন এই মার সে খেতে পারবে না—এ জ্বালা তার সহ্য হবে না। এক দিনের এই আঘাতেই মনে হচ্ছে বুকের ভেতরটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রতিদিন এই যন্ত্রণা—চোখের সামনে থাকবে, বার বার দেখা হবে, মনের সমস্ত আবেগ ও বাসনা উত্তাল হয়ে উঠে ওর কাছে ছুটে যেতে চাইবে—চাইবে ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে, ওকে একটু স্পর্শ করতে, অথচ পারবে না—এ যন্ত্রণা অসহ্য।

না, দক্ষিণাদাই তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। সে-ই ঠিক বলেছে!

হেম আর দাঁড়াল না। কারুর সঙ্গে দেখাও করলে না। সকলের অলক্ষ্যে একেবারে থিয়েটার থেকেই বেরিয়ে এল।

ঠিক এখনই বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। অসময়ে ফেরার জন্য অজস্র জবাবদিহি করতে হবে, এখনও সকলে জেগে—রাণীর তীক্ষ্ণ চোখের সকৌতুক চাহনিকে আরও বেশী ভয়। সে খানিকটা ইতস্তত ক'রে কোম্পানির বাগানেই গিয়ে বসল।

কিন্তু এখানে ভাল লাগল না। এখানেও বসার সঙ্গে সহস্র স্মৃতি জড়ানো! নলিনীর বাড়ি যাওয়ার পথে সানন্দ প্রতীক্ষার স্মৃতি। সে যেন অস্থির হয়ে উঠে পড়ল আবার। পথে পথেই ঘুরল খানিকটা। তার পর, ওদের শুয়ে পড়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আন্দাজ ক'রে বাড়িই ফিরে এল এক সময়।

তার পরের দিন খবরটা ভাঙলে বড় মাসীর কাছে, বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মাসীমা! আর ওখানে যাব না।'

'সে কী রে, কেন? কী ব্যাপার?'

'এমনিই তো মাইনে দিতে চায় না ব্যাটারা, খামচা খামচা ক'রে দেয়—সব জুড়লে আমার অমন ছ মাসের মাইনে পাওনা বেরোবে। তার ওপর আবার মেজাজ। কাল একটু যেতে দেরি হয়েছিল বলে যাচ্ছেতাই করলে সকলের সামনে। আমিও—এই রইল তোমার চাকরি বলে চলে এলুম।'

'তার পর? এখন কী করবি?' খানিকটা যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে বলে কমলা।

'এখন তো দিনকতক বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তার পর আবার চাকরির জন্যে উঠেপড়ে লাগা যাবে। একটা যা হোক বাঁধাধরা ছিল বলে অত গা-ও ছিল না, এখন যা পাব তাই নেব!'

নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের মানসিক বৈকল্যে হেমের একবারও মনে পড়ল না যে, সে কিছু দিন ধরে সারা দুপুর বিকেল টো-টো ক'রে ঘুরছে চাকরির জন্যেই—অন্তত এই কথাই এদের কাছে বলেছে।

কমলা পর্যন্ত একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল এই কথায়। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। এই থিয়েটারের চাকরিটা একটা অস্বস্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইদানীং—কিছু না বুঝেও অস্বস্তি হ'ত তার। গেল, ভালই হল। বেটাছেলে মোট বয়েও খেতে পারবে। আরও কিছু একটা ঘটেছে, যা বলছে তা সবটা সত্যি নয়—তা বুঝেও তাই আর সে কিছু জেরা করলে না।

সেই দিনই বিকেলে বাড়ি চলে গেল হেম। মাকে গিয়ে বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম মা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না, রাত জেগে জেগে শরীর কালি হতে বসেছে, অথচ তোমাদের দুটো টাকাও দিতে পারি না এক এক মাসে—অমন চাকরিতে দরকার কি? আর যদি কিছু না জোটে শাঁকে ফুঁই দেব না হয়। কী বল?'

শ্যামা উদ্দেশে দু হাত তুলে মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে

॥ ২ ॥

মহাশ্বেতা অনেক দিন ধরেই অভয়পদকে খোঁচাচ্ছিল হেমের চাকরির জন্যে—এবার উঠে পড়ে লাগল।

'বলি নিজের ভেয়েদের জন্যে তো বেশ টুকটুক ক'রে চাকরি যোগাড় করতে পার—আমার ভায়েব বেলাই আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না—না? এতটা বয়স হ'ল, কবে বা কী কাজকর্ম পাবে আর কবেই বা বে-থা ক'রে সংসারী হবে?'

প্রথম প্রথম অভয়পদ তার স্বভাবমত চুপ ক'রেই থাকত, ইদানীং—বোধ কবি বা উত্ত্যক্ত হয়েই—দু-চাবটে কথা বলে। বলে, 'আমাব ভাইদের যখন চাকরিতে ঢুকিয়েছি তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। এখন একটা পাস নইলে কোথাও নিতে চায় না, আর নেবেই বা কেন—পাস কবা ছেলেরাই কত গণ্ডা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাও এত বয়স হয়েছে—এই প্রথম চাকরির চেষ্টা করছে তা তো আর বলা যাবে না—এব আগে কোথায় কাজ করেছে জিজ্ঞাসা করবেই—তখন কী পরিচয়টা দেব? সেখানেও তো মুখ পুড়িয়ে রেখেছে।'

'সে ওর বরাত। নইলে এই যে—তোমরাই কি চুরিটা কম কবলে। লোকে বলে পুকুর চুবি করা, তুমি তো বলতে গেলে বড় বড় দীঘিই চুরি ক'রে মেরে দিলে।...বরাত, নইলে সামান্য দুটো শিশি চুরি করেই বা ধরা পডবে কেন—আর তোমরা গাড়ি গাডি মাল চুরি ক'রে মেজ বোয়ের বুক-পোঁতা ক'রে পার পেয়ে যাবে কেন! সে ছেড়ে দাও। বলি যে যেমন—তার তেমনিও তো জুটবে। বেটা ছেলে—তার একটা মুটেমজুরের কাজও কি জোটে না?'

মেজবৌয়ের বুক-পোঁতা করবার অভিযোগটা প্রায় নিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—কোন দিনই এর কোন জবাব দেয় না অভয়পদ। শেষ কথাটারই জের টেনে বলে, 'মুটে-মজুরের কাজ আবার যোগাড় করে দিতে হবে কেন, সে তো পড়েই আছে। বড়বাজারে গিয়ে দাঁড়ালেই মোট মেলে। আর আমরা হলে থিয়েটারে চাকরি নেওয়ার আগে সেই চেষ্টাই দেখতুম।'

বার বার একই ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা ক্ষেপে যায়। এ খোঁচা ঘরে বাইরে খেতে হয় তাকে। স্বামীর মুখেও সেই একই খোঁচার অনুবৃত্তি সহ্য হয় না। সে চাপা গলাতেই যথাসাধ্য চেঁচায়, 'কেন থ্যাটারে চাকরি ক'রে কি সে একেবারে বয়ে গেছে নাকি? কী করছে সে তাই শুনি? কটা রাঁড় রাখার কথা শুনেছ? না কি কাপ্তেনি ক'রে মোট মোট টাকা ওড়াচ্ছে!'

এর জবাবে অনেক কথাই বলা চলত। বলা চলত যে, কাপ্তেনি করার মত

চাকরি সে করে না, গেটকীপারের চাকরিতে পেটে খেতেও জোটে না। বলা চলত যে পুরো মাইনে কোন মাসেই ঠিক মত আদায় হয় না বলে যে নাকে কাঁদে, তার পরনে দেশী ধুতি এবং জার্মানির শাল মানায় না। কত মাইনে পেয়েছে সে আজ পর্যন্ত, আর তার কতখানি সংসারে উসুল দিয়েছে—তার হিসাবও কেউ দেখে নি কোন দিন।

কিন্তু অভয়পদ কোন দিনই এসব কথা বলে না। বলার অভ্যাস নেই তার। কোন দিনই কারুর সঙ্গে সে দুটোর বেশী তিনটে কথা বলে না—বিশেষত বিনা প্রয়োজনে। তা ছাড়া এর পরে কী শুনতে হবে তাও সে জানে। আর শুনতে হয়ও। অভয়পদকে চুপ করে থাকতে দেখে মহাশ্বেতা আরও ক্ষেপে যায়। গলাটা আর একটু চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বলে, 'বলি থ্যাটার তো ভাল, সে তো তবু বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি। সে ঢলাঢলি তো ঘরে তোলে নি সে!'

কথাটা বলেই সেখান থেকে সরে যায় মহাশ্বেতা। অনেক দিনের পরে এই সাহসটা যে হয়েছে তার—তাতেই সে একটু অবাক হয় মনে মনে। নিজেই নিজেকে বাহবা দেয় এক একসময়। তবু এই খোঁচাটা দেবার পরও স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহসে কুলোয় না—কোথাও হয়তো একটা সহজাত ভদ্রতাবোধেও বাধে। সে লেখাপড়া শেখে নি কিন্তু সে দিদিমাকে দেখেছে, মাসীমাদের দেখেছে এমন কি মা'ও তার আজ পর্যন্ত কতকগুলো ভদ্র চালচলন ছাড়তে পারে নি—তাও সে দেখেছে। মোটামুটি একটা সংস্কার তার আপনিই থেকে গেছে ভেতরে। সামনে থাকে না তাই কোন দিন লক্ষ্যও করে না—তার স্বামীর সুগৌর বর্ণ এত বড় আঘাতেও রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে কি না।

লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে যেত।

অভয়পদর মুখে লজ্জা কি উষ্মার কোন রক্তিমাভাই ফোটে না। প্রশান্ত মুখে হাতের কাজ করে যায়।

বাড়িতে থাকলেই—যতটুকু জেগে থাকে—টুকটাক মেরামতির কাজ ক'রে যায় সে। যা পায় হাতের কাছে। বাইরের দিকে একটা করোগেট টিনের চালা মতও খাড়া করেছে এই জন্যে। নানা যন্ত্রপাতি থাকে সেখানে। এমন কি একটা ছোটখাটো রও ক'রে নিয়েছে, কেমন চাকা ঘোরালেই আগুনটা ধরে ওঠে—মহাশ্বেতা প্রথম প্রথম অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে গেলে এখানে এসেই কইতে হয়—সেই হয়েছে আরও খেয়াল ব্যাপার। 'মুখপোড়া

মিন্‌সে' সাতজন্মে যদি ঘরে ঢোকে। হয় আপিস, নয় এই হাপরখানা। রাত্তিরে শোবে তো সেই চলনে—একখানা কাঠের বেঞ্চিতে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সমান ব্যবস্থা। শীতে দয়া ক'রে একখানা কাঁথা গায়ে দেয়, এই বোধ হয় মহার বাবার ভাগ্যি। যুদ্ধের বাজারে হাতে দু পয়সা আসতে মেজকর্তা বাড়িতে ধুনুরি ডেকে জনা-জাত লেপ তৈরী করিয়ে দিয়েছে—মায় ছেলেপুলের সুদ্ধ। তৈরী হয়েছে ওর জন্যেও কিন্তু এক দিনও কি গায়ে দিলে সে লেপ? এক দিনও না। সেবার পৌষ মাসে বর্ষা হয়ে হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছিল—এক দিন রাত্রে শুয়ে মহাশ্বেতার মায়া হ'ল—সে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজে নিজেই লেপখানা এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিলে। সকালবেলা দেখে—মাগো, মনে হলে এখনও গালে, মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে ওর—সেখানা পাট ক'রে কখন শাশুড়ীর দোরের সামনে রেখে এসেছে, নিজে সেই কাঁথামুড়ি দিয়েই শুয়ে আছে! ভাগ্যিস ভোরে ওঠে মহাশ্বেতা—ও-ই আগে দেখেছিল, নইলে শাশুড়ী ঠিক লেপখানা বাজেয়াপ্ত করতেন—আর প্রথম সুযোগেই বড় মেয়ের বাড়ি চালান ক'রে দিতেন। সেই থেকে নাক-কান মলেছে মহাশ্বেতা, ওকে আর কোন স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা সে করে না। নষ্ট হোক দুষ্টু হোক—মেজবৌ কথাগুলো বলে ঠিক ঠিক। বলে, 'ভোগ করারও বরাত থাকা চাই, বুঝলি দিদি। বট্‌ঠাকুর গত জন্মে কি প্রাণে ধরে কাউকে কিছু দিয়ে এসেছিল যে এ জন্মে ভোগ করবে!...ওরা কষ্ট করতেই জন্মেছে। গেল জন্মের পাপের সাজা!'

ঘরের ঢলাঢলি নিয়ে অভয়পদকে ইঙ্গিত করার সাহসটাও এক দিনে হয় নি মহাশ্বেতার। মেজবৌয়ের অনেক বাড়াবাড়ি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অনেক সাহস। কতকগুলো জিনিস যে সম্ভব তা-ই জানা ছিল না মহাশ্বেতার। প্রথমটা চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'ত না। ভয় হ'ত প্রমীলার জন্যই। এতটা সহ্য করবে না কেউ, এতটা ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস। মাথার ওপর ধর্ম তো আছেন। ভগবান এর সাজা দেবেনই ওকে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। ভগবানও যেমন প্রকাশ্যে কোন সাজা দেন না, তেমনি গুরুজনরাও না। কানাকানি গা-টেপাটেপি করেন অনেকেই—তবু মুখ ফুটে প্রমীলার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না। এমনই দাপট তার যে সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন সবাই কেঁচোটি হয়ে যান। আসলে ওর ক্ষুরধার রসনাকেই সবাই ভয় করে—মুখে কিছু আটকায় না কিছু

বলতে যিনি পারতেন—যাঁর বলার অধিকার সর্বাগ্রে—তিনিই যে কিছু বলেন না। ক্ষীরোদা যেন বুড়ো হয়ে আরও ভীতু, আরও জবুথবু হয়ে গেছেন। বেশী ভয় তাঁর মেজছেলে আর মেজবৌকেই। আহা, দেখলেও দুঃখ হয় মহাশ্বেতার—ইদানীং কাউকে কিছু দেবার ইচ্ছে হলে কি খেতে ইচ্ছে হলে আড়ালে অভয়পদকে বলেন, এদিক ওদিক দেখে—কেউ কাছে না থাকলে। অথচ ভয় যে কাকে তা বোঝে না মহাশ্বেতা। বড ছেলে আর বৌ যখন মান্য করে তোমাকে তখন, এত ভয় কেন? তাও—এই তো সেবার, মুখ ফুটে বলেছিলেন মেজ ছেলেকে অনন্ত চতুর্দশীর ব্রতর কথা—তা কৈ অম্বিকাপদ তো দ্বিরুক্তি ক'রে নি। ব্রত উদ্‌যাপনে বাবোটি বামুন খাওয়াবার কথা, রীতিমত বাডিতে ভিয়েন ক'রে দেড শ' লোক খাইয়ে দিল। তবে?

এই তবেটাই বুঝতে পারে না। আড়ালে গজগজ করে শুধু।

তাও প্রমীলার যে খুব দোষ তাও তো দিতে পারে না মহাশ্বেতা। সেই যা ফুলশয্যার রাত্রে 'ধাষ্টামো' করেছিল--খুবই 'গর্হিত্ কাজ' সন্দেহ নেই (মহাশ্বেতার ও্যা দু-একটি সংস্কৃত সাধুশব্দ জানা আছে এই গর্হিত শব্দটি তার মধ্যে অন্যতম, যদিচ উচ্চারণ করার সময় সে অকারণে একটা হসন্ত দেয়)--তবু তার পরে সে আব ছোটকর্তাদেব ধারে কাছে যায় নি। বরং ছোট বৌকে নিজে ভাল ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছোটকর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিত। দোষ ষোল আনা দুর্গাপদরই—এটা মহাশ্বেতা স্বীকার করতে বাধ্য। বিয়ের আট দিন কোনমতে শুয়েছিল ছোট বৌয়েব সঙ্গে, তার পর বৌ বাপেব বাড়ি যেতে গোনা দুটো কি তিনটে দিন শ্বশুববাড়ি গিয়েছিল কিন্তু প্রথম দিন ছাডা রাত্রে থাকে নি এক দিনও। তার পবে দ্বিরাগমনের পরই কী হ'ল—ছেলে কিছুতে বৌয়েব কাছে শোবে না। আবার বলে কিনা—'অত কালো আমার ঘেন্না করে।' সেই যে ছেলেবেলায় দাদা পডত কথামালা না কিসের গল্পে আছে—মন্দ লোকের ছুতোর অভাব হয় না—এ-ও তাই!. আসলে ওর মনে আছে অন্য কথা—মন পড়ে আছে অন্যখানে!

তা যাক। বেটাছেলে একটু এদিক-ওদিক চন্‌মন করেই—বয়সকালে নানা-রকমই করে থাকে কিন্তু তাই বলে ঘরের বৌকে কে এমন ত্যাগ করে? 'কত রকম কল্লাই জানে ছোটকর্তা!' মনে মনে গজরায় মহা, 'ওসব কল্লা! আমি বেশ বলতে পারি, ও মাগীর সঙ্গে বড় আছে দস্তুরমত!'

বাস্তবিক অসৈরণ হবারই কথা।

রোজ রাত্রে শোওয়া নিয়ে এক কেলেঙ্কারি। বাবু ঘরে শোবেন না বৌয়ের

কাছে। বৌ শুতে যাবার আগেই ছেঁড়া মাদুর আর বালিশ নিয়ে ছাদে দৌড়বেন। মেঘ বৃষ্টি হ'ল তো রান্নাঘরের দাওয়ায়। এক দিন মেজবৌ মাদুর লুকিয়ে রেখেছিল সবগুলো—সে বাবুর তেজ কত—বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে গিয়ে পেতে শুয়েছিলেন ছাদে।

তা তো নয়—আসলে ওটা মেজবৌকে সুযোগ দেওয়া।

মেজবৌ অমনি সেই রাত্তিরে ছুটবে ছাদে—কী সমাচার না 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে যাচ্ছি।'

তার পর দুপুর রাত পর্যন্ত ছাদে চলবে—মহাশ্বেতার ভাষায়—'দুপুরে মাতন।' কী যে ওদের এত কথা তা সে বোঝে না—শুধু হা-হা হি-হি হাসি আর ফিস্‌ফিস্ গল্প। যে শাসন করতে যাচ্ছে তার এত হাসি-মস্করা কিসের? আর রোজ রোজ এত বুঝোবারই বা কি আছে কি? এ কী কচি খোকা? একই তো কথা- রোজ নতুন ক'রে সেটা আওড়ালেই কি নতুন কথা হয়? এক-আধ দিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আড়িও পেতেছিল মহাশ্বেতা- তা শুনবে কি, নিজেরই এমন বুক ঢিপঢিপ করে যে তার আওয়াজে কিছু শোনাই যায় না। শুধু ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ আর মধ্যে মধ্যে ঐ হাসি। তাই কি ছাই নিশ্চিন্দি হয়ে দাঁড়াবার উপায় আছে? হতভাগা ছেলেমেয়েরা ঠিক সময় বুঝে তখনই উঠবে, কাকে মোতাও, কাকে দাঁড়াতে চল বাগানে—এই সব।

রোজ এই ঘটনা। দুপুরে মাতন শেষ ক'রে দুজনে নামবে। মেজগিন্নী চাপা হাসির লহর টেনে শুতে যাবে, ছোটকর্তা গিয়ে সুড় সুড় ক'রে সেঁধোবে নিজের ঘরে। তবু কিন্তু আধিক্যেতার সেইখানেই শেষ নয়—কত ঢং যে জানে ছোঁড়া! ঘরে ঢুকবে, যোদ্দা বিছানায় শোবে না—ঢালা বিছানা ক'রে দিয়েছে মেজকর্তা রীতিমত গদিবালিশ দিয়ে—সেখানে শোবে বৌ—উনি শোবেন মেঝেতে মাদুর পেতে কিংবা অমনি। প্রথম প্রথম ছোট বৌও শুতে আসত মাটিতে, সে বাবুর প্রচণ্ড ধমক—'যাও, ওপরে গিয়ে শোও বলছি! নইলে আমি আবার বেরিয়ে যাব!'

ছোট বৌ তরলার এইতেই বেশী আপত্তি।

আহা চোখের জল শুকোয় না বেচারার—একটি দিনের জন্যও।

হোক কালো রং, চেহারাটা ওর মহাশ্বেতার কোন দিনই পছন্দ হয় নি এটাও ঠিক—তবু মেয়েটা যে খুব ভাল তা যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছে সে। ভারি লাজুক আর শান্ত। গতরও তেমনি। ভোরে উঠে সেই যে গাধার মত

খাটতে শুরু করে—রাত এগারোটার আগে এক দণ্ড বিশ্রাম নেয় না। সকলকার মুখে মুখে ছিষ্টি যোগান দিচ্ছে। ঐ ছোটকর্তারই কি কম কৈজত। বাবুর আবার এদানিস্তে এক নোংরা নেশা হয়েছে নস্যি নেওয়া—নিত্যি একরাশ ময়লা রুমাল কাচতে দিয়ে যাবে। মায় জুতোয় কালি দেওয়া পর্যন্ত শিখেছে ছোট বৌ। বলে ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক কাটবার গোসাঁই! কেন রে বাবু, তাকে যদি তোর পছন্দ নয়, যদি নিবিই না ঘরে—তো অত ফরমাশ করিস কোন্ লজ্জায়? ঘেন্না করে না পরের মেয়েকে অমনি ক'রে শুধু ঝিয়ের মত খাটাতে?

ছোট বৌও তেমনি, মুখ বুজে সব করবে। একটা কথাও শোনাতে পারে না। হ'ত মেজ বৌয়ের মত মেয়ে তো দেখিয়ে দিত মজা। এ মেয়ে খালি কাঁদতে জানে আর খাটতে জানে। দুপুরবেলা অবধি শোয় না একটু। সব চুকল তো শাশুড়ীর পা টিপতে বসল, নয়তো এসে মহাশ্বেতার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ল। এমন কি কোলেরটার নোংরা ব্যাপারগুলো পর্যন্ত সে-ই উদ্ধার করে।

তরলার কাছে এ অবহেলাটা বড় প্রশ্ন নয় তার কাছে সব চেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে অপমানটাই। চুপ ক'রেই কাঁদে—কিন্তু এক-আধ দিন, বোধ হয় মুখ না খুলে পারে না বলেই ওর কাছে দুঃখ করে 'দিদি, সে-ই মেঝেতে শোয়, আমি তো মেনেই নিয়েছি তবে শুধু শুধু আদ্ধেক রাত পর্যন্ত এ কেলেঙ্কারি কেন। পাড়াসুদ্ধ লোক জানাজানি. টিটিক্কার! কী লাভ হয় এতে বলতে পারেন? সবাই রোজ জানছে একবার ক'রে যে বৌটাকে ওর বর নেয় না। নিতে চায় না—ঘেন্না করে!'

আর একটা বড় ক্ষোভ ওর—মেজ বৌয়ের ঐ অভিনয়টা। প্রত্যহ সন্ধ্যের সময় সাজাতে আসাটা। সত্যি বড় ভাল মেয়ে তরলা তাই, নইলে মহাশ্বেতা হলেও বোধ হয় এক চড় কষিয়ে দিত কোন দিন। জানিস তো তুই এ সাজের দিকে দুর্গাপদ কোনদিন ফিরেও তাকাবে না, তবে শুধু শুধু এ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন! জোর ক'রে ধরে সাজানোও চাই অথচ অর্ধেক রাত পর্যন্ত নিত্যি তার বরকে আগলে রাখাও চাই।

ছি! ছি! ঘেন্নায় মহাশ্বেতার গলা পর্যন্ত তেতো হয়ে ওঠে যেন। তাই এক-একদিন নিজের স্বামীকে অন্তত না শুনিয়ে পারে না। কিন্তু শোনালেই বা কি—এরা কি মানুষ! যেমন উনি তেমনি মেজবাবু। 'এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার!'—অন্ধকারে ঘরে শুয়ে শুয়ে অথবা নির্জন পুকুরঘাটে বসে আপনমনেই হাত-পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'এরা কি মানুষ! কেউ মানুষ নয়। মানুষের রক্ত গায়ে থাকলে—পুরুষ-বাচ্ছা হলে এ কেলেঙ্কার কিছুতে সহ্য করত না!'

স্ত্রীকে যা-ই বলুক, সত্যিই কিছু হাল ছেড়ে বসে ছিল না অভয়পদ। ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর নিচ্ছিল নানা দিকেই। অবশেষে একটা খবর নিয়েও এল এক দিন, কিন্তু ওর প্রস্তাব শুনে হেম অবাক হয়ে গেল। বক্তব্যটার মর্মোদ্ধার করতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তার।

সকালবেলা বড ভাগ্নে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল। হেম যেন বাড়ি থাকে, সন্ধ্যা-বেলা অভয়পদ আসবে। অবশ্য খবর দেওয়ার দরকার ছিল না, কারণ এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসবার পর থেকে, বিশেষ কাজ না থাকলে হেম কোথাও যায় না। শুধু অনেক ফল জমলে কি কলার কাঁদিতে রং ধরলে শ্যামা জোর করে পাঠায় কল-কাতাতে—তা না হলে সে বাড়িতেই বসে থাকে—বাগানের তদ্‌বির-তদারক করে।

দরকার না থাক, খবরটা পাওয়া অবধি হেম একটু আগ্রহের সঙ্গেই অপেক্ষা করছিল তখনও। এ খবরের সঙ্গে নিজের চাকরির কোন যোগাযোগ কল্পনা করে নি। তবে অকারণে লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে বলবার লোক নয় অভয়পদ এটা সে জানে। তাই কৌতূহলের শেষ ছিল না তার—হয়তো একটু দুশ্চিন্তাও ছিল। কোন বিপদের খবর নয় তো? তরুর বিয়ের খবরও হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে তো মা রয়েছে—তার কাছে কেন?

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। সেদিন কোন্ সাহেবের রিটায়ারমেণ্ট উপলক্ষে একটু আগেই ছুটি হয়েছিল—সুতরাং চারটে বাজবার আগেই মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের আড়ালে সেই বিবর্ণ হ'য়ে যাওয়া অদ্বিতীয় ছাতাটির উদয় হল।

ছাতাটি পেতে দাওয়াতে বসে বিনা ভূমিকাতেই একেবারে কাজের কথা পাড়ল অভয়পদ। হরিনাথের ভাই শিবু দাদার অফিসে ঢুকেছে—লিলুয়ার কারখানায় চাকরি করে। ওখানকার এক সেকশনের বড়বাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রে ইতিমধ্যেই সে এস্টাব্লিশমেণ্টে চলে গেছে। তাকে ধরলে এখনই কাজ হতে পারে একটা।

কথাটা শুনে প্রথম কিছুক্ষণ মুখে কথা যোগাল না হেমের। শিবুর কাছে যাবে সে চাকরির জন্যে! শিবু!

অনেকক্ষণ পরে যখন কথা বলতে পারল—তখন ঐ প্রশ্নটাই বেরোল, 'শিবুর কাছে যা চাকরির জন্যে! এত কাণ্ডের পরে? কী বলছেন!'

'কেন, তাতে অসুবিধেটা কি?' স্থির অবিচলিত মুখেই পাল্টা প্রশ্ন করে অভয়, 'তোমরা তাদের তো ক্ষতি কর নি কিছু, বরং উপকারই করেছ। তোমরা নিয়ে না এলে ভাজ-ভাইঝিকে পুষতেই হ'ত তাদের—যা হোক ক'রে ভাইঝিটার বিয়েও

দিতে হ'ত। মুখে যত যাই বলুক—পাড়াঘরে মুখ দেখাতে পারত না নইলে। তা ছাড়া—ধর এখানে এনেও বোনকে দিয়ে তোমরা নালিশ-মকদ্দমা করাতে পারতে—অত বড় শক্ত অসুখের ভেতর সই করিয়ে নিয়েছে দলিলে—সেটা আদালতে কতখানি টিকত তা বলা কঠিন। তোমরা তো কিছুই কর নি—ঝগড়াঝাঁটি মামলা-মকদ্দমা। তবে আর তোমাদের লজ্জাটা কি বাপু?'

যুক্তি অকাট্য কিন্তু এভাবে ভেবে দেখে নি কোন দিন হেম। ভাবতে অভ্যস্ত নয়। সে বিমূঢ়ের মত বসে রইল অভয়পদর মুখের দিকে চেয়ে।

তখন শ্যামাকে ডেকেও কথাটা বলল অভয়।

শ্যামাও প্রথমটা প্রবল আপত্তি ক'রে উঠেছিল, 'না না। ঐ ছোটলোকদের কাছে যাবে মাথা হেঁট ক'রে চাকরির জন্যে! ছিঃ! তার চেয়ে ও চিরকাল শাঁকে ফু দিয়ে খায় সে-ও ভাল।'

'দেখুন, সে আপনাদের যা অভিরুচি। তবে চাকরির জন্যে, টাকার জন্যে মানুষ অনেকখানিই নিচু হয়। আপনারা একটু আশ্রয়েব জন্যে তো কম অপমান হন নি সরকারদের কাছে। অথচ এখন তো তাদের সঙ্গে দিব্যি সদ্ভাব। যাওয়া-আসা সবই আছে। তা ছাড়া দেখুন ছোটলোকমি তারাই করেছিল—আপনারা তো করেন নি।…আর শাঁকে ফুঁ—সে ওখানে থাকলে যাও বা হ'ত—এখানে আপনারা নতুন এসেছেন, এখানে আপনার ছেলেকে যজমানি দেবে কে? আপনাদের নামই হয়ে গেছে নতুন বামুন। পুরনো পুরুতও আছে। এই তো এতদিন ঘরে এসে বসে রয়েছে, ক পয়সা আনতে পারল?…যাই হোক, ভেবে দেখুন আপনারা!'

বলতে বলতে একেবারে উঠে দাঁড়াল অভয়পদ।

মা-ছেলে দুজনেই হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। হেম হাত ধরে টেনে বসাল, শ্যামা ছুটে গেল ঘরে জলখাবার আনতে। জামাই অফিসের ফেরত আসবে খবর পেয়ে সে গুড় দিয়েই চন্দ্রপুলি ক'রে রেখেছিল, আর ক্ষুদ-ভাজার নাড়ু। তার সঙ্গে দুটো পাকা কলা কেটে জামাইয়ের সামনে সাজিয়ে দিলে।

অগত্যা অভয়পদকে বসলে হ'ল।

আবারও কথাটা উঠল।

প্রথম প্রথম যতটা অসম্ভব ব'লে মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা—ক্রমশ আর ততটা অসম্ভব রইল না। প্রথম মাথা ঠাণ্ডা হ'ল শ্যামারই। রেলের চাকরি পাকা চাকরি। না হয় শত্রু হাসবে একটু প্রথম প্রথম। ভাল চাকরি

আজকাল অত সোজা নয়। চাকরি পাবার সময় একটু মাথা হেঁট করতেই হয়। তার পর অত বড় অফিসে কে কোথায় থাকবে! কে-ই বা মনে রাখবে কথাটা!

'কিন্তু গেলেই কি ক'রে দেবে? মিছিমিছি সেই মুখ পুড়িয়ে যাওয়া ছোট-লোকদের কাছে!' তবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে শ্যামা।

'তা বোধ হয় দেবে। শিবু ঠিক ওর মায়ের মত নয়। পথে যখনই দেখা হয় —আসা-যাওয়ার সময়—ভাইঝির খবর নেয়, আপনাদের কথাও জিজ্ঞাসা করে। তা ছাড়া হাজাব হোক ছেলেমানুষ—বাহাদুরি দেখাবার লোভও তো একটা আছে!...ববং এক কাজ করা যেতে পারে। শনিবার হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা হতে পাবে। কোন্ ট্রেনে ফেরে তা আমি জানি। কথায় কথায় চাকরিব কথাটা পেড়ে দেখা যেতে পাবে। তেমন বুঝলে তখন বাড়ি যাওয়া যাবে।'

তার পর একেবারে ছাতা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা হলে শনিবার একটার সময় ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো।'

হয়ত আর একটু আলোচনা করতে পারলে খুশী হ'ত এরা -একবার ব্যাকুল-ভাবে কী একটা বলতেও গেল শ্যামা, কিন্তু অনাবশ্যক বোধেই সে চেষ্টা আর কবল না। জামাইকে এত দিনে ভাল করেই চিনেছে। অকারণ·আলোচনা সে করে না। আর তার হিসেবে কথাও সে অনেক বলেছে, বৃথা এখন আর একটি কথাও কইতে রাজী হবে না।

॥ ৩ ॥

শিবুর ক্ষমতা বা সদিচ্ছা সম্বন্ধে অভয়পদ যতই যা বলুক না কেন —শ্যামার বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল। যারা নিজের বংশের বৌ আর মেয়ের সঙ্গে অমন শত্রুতা করতে পারে, মতলব এঁটে যথাসর্বস্বে বঞ্চিত করতে পারে—তাদের যে কোন রকম মনুষ্যত্ব আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না ওর। শুধু-শুধুই শত্রু হাসাতে যাওয়া হয়তো। শত্রু হাসানোও বড় কথা নয়—যাদের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না ইহ-জীবনে তাদেরই দোরে গিয়ে 'কালামুখ নীলে ক'রে' দাঁড়ানো।—এর চেয়ে সত্যিই যেন গলায় দড়ি দেওয়াও ভাল। নিতান্ত নাকি ছেলের নামে একটা কালি থেকে গেছে, তাও পাস-কবা ছেলে নয়—বয়সেরও গাছপাথর নেই—এই ভেবেই বিদ্রোহী মনকে শান্ত করে শ্যামা। এখনও যদি চাকরিতে না ঢোকে তো কবে কি হবে? এমনিতেই তো সরকাররা যখন-তখন বলে 'ওর আর চাকরির বয়স নেই বামুনদি, মিথ্যে ও চেষ্টা করো না। বরং কোনও দোকানে খাতা লেখার কাজ-টাজ দেখ,

গে, হাতের লেখাটা ভাল—হয়ে যেতে পারে। তবে তাও যে পাবে বলে মনে হয় না, যা চোর-বদনাম রটে গেছে!'

এই সব কথা মনে পড়েই চুপ ক'রে যায় শ্যামা।

কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় অভয়পদর হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। শিবু সম্বন্ধে তার অনুমান অভ্রান্ত। সত্যিই সে অসাধ্য সাধন করলে। মাস দেড়েকের চেষ্টাতেই অফিসে বসিয়ে দিলে সে। কেরানীরই চাকরি—কারখানা বলে লোহা-পেটানোর কাজ নয়, যদিচ তখন যা হেমের মানসিক অবস্থা, লোহা-পেটানোতেও খুব আপত্তি ছিল না। মাইনেটা অবশ্য যৎসামান্য—মাসে আঠারো টাকার মত—তবে এ মাইনে বেশীদিন থাকবে না, শিবু বার বার বেশ জোর দিয়েই সে ভরসা দিয়েছে। কোনমতে খাতায় নামটা একবার ওঠা নিয়ে কথা, তার পর একটু ভাল জায়গায় সরিয়ে দিতে কতক্ষণ।

সে যা হোক, মাইনে নিয়ে শ্যামা মাথা ঘামায় না—চাকরি একটা হয়েছে এইতেই সে খুশী। রেলের চাকরি লোককে বলতে কইতে, বিয়ের বাজারে ছেলের দাম উঠে গেল।

কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা এখন ভাবলে চলবে না তা শ্যামা জানে। ছেলের বয়স যতই হোক—বেটাছেলের বিয়ের বয়স পার হয় না কখনও—মেয়েকে নিয়েই এখন তার বড় সমস্যা। তরুকে আর কোনমতেই রাখা যায় না ঘরে। যা হোক ক'রে এবার পার করতে হবে। পাড়াঘরের লোক এখানকার ভাল তাই—অন্য জায়গা হলে হয়তো একটা দুর্নাম তুলে দিয়েই বসে থাকত।

শ্যামা অবশ্য ঠিক ছেলের চাকরির জন্যে বসে ছিল না। টাকা, এই বলতে গেলে বিনা আয়ে সংসার চালিয়েও, কিছু জমেছে তার। উমার কাছে যে ফল পাঠায়—কিছুদিন ধরেই তার দাম নিচ্ছে না সে। বলে দিয়েছে, 'তোর কাছেই রেখে দে, যা হোক ভিক্ষে-দুঃখু ক'রেও চালাব আমি ঠিক—এইটেই আমার ভরসা রইল। একেবারে শুধু হাতে কিছু মেয়ের বিয়ে হবে না, আর সবটাই জামাইয়ের ওপর ভরসা করা ঠিক নয়।'

জামাই টাকা দেবে তা সে জানে। এবার নিতেও তার খুব সংকোচ নেই—কারণ সে এমনি নেবে না, ধারই নেবে। ধার শোধ করতেও পারবে এ বিশ্বাস তার এখন হয়েছে। এর ভেতর সে রোজগারের আর একটা উপায় বার ক'রে ফেলেছে। এখানে চার আনা আট আনা এক টাকা ধার করবার লোক ঢের।

থালা বাটি ঘটি বাঁধা রেখে ধার নেয়, টাকা মারা যাবার ভয় নেই, অথচ সুদ পাওয়া যায় ভাল। চার আনা আট আনায় এক পয়সা সুদ। এক টাকা হলেই দু পয়সা।

প্রথম প্রথম শ্যামা ফিরিয়েই দিত! সে এক যন্ত্রণা। নতুন বামুনদি এক রাশ নগদ টাকা দিয়ে বাড়ি কিনেছে অথচ তার হাতে চার আনা আট আনা পয়সা নেই এ কেউ বিশ্বাস করে না। আব 'নেই' বলতে—এবং সেটা বিশ্বাস করাবার জন্যে যতখানি জোর দিয়ে বলতে হয়, ততটা জোর দিয়ে বলতে নিজেবও সংকোচে বাধে। মাথাটা বড বেশী হেঁট হয়ে যায় যেন। তবু তাও করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই, কিন্তু তার পরই বুদ্ধিটা খুলে গেল। জামাই এক গাদা টাকা ধার দিয়ে রেখেছে—অম্বিকাপদব নাম করে দিলেও টাকাটা যে ওরই তা জানে—সুতরাং তার কাছে চাওয়া যায় না আর। অথচ আয়ের এমন পথটাও ছেড়ে দিতে মন সরে না। ছেলের রোজগাব নেই, সরকারবাড়ির বাঁধা-বরাদ্দ বন্ধ—তাব ওপর খরচ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। জামাইয়ের দেনা শোধ করতে হবে, সে তাগাদা না দিক, নিজের চক্ষুলজ্জা আছে। আগে আগে সে মনে করত যে চার আনা আট আনা পয়সা ধার করতে আসে অমনিই—চার আনার আবাব সুদ কি? দৈবাৎ এক দিন সুদের হারটা শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। মহাশ্বেতাকে ডেকে পাঠিয়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে তার কাছ থেকে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিলে—ধার হিসেবেই। যুদ্ধের বাজারে যখন অভয়পদর পকেট বোঝাই থাকত তখন মহাশ্বেতা টাকাটা সিকেটা সরিয়ে হাতে দু-চার টাকা করেছে তা শ্যামা জানে। ধার বলে চাইতে মহাশ্বেতাও ইতস্তত করে নি। তবে টাকাটা নিয়ে শ্যামা কি করবে তা মহাশ্বেতাও জানতে চায় নি—শ্যামাও বলে নি। ইচ্ছে ক'রেই বলে নি। ওর এই অবস্থায় টাকা ধার নিয়ে তেজারতি কারবার করতে চায়—কথাটা অত্যন্ত হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া এই টাকা খাটিয়ে রোজগার করবে সে—শুনলে মহাশ্বেতাও সে রোজগারের ভাগ চাইবে অর্থাৎ সুদ চাইবে। এমনি কথাটা মহাশ্বেতার মাথাতে যাবে না, সেদিক দিয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত। যার এক পয়সা আয় নেই- এতগুলি পেট খেতে—সে সুদে খাটাবার জন্যে টাকা চাইছে—এ মহাশ্বেতা কেন, কারুর মাথাতেই যাবে না।

সেই কুড়ি টাকা মূলধন খাটিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ক-টা টাকাই ক'রেছে শ্যামা। দুটো থলে বোঝাই হয়ে গেছে বন্ধকী বাসনে। চার আনা ধার দিলে মাসে এক পয়সা সুদ—অর্থাৎ টাকায় এক আনা। কিন্তু গোটা টাকা নিলে দু' পয়সার

বেশী পাওয়া যাবে না। শ্যামা তাই চেষ্টা করত চার আনা হিসেবে ধার দিতেই। আট আনা চাইতে এলে চার আনা দিত। .আবার চার আনা দিত হয়তো পরের দিন—আলাদা একটা বাটি কি একটা হাতা রেখে, এ দুটো মিলিয়ে আট আনার হিসেব ধরা হ'ত না—আলাদা আলাদা ঋণ হিসেবে পৃথক সুদ ধরে নিত। তাতে টাকা পিছু এক আনাই দাঁড়ায় মাসে .

এই সুদের প্রায় সবটাই জমে। খুব প্রয়োজন না হলে—অর্থাৎ একেবারে হাড়িচড়া বন্ধ না হলে এ থেকে খরচা করে না সে। তাব ফলে এক দিন হিসেব করে দেখেছিল যে মোট এখন তাব দেড শোব ওপব খাটছে এই কারবারে। বাসন বাধা রেখে কাববারের সুবিধা এই –বেশীদিন টাকা পডে থাকে না। পুরো মাস বাখে না প্রায় কেউই। দবকাবেব জিনিস, চার আনা আজ নিলে—কাল হয়তো জন-খেটে হোক কি কাকব বাগানে কাজ ক'রে হোক মজুরি পেলেই সতেরোটি পয়সা শোধ দিয়ে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ধার করতে আসে মেয়েরা—তাদেব হাতেব জিনিসে টান বেশী তারা পুরুষেব অসুবিধা থাকলেও জোর ক'রে আদায় কবে আনে ধারেব পয়সা। একবার সীতার শাশুড়ী একটা পাইজোর রেখে পাঁচ টাকা নিয়ে গিয়েছিল টাকায় তিন পয়সা সুদ কবুল ক'রে—আর এ-মুখো হয় নি। সুদে আসলে জিনিসের দাম ছাপিয়ে গেছে কিন্তু ঠিক বেচে-কিনে নিতে সাহসে কুলোয় নি শ্যামার—কে জানে এর পর এসে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা করে! সেই থেকে নাকে কানে মলেছে সে—পুরো এক টাকার বেশী ধার কাউকে দেয় না, বেশী চাইতে এলে চোখ কপালে তুলে বলে, 'তিন টাকা! ওমা অত টাকা কোথা পাব বাছা! তোমরা তো বেশ লোক, দেখছ গামছা-কানি পরে থাকি, সারা দিন পাতা কুড়িয়ে নারকোলপাতা চেঁচে পেট চালাই—তাব কাছে এসেছ তিন টাকা ধার চাইতে। মল্লিক-গিন্নীর কাছে যাও!' নয়তো বলে, 'চৌধুরীদের বড় বৌ থাকতে এখানে কেন এসেছ বাছা?'

চার আনা ক'রে ধার দিলে সাত দিনে উসুল হয়; তাতে—হিসেব ক'রে দেখেছে শ্যামা—গড়পড়তা এক টাকা খাটলে মাসে অন্তত পাঁচ পয়সা আয় হয়ই। তার মানে তিনটে টাকা খাটালে এক মাসে চার আনা—সে চার আনা আবার মাসে সওয়া পয়সা দিতে থাকে। বেশী লোভে কাজ নেই তার।

টাকার জন্য কৃচ্ছ্রতা বড় কম করছে না সে। আরও করতে পারত যদি ঐন্দ্রিলাটা একটু বুঝদার হ'ত। ওর বড়লোকের হাত হয়ে গেছে। ছেলেবেলা দিদিমার সংসারে ছিল, তার পর গিয়ে পড়ল ঘোষালদের ঘরে। সেখানে

ফেলাছড়ার মত অবস্থা না হোক—প্রাচুর্য ছিল। ফলে রান্না করতে দিলেই বিপদ—কিছুতে হাত-টেনে চলতে পারে না। পরিষ্কার মুখের ওপর বলে দেয়, 'ওসব ডেয়ো-ভোকলার রান্না কখনও শিখি নি, এখন আর শিখতে পারবও না। রাঁধতে হয় তুমি রাঁধ।'

রাঁধতে পারে শ্যামা—তার জন্য কিছু নয়। এত দিনের দারিদ্র্যই তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে, আদৌ তেল না দিয়ে বা মশলা না দিয়ে কেমন ক'রে রাঁধতে হয়। কিন্তু সে যদি ঐ নিয়ে থাকে তো এদিক করে কে? প তা কুড়নো, পাতা চাঁচা, বাগানের তদ্বির করা, সুদ কষা, তেজারতি, পাইকেরদের সঙ্গে নারকোল সুপুরি নিয়ে দরকষাকষি, টাকা আদায় - এক কথায় পুরুষের কাজ। তা ছাড়া বিনা বাজারে রান্না তা।, সকাল থেকে সুষুনি কলমি শাক তুলতে, ডুমুর পাড়তে, কি কাঁচকলা গুনে দেখে কাটতেই এক প্রহর বেলা কেটে যায়। সে ছাড়া এগুলো যে আর কেউ পারবে না। তরুকে আসতে দিতে চায় না, হয়তো রং ময়লা হয়ে যাবে রোদে পুড়ে মাটি ঘেঁটে। আইবুড়ো মেয়ে, চেহারা দেখিয়ে পার করতে হবে। হেম বাইরে থাকে, আর এক-আধ দিনের জন্যে এলেও এসব উঞ্ছবৃত্তি তার দ্বারা হয় না। বড় জোর বাগানের মাটিটা কুপিয়ে দিলে কি কলাঝাড়ের এঁটে মারলে। এই কাজগুলোই তার জন্য রেখে দেয় শ্যামা।

তা ছাড়া শ্যামা দেখেছে—কাজ নিয়ে থাকল তবু ঐন্দ্রিলা এক রকম থাকে বসে থাকলে অহরহ ঝগড়া। দিনরাত কাকচিল বসতে দেয় না একেবারে। তার সব চেয়ে বেশী রাগ যেন তরুর ওপর—কথায় কথায় শাপশাপান্ত করে। 'দেখব দেখব, তোর তেজই বা কদ্দিন থাকে। তেজ ভাঙবে, আমার মত হাত হবে, সর্বস্ব খুইয়ে তুইও পথে বসবি!' তরু শান্ত স্বভাবের মেয়ে – সে এই অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক আক্রমণের কোন জবাবই দিতে পারে না, শুধু চোখের জল ফেলে। শ্যামা দু-একবার শাসন করতে যে যায় নি তা নয়, কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে শুধু গালাগালিটা তরুর ওপর থেকে ওর ওপরই এসে পড়েছে। এমন অকথা-কুকথা বলে গালাগাল দেয় যে শুনলে কানে আঙুল না দিয়ে পারা যায় না। মেয়েকে নিয়ে হয়েছে ওর সাপের ছুঁচো ধরা, ফেলাও যায় না গেলাও যায় না।

সুতরাং রাঁধতেই দিতে হয়। আর তা নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। এক পয়সা করে তেল কিনতে পারলে হয় বটে—কিন্তু কে নিত্য দোকানে যায়? কান্তি নেই, পরের ছেলেটা সাত বছরের হয়ে মারা গেছে—এমন কেউ নেই যে বাজার-হাট করে। শেষে অনেক খেচাখেচির পর ঐন্দ্রিলাই এক ফন্দি বার করেছে,

বলেছে, 'তুমি বাবা তেলের শিশিতে দাগ কেটে দিও ওষুধের দোকানের মত। পাঁচ ছটাক তেল তো আসে যদি আট দিন চালানোরই মতলব হয় তো আটটা দাগ কেটে দিও—কি দশটা। যা পারি যেমন ক'রে পারি আমি ঐ দাগেই চালাব।'

মেয়ের মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা বুঝিয়ে বলাব চেষ্টা করে, 'তেল মোটে আগে দিবি নি। যেটুকু তেল দিবি তাতে আনাজ কষাও হবে না, মিছিমিছি তেলটা মাটি। আগে নুন বাটনা দিয়ে সেদ্ধ করে নিবি—পরে সুদ্ধ একটু ফোড়ন চোঁযানোর মত তেল ঢেলে সাঁত্‌লাবি। তাতে গন্ধটা তো হবে—তাতেই ব্যান্নন উত্‌রে যাবে দেখবি। বলি তেলের তো কোন স্বদ নেই—শুধু গন্ধ। যত শেষে দিবি তত গন্ধ ঠিক থাকবে। বুঝলি না? তবে লঙ্কাফোড়ন দিস্‌ নি কখনও—যেটুকু তেল তা হলে ঐ লঙ্কাতেই শুষে নেবে।'

মেয়ে হাত-পা নেড়ে বলে, 'মাইরি মা, তুমি একটা পয়সা বাঁচাবার ইস্কুল খোল। বিস্তর মেয়ে পাবে বলে দিচ্ছি! চার গণ্ডা ক'রে মাইনে নিলেও তোমার পয়সা খায় কে! মেয়েরা না আসুক, পুরুষরা জোর ক'রে ভর্তি ক'রে দিয়ে যাবে।'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে শ্যামা বলে, 'তা তো পারি খুলতে! অনেকেরই সুসার হয় তাতে, বুঝলি! বেশির ভাগই তো দেখি ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না—অথচ বাইরের ঠাট বজায় দিতে গিয়ে সব্বস্বান্ত। কেন বাবা, যেমন আয় তেমনি ব্যয় কর না—তাতে অশান্তি হয় না কিছু। তা তো নয়, কোতো নবাবিটুকু চাই ষোল আনা। বিশেষ দেখি মাগীদেরই নবাবি বেশী। আমি কম তেলে রাঁধতে পারি না—আমি আতেলা তরকারি মুখে দিতে পারি না—সুর টেনে টেনে আদিখ্যেতার কথা শুনলে বেম্ভাণ্ড জ্বলে যায় আমার। টাকা তো রোজগার করতে হয় না—কী কষ্টে আসে তা তোরা কি বুঝবি!'

॥ ৪ ॥

শেষ পর্যন্ত মঙ্গলার সেই সম্বন্ধই নিতে হয়। এদিকে ভাল ছেলে, কি এক বিলিতী সওদাগরী আপিসে কাজ করে, মাইনে চল্লিশ টাকা—উপরিতে ছুনো পুষিয়ে যায়। একটা পাসের পড়া পর্যন্ত পড়েছিল, পাসটা দিতে পারে নি। মা-বাপ নেই, আছে বুড়ী ঠাকুমা। বুড়ী বাপের বাড়ির দরুন বিস্তর জমিজমা পেয়েছিল, সে সবই আছে। হয়তো তা ছাড়াও নগদ টাকা কিছু আছে। বুড়ীর

আদরেই পাস দিতে পারে নি। ঘুড়ি উড়িয়ে ডাংগুলি খেলে কাটিয়েছে। তা হোক্—মাথা আছে। কথাবার্তা পরিষ্কার। পাত্র সব দিক দিয়েই ভাল। একমাত্র দোষ ঐ সতীনের। তা সে এমন কিছু নয়—বুড়ী লেখাপড়া করিয়ে সব দিক দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। সে বৌ আর তার বাবা দুজনেই সে নাদাবি-নামায সই ক'রে দিয়েছে—জমিটা পেয়ে তারা সব স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া এই তো মোটে তেইশ বছর বয়স—'তা এ বয়সে তো কত লোকের পেরথম পক্ষই হয় না, এই তো ধর্ না কেন তোরই ছেলে, দেখতে দেখতে যেটের কম বয়েসটি কী হ'ল। এর পর ওর কনেই পাবি না। তখন মিছে ক'রে বলতে হবে দোজবরে, নইলে লোকে ভাববে ছেলের কোন দোষ ছিল, তা না হলে অ্যাদ্দিন বে হয় নি কেন?'

বলেন আর অন্ধকার মুখগহ্বর বিস্তার ক'রে হাসেন হা-হা ক'রে।

শ্যামা এবার মন স্থির করে। কিন্তু তাও, এ সৌভাগ্যও যেন তার বিশ্বাস হয় না। বলে, 'এ কী আর আমার ববাতে হবে মা, কতটি হেঁকে বসবে তার ঠিক কি।'

'তুই রেখে বোস দিকি। সতীনের ওপর আবার খাঁই কি। খাঁই করলে চলবে কেন। হাজার হোক একবার দাগ তো পড়ে গেছে। দোজবরে এমন ফুটফুটে মেয়ে পাচ্ছে এই কত না। সে আমি বলে দিয়েছি বুড়ীকে মুখের ওপর। ওলো বামনী কে জানিস, আমার পিসতুতো নন্দাই দুকড়ি দত্ত, সে হ'ল বুড়ীর প্রেজা। ওদের বাড়িতে আসে পেরায়। সেইখানেই দেখা আমার সঙ্গে। কথায় কথায় কথা উঠল, বুড়ী বলে আমার হারানের জন্যে একটা ভাল মেয়ে দেখে দাও মা। আগে মনে পড়ে নি, বলেছিলুম কায়েতের ঘর হলে দু কুড়ি দশ গণ্ডা মেয়ে এনে দিতে পারতুম—এ যে বামুনের ঘরের মেয়ে চাইছ মা।...তার পরই মনে পড়ে গেল। সোন্দর মেয়ে শুনে বুড়ী বলেছে আমার এক পয়সা চাই নি। মেয়ে পছন্দ হলে দেনাপাওনার কথাই তুলব না। যা দেবে তাই নেব। তা তোর এখন থেকে অত ভাবনা কি, মেয়ে দেখা না আগে।'

শ্যামা একটু আশ্বস্ত হয়। মেয়ে ঐন্দ্রিলার মত রূপসী নয় ঠিকই—নাক চোখ-মুখ খুব একটা সাকাশাও নয় -তবে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় ভালই দেখতে। তা ছাড়া গৌর বর্ণটা আছে। সেখানেও হয়তো ঐন্দ্রিলার চেয়ে কিছু নিরেস -কিন্তু তবু করসাই যে তাতে সন্দেহ নেই। আর সর্বদোষ হরে গোরা।

'তাই তা হলে দেখাও মা। কবে কী হবে—আমি খবর পাব কী ক'রে?'

'খবর তোকে নিতে হবে না। আমি বুড়ীকে বলে দিয়েছি—সামনের রবিবার খোদ নাতিকে সঙ্গে ক'রে যাবে তোদের বাড়ি। নাতি ঢুকবে না,

ওখানে ঐ চৌধুরীপাড়াতেই ওর কে ফেরেণ্ড আছে, তার বাড়ি গে বসে থাকবে। বুড়ী যাবে। কেমন, ঠিক করি নি?'

নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই হেসে ওঠেন আবার হা-হা ক'রে।

তার পর বলেন, 'ভালয় ভালয় বে হয়ে গেলে ঘটকী-বিদেয় দিবি তো? ছাখ্—ভাল ঘটকী-বিদেয় কবুল না করলে ভাংচি দেব।'

'তোমার নাত্‌নীর বিয়ে—ঘটকী-বিদেয় আবার কি। নুন-ভাত যা জোটে খেয়ে এসো এক পেট।'

'তবেই হয়েছে।' পিঁটকী খন্‌ খন্‌ ক'রে ওঠে। ওর এই বয়সেই দাঁত পড়তে শুরু হয়েছে, কথা জড়িয়ে যায়। তাই গলায় জোর দিয়ে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। বলে, 'মা কি কোথাও খায় নাকি? খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো মা'র কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নোংরা। দেখছ না উঠোনের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাড়িয়ে আছে, অথচ কাপড় এখনও ভিজে, সদ্য গা ধুয়ে আসছে ঘাট থেকে। ঐ যে নতুন এক ঘর পিরিলী বামুন এসেছে এখানে, ওদের বৌ সেদিন দশটা টাকা ধার নিয়েছিল একটা নাকছাবি রেখে, মা গা ধুয়ে আসছে, সেই টাকা শোধ দিয়ে গেল। তা গেল তো গেল—সে তো আর অতশত জানে না—টাকাটা দিয়ে গেল হাতে হাতে ঠেকিয়ে—ব্যস্‌, আর রক্ষে আছে—এখন আবার পুকুরে যাবে, গলা অবধি ওলাবে, নোটখানা ধোবে—তবে ঘরে ঢুকবে।'

'নোট ধোবে কি!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে শ্যামা। দশ-দশটা টাকা—যদি নষ্ট হয়ে যায়! টাকা—তা সে যারই হোক—নষ্ট হচ্ছে শুনলে বুকে বাজে বৈকি!

'তবে না তো কি! ধোবে তার পর উনুনপাড়ে রেখে শুকোবে, তবে বাক্সয় তুলবে।'

'তুই থাম দিকি। হাটিপাটি পেড়ে সব কথা সবাইকে না শোনালে চলে না—না? বলে আহাম্মুক নম্বর চার—ঘরের কথা করে বার!'

মঙ্গলা রেগে গজগজ করতে করতে ঘাটের দিকে চলে যান।

শ্যামা বলে, 'তা ভিজে কাপড়ে ছুঁয়েছে তাতেও দোষ?'

'নিশ্চয়ই, কাপড়ের জলটা তো ওর ছোঁওয়া হয়ে গেল! পুষ্করিণীতে দোষ নেই—পিতিষ্ঠে করা বলে। কাপড়ে বয়ে আনলে দোষ জন্মায় বৈকি!'

পিঁটকী ম্লান হাসে। কারণ এটা তাদের পক্ষে—বিশেষ ক'রে তার পক্ষে আর কৌতুকের কথা নয়। এর ধাক্কা বেশির ভাগ তাকেই পোয়াতে হয়।

পাত্রপক্ষ তরুবালাকে দেখে পছন্দ ক'রে গেলেন। পাত্রের ঠাকুমা ভারি খুশী—তখনই আশীর্বাদ ক'রে যেতে চান। অতি কষ্টে নিবৃত্ত করে শ্যামা, ভাল দিন দেখে পাকা-দেখাটা করা দরকার। সিদ্ধেশ্বরীতলায় পাঁজি দেখিয়ে না এলে সে আশীর্বাদ করতে দেবে না।

হারানের ঠাকুমা বললেন, 'সে যা হয় করো মা, কিন্তু সামনের তিন মাস বে নেই যা করতে হবে এই মাসে। আমার এই ধর চার কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, শরীরেরও এই অবস্থা—কবে বলতে কবে টেঁসে যাব, তখন ছেলেটা একটু ভাত-জলের পিত্যিশী হয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে—তা হতে দোব না। মেয়ে আরও দু-একটা দেখে রেখেছি—অবিশ্যি পছন্দের মেয়ে নয় সে সব—তবে নাপায্যিমানে তাদেরই কাউকে নিতে হবে, অগত্যে। এই সাফ্ সাফ্ বলে দিলুম।'

এ মাস অর্থাৎ আর কুড়ি দিন বাকী। শ্যামার মুখ শুকিয়ে যায়।

কিছু দিতে হবে না—বুড়ী গিন্নী বলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন যে 'দানসামিগ্‌গিরী নমস্কারী যেন খারাপ না হয়। আমাদেরও তো পাঁচটা কুটুম্বসাক্ষেৎ আসবে, তাদের সামনে ব্যাভ্রম না হই। নগদ টাকাটা কেউ সিন্দুক খুলে দেখতে আসবে না, কিন্তু এসব সামনে থাকবে। লোকে না ভাবে এর নাতির বে হচ্ছিল না বলে কোনমতে হাভাতের ঘরের মেয়ে এনেছে।'

শ্যামা তখনই ছোটে সিদ্ধেশ্বরীতলায় দিন দেখাতে। এ মাসের শেষ বিয়ের দিন পড়ছে আর ঠিক বারো দিনের মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে বসবার কথা, কিন্তু মাথায় হাত কেন, মেঝেতে মাথা কুটলেও বিয়ে হবে না তা সে জানে। বুড়ী তিন মাস অপেক্ষা করবে না—তা তার গলার আওয়াজেই বুঝেছে সে, তা ছাড়া তিন মাস অনেক সময়, শ্যামাও সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যদি আরও ভাল মেয়ে পেয়ে যায় ওরা—অথবা মাঝারি মেয়ের সঙ্গে টাকার পাওনাটা ভাল হয়—তা হলে কি আর তখন ওর মেয়ে নেবে?

অথচ বারো দিন। কী ক'রেই বা কি হয়!

সেই রাত্রে হেমকে পাঠায় শ্যামা বড় জামাইয়ের কাছে। এক দেনা শোধ হয় নি, আবার দেনার প্রস্তাব পাঠানো—কথাটা মুখে উচ্চারণ করতেই লজ্জায় মাথা কাটা যায়—অথচ ওরই বা কে আছে ঐ অধম-তারণ জামাইটি ছাড়া!

অভয়পদর কোমরে একটা ব্যথা ধরেছে, সে আসতে পারলে না, কিন্তু হেমের মুখে সব শুনে বলে দিলে, 'মাকে ও সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে বারণ কর। যা হোক ক'রে হয়েই যাবে। ও ছেলেকে আমি জানি—প্রথম বয়সে বড় বকে গিয়েছিল,

কিন্তু এখন মন দিয়ে চাকরি-বাকরি করে শুনেছি, থিয়েটারের শখ খুব--তা নিজের বাড়িতেই ক্লাব বসিয়েছে, বাইরে কোথাও যায় না। নানা ঝঞ্ঝাটে ওর কথাটা এতদিন মনে পড়ে নি। ত ছাড়া—শুনেছি কী সব ফাঁড়া-টাড়া ছিল। অবিশ্যি যদি সে সব কেটে গিয়ে থাকে তো আর আপত্তি কি!'

শ্যামা পরের দিন ভোরবেলাই ছুটল কলকাতাতে। উমা নতুন বাড়িতে চলে আসার পর একবার মাত্র এসেছিল:সে গোবিন্দকে সঙ্গে ক'রে। বাড়ি ঠিক মনে নেই—তবু আগে দিদির বাড়ি গেল না ইচ্ছে ক'রেই। দিদির কাছে কান্নাকাটি ক'রে মোটা কিছু আদায় করতে হবে, উমাব কাছে জমা টাকা আদায় করতে যাচ্ছে শুনলে দিদির হাত গুটিয়ে আসবে।

উমা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলে। নিজে থেকেই বললে, থান দুই নমস্কারী সে দেবে। ওর ছাত্রীরা পূজোয় কাপড় দেয় কেউ কেউ—তা থেকে ভাল শাড়ি দুখানা তুলে রেখেছে সে তরুর বিয়ের কথা ভেবেই।

উমাব তখন রান্না চড়েছে। এখানে এসে রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা করে না—বাড়ি ফিরতেই আটটা-নটা হয়ে যায়, তখন উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসা পোষায় না। তা ছাড়া ঘুঁটে-কয়লা খরচের কথাও ভাবতে হয়। প্রথম প্রথম রুটি ক'রে রাখত, কিন্তু সকাল দশটার রুটি রাত দশটায় এসে চিবোতে রীতিমত কষ্ট হয়। এখন অনেকখানি ক'রে সাবু ক'রে রাখে। রাত্রে এসে দুধসাবু খায়। দুধসাবু—তার সঙ্গে ঘরে নারকেল নাড়ু করা থাকলে তাই দুটো- নইলে বাজার থেকে সস্তার মিষ্টি নারকোল ছাপা বা তিলকুটো কিনে আনে—তাই। শীতকাল হলে একটু তরকারিও রেঁধে দেয়।

শ্যামা যখন এল তখন উমার সাবু আর একটা তরকারি নেমেছে ভাত চড়াতে যাচ্ছে। ওকে দেখে একেবারে চালেডালে চড়িয়ে দিলে। ঘরে অন্য জল-খাবার ছিল না কিছু, অগত্যা দুধসাবুই এক বাটি ধরে দিলে ওকে—তার সঙ্গে দুটো তিলকুটো। তার পর নিজের তোরঙ্গ খুলে (মা'র দরুন তোরঙ্গ এটা—তার ভেতরই শ্যামা লক্ষ্য ক'রে, এখনও কেমন মজবুত আছে, সেকালের জিনিস, ওর দাম কত! উমিটা কত-কীই পেলে!) কাপড়ের তলা থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা-পয়সা বার ক'রে ওর সামনে দিয়ে বললে, 'ভাখ দিকি গুনে কত আছে। আমার গোনা-গাঁথা নেই। যেদিন যা পাই এনে ঐতেই রেখে দিই। হিসেবনিকেশ গোনাগাঁথার সময়ই বা কৈ, করেই বা কে।'

পুঁটুলির আকৃতিটা দেখেই শ্যামা যেন অনেকখানি দমে যায়। ওর যে

অনেক আশা এর ওপর। সে ব্যগ্র কম্পিত হাতে পুঁটুলিটা খুলে গুনতে বসে। টাকা, নোট, খুচ্‌রো—এক গাদা। কিন্তু তবু অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে এর মোট মূল্যের পরিমাণ ওর আন্দাজের চেয়ে অনেক কম।

বার বার তিনবার গোনে শ্যামা, ছিয়াশি টাকা সাত আনা।

'এ কী রে! আর?' ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে। যেন আর্তনাদের মত শোনায় প্রশ্নটা।

'আর কোথা পাব। তোমার যা ফলবেচা টাকা সব ঐতেই আছে।'

'সে কি! এ কী সব্বনেশে কথা রে! আমার যে ঢের বেশী পাবার কথা, আমি যে এর ওপর ভরসা ক'রে বসে আছি!'

'পাবার কথা!' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে উমার কণ্ঠস্বর, 'পাবার কথা তার মানে কি! কত পাবার কথা তুমি জানলে কী ক'রে? এর কি কোন লেখাপড়া হিসেবনিকেশ আছে?'

'ঠিক হিসেবনিকেশ নেই—তবু একটা আন্দাজ তো আছে। এত দিন নিই নি—এই কটি টাকা হবে কী ক'রে। তুই অন্য কোথাও রাখিস নি তো? মনে ক'রে গ্যাখ একবার বরং। ভুলে—কি এমনি—হাত-আজাড়ের অভাবে?'

মিনতির মত শোনায় শ্যামার গলা। কিন্তু তবু তার ভেতরেই যেন একটা অন্য ধরনের সন্দেহও কোথায় উঁকি মারে।

আর সেইটে লক্ষ্য করেই নিমেষে জ্বলে ওঠে উমা, 'বলছি এই সব হিসেবনিকেশের ভয়েই তোমার ফল-বেচা টাকা আমি কোথাও রাখি না—যত কাজই থাক, বাড়ি ফিরে আলাদা ক'রে রেখে দিই কাপড় কেচে এসে, শত কাজ ফেলে, এমন কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবারও আগে তোমার টাকা তুলে রেখে দিই। আর কোথাও থাকে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তা ছাড়া এই টাকাটাই কি সোজা—পনেরো-কুড়ি দিন অন্তর অন্তর তো হেম দিয়ে যায় চার-পাঁচটা পেঁপে সাত-আটটা নারকোল—তাতে এত হবেই বা কী ক'রে। কী এমন ন শো পঞ্চাশ টাকা দামের জিনিস ওসব।'

'চার-পাঁচটা পেঁপে আট-দশটা নারকোল ঠিকই—কিন্তু সেই কী সাধারণ জিনিস। তা ছাড়া ছড়া কলাও তো পাঠিয়েছি, ভাল কালীবৌ কলা আমার। যেমন মোটা তেমনি বড়, মোলাম কলা। একোটা-কল এক পয়সা আমার ওখানে বসে বিক্রি হয়!'

বলতে বলতে পেট-কাপড়ে বাঁধা তিন-চারখানা কাগজ বার করে শ্যামা। কান্তির ফেলে যাওয়া বাদামী কাগজের খাতা থেকে ছেঁড়া। তাইতে তারিখ

দিয়ে দিয়ে সে লিখে রেখেছে কবেকার চালানে কী কী মাল এসেছে। কটা পেঁপে কটা নারকোল কটা কলা। মাল আর তার পাশে একটা আনুমানিক মূল্য। সেটা যোগ দি'য় দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে দু শো টাকার মত।

কাগজগুলো উমার সামনে ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে বলে ওঠে শ্যামা, 'এই তো। হিসেব তো সামনেই রয়েছে, আমি কি আর বিনা হিসেবে এত কথা বলছি। এক শো বাহাত্তর টাকা হবার কথা—নিদেন দেড় শোও তো হবে। এত কম হয় কি ক'রে!'

উমার মুখ লাল হয়ে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি কাগজগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়েই ফেলে দেয় শ্যামার সামনে 'এ কী করেছ, সব পেঁপে গড়পড়তা তিন আনা হিসেবে দাম ধরে বসে আছ, সব নারকোল তিন আনা। তাই কেউ দেয়? ছোট বড় সব একদাম? বাজারে একটা মাঝারি পেঁপের দাম চার পয়সা—সেই জিনিসের কত দাম নেওয়া যায় বল। তাবাও তো বাজারে যায় রোজ—না কি? খুব বড় হলে—দেখাবার মত হলে সেটায় তিন কেন চার আনাও আদায় করা যায়। তাই বলে গড়পড়তা সব তিন আনা! আর নারকোল তুমি তো বেচছ সাড়ে তিন টাকা শ—পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সেই নারকোল এখানে কত দাম হবে মনে কর? বাজারে গিয়ে দ্যাখ বড় বড় নারকোল এক-একটা এক আনায় বিক্রি হচ্ছে। তার দেইনি আমি তবু ছ পয়সার কম নিই না কোনটা, খুব মিষ্টি মোলাম নারকোল--এমনি নানান বক্তৃতা দিয়ে গছাই। বড়গুলো দু আনা পর্যন্ত ধরি। তাও তোমার ফল তো ছোটই হয়ে আসছে ক্রমশ। দাতাব নারকোল বকিলের বাঁশ—তোমার নারকোল ছোট হবে জানা কথাই।'

হতাশ ক্ষুব্ধ মুখে বসে থাকে শ্যামা কিছুক্ষণ, তার পর রীতিমত বিরস কণ্ঠে বলে, 'কী ক'রে জানব বল, এই ফলই আগে আগে তুমি যে দামে বিক্রি করেছ সেই হিসেবেই আমি দাম ধরে রেখেছি। মেয়ের বে দিতে হবে, আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছি—সেই জন্যেই আরও এত হিসেব রাখা। কোথায় দাঁড়াচ্ছি সেটা বুঝতে হবে তো। এমন জানলে সভ্য সভ্যই নিয়ে নিতুম। তাতে ভুলচুক হবার অত পথ থাকত না। আমারই বোকামি—টাকাটা ওখানে সুদে খাটালে দশগুণ বেড়ে যেত। উল্টে এ কমেই গেল আসল থেকে!'

'তার মানে কি বলতে চাইছ পষ্ট ক'রে বল দিকি। আমি তোমার টাকা মেরে দিয়েছি—এই তো? চুরি করে খেয়েছি—না কি? বেশ তো, এতকাল ধরে ঘাড়ে ক'রে ক'রে ফিরিওলার মত বেচেছি তারও তো একটা দালালি-দস্তুরি আছে, মজুরি আছে। সেইটেই ধর না কেন।'

এবার শ্যামার হিংস্র চেহারাটা পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ে। সে সমান তালেই জবাব দেয়, 'সে নিলেও তো বাঁচতুম—তাতে এত যেত না। এ যে মূলেই হাভাত!'

উমাও আর সামলাতে পারে না। বলে, 'ইতর ছোটলোকদের সঙ্গে ঘর ক'রে ক'রে তুমিও ইতর হয়ে গেছ, তাই এমন কথাটা বলতে পারলে। আমার কী গরজ পড়েছিল এতখানি নীচু হয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ফল বিক্রি ক'রে বেড়াবার? এই সব ফলের যে এত দাম হতে পারে তা তুমি জানতে কখনও? তোমার ওধারের বাজারে কী দরে বিক্রি হয়? এ পথ দেখালে কে? সে প্রবৃত্তি যদি আমার থাকত তা হলে প্রথম থেকেই তো পয়সা সবাতে পারতুম। যে পেঁপে চার আনা পাঁচ আনায় বিক্রি করেছি এককালে, সে পেঁপের জন্যে তিন আনা দশ পয়সা দিলেও তুমি বর্তে যেতে! তোমার উপকার হবে বলেই তো করা। কারবার করছি জানলে নগদ কিনে নিয়ে কারবার করতুম—তাতে ঢের লাভ হ'ত! বেশ হয়েছে—উচিত শিক্ষা হয়েছে। তুমি যাও, কত টাকা তোমার চুরি করেছি ব'লো হিসেব ক'রে—একেবারে না পারি মাসে মাসে দিয়েও কড়াক্রান্তিতে শোধ ক'রে দেব। আর কখনও কিন্তু এ-মুখো হয়ো না। ফলও পাঠিও না।'

এবার শ্যামা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ভয়ও হয় তার। সত্যিই যদি ফল না এখানে পাঠাতে পাবে তো সিকি দামও পাবে না। অর্ধেক ফল বিক্রিই হবে না, ওখানে খদ্দের কোথা এত? আর বাজারে বসে বিক্রিই বা করতে যাচ্ছে কে?

অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলে, 'না, না। তাই কি আমি বলছি—তা বলছি না। ভুলও তো হতে পারে—তাই বলা। আমার বড্ড ভরসা ছিল কিনা, এই টাকাটা হিসেবে ধরা ছিল তাই। চুরির কথা কে বলছে—তোর সব উল্টো-পালটা কথা—'

বলে আর আড়ে আড়ে উমার পানে তাকায়। উমার মুখ অঙ্গার-বর্ণ হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি কঠিন। সেদিকে চেয়ে ভয়-ভয়ই করে শ্যামার। উমা কিন্তু আর জবাব দেয় না, কথাও বলে না। অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাকাগুলো আর একবার গুনতে বসে। এটাকাতে কিছুই হবে না ওর অন্তত এক শো টাকা পুরো হলেও কথা ছিল। দান সামগ্রী, বরযাত্রী খাওয়ানো—কন্যাযাত্রীও দু-চারজন বলতে হবে, নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে এসে এই প্রথম কাজ—তা ছাড়া বরের আংটি আছে, মেয়েকেও কোন্ না দুগাছা রুলি আর কানের একটা কিছু দিতে হবে। বড় জামাইয়ের জামাই-বরণের ধুতি চাদর দেওয়া আছে—একজন তো এ

দায় থেকে তবু অব্যাহতি দিয়ে গেল! তবে সে বেঁচে থাকলে এ বিয়ের দায়টা সম্পূর্ণ তার ওপরই চাপাতে পারত। বড় জামাইকে অবশ্য বরণের সময় একখানা গামছা দিলেও সে কিছু বলবে না - কিন্তু তা করতে চায় না শ্যামা। জামাইয়ের মত জামাই —সে যা করেছে ছেলেতেও তা করতে পারে না আজকাল। স্বামীপুত্র থেকে যে আশা করে নি, সেই আশা সে সফল ক'রে দিয়েছে, নিজের বাড়ি ক'রে দিয়েছে।

আবারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামা। উমা হেঁট হয়ে খিচুড়ি নাড়ছে। মুখটাও ভাল ক'রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তার। রাগ করছে বটে—কিন্তু এত তফাত কখনও হতে পারে না। অন্তত আরও পঁচিশ-তিরিশ টাকা কি ওর ন্যায্য প্রাপ্য নয়? নিজেকে রীতিমত বঞ্চিত বোধ করে শ্যামা। যে হিসেবে দাম পেয়ে এসেছে এত কাল, সেই হিসেবেই সে দাম ধরেছে মনে মনে—তবে এত তফাত কেন হবে?

নিজের মনকে শাসন করতে চায় শ্যামা, উমা ঠকাচ্ছে তাকে – এমন সন্দেহ যেন সে না করে, ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো ভুল ক'রে নিজে দু-চার আনা খরচ ক'রে ফেলেছে মধ্যে মধ্যে, মনে নেই। হয়তো আঁচলে করে নিজের পয়সাও নিয়ে গিয়েছিল, ফলের দামও সেই আঁচলে বেঁধেছে ফিরে এসে একসঙ্গেই নিজের বাক্সয় রেখে দিয়েছে। এমনও হতে পারে। সেদিক দিয়ে একবারও ভাবছে না উমা, কেবলই রাগ করছে।

কিন্তু তাতেই কি এত তফাত হয়! অবশ্য শ্যামাও হয়তো বেশী বেশী ধরেছে হিসেব। তবে তার জন্যে না হয় পঁচিশটে টাকা কম হোক! তাই বলে এত?

একটা কুটিল সংশয় তার মনের মধ্যে একটু একটু ক'রে মাথা তোলেই, কিছুতে তাকে দমন করতে পারে না শ্যামা।...

খিচুড়ি নামিয়ে ঠাঁই ক'রে নিঃশব্দেই তাকে খেতে দেয় উমা। নিজেও খেতে বসে। কিন্তু দুজনের কেউ খেতে পারে না। উমা নিঃশব্দ দহনে দগ্ধ হচ্ছে—তার আহারে রুচি থাকা সম্ভব নয়; আর শ্যামার এই টাকার শোক। বহু ছেলেমেয়ে মারা গেছে তার, সে শোকের মত না হোক, কাছাকাছিই এটা। তবু শ্যামা কোনমতে জোর ক'রে পাতের আহার্য শেষ করে, কিন্তু উমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। খানিকটা খেয়েই উঠে পড়ে।

তার পর তাকে দ্রুত কাজ সেরে নিতে হয়। বাসন-কোসন মেজে, উনুন নিকিয়ে রান্নার জায়গা ধুয়ে, একেবারে কাপড় কেচে আসে সে। এবার বেরোবে ছেলে পড়াতে। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, দুটোর মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

শ্যামা ইঙ্গিত বুঝে উঠে পড়ে। তাকেও দিদির ওখানে যেতে হবে। উমার

ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। কথা আছে কিছু কিছু বাজার সেরে হেমের সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। হেম পাঁচটার মধ্যে দিদির ওখানে পৌঁছবে।

কিন্তু কাপড় দুখানার কথা উমা আর উচ্চবাচ্য করছে না যে। সে দুটো পেলেও তবু অনেকখানি হয়। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শ্যামা বলে, 'হেমকে পাঠাব বরং রবিবার, শাড়ি দুটো তার হাতে দিয়ে দিস?'

'না দাঁড়াও। তুমিই নিয়ে যাও। হেমকে পাঠাতে হবে না।'

'হেম তো আসবেই। তুই এবার যাবি তো, তরুর বিয়েতে?'

'যাব না যে তা তুমি ভাল ক'রেই জান ছোড়দি। মিছিমিছি হেমকে তার জন্যে পাঠাতে হবে না।'

উমা মায়ের দরুন দেরাজটা খুলে শাড়ি দুখানা বার করে। তার পর মায়েরই ক্যাশবাক্সটা খুলে হাত্ড়ে হাত্ড়ে কতকগুলো টাকা পয়সা বার করে। সেগুলো একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শ্যামার সামনে ধরে দিয়ে বলে, 'এগুলো নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গুনে দেখো কত আছে। আর কত দিতে হবে চিঠি লিখে জানিও—আমি মাসে মাসে যেমন ক'রে পারি না খেয়েও শোধ দেব। তবে আমার তো ন শো পঞ্চাশ টাকা আয় নয়—খেয়ে-পরে সামান্যই বাঁচে, তার মধ্যে খাওয়াটা কমাতে পারি, তাই বাঁচিয়েই দেব।'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আমি কি তাই বলিছি? তুই বা দিবি কেন, আর আমার হিসেবই যে বেদবাক্যি তাই বা কে বলেছে। আমি একটা আন্দাজ ক'রে রেখেছিলুম এই পর্যন্ত। আমারও তো ভুল হতে পারে।'

উমা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, 'ভুল দুজনেরই হতে পারে। সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমার এ কাজ ঘাড় পেতে নেওয়া, আর তোমার ভুল হয়েছে বিশ্বাস ক'রে টাকাগুলো আমার কাছে ফেলে রাখা। নাও, এখন ওঠ দিকি—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শ্যামা একবার ওর মুখের পানে চেয়ে শুধু শাড়ি দুখানা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উমা আঙুল দিয়ে টাকাটা দেখিয়ে বললে, 'ওটাও নিয়ে যাও ছোড়দি—নইলে আপসোসের সীমা থাকবে না। চক্ষুলজ্জায় টাকাটা থুইও না। তা ছাড়া বিয়েটা তো দেওয়া চাই। টাকা যখন হিসেবে কমই পড়ল, তখন ওটা দিয়ে ভোক্তন ক'রে নাও। টাকা কুড়ির মত হবে বোধ হয়।'

শ্যামা রাগ ক'রে বলে, 'তোর দিন দিন বড় চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি হচ্ছে উমা। আমি কি বললুম আর তুই কি বুঝলি। ও টাকায় আমার দরকার নেই। মেয়ের

যে আমার অদৃষ্টে থাকে তো হবেই। তোর যদি দেবার মন থাকত তো এমনিই দিতে পারতিস—এভাবে আমি নিতে পারব না।'

'সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু নিলেই ভাল করতে। মনে মনে চিরদিনই আমাকে চোর ধরে রাখবে। তখন এটা না নেওয়ার জন্য হাত কামড়াবে শুধু শুধু।'

সে টাকাটা তুলে রাখে আবার। শ্যামা সেদিকে চেয়ে আর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে পড়ে।

টাকাটা পেলে একশো টাকা পুরো হ'ত এটা ঠিকই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এ টাকার লোভ সংবরণ করলে সে। যদি এর পর সত্যিই আর কিছু না বেচে উমা!

তা হলে একেবারে দাঁড়িয়ে লোকসান। হেম যা ছেলে, সে কিছুতেই বাজারে গিয়ে ওসব বেচতে পারবে না। আর বেচলেই কি এত দাম উঠবে? ওর অর্ধেকও হবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তরুর বিয়ে উপলক্ষে অনেকগুলো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। আর সে জন্যে তরুর ভবিষ্যৎ ভেবে শ্যামা বেশ একটু কণ্টকিত হয়েই রইল। মহাশ্বেতা যখন ওর কোলে এসেছে তখন সব চেয়ে দুর্দিন, তবু তার বিয়েই সব চেয়ে নির্বিঘ্নে এবং এখন দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে ভাল হয়েছে। ঐন্দ্রিলারও বিয়ের সময় অন্তত কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। ওর বরাত—নইলে ঘর বর সবই ভাল পেয়েছিল; কিন্তু তরুর বিয়েটা যেন কি রকম হয়ে গেল।

প্রথমত উমার সঙ্গে কাটান-ছিড়েন হয়ে যাওয়া।

সেদিন যখন নগদ কুড়ি-পঁচিশ টাকার মায়া কাটিয়ে চলে এসেছিল শ্যামা তখন ভবিষ্যতের কথাটাই বেশী ক'রে ভেবেছিল। উমা যে এমন কাণ্ডটা করবে তা সে একবারও ভাবে নি। এমন কি দু-তিন দিন পরে যখন কুড়ি টাকার একটা মণি-অর্ডার এল ওর নামে—তখনও ঠিক এতটা বুঝতে পারে নি। কুপনে লেখা ছিল—'তরুর আইবুড়ো-ভাতের জন্য যৎসামান্য পাঠালাম।' তাতেও ভেবেছিল যে

উমা একটু নরমই হয়েছে পরে—নইলে টাকাটা এভাবে পাঠাত না। · তা ছাড়া আইবুড়ো-ভাত তো তার দেওয়া উচিতই—না হয় কিছু বেশী দিয়েছে, সাহায্য হিসেবে।

তবু অস্বস্তি একটা ছিলই। তাই বিয়ের একদিন আগে হেম যখন বাজার করতে কলকাতায় গেল তখন তার হাতে জোর ক'রেই কয়েকটা নারকোল পাঠিয়ে দিলে সে। বাজারের জন্যে বস্তা ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল হেম—তার মধ্যে এগুলো নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা, আপত্তিও সে যথেষ্ট করেছিল—কিন্তু শ্যামা এক রকম অনুনয় বিনয় ক'রেই গছিয়ে দিলে। বললে, 'আমি বিয়ের কথা হচ্ছে বলে এসেছি, ঠিক নেমন্তন্ন সেদিন ক'রে আসতে পারি নি। একবার সেভাবে বলাও তো দরকার। দিদি যদি না-ও ·আসে, গোবিন্দ বৌমা যেন আগের দিন থেকে এসে থাকে, জোর দিয়ে বলে আসবি। আর উমা অবিশ্যি আসবে না কিন্তু তবু আমাদের কর্তব্য আসতে বলা। যাচ্ছিসই যখন, সেই ঝাড়নও নিয়ে যেতে হবে—এ-কটা বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা কি? ওখানে ঢেলে দিয়ে চলে আসবি, বয়ে তো বেড়াতে হবে না।'

কিন্তু হেম রাত্রে ফিরল মুখ কালি করে। মাকে প্রায় যাচ্ছেতাই করলে সে, 'তুমি এই কাণ্ড ক'রে বসে আছ। মাসী তোমার পয়সা চুরি করে! আর সেই কথা বলে এসে তিন দিন পরেই আবার তার কাছে মাল পাঠিয়েছ। কী রকম বেহায়া মেয়েমানুষ তুমি। ছি ছি। আমাকে ঘুণাক্ষরেও তো বল নি একথা—তা হলে কি এ গুখুরি করতুম। একেবারে অপদস্থের শেষ। তা-ও এটুকু বুদ্ধি হ'ল না যে ব্যাপারটা একটু জুড়ুতে দাও! ··তা না সাত দিনের মাথাতেই আবার সেইখানে মাল পাঠাতে গেলে। তোমার ভীমরতি হয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি।'

না, উমা নারকোল রাখে নি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে এ ভূতের ব্যাগার তার দ্বারা হবে না। বোন-বোনপো খেতে পাচ্ছিল না বলেই সে এতটা নীচু হয়ে ফিরিউলীর কাজ করেছে। আর তো এখন দরকার নেই। আর কেন? তা ছাড়া ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, .তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে—আর নয়। প্যাঁজ-পয়জার-গুণগার -এর মধ্যে আর সে নেই। হেম যদি এমনি যায় তো স্বচ্ছন্দে যেতে পারে—তাদের ভালবাসে উমা, কল্যাণই চায় কিন্তু এসব কেনা-বেচার ব্যাপারে যেন আর না যায়, তা হলে ওর ·দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এটা যেন মনে রাখে।

অগত্যা হেম সেই আট-আটটা নারকোল কমলাদের বাড়ি ঢেলে দিয়ে এসেছে। ওদের খেতে দিয়ে এসেছে। কী করবে, এত মালের মধ্যে ঐ বোঝা টেনে

বেড়াবে কে।···বেশী লাভের আশা তো গেলই—আসলেও টান। এখানে শ-দরে বেচলে তবু যে কটা পয়সা হ'ত—তাও গেল। বোন-বোনপো থাক—তাব জন্যে কিছু নয়, সে তো মধ্যে মধ্যে সে দেয়ও এক-আধটা—কিন্তু তারই বা এত খয়রাত করতে গেলে চলে কি ক'রে, ঐ কটা নারকোল গাছই তো ভরসা। নিজের নিবুদ্ধিতায় নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে শ্যামার—বেছে বেছে আজকের দিনই বা এত তাড়াতাড়ি করতে গেল কেন। ঘি-ময়দা-পাঁপর, এক গাদা কাঁচা বাজার, তার মধ্যে নারকোলগুলো বয়ে ফিরিয়ে আনা সত্যিই সম্ভব নয়। তাও হাঁদারাম ছেলে যদি 'এখন রইল পরে নিয়ে যাব' বলেও রেখে আসত। কী সমাচার—না, লজ্জা করে। এত লজ্জা কি তোদের মানায়, যারা মোটা টাকা রোজগার করে তারা লজ্জার কথা তুললে তবু সাজে।

এদিকে তো এই ওদিকে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল সরকারদের সঙ্গে। মাথার ওপর অভিভাবকের মত দাঁড়িয়ে থেকে উদ্ধার করিয়ে দেবেন'—একথা শ্যামাই বলে এসেছিল অক্ষয়বাবুকে। আর সত্যিই তার কে আছে, এক বড় জামাই, তা সে ওসব আদর-আপ্যায়ন-তত্ত্বাবধানের ধার ধারে না, নিজে ভূতের মত খাটতে পারে শুধু। তা ছাড়া সে তো ভিয়েনের কাছেই জোড় থাকবে—বলেই দিয়েছে যে, 'একজন শুধু বামুন ব্যবস্থা করো, যোগাড়ে দরকার নেই, আমিই যোগাড় দেব।' বড় জামাইয়ের বাড়ি, মেজ জামাই-বাড়িও বলতে হয়েছে—সদ্য সদ্য শিবু চাকরিটা করে দিয়েছে – সরকার-বাড়ি, তা ছাড়া বাড়ির ঠিক আশে-পাশে যারা আছে—বাড়ি-পিছু একজন ক'রে বলতে বলতেই পঞ্চান্ন-ষাটজন হয়ে গেছে। তা ছাড়া বরযাত্রীও আসবে কুড়ি-পঁচিশজন মোট—অর্থাৎ প্রায় এক শোর ধাক্কা। হালুইকর বামুন তাই এবার একটা ঠিক করতে হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাড় দেওয়া সহজ কাজ নয়, বড় জামাইকে অন্য কোন দিকে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং সরকারদের ওপরই ভরসা।

তা অক্ষয়বাবু এসেও ছিলেন, তদ্‌বির-তদারক করছিলেন যেমন করতে হয় তেমনিই। গোলমাল বাধল বরযাত্রী আসতে। বরের এক পিসেমশাই এসে-ছিলেন গাঁজাখোরের মত চেহারা, তেমনিই গলার আওয়াজ ··পরে শুনেছে শ্যামা যে লোকটা অতি হতভাগা, এদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও নেই, নিহাত মাথার ওপর একজনকে দাঁড়াতে হয় তাই আনতে বলেছিল বুড়ী দিদিশাশুড়ী,

—তিনি এসেই তম্বি শুরু করে দিলেন, 'এই দান—? দানের বাসন তো মশাই আপনাদের মেয়েই ভোগ করবে—তা ঐ ফুঁয়ে-উড়ে-যাওয়া বাসন কখানা না দিলেই পারতেন। ও আর কদিন। ও কি, বরের জুতো দেন নি?… গরদের পাঞ্জাবি দিয়েছেন তো? আংটি কৈ? সেটা একটু ভারী ভুরি দিয়েছেন, না কি সেও অমনি ফঙ্গবেনে? বন্ধু-বান্ধবের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তা হলে আমাদের হাবান।…ঘড়ি, ঘড়ি কৈ? ঘড়ির চেহারা তো দেখছি না। ও হরি, আপনারা তা হলে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে তোলাতে চান দেখছি…যা ছিরির ব্যবস্থা, মেয়েটাকেও শেষ অবধি ন্যাড়াবুচো বার করবেন নাকি? কী ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ও মশাই কন্যেকর্তা কে আছেন—একবার আসুন তো দিকি এধারে, গয়না গাঁটি মেয়েকে কী কী দিলেন বলুন তো।'

হেম চটে আগুন হয়ে উঠেছিল, শ্যামা অতিকষ্টে তাকে সরিয়ে দিলে। তারও বুক দুর-দুর করেছিল এ আবার কি কথাবার্তা। না জানি কি অঘটন ঘটে।

এগিয়ে গেলেন অক্ষয়বাবু, বললেন, 'আপনি কে তা তো জানি না—বরের অভিভাবিকা যিনি এসেছিলেন দয়া ক'রে, যাঁর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে—তিনি জানেন আমরা কিছুই দিতে পারব না। তিনি বার বার বলেও গেছেন কিছু চাই না তাঁর। এদের বলতে গেলে ভিক্ষে দুঃখু ক'রে বে দেওয়া—কোথায় কি পাবে বলুন। যা দিয়েছে তাতেই খুশী হয়ে আপনারা দয়া করে মেয়েটি উদ্ধার করুন।'

পিসেমশাইয়ের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল—হয়তো আগে থাকতেই ছিল একটু, তিনি বললেন, 'ও, আমি কে তা জানেন না? তা মশায় কে তা জানতে পারি কি? মশায়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধটা?'

একটু অপ্রস্তুত হলেন বৈকি অক্ষয়বাবু। একটু ঢোঁক গিলতে হ'ল। বললেন, 'আমার নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দে সরকার। এঁরা—'

'এঁরা আমাদের পুরোহিত'—এই বলতেই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাড়ি-ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন পিসেমশাই। 'বামুনের মেয়ের কায়েত অভিভাবক! বামুনের ঘরে কায়েত কন্যেকর্তা!…ওহে জগমোহন, ব্যাপারটা তো ঘোরালো দেখছি। এখনও ভেবে ছাখ, এখানে বিয়ে দেবে কি না!…শাশুড়ী ঠাকরুন খোঁজখবর করেছিলেন তো ভাল করে?…এই তো—কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, মেয়ে-কর্তা কোন ব্যাপারেই ভাল না। এসব কি ওদের কাজ! দশহাত কাপড়ে কাছা দিতে পারে না ওরা। কী করতে কী ক'রে বসে রইল ছাখ দিকি!'

এর পরে অক্ষয়বাবুর মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। তিনি বললেন, 'কী বলছেন মশাই যা তা। একটু বুঝে-সুঝে বলুন। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এসব কী কথা।'

'কী, কী বললেন!...ভদ্রলোকেব বাড়ি। তা যার বাড়ি—যাদের বাড়ি তারা কৈ? আমি বরেব পিসেমশাই, ইনি জগমোহন ওর মামা—আপনি কনের কে বলুন আগে তবে এর পব কথার জবাব দেব। কথা হয় সমানে সমানে - কায়েতের সঙ্গে বামুন এ সব বের ব্যাপারে কথা কইবে কি?'

জগমোহন—বরের মামা বটে, কিন্তু বরেরই প্রায় সমবয়সী—সে হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। ও পক্ষে আবও দু-চারজন তিরস্কার করলেন, বর নিজেও যেন ধমক দিল একবার। এ পক্ষে বড়জামাই এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল (হেমকে ইচ্ছে ক'রেই সামনে আসতে দিলে না শ্যামা)—পিসেমশাই শান্ত হয়ে এলেন। বোধ করি নেশাতেও আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলেন, তিনি তার পব থেকে সমস্ত সময়টাই ঝিমিয়ে রইলেন, কনে যখন সভায় এল তখন তার গায়ে কী গয়না আছে না আছে ফিরেও দেখলেন না। তা ছাড়া জামাইয়েব ওপর বুড়ীর যে কী পর্যন্ত ভরসা—তা বোঝা গেল যখন সম্প্রদানের পর জগমোহন বড়ীর পাঠানো চুড়ি আর হার বার ক'রে কনেকে পরিয়ে দিতে বললে। ওঁদেরই মুখ-দেখানি গহনা এগুলো, শুধু-গায়ে বৌ এসে নামবে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বোঝা গেল নিজের জামাই বরকর্তা থাকতে ছেলেব শালার ওপর তাঁর বিশ্বাস বেশী।

কিন্তু শান্ত হলেন না অক্ষয়বাবু। তিনি সম্প্রদান পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ঠিকই—তবে জলস্পর্শ করলেন না। ছেলেমেয়েদেরও খেতে দিচ্ছিলেন না—নিহাত শ্যামা এসে ঢিপঢিপ ক'রে মাথা খুঁড়তে ওদের খেতে বললেন। নিজে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে বাড়ি চলে গেলেন। অথচ এদের কী দোষ তাও বোঝা গেল না। গাঁজাখোরই হোক আর নেশাখোরই হোক—একে বরযাত্রী তায় বরের পিসেমশাই, কুটুমের কুটুম—তাকে গলাধাক্কা দেওয়া যায় না। বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীর বহু দাপট সহ্য করতে হয়, সেটা অক্ষয়বাবুর জানা উচিত। শ্যামা অনেক বোঝালেও কিন্তু তিনি অবুঝের মত রাগ ক'রেই রইলেন। আশ্রয়দাতা উপকারী বন্ধু, এককালের মনিব বলতে গেলে—তিনি অভুক্ত চলে গেলেন বিয়েবাড়ি থেকে, মনটা খচখচ করতে লাগল শ্যামার। এদের অকল্যাণ বাঁচাবার জন্যেই এক গ্লাস জল খেয়ে গেলেন বটে কিন্তু তাতে কোন সান্ত্বনা পেলে না শ্যামা।

॥ ২ ॥

তবে যতই যা হোক —এই বিয়ে উপলক্ষে কিন্তু সব চেয়ে অশান্তি বাধালে ঐন্দ্রিলা। সেদিন উমার বাড়ি থেকে ফিরেই শ্যামা যক্ষদজ্ঞের মধ্যে পডল বলতে গেলে। একে উমার সঙ্গে ঐ বিরোধ উপলক্ষে মনটা যৎপরোনাস্তি খারাপ হয়ে ছিল, তার ওপর দিদির কাছে গিয়েও খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে। ইদানীং ঝি রাখতে হয়েছে, বৌমা পোয়াতি, তাকে এটা-ওটা খাওয়াতে হচ্ছে - আরও নানা কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে—অথচ গোবিন্দর অফিসের অবস্থাও নাকি টলোমলো, এক মাসের মাইনে তিন মাস ধরে আদায় হচ্ছে—ইত্যাদি টানাটানির নানা অজুহাত দেখিয়ে দিদি দিয়েছিল মাত্র দশটি টাকা। এবার গোবিন্দ চাকরি বাকরি করছে আরও অনেক বেশী পাবার আশা ছিল শ্যামার, সে জায়গায় আগের আগের বারের চেয়ে কমেই গেল টাকাটা। সেখানেও একটা বহু দিনের চাপা অসন্তোষ মাথা তুলেছে— ওর এখনও ধারণা থিয়েটারে কাজ করবার সময় হেম মোটা মোটা টাকা দিয়েছে বড মাসীকে। সেদিক দিয়ে একটু কৃতজ্ঞতাও থাকা উচিত ছিল না দিদির? 'তা তো নয় —তখন খুব হাত বাড়িয়ে ফেলেছেন, এখন আর তাল সামলাতে পারছেন না ঠাকরুন! মোটা আয় একটা বন্ধ হয়ে গেছে তো!' মনে মনে যতটা ঝাঁজের সঙ্গে বলা সম্ভব ততটাই বলে সে।

একে তো এমনি নানা কারণে তিক্ত হয়ে ফিরছে, তার ওপর স্যাকরাদের বাঁশঝাড়টা ছাড়াতেই কানে এল এক বিকট চিৎকার। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সে চিৎকার ভয়াবহ শোনাচ্ছে—মনে হ'ল যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

শোনামাত্র দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গিয়েছিল ঠিকই—তবু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি মেরেছিল একবার। নরেন নিশ্চয়। সে-ই এসে তার অভ্যস্ত চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে, বেধেছে বাপেতে আর বেটীতে।...বহুকাল আসে নি সে, কিছু দিন ধরে সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে বার বারই মনে হয় তার কথা। কে জানে কোথায় আছে, কী ভাবে আছে। কোথাও হয়তো রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, মুখে জল দেবার কেউ নেই—কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে কোথাও মরেই গেছে হয়তো, ওরা কেউ জানতেও পারলে না। হয়তো ভিক্ষে ক'রেই খাচ্ছে—কে জানে। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

সে আশার চমক লেগেছিল এক লহমা মাত্র। আরও দু কদম এগিয়ে যেতে যখন বোঝা গেল শুধুই নারীকণ্ঠের চিৎকার এবং একতরফা, তখন আর সে আশা রইল না। চুপ করে মেয়ের গলাবাজি সহ্য করবার লোক নরেন নয। এটা শুধুই একতরফা চিৎকার—ঐন্দ্রিলারই।

দারুণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল দুজনেরই। নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতায় বহু দূর পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছচ্ছে, আশেপাশে ভদ্রলোকের বাড়ি। তারা না জানি কি মনে করছে। লোকে বলে হাড়াই-ডোমাই, কিন্তু তারাও মদ খেলে চেঁচায় না। ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতদুপুরে ডাকাতপড়া চেঁচানি—অলক্ষ্মীর দশা।

দুজনেই এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

দেখা গেল ব্যাপারটা আজ বহু দূব গড়িযেছে। তরু শোবার ঘরে খিল দিয়ে দাডিয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'বে কাঁপছে। মেয়েটা পালিযে এসে অন্ধকারেই পুকুরঘাটে বসে আছে চুপ ক'বে। মা'র কাছে তাব অন্ধকাব বাগানের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে গেছে আজ। আর ঐন্দ্রিলা এক গাছা ঝাটা নিয়ে আস্ফালন করছে, মধ্যে মধ্যে বদ্ধ দোবে লাথি মাবছে এবং অবিরাম অকথ্য গালিগালাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'কী হচ্ছে কি? ছোটলোকপনা! চুপ করবি—না কি?'

আরও যেন জ্বলে উঠল ঐন্দ্রিলা, এদিকে ফিরে যেন এক পাক নেচে নিলে সে, 'কেন চুপ করব? কিসের জন্যে মুখ বুজে থাকব চিরকাল তাই শুনি। ঝিয়ের মত খাটব আর অপমান হব। আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোমাদের চক্ষুশূল - নয়? মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারলে বাঁচো তোমরা, একটা পেট বেঁচে যায়। সেই ফন্দিই এঁটেছ মায়েতে ঝিয়েতে—আমি কি কিছু বুঝি না? কেন, আমরা থাকলে ছোট মেয়েকে রাজরাণীর মত বিয়ে দেওয়া যাবে না বুঝি—চক্ষুলজ্জায় বাধবে, না? ঘোচাচ্ছি তোমাদের বিয়ে, দাঁড়াও না। ফন্দি-আঁটা বার করছি আজ!'

হয়তো আরও বহুক্ষণ এইভাবে চলত, কারণ ওর সে রণচণ্ডী মূর্তির সামনে শ্যামাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সেযাত্রা রক্ষা করলে হেমই—তার অকস্মাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এ রকম অকারণ কলহ আজকের নয়, এক দিনের ঘটনা নয়, এ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে তার। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কমলাদের বাড়ি থেকে ফিরেছে সে—হাসিতে, কৌতুকে, আদর-যত্নে অপরূপ নারীমূর্তি দেখে এসেছে। সে মধুর স্মৃতি যে মধুরতর স্বপ্নরসে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা থেকে এই জাগরণ বড় বেশী রূঢ়, বড় বেশী

দুঃসহ মনে হ'ল। সে এগিয়ে এসে একেবারে ওর চুলের মুঠি ধরে ঠাসঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিলে, 'চুপ! একেবারে চুপ! নইলে শেষ করে দেব একেবারে!'

সত্যিই কিন্তু এইতে কাজ হ'ল। স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে ঐন্দ্রিলা। জ্ঞান হবার পর থেকে তার গায়ে কেউ কোন দিন হাত তোলে নি! মা-বাবা নয়—দাদা নয়, কেউ নয়। মানুষ হয়েছে সে মাসীর কাছে, দিদিমার কাছে। রাশভারী লোক ছিলেন দিদিমা, তাঁর চোখের দৃষ্টিই ছিল যথেষ্ট, কারুর গায়ে হাত তোলবার তাঁর কোন দিন দরকার হ'ত না। উমাও সেই স্বভাবই পেয়েছে কতকটা। সুতরাং এটা ওর একেবারে অভিজ্ঞতার বাইরে।

সে খানিকটা হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল দাদার মুখের দিকে। তার আয়ত চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পলকও পড়ছিল না। সেই ভাবে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থাকবার পর আস্তে আস্তে এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় পৌঁছে বসে পড়ল।

তরুর মুখে তার পর ব্যাপারটা শোনা গেল।

হঠাৎ বিকেল থেকে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলা, একেবারে যাকে বলে গায়ে-গাছকেটে ঝগড়া বাধানো। তরুকে উদ্দেশ ক'রে বলতে শুরু করেছে, 'ঘোষালদের জ্ঞাতি বলে ভাল বরও পছন্দ হ'ল না। তা তার বদলে কী এমন তালেবর জুটল শুনি! ঐ তো ছিরির বর, দাদাবাবু বলেছে বিশ্ববকাটে হয়ে গিয়েছিল—তাও সতীন সুদ্ধ—নিক্ না নিক্, সে কাঁটা বজায় আছে তো! কেন, ঘোষালদের ঘরে পড়লে কী মহাভারত অশুদ্ধটা হ'ত—তোর মেজদাদাবাবু তো ঐ ঘরেরই ছেলে! তার পায়ের নখের যুগ্যি বর পেলেও তরে যেতিস। তোদের বড্ড তেজ হয়েছে—বুঝেছিস্! এত তেজ ভাল নয়। আমি হাজার হোক তোর দিদি, বয়সে বড়—আমাকে এত অপমান করা এত হেনস্থা করা ধর্মে সইবে না—বুঝলি!'

তরু অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে চুপ ক'রে, তার পর আর থাকতে পারে নি—বলেছে, 'তা আমাকে এসব কথা বলছ কেন মেজদি, আমি কি আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছি!'

'না—তা নয় তবে তুইও জানিস। শলাপরামর্শ তো হচ্ছে দেখছি দিনরাত, মায়ে-ঝিয়ে গুজগুজ ফুসফুস। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিই—বেইমানি ভাল নয়। সেই ঘোষালরাই ছিল তাই তো ছেলে চাকরি পেয়েছে, কৈ আর তো কেউ পারে নি চোর ছেলেকে চাকরি ক'রে দিতে!'

এইবার বোধ করি তরুর অবিচলিত ধৈর্যও টলেছে, সে জবাব দিয়েছে, তা' মেজদি, এত যদি ভাল ঘোষালরা তো তাদের ঘরের মেয়ে তারা পুষছে না কেন, চোরেদের ঘরে এনে তুলেছে কেন! এই তো শুনেছিলুম, জুচ্চুরি ক'রে তারা যথাসর্বস্ব তোমার নিয়ে নিয়েছে আজ আবার এত ভাল হয়ে গেল!'

ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। তার পরই একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছে ঐন্দ্রিলা, 'কী, কী বললি—তুই সুদ্ধু আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি! তোর খাচ্ছে সে, না তোর ভাতারের খাচ্ছে! এখনও তো ভাতার হয় নি তবে কোথা থেকে রোজগার ক'রে আনছিস তাই শুনি, খবরটা একবার নিবড়েয় পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় বেশী খাচ্ছে, না? তাই আমি আর আমার মেয়ে হয়েছি তোদের চক্ষুশূল! কেন আমার মেয়েকে ভাতের খোঁটা দিবি তুই? পয়সা বাঁচলে কি তুই পাবি ভেবেছিস! বাঁচলে ভাইয়েরই থাকবে। তোকে বেশী ক'রে দেবে না—ভয় নেই। ভাইয়ের সংসারে এত টান—ওরে আমার ভাইসোহাগী রে!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তার পর থেকেই চলেছে। তরু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তাইতে ওর আরও রাগ। ক্রমশ সে আবিষ্কার করেছে যে তাকে আর তার মেয়েকে মেরে ফেলবারই ষড়যন্ত্র চালিয়েছে এরা! নিত্য নূতন অপমান তাকে করে শুধু সেই অপমানে ঘেন্না হয়ে গিয়ে পুকুরে উলবে বলে।

গজরাতে গজরাতে বোধ করি রক্ত আরও চড়েছে মাথায়। শেষে থ্যাংরা হাতে তেড়ে এসেছে—'মরতে যদি হয় তো তোকে মেরে মরব!' সেই সময়ই ভয় পেয়ে কোলের ভাইটাকে নিয়ে ঘরে দোর দিয়েছে তরু। পাড়ার দু-চারজন এসেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলার ঐ সংহার-মূর্তি দেখে সকলেই আবার সরে পড়েছে। ইশারায় শুধু তরুকে বলে দিয়ে গেছে যে সে দোর না খোলে—কোন কারণেই।

সারারাত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রইল ঐন্দ্রিলা। শ্যামা ডাকলে না। রান্না হয় নি—বিকেল থেকেই এই কাণ্ড চলছে, রাঁধবে কে? তখন আর কারুর ইচ্ছেও হ'ল না। ঘরে মুড়ি ভাজা ছিল—একটা নারকোল কুরে নিয়ে তাই ক'জনে ওরা খেলে এক গাল ক'রে। মেয়েটাকে আগেই টেনে এনেছিল শ্যামা, তাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাল ঐন্দ্রিলাকে—সে কিছু খাবে কি না। ঐন্দ্রিলা জবাব দিলে না। মেয়েটাও কোনমতে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই দৌড়ে পালিয়ে এল, 'আমার ভয় করছে দিদিমা, মা কেমন ক'রে চেয়ে আছে!'

ভয় শ্যামারও ছিল। ও যা মেয়ে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারাও বিচিত্র নয় ওর পক্ষে। ওর মেয়েকে নিয়েই দোরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু কারুরই সে রাত্রে ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না!

তবে ভয়ানক কিছুই করলে না সে। তেমনি জেগে বসে রইল শুধু। পরের দিন ভোরে মেয়েটা ঘর থেকে বেরোতেই তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল।

প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি শ্যামা। একেবারে যখন ওদের বাগান পেরিয়ে আগড়ের কাছে এসে পড়েছে তখন ছুটে এসে একটা হাত ধরলে সে, কোথা চললি, সাত সকালে! বাড়ি আয়, মেয়েটা খায় নি কাল থেকে—ওকেই বা টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

আবারও ভীষণ মূর্তি হয়ে উঠল ঐন্দ্রিলার 'খবরদার, আমাকে ধরবে তো বেটাদের মাথা খাবে—এই বলে দিলুম, পেয়ারের ছোট মেয়ের আমার মত হাত মাথা দেখবে। যদি মার খেয়ে অপমান হয়ে পড়ে থাকতে হয় তো শ্বশুরবাড়িতেই পড়ে থাকব—সে আমার ঢের বেশী সম্মানের। ভায়ের সংসারে ঝিয়ের মত খেটে বকশিশ পাব মার—চড়চাপড় গায়ের কাপড়—সে আমার দরকার নেই। ঘোষালদের ঘেন্না কর তোমরা, তাদের বৌ মেয়ে রাখতে ঘেন্না করে—রাখতে হবে না তোমাদের—আমরা যেখানকার জিনিস সেখানেই যাচ্ছি।'

মেয়েটাকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল সে।

॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার ফলে শ্যামা রীতিমত অসুবিধায় পড়ল। তরুর বিয়ের পর এক দিন মাত্র জোড়ে এসেছিল মেয়ে-জামাই, তার পর আর তরুকে ওর দিদি-শাশুড়ী পাঠাল না। বললে, 'আমার সংসার চলছে না বলেই তো ধেড়ে মেয়ে নিয়ে আসা। নাতির বে'র এত তাড়াও তো সেই জন্যে। আমি বুড়ো মানুষ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকি আদ্দেক দিন, ওকে ভাত জল দেয় কে! না, বৌ পাঠানো হবে না। আর—ঢের দিন তো বাপের বাড়ি রইল, আর কেন?'

ফলে সংসারের যাবতীয় কাজ—দু বেলা রান্না, বাসনমাজা, ঘর উঠোন নিকানো ছড়া ঝাঁট—সবই শ্যামার ঘাড়ে এসে পড়ল। রান্না অবশ্য হাতিঘোড়া কিছু নয়—তবু দু বেলাই হাঁড়ি চাপাতে হয়। লিলুয়ায় যাওয়া, এখানে সাড়ে ছটার ট্রেন, বাড়ি থেকে ছটার সময় না বেরোলে সে ট্রেন ধরা যায় না। তার মধ্যে জান

খাওয়া সারতে হবে। সুতবাং রাজগঞ্জের কলে চারটের ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হয়, উনুনে পাতা জেলে দিয়ে তবে মুখহাত ধুতে যাওয়া। সে ভাত-তরকারি দুপুরে নিজে খাওয়া যায়—কিন্তু আবার সন্ধ্যের পর কিংবা রাত আটটা-নটায় ফিরে যে খাবে তার সামনে আর ধরে দেওয়া যায় না।

ঐন্দ্রিলা থাকতেও ভোরের রান্না অবশ্য শ্যামাকেই রাঁধতে হ'ত, কারণ অত ভোরে উঠে সে রাঁধতে পারবে না সাফ্ বলে দিয়েছিল—কিন্তু তার পর ছিল ছুটি, সারা দিন ধরে পুরুষ মানুষের কাজ—অর্থাৎ বাগান দেখা, ফল বিক্রি করা, পুকুরে ডিম ফোটানোর তদ্বির, পাতা কুড়োনো--ক'রে বেড়াত নিশ্চিন্ত হয়ে। ঐন্দ্রিলা থাকত হেঁসেল আর রান্নাঘর নিয়ে, ক্ষার কাচাও তার ওপর ভার ছিল। এবারে বাসনমাজা, ঘরেদোর পরিষ্কার করা, বিছানা তোলা-পাড়া, ছড়া ঝাঁট—এগুলো ছিল তরুর। এখন সবগুলো ঘাড়ে এসে পড়ায় চোখে অন্ধকার দেখলে একেবারে।

ঐন্দ্রিলা যেদিন যায় সেদিনও শ্যামা এতটা বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল সেখানে তারা আর কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, দিলেও এক দিন কি দু দিন বড় জোর, তার পরই আবার ফিরে আসতে পথ পাবে না। কিন্তু হেম নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে এল। হরিনাথের মা মাস-দুয়েক ধরে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে বিছানায়, শিবুর নতুন বৌ পোয়াতি – কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। এই সময় ঐন্দ্রিলা গিয়ে পড়াতে ওরা হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছে। শুধু পেট-ভাতায় এত খাটবে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং মৌখিক আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নি, এখন নাকি শাশুড়ীও বৌমা বলতে অজ্ঞান। অর্থাৎ ঐন্দ্রিলা এখন সহজে ফিরছে না।

এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আর একটি পরের মেয়ে নিয়ে আসা—অর্থাৎ হেমের বিয়ে দেওয়া। চাই কি—তাতে দেনাও খানিকটা হাল্কা হয়ে যেতে পারে। দেখতে ভাল, রেলে কাজ করে, নিজের বাড়িঘর আছে,—হাজার না হোক সাত-আট শো টাকা নগদ খুব পাবে। তাতে বিয়ের খরচ ক'রেও খানিকটা দেনা শোধ দেওয়া যাবে। চাই কি যদি একটু নিরেস মেয়ে নেয় তো দেড় হাজার দু হাজার পাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে তা করবে না শ্যামা, সুন্দরের ঘর ওর, পণ খারাপ করবে না।

এক দিন রাত্রে ছেলেকে খেতে দিয়ে সেই কথাই তুলল শ্যামা, 'সামনের একটা মাস পরেই তো আবার বে'র মাস পড়বে—এইবার তা হলে খোঁজখবর করি—কী

বলিস ? জামাই বলেছেন ওদের জানাশোনা কোথায় একটি মেয়ে আছে—দেখতে ভাল, বড় বংশ - একবার দেখে আসব ভাবছি !'

'আবার কার বিয়ে ?' অন্যমনস্ক ভাবে খাচ্ছিল হেম, হঠাৎ চমকে উঠল, 'আবার কী বিয়ে !'

'ওমা, তোর বিয়ে দিতে হবে না ?'

'রক্ষে করো মা। এই রোজগারে বিয়ে ! আগে দুটো দিন খেয়ে পরে বাঁচি।'

'রোজগার নিয়ে তোর কি হবে ? সংসার কি তুই চালাস ? তা ছাড়া এই তো আড়াইখানা পেট কমে গেল, তার জায়গায় একটা পেট চালাতে পারব না ? আর এমন কি নবাব-নন্দিনী আনব যে তার জন্যে নিত্যি কালিয়া পোলাও চাই, লালবাগানের শাড়ি ছাড়া তাঁকে পরতে দেওয়া যাবে না ! আমরা যা খাচ্ছি সুষুনি শাকের ঝোল ডুমুর ছেঁচকি, সে ও তাই খাবে !'

'না না—ওসব এখন থাক।' অত্যন্ত বিরস কণ্ঠে বলে হেম, 'চিরদিন দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে কাটল, টানাটানি আর টানাটানি—দুটো দিন হাঁফ ছাড়তে দাও। মেয়েরা তো পার হয়েছে, ছেলেকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন !'

'ওমঃ মাথাব্যথা কি সাধ ক'রে হয়, বয়স কত হ'ল বল দিকি। ঐ যে এক জন দোজপক্ষে করলে তা-ও তো তোর চেয়ে ঢের কম বয়সে।'

'তা কি হবে ! আজকাল অমন অনেকে করছে। তেজবরেও তো করে ঢের লোক। একটু সামলে নাও দিকি, দেনাটা একটু কমুক। বৌ মানে তো একটা পেট নয়—এর পর যখন বাচ্ছা কাড়তে শুরু করবে তখন ! কান্তিটা সামান্য একটু লেখাপড়ার জন্যে কোথায় পড়ে আছে ! এই কি বিয়ে করার সময় ?'

তা বটে। চুপ ক'রে যায় শ্যামা।

কান্তি অবশ্য খুব খারাপ নেই। তরুর বিয়েতে এসেছিল। ঢ্যাঙা হয়েছে অনেকটা—তবু খুব রোগা হয় নি। বেশ দেখতে হয়েছে। জামা কাপড়ও দিব্যি, হেম সেরকম জিনিস কখনও চোখে দেখে নি। গত বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠে প্রাইজ পেয়েছে। সব দিক দিয়েই ভাল। কুস্থান বটে—তা এমন কী আর, কুটুমের বাড়ি তো বটে।

খানিকটা পরে বলে, 'আমি যে আর এধারে পারছি না। এক একা।'

'বৌ এসেই কি একেবারে চার চালের ভার নেবে নাকি ! এখন দু দিন থাক—এত বিরক্ত ক'রো না।'

হেম তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে নিয়ে বাইরের চালা-ঘরটার বারান্দায় এসে বসে। এরই কি একটু শান্তিতে বসবার জো আছে, এমন দক্ষিণ খোলা বারান্দা—তা গামড়া ছোবড়া আর নারকোল পাতায় বোঝাই হয়ে আছে। ওরই মধ্যে জায়গা ক'রে নিয়ে বসে বটে কিন্তু কেমন ভয়-ভয়ও করে। সাপ-বিছে থাকা বিচিত্র নয় তো।

বেশী রাত হয় নি—আটটা হবে বড় জোর। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়া-ঘর নিষুতি হয়ে এসেছে। মল্লিকদের কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে—বাগানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। স্যাকরাদের বাড়ির দিক থেকে অস্পষ্ট একটা কথা বলার শব্দও কানে আসছে। আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই জনবসতির। বিপুল এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে এক হয়ে গেছে। এমন কি ওদের সামনের পুকুরটাও দেখা যাচ্ছে না আর ভাল ক'রে। মধ্যে মধ্যে কাতলা মাছগুলো ঘাই না মারলে পুকুরের অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না।

তবে হ্যাঁ—মানুষের আলো নেই কিন্তু প্রকৃতির আলো আছে। জোনাকি আছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জোনাকি। দপদপ ক'রে নিভছে আর জ্বলছে। ওর সামনে পুকুরপাড়ের যেখানটা আমড়া গাছে চালতা গাছে আর আম গাছে জড়াজড়ি, তার ওপাশে নতুন বাঁশঝাড়টা উঠছে—সেইখানের সেই জমাট অন্ধকারে যেন জীবন্ত নীহারিকার মত তাল পাকিয়ে ঘুরছে সংখ্যাহীন জোনাকির দল। তাদের সেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণার ঘুরপাক খাওয়া দেখতে দেখতে কেমন যেন ভয়-ভয় করে হেমের। মনে হয় মানুষ সংখ্যায় কত কম—এইসব পতঙ্গের তুলনায়। যদি তেমন কোন দিন আসে, ওরা আর সামান্য একটু শক্তি সঞ্চয় করে—তা হলে মানুষের কী দুর্গতিই না হবে।

এদিকে জোনাকি, ওদিকে ঝিঁঝিঁ পোকা। তার সঙ্গে গাং-ফড়িংগুলোর একঘেয়ে ডানা নাড়ার শব্দ। ঠিক ওর পিছনেই একটা ফড়িং—বোধ করি দেওয়াল আর টিপি-করা গামড়ার মধ্যে আটকে গেছে। মনে হচ্ছে পাশে বসে কে বাতাস খাচ্ছে পাখা নেড়ে। জানে ফড়িং—তবু যেন গা ছমছম করে কেমন। মানুষের আশেপাশে কত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে কত রকমের, তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে—মানুষের দিকে। মানুষ লক্ষ্য করে না, অবজ্ঞা করে—কিন্তু তারা লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে ঠিকই। হয়তো হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সুযোগের—যেদিন সময় পাবে সেইদিনই মানুষের এতকালের অকারণ হিংসার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর করেও তো—মাতাল

রমা লাহিড়ীর বৌয়ের থেকেই বুঝেছে সে। বড় মাসীমার বাড়ির কখানা বাড়ি পরেই তারা থাকত—রমা লাহিড়ী চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রী—কে আবার উঠে দোর দেয় খোলে—এই জন্যে। তার পর পাল্লায় পড়ে দু দিন মদ খেয়েছে বসে বসে কোন্ আড্ডায়, যখন খেয়াল হয়েছে এসে দেখেছে—জ্যান্ত মেয়ে-ছেলেটাকে পিঁপড়েতে খাচ্ছে। খুব অসুস্থ, উঠে কোথাও যেতে পারে নি, রাজ্যের পিঁপড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে। রমা লাহিড়ী যখন এসেছে তখনও প্রাণটা আছে, ধুক ধুক করছে- কিন্তু তখনই তার চোখ কুরে খেয়ে ফেলেছে পিঁপড়েতে।...

শ্যামার নিজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। 'ল্যাম্পো' নিয়ে ঘাটে এসেছে বাসন মাজতে। বাসন মাজা শেষ হলে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চাল এনে ধুয়ে রাখবে। হাঁড়িতে জল চাল ঠিক করাই থাকে, উনুনে পাতা সাজানো—ভোরে উঠে আগে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিয়ে তবে ঘাটে বেরোবে, প্রাকৃতিক কাজের জন্য। মোটা চালের ভাত—সেদ্ধ হতে ঠিক একটি ঘণ্টা সময় লাগে। ভাত আর একটা কিছু ভাতে নেমে গেলে—যা হোক একটা তরকারি কি ডাল চাপিয়ে দেয়। পৌনে ছটায় খেতে বসবে হেম—তার মধ্যে অন্তত ভাতগুলো ঠেলবার মত উপকরণও একটু কিছু তৈরী করা চাই!

কষ্ট খুবই। রাত চারটেয় ওঠে রাত নটার আগে কাজ চোকে না। কিন্তু এখন তাও ছুটি মেলে না। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে এই 'ল্যাম্পো'র ক্ষীণ আলোতেই নারকোল পাতা চাঁচবে। এক আনা সের ঝাঁটার কাঠি বিক্রি হয়—পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা বন্ধ রাখলে তো চলবে না।

তাই বলে বিয়ে!

নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসে বসে নিজের মনের মধ্যেটা দেখবার চেষ্টা করে। না, বিয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না আদৌ। নলিনীর স্মৃতি এখনও বড় স্পষ্ট, বড় উজ্জ্বল। ভালবেসেছিল কিনা তা এখনও বলতে পারে না—ভালবাসা কাকে বলে ঠিক জানেও না সে—তবে আজও সেই স্মৃতি মনে হলে মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে দেহের মধ্যে কেমন করতে থাকে, হাত-পাগুলোয় একটা কাঁপন অনুভব করে। এক-এক সময় ইচ্ছে করে ছুটে যেতে—সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ক'রে সমস্ত বাধা লঙ্ঘন ক'রে। এখনও বোঝায় মনকে, এখন তো আর সে রমণীবাবুর কর্মচারী নয়—এখন আর ভয়টা কি!

আবার মনে পড়ে যায় শেষের দিনের স্মৃতিটা, তাকে পরিষ্কার ক'রে পালিয়ে

যাওয়ার কথা—সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেলিত আবেগ শান্ত হয়ে আসে আপনা-আপনিই। ছিঃ! সে কি ভিখিরী, না এতই হেয়? না, দরকার নেই। ভালবাসা হয় সমানে সমানে ভিক্ষা ক'রে চুরি ক'রে হয় না। তার যদি পয়সার জোর থাকত তা হলে কি আর সে এমন অবহেলা করতে অবহেলারও বেশী, এড়িয়ে চলতে পারত! তা ছাড়া এ পথের এই দস্তুর। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় যে জিনিস—বিনা পয়সায় তা চাওয়াই অন্যায়।

না, ওপথে আর যাবে না। তার চেয়ে তার যেমন অবস্থা সেই মত থাকবে। বিয়েই করবে। বৌ অন্তত তাকে অবজ্ঞা করতে এড়িয়ে যেতে সাহস করবে না, তার ভালবাসায় খাদ থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্য একসঙ্গে জোড়া।

তবু ঠিক এখনই সে কথা যেন ভাবা যাচ্ছে না।

তার বৌ—তাকে যে মেয়ে দেবে - সে মেয়ে কেমন আর হবে। এই পাড়াগাঁয়েরই কালো-কোলো একটা মেয়ে, যে না বুঝবে দুটো রসিকতা না বুঝবে তার সুখ-দুঃখ। যে শুধুই খাটবে খুটবে, খাবে এবং সেবা করবে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় রাণী-বৌদির কথা।

যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কী প্রাণ-প্রাচুর্য! চোখেমুখে কী প্রখর বুদ্ধির আভা! অথচ মনটা কি মিষ্টি। চোখের চাহনিতে মানুষের প্রয়োজন বুঝে নেয়, আর সে প্রয়োজন মেটানোতেই যেন তার সব চেয়ে আনন্দ। যতক্ষণ হেম থাকে ওদের বাড়িতে, যেন কী এক মধুর স্বপ্নে সময় কেটে যায় ওর—হাসিতে ঠাট্টাতে গল্পে মাতিয়ে রাখে সমস্তক্ষণ। তার কৌতুক প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকে চারদিকে. হাসিতে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ ওঠে। এত কথাও জানে। মনে হয় দিনরাত বসে বসে শুধু ওর কথা শোনা যায়-- অনন্তকালেও যেন শ্রান্তি আসবে না।

সকলের কী আর জোটে অমন বৌ! ও মেয়ে দুর্লভ! দাদার ভাগ্যটাই ভাল। সে বৌ-ও ভাল ছিল, অবহেলায় কোন দিন সেদিকে তাকাল না দাদা—আর এ তো অমূল্য রত্ন—কিন্তু তাই কি এর দামও পুরোটা বোঝে!…

শরতের অসহ্য গুমোট—তবু তার মধ্যেই সারা দিনের পর ভাত পেটে পড়ায় চোখ দুটো তন্দ্রায় ভারী হয়ে আসে। কেমন যেন ঘুমে জাগরণে চিন্তায় কল্পনায় স্বপ্নে একাকার হয়ে যায় মনের মধ্যে।…

মা'র বাসন মাজা শেষ হয়ে গেছে। ধুয়ে ধুয়ে তুলছে তালের গুঁড়ির পৈঠেতে। ধোওয়ার সময় জলে নাড়া পেয়ে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পুকুরে। তাতে [illegible]পোয়

আলোটা পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা অসংখ্য আলোব ঢেউ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হেমের মনে হ'ল আসলে রাণী-বৌদিরই হাসি ওগুলো, আলোর তরঙ্গ তুলে শতখণ্ডে ভেঙে ভেঙে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এখন তাব পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অঘ্রানের গোডাতেই কোথা থেকে নরেন এসে পডল। স্বামীকে দেখে এত আনন্দ বোধ হয় শ্যামার কখনও হয় নি। একা একা এই এত বড় বাড়িতে থাকা সারা দিন, আর ভূতের মতন পরিশ্রম ক'রে যাওয়া—এ যেন আর ও পেরে উঠছে না কিছুতেই। তেমনি হেমেরও হয়েছে আজকাল—রোজই ফিরতে রাত হচ্ছে। তাও যদি ওপরটাইম ক'রে রাত করত তো শ্যামার একটা সান্ত্বনা থাকত। দুটো পয়সা আসত তাতে। এ শুধুই আড্ডা, জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'এই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করছিলুম।' কিন্তু শ্যামা জানে বন্ধুবান্ধব কিছুই নয়, প্রত্যহ সে আজকাল বড মাসীর কাছে যায়। টানটা কোথায় তাও বোঝে। ওর বয়েস হয়েছে ঢের, মানুষ দেখে দেখে কিছুই আর বুঝতে জানতে বাকি নেই। 'ডব্‌কা হ'ল ছোঁডা তো ছুঁড়ীব হ'ল গোঁডা!' যে বয়সের যা। ঐদিকে টান না হলে আর প্রত্যহ হাওডা থেকে সিমলে, সিমলে থেকে হাওড়া হাঁটতে পারত না। সবই জানে শ্যামা—তবে এ নিয়ে কেজিয়া করতে ইচ্ছে করে না। সম্পর্কটা বড্ড তেতো হয়ে যায়। তা ছাড়া ভয়েরও কিছু নেই। বৌমা ঠিক সে ধরনের মেয়ে নয়, সুযোগ অবসরও কম ও বাড়িতে। দিদি তো দিনরাতই বাড়িতে বসে। কথা গান কীর্তন এসব শুনতেও কখনও কোথাও যায় না। আর সব চেয়ে বড কথা, পয়সা খরচ নেই। মাসের শেষে মাইনের পাইপয়সা এনে ধরে দেয় হেম। মাসকাবারী টিকিটেব টাকা আর যখন যা দরকার হয় বলে চেয়ে নেয়। এ ছাড়া আট আনা চার আনা নেয় মধ্যে মধ্যে—বলে, 'বন্ধুবান্ধবরা পাঁচদিন খাওয়ায়, তাদের না খাওয়ালে চলে না। তা আমি আর কি খাওয়াই—বেগুনি প্যাজের বড়া বড়

জোব।' শ্যামা হাসে মনে মনে —বেগুনি পাঁজেব বডা ছাডা ও পযসাতে কিছু কেনা যায় না ঠিকই, বড জোব দুখানা হিংযেব কচুবি কিন্তু সেটা যে কোথায যায তাও শ্যামা জানে। বৌমা ভবা পোযাতি।

এই অবস্থায় নবেনকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল ও।

কিন্তু এ কী অবস্থায এল সে!

রোগা কাঠি হযে গেছে। পেটটা জযঢাক। হাত-পাগুলো ফোলা ফোলা, মাথার চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। চোখের কোল ফুলেছে। সভ্য শোথেব লক্ষণ।

শঙ্কিত হযে উঠল শ্যামা, বুকেব মধ্যেটা ঢিব্ ক'বে উঠল সেদিকে চেয়ে—যতই হোক লোকটা আছে তাই হাতেব লোহাগাছটা আছে, সিঁথিটাও সাদা নেই। সাত পাতেব কুডিযে যা-তা খেযেও চলে যাচ্ছে। বোদে পুডে, জলে ভিজে, সাবা দিন বাগানে ঘুরে, গাছে ঠেকো দিয়ে আব পাতা কুডিযে, যা ছিরির চেহারা হযেছে—এর পব শুধু হাত আব সাদা সিঁথি হলে একেবারেই কাঠকুড়ুনী বলবে লোকে। তাব চেযেও বড় কথা হল, লোকটা পাজী হোক, বদমাইশ হোক—চিবজন্মেব সাথী। অন্য কোন পুরুষেব দিকে চাইবার কখনও অবসরও হয় নি, প্রবৃত্তিও হয নি।' আশা আকাঙ্ক্ষা না হোক, জীবনেব কামনা বাসনাব দিকেও যদি কখনোও ক্ষণকালেব জন্যও কোন আনন্দ কোন তৃপ্তি পেযে থাকে তো—এই লোকটাকে উপলক্ষ ক'রেই পেযেছে। এখনও তাই কোথায মনেব গোপন কোণে একটু কোমলতা একটু মাযা আছে লোকটা সম্বন্ধে।

কিন্তু মনে যাই হোক, মুখে বেশ খানিকটা বিদ্রূপেব ভঙ্গীতেই বলে, 'বাঃ, চেহারা তা বেশ খুলিযে আসা হযেছে দেখছি, এবাব আব কি—খাটে তুললেই তো হয়।'

কে জানে কত দূর থেকে হেঁটে এসেছে, ক্লান্ত দেহে হেঁটে আসার ফলে হাপরের মত হাঁপাচ্ছিল নবেন, কোনমতে রান্নাঘরের দাওযাটাতেই বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'হুঁ। তো তেমন অবস্থা না হলে আর এ যমপুরীতে আসবই বা কেন।'

'বলি স্বগ্‌গপুরীতে থেকেই তো এমনি চেহারা খুলিয়ে আসা হয়েছে, তা সেখানে আর কটা দিন চেপে থাকলেই তো একেবারে খাঁটি স্বগ্‌গে চলে যেতে পারতে! মিছিমিছি এ যমপুরীতে কষ্ট করতে আসবার দরকার কী ছিল!'

'নইলে তোর স্বগ্‌গবাসের উপায় হয় না যে। দিনকতক সোয়ামীর গু-মুত ঘাঁট, নইলে পরলোকে গিয়ে কি জবাব দিবি?'

তার পর হাতের ময়লা পুঁটলিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে, চুপ কর্ এখন — আসা-মাত্তর ক্যাচক্যাচানি শুরু করেছে! একটু তামাক সাজ দিকি! ঐতে সব আছে—'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। মেয়েরা কেউ নেই—এক হাতে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব করছি, তার মধ্যে তোমার তামাক সেজে দিতে বসি! ওসব চলবে না, খেতে হয় সেজে খাও।...কত্তার মত রোজগার করব, বিষয়-সম্পত্তি দেখব, গিন্নীর মত রান্নাবান্না করব, ঝিয়ের মত ঘরবাড়ির পাট করব, বাসন মাজব, ক্ষার কাচব, আবার খানসামার মত তামাক সাজতে বসব—এমন নিকড়ে গতর আর নেই, আমারও বয়স হয়েছে!'

'মাইরি দে বামনী, এতটা হেঁটে এসে—তবু বসতে বসতে এসেছি, এই সিদ্ধেশ্বরীতলাতেই আধ ঘণ্টার ওপর বসতে হয়েছে—তাও হাঁপ ধরেছে দেখছিস, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। এইবারটি অন্তত সেজে দে, এখন আর পারছি না, চোখে যেন ধোঁয়া দেখছি সব!'

অগত্যা শ্যামা পুঁটলিটা খুলে নেয়। নরেনের একটা হুঁকো বাড়িতেই থাকত, সেটা ওখান থেকে এখানে আনতে ভোলে নি শ্যামা, কিন্তু তামাক নেই ঘরে। কলকেটাও ভেঙে গেছে এক দিন পড়ে গিয়ে—নরেন আর আসে না, এনে রাখবার কথাও মনে হয় নি তাই। তা ছাড়া হুঁকো কলকে তামাক সর্বদা তার সঙ্গেই থাকে—বলতে গেলে ঐগুলোই যথার্থ তার জীবনের সাথীসঙ্গী—সুতরাং জানত যে সে এলে নতুন কলকেও আনবে!

'তা সে আঁটকুড়ীর বেটীরা গেল কোথায় সব?' একটু দম নিয়ে এবং শ্যামা তামাক সাজতে বসায় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে—প্রশ্ন করে নরেন।

'যাবে আবার কোথায়, যে যার শ্বশুরবাড়ি। তরুর বিয়ের আগে খেঁদি রাগ ক'রে নিজের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন তাদের কন্না করার লোক চাই তো —বড় বোয়ের নাকি তাই খুব আদরও হয়েছে।'

'তরুটারও বে হয়ে গেছে! ইস্। জানতে পারলে আসতুম। কত কাল যে বিয়ে বাড়ির খ্যাঁট জোটে নি অদেষ্টে!'

'মুখে আগুন! নিজের মেয়ের বে, তা কেমন পাত্তর হ'ল, কোথায় পড়ল তা জিজ্ঞেস করা চুলোয় গেল—খ্যাঁটের চিন্তা। ঐ তো চেহারা, উত্তুরী ধরিয়ে বসে আছ যা বুঝতে পারছি—খ্যাঁট হজম হ'ত?' মুখনাড়া দিয়ে বলে শ্যামা।

কিন্তু যে ধরনের উত্তর আশা করেছিল ওদিক থেকে সে ধরনের উত্তর এল

না। খালি উঠোনের কাঁটাল চারাটার দিকে কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললে নরেন, 'কোন ছেলেমেয়েরই কখনও খবর নিলুম না, আজ আর নিয়ে কি করব বল্। যা ভাল বুঝেছিস করেছিস—যেমন পাত্তর জুটেছে দিয়েছিস—অদেষ্টে থাকে ভোগ করবে, আর তোর মত পোড়া বরাত হয় তো জ্বলবে। আমার শাশুড়ী মাগীও তো খাবাপ দেখে দেয় নি। তোর কী হাল হ'ল তা তো দেখলিই। ও নিয়ে আর আমি ভাবি না।'

ওর কথা বলবার ধরনে একটা কী ছিল, শ্যামা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, হঠাৎ কিছু জবাব দিতে পারলে না।

নরেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানবার পর একটু সুস্থ হয়ে চার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাড়িটা মন্দ করিস নি কিন্তু—মাইরি, তোর মাথা খুব। আমাদের যথা-সবস্ব যখন গেল তখন যদি তুই একটু সেয়ানা হতিস, তা হলে হয়তো সব যেত না।'

তার পর আর গোটা দুই টান দিয়ে বললে, 'বরাত! বুঝলি, সবই বরাত। নইলে অমন বুদ্ধি হবে কেন! তুই এখানে এই ইন্দির ভবন করেছিস তা তো জানি না—শুনেছি বাড়ি করেছিস, কিন্তু সে যে এমন পাকা বাড়ি, বাগান পুকুর তা ভাবি নি। ওঃ, যা কষ্ট গেল ক মাস! অসুখে ভুগছি—এ সময় কোথাও কেউ আশ্রয় দিতে কি চায়? পথে পথেই কাটল বলতে গেলে। হঠাৎ খেয়াল হল তাই, লোককে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে চলে এলুম। ভাবলুম কে জানে শরীরের এই অবস্থা - হয়তো কোথায় কোন্ দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকব—তোদের সঙ্গে দেখাও হবে না। আর বাড়ি একটা করেছিস যখন, একবার দেখেও নিই।'

হঠাৎ যেন শ্যামার চোখে জল এসে যায়। বহুদিনের শুষ্ক রুক্ষ চোখে তপ্ত জল ভরে আসে। প্রাণপণে অন্য দিকে চেয়ে সে-জল সামলে নেয় সে। তার পর গলাটা সহজ করার চেষ্টা করতে করতে অর্ধ-বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'কেন, রাজ-অট্টালিকা না জানলে বুঝি আসতে নেই? যদি মাটির ঘরই হ'ত—তাতে কি তুমি থাকতে পারতে না!'

'না, তা নয়।' একটু যেন অপ্রতিভই হয়ে পড়ে নরেন—যা এর আগে আর কখনও ওকে হতে দেখে নি—বলে 'তা নয়। মনে হ'ত কোন মতে একটু হয়তো মাথা গোঁজার কুঁড়ে ঘর করেছিস—ছেলেমেয়ে ঐন্দ্রিলাটা আছে মেয়ে সুদ্ধ—তার মধ্যে কোথায় আর গিয়ে সেঁধুব! শুধু অশান্তি বৈ তো নয়!'

দুঃখের মধ্যেও ফুট্ ক'রে জবাব দেবার লোভ সামলাতে পারে না শ্যামা, 'থাকতে

তো তুমি কখনই আসতে না। পরের বাড়িতে—তাই তো এসেছ চলে গেছ এমন কতবার। তা নিজের বাড়ি না হয় দেখেই চলে যেতে!'

'না রে—বুঝিস না। শরীর ভেঙে এসেছে। চিত্রগুপ্ত হুলিয়া বার করেছে এবার। কবে বলতে কবে এসে ক্যাঁক ক'রে চেপে ধরবে। এখন একটু একটু সেবা খাবারও লোভ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে এসে পড়লে আর হয়তো নড়তে চাইতুম না!'

আবারও বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে শ্যামার। তাই মনটাকে শক্ত করবার জন্যই বুঝি কর্কশ কথা টেনে আনে মুখে। বলে, 'সাত জন্মের পাপ তোমার—তাই! নিজের বৌ, নিজের ছেলে, নিজের নাতনী—তার মধ্যে এসে থাকবে, একখানা ঘরই বা কি আধখানা ঘরই বা কি! আমরা যেমন ভাবে মাথা গুঁজে থাকতুম তুমিও তাই থাকতে, তোমাকে কি তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত! আপনার তো মনে করতে পারলে না কোন দিন, তার কি হবে!'

নরেন আর জবাব দেয় না, অন্যমনস্ক ভাবে হুঁকোয় টান দিতে থাকে। কল্‌কের আগুন কখন নিভে এসেছে, ভেতরের তামাকও গিয়েছে পুড়ে ঠিক্‌রে হয়ে তা বুঝতেও পারে না।

॥ ২ ॥

হেম যখন রাত্রে বাড়ি ফিরল তখন নরেন রান্নাঘরের দাওয়াতে খেতে বসেছে, শ্যামা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে।

দৃশ্যটা এতই অভাবনীয়—বিশেষত দরজার কাছ থেকে একটা দিক মাত্র দেখা যাচ্ছিল নরেনের, ল্যাম্পোর ক্ষীণ আলোতে সেভাবে চেনা সহজ নয়, আর নরেন এত দিন বাড়ি আসে নি, তাকে দেখার সম্ভাবনাটাও ছিল সুদূর কল্পনার বাইরে—কাজেই হঠাৎ একটা লোককে মা এত যত্ন ক'রে সামনে বসে খাওয়াচ্ছে, অথচ পরিচিত কেউ বলেও মনে হচ্ছে না—চমকে ওঠবারই কথা। হেমও চমকে উঠল। খানিকটা গলা-খাঁকারি দিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেল।

সেই আধা-আলোতে আধা-অন্ধকারে চিনতে পারলে না নরেনও। ওর সেই কাশির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই চমকে উঠল, হাতের গ্রাস হাতেই ধরে ফিরে বসে প্রশ্ন করলে, 'মশাই? চিনতে পারলুম না তো!'

'পোড়া কপাল! এমনি সম্বন্ধই দাঁড়িয়েছে বটে, বাপ ছেলেকে চিনতে পারে না, ছেলে বাপকে চেনে না। ও তো খোকা।'

'খোকা ? ও, আমাদের হেমচন্দর !···এসো এসো বাবাজী, এসো। বাবুই বলি—রোজগেরে বাবু যখন !'

সে আবার ফিরে বসে মুখের গ্রাস মুখে তুলল।

বাপকে দেখে পুলকিত হবার কথা নয়, তবে বাবার কথাবার্তায় এবং মার ধরন-ধারণে সে একটু বিস্মিত হ'ল। এ যেন কেমন অন্যরকম সুর দু'জনেরই গলায়।

হেম আসবার সময় বড়বাজার থেকে খানিকটা ডালের ক্ষুদ কিনে এনেছে—শ্যামা এক-এক-দিন ভিজিয়ে বড়া করে, চালের ক্ষুদের সঙ্গে মিশিয়ে সরুচাকলিও—সেইগুলো নামিয়ে রেখে দাওয়ারই এক পাশে বসল একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে।

'উঃ—কত কাল পরে বাড়ি এলুম, তোমার জননীর হাতের রান্না খাব বলে—তা তোমার গর্ভধারিণী কোথা থেকে গাঁদালপাতার ঝোল রেঁধে বসে আছেন—কাঁচকলা আর ডুমুর দিয়ে। তবে মাগী রাঁধে ভাল, অনেক দিন পরে খাচ্ছি বলে আরও—অমর্ত লাগছে যেন।'

'তা কী করব—রোগটি তো বেশ ধরিয়ে এসেছ—শুধু কাঁচকলার মণ্ড খেয়েই তো থাকা উচিত।'

'তুই রেখে বোস্ দিকি। কাঁচকলার মণ্ড খেয়ে থাকাচ্ছি আমি ! একটা-দুটো দিন—এর বেশী আর এ পথ্যি চলছে না।'

খেয়ে উঠে শ্যামার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে আঁচাতে আঁচাতে বলে নরেন, 'এবার আর একটু তামাক দে বাপু, উনুনে তো আংরা আছেই। বাস্তবিক, কাই বা বলি। একা এক হাতে। তা পুত্রের এবার বিবাহ দাও গিন্নী, আর কেন ?'

'ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না !'

'ছেলে চায় না ! ছেলে আবার চাইবে কি ? আমরা হলুম ওর অভিভাবক, আমরা সম্বন্ধ ঠিক করব—সুড় সুড় ক'রে গে পিঁড়িতে বসবে। ওর চাওয়া-চাওয়ির কি ধার ধারি !'

হেম বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'মা গামছাটা দাও। ঘাটে যাই। আর আমারও ভাত বাড়ো। বাজে কথা শোনবার সময় নেই ওসব।'

'ও,—মিলিটারী মেজাজ ! রোজগেরে বাবু যে। আচ্ছা, হচ্ছে হচ্ছে। মেয়ে

আগে একটা লাগসই খোঁজ করি, তার পর দেখছি। মেজাজ বুঝছি। দে, তামাক দে বাগ্নী।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বাইরের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। ঐখানেই ওর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শ্যামা।

হেম গামছা নিয়ে ঘাটে চলে গেল। তার বিস্ময়ের শেষ নেই। মা'র এত নরম হয়ে আসার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। নরেনের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে এটা দেখেছে সে—কিন্তু সে খারাপ কতখানি তা বুঝতে পারে নি অন্ধকারে। আরও অবাক হচ্ছে সে বিধাতার যোগাযোগ দেখে। আজই রাণী বৌদি বলছিল, 'সত্যি, মেসোমশাইকে কখনও দেখলুম না, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। যে সব গল্প শুনেছি ম'র মুখে আর তোমার দাদার মুখে—দেখবার মত মানুষ বটে। কোথায় থাকেন একটু খোঁজ করো না ভাই—'

'জানলে তো খোঁজ করব। কোথায় থাকেন এক ভগবান ছাড়া কেউ জানে না।'

'আচ্ছা—আসবেন তো এক দিন না এক দিন। খবর পেলেই আমি গিয়ে দেখে আসব, নয়তো ধরেই নিয়ে আসব এখানে। আমি গেলে ঠিক চলে আসবেন দেখো!'

'এনে কি কববে? পুষবে?' হেসে প্রশ্ন করেছিল গোবিন্দ।

'ওমা পুষব কি কথা। মেসোমশাই গুরুজন। মাথায় ক'রে রাখব। তাতে দোষই বা কি?'

'দোষ কিছু নয়। তবে ঘটিবাটি সাবধান। পোষ মানবার মানুষ সে নয়।'

'ছি ছি। কী বল যা-তা কথা। মুখের রাখঢাক নেই! ঠাকুরপো বসে আছে, ওর বাবা তো বটে।...তা ছাড়া ছাখ বয়স হচ্ছে, শরীর ভেঙে আসছে, এবার ঘরমুখো মন হবে,—সেবার দরকার যে এখন!'

কথাগুলো যখন হচ্ছিল হেম তখন একবারও ভাবে নি যে বাড়ি এসেই বাবাকে দেখতে পাবে আর এমন নরম মেজাজে দেখবে। শরীরের অবস্থা খারাপ বলেই হয়তো। সত্যিই এবার হয়তো ঘরমুখো মন হয়েছে। ঐ লোক দিন-রাত বাড়ি বসে থাকবে আর অবিরত বাজে বকবে -মনে হলেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। অথচ মা'র যে রকম ভাবগতিক—এবার তাড়াবার মত মনের ভাব নয়। বোধ হয় একা থাকে বলেই আরও। খবর পেয়ে যদি সত্যিই রাণী বৌদি এসে যায়? সব পারে ও মেয়ে। মুখে হয়তো খুব যত্ন-আত্তি করবে, ভক্তি-

শ্রদ্ধাও দেখাবে, কিন্তু মনে মনে—? ওরই ছেলে মনে করে হেম সম্বন্ধেও কি একটা খারাপ ধারণা হবে না?

কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

অবশ্য রাণী বৌদির বুদ্ধি খুব। বয়স কম হলে কি হবে, অভিজ্ঞতা কারুর চেয়ে কম নয়। মানুষ চেনে খুব। সত্যি এই বয়সে এত জ্ঞান কি করে হ'ল, ভাবতেও অবাক লাগে। আর কী মায়া—সকলকেই যেন আপন ক'রে টানতে চায়।…

'ল্যাম্পো'র শিখাটা হেমন্তের কুয়াশাঘন রাত্রে কেমন যেন আব্‌ছা আব্‌ছা দেখায়। হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাণী বৌদির কথাই ভাবে হেম, মুখহাত ধোওয়া আর হয়ে ওঠে না।

অন্ধকারে উঠানে দাঁড়িয়ে শ্যামা নরেনের সঙ্গে কথা বলছিল—সেইখান থেকেই হেঁকে বলে, 'কী রে, হিমে কতক্ষণ খালি গায়ে থাকবি? এত কিসের মুখহাত ধোওয়া?'

'এই যে যাই।' হেম কোনমতে একটা কুলকুচো ক'রেই জল থেকে উঠে আসে, মুখের ওপরটা ভাল ক'রে ধোওয়ার কথা মনেও পড়ে না।

॥ ৩ ॥

নরেন শ্যামাকে ভরসা দিয়েছিল যে তার সন্ধানে অনেকগুলি ভাল পাত্রী আছে, দুটো-একটা দিন একটু সময়মত নেয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেই সে বেরোবে মেয়ে দেখতে। কিন্তু দুটো-একটা দিন কাটাবার পর—নিয়মমত শ্যামার গাঁদালঝোল ভাত সত্ত্বেও—অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাত-পা আরও ফুলে গেল, ঘর থেকে দাওয়াতে বেরোবার মত শক্তিও আর রইল না।

নরেন বলে, 'বুঝলি বামনী—ভগা, ভগার খেলা এসব। আর দুটো দিন দেরি করলেও পথে মুখ থুবড়ে পড়তে হ'ত। এতটা পথ হেঁটে খোঁজ ক'রে ক'রে আসবার আর শক্তি হ'ত না। নিহাত মা-বাপের পুণ্যের জোর আছে তাই পথের মধ্যে গুয়ে-মুতে পড়ে মরতে হ'ল না। আর তোরও অদৃষ্টে আছে ভোগান্তি।'

আবার কখনও বলে, 'তুই গাঁদালঝোল খাইয়েই আমাকে পেড়ে ফেললি। এ তোর আড়ি-আকোচ আমি পষ্ট বলতে পারি। আমাকে জব্দ করবি বলেই—। আমার হ'ল গে অত্যেচারের দেহ, এ কখনও তোয়াজে ভাল থাকে? এত ক'রে বললুম দুখানা বড়া ভেজে আমাকে একটু বড়ার ঝোল ক'রে দে, নিদেন প্যাজ

কুঁচিয়ে এখনকার একটা নতুন বেগুন পুড়িয়ে দে—তা দিলি নি। খাওয়া তো এবার ঘুচে এল।'

গজগজ করে আপনমনেই। ভাতের থালা দেখলেই ঝগড়া করে—গালাগাল দেয়।

'কী ও—গাঁদালঝোল? কোন গুযোটা খায় দেখি। সরিয়ে নিয়ে যা, সরিয়ে নিয়ে যা। আমি খাব না। উপোস ক'রে প'ড়ে থেকে গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে হব বলে দিলুম।'

আবার খানিকটা হাউ হাউ ক'রে কাঁদে, 'বামনী—অক্ষ্যাম হয়ে এসে তোর দোরে পড়েছি বলেই কি এমনি শোধ নিতে হয়? আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবি? ঐ কি কেউ খেতে পারে?'

'না, তা পারবে কেন। শোথ ধরিয়ে এসে এখন কালিয়ে পোলাও খাবেন। নাও ওঠ, খাও বলছি ভাল চাও তো—নইলে হেম এসে টেনে ঐ পাঁদাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে জ্যান্তে, এত বড় বড় গো-হাড়গেল, খুবলে খুবলে খাবে, উঠে পালাবারও তো ক্ষমতা নেই। ওঠ, খেতে বসো।'

কখনও ধমক দিয়ে, কখনও ভুলিয়ে, কখনও বা ভবিষ্যতের আশা দিয়ে সেই গাঁদালঝোল আর গলাভাতই খাওয়ায় শ্যামা। রাত্রে মরি বাঁচি ক'রে বার্লিরও ব্যবস্থা করেছে, পাড়ার লোকে বলেছে কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ খাওয়াতে—অনেক পয়সার মায়া ত্যাগ ক'রে তাও পেড়েছে সে গাছ থেকে, তবু যেন দিন দিন শয্যাগতই হয়ে পড়ছে নরেন।

শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ডাক্তার-বদ্যি একটা কিছু না দেখালেই নয়। অথচ পয়সা খরচা ক'রে ডাক্তার দেখাবার কথা এখন ভাবাও যায় না—মাথার ওপর 'অম্বুমর' দেনা। পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি বই দেখে একটু আধটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন—তিনিও নাকি আজকাল আট আনা ভিজিট করেছেন, এক আনা ক'রে ওষুধের পুরিয়া। তাই যদি খরচ করবে তো পাল্কি ভাড়া ক'রে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাবে না কেন? মৌড়ীর হাসপাতাল যাওয়া-আসা এক টাকা বেট, তেমন দরদস্তুর করলে বারো আনাতেই রাজী হয়ে যায়। কিন্তু সে-ও ঢের। ওদের যা অবস্থা, মরণাপন্ন রোগীর ক্ষেত্রেও বিবেচনা করতে হয়। সদ্য তরুর বিয়েতে দেনা আরও বেড়েছে জামাইয়ের কাছে, শোধের উপায় একান্ত সীমাবদ্ধ।

কিন্তু হেম অবধি চিন্তিত হয়ে পড়ে। শেষে একটা রবিবার দেখে কোনমতে

.র ধরে রাস্তার ধারে বসিয়ে বসিয়ে—বলতে গেলে সম্পূর্ণটা বয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে হাজির করে। তারা একটা মিক্সচার দেয়, আর কি বড়ি। চিঁড়ের মণ্ড, সিঙ্গি মাছের ঝোল পথ্য ব্যবস্থা।

ওখানে ওরা এসে বসে আছে কার মুখে খবর পেয়ে অভয়পদ ছুটে এল। তাদের বাড়িতে নিয়ে রাখবার প্রস্তাব করলে সে। কাছাকাছি থাকলে হাসপাতালে দেখাবার সুবিধা হবে—এই তার যুক্তি। কিন্তু হেম রাজী হ'ল না। বাবাকে তার খনও বিশ্বাস হয় না, শুধু বোন ভগ্নিপতি হলেও কথা ছিল, বাড়িতে আরও পাঁচজন আছে, দুর্গাপদর নতুন বৌ, মেয়েরা একজন না একজন সপরিবারে থাকেই মিছিমিছি তাদের কাছে কুটুমবাড়িতে থাকতাই।

নরেন নিজেও রাজী হ'ল না অবশ্য, 'না বাবাজী, শরীরের যা অবস্থা হয়েছে —হয়তো মাঠে ঘাটে যাবার অবস্থাও থাকবে না বেশী দিন। সেখানে মাগী করতে বাধ্য কিন্তু এখানে কে ওসব করবে বল? ভবসার মধ্যে তো কন্যা—তা তারও তিন-চারটে নেণ্ডিগেণ্ডি, সেইসব সামলাবে না সংসারের কাজ করবে—না আমাকে দেখবে!...না, এখন থাক, একটু সেরে উঠি তার পর বরং এসে তোমাদের বাড়ি প্রসাদ পেয়ে যাব।'

ফেরার পথে কিন্তু ওভাবে আর ফিরতে দেয় না অভয়। একটা পাল্‌কি ডেকে তাতে তুলে জোর করে ভাড়ার পয়সাটা হেমের হাতে গুঁজে দেয়।

অনেক দিন অনেক কিছুই এই ভগ্নিপতির হাত থেকে হাত পেতে নিতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মিছিমিছি এই সামান্যর জন্য প্রতিবাদও বেশী করতে ইচ্ছা হ'ল না। আট আনা পয়সা হাত পেতেই নিলে।

অভয়ের মুখে খবর পেয়ে মহাশ্বেতা এল বিকেলবেলা বাপকে দেখতে। তার অভ্যাসমত কোলে একটা ও হাতে একটা ছেলে নিয়ে।

নরেন তখন এক ছিলিম তামাক নিয়ে বাইরের রকে এসে বসেছে কিন্তু হুঁকোয় টান দিতে পারছে না—দুপুরের খাওয়ার পর সন্ধ্যে অবধি হাঁপানির ভাবটা থাকে বড় বেশী—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। মহাশ্বেতা এসে প্রণাম ক'রে ছেলেদের বললে, গড় কর সব - বেশ ক'রে পায়ে হাত দিয়ে গড় কর!'

নরেন অবাকও হ'ল, ব্যস্তও হয়ে উঠল।

কে মা আপনি—কৈ আপনাকে তো - ও আপনি বুঝি এই চটখণ্ডীদের কেউ হন? না কি চৌধুরীদের? মানে আমি তো ঠিক থাকি না এখানে—'

মহাশ্বেতা এতখানি জিভ কাটে।

'পোড়াকপাল। ছেলেমেয়েদেব পব ক'রে দিতে হয় বলে কি এমনি ক'বেই পর করতে হয়। নিজের মেয়েকেও চিনতে পারলে না। আমি যে মহা।'

'অ, মহা। বেশ বেশ, বড খুশী হলুম। হ্যাঁ, জামাইয়ের সঙ্গেও দেখা হ'ল যে। মহা ভক্তিমান ছোক্‌বা। সেই হাসপাতালেই প্রণাম ক'রে পাযেব ধুলো নিলেন। এই যে আমার পুত্র, হেমচন্দ্র, কৈ একদিনও তো দেখি না একটা কাঠি ক'রে একটু পাযে হাত দিতে। কলি, কলি—ঘোব কলি। না-ই বা রইলুম বাড়িতে, জন্মদাতা পিতে তো বটে। না, জামাইযেব ভাল হবে, খুব উন্নতি হবে—মানুষেব মত মানুষ। নিযে যেতে চাইছিলেন বাডিতে—বলছিলেন, ওখানে থাকলে হাসপাতালে দেখাবাব সুবিধে হবে। হেমচন্দ্রেবও তাই ইচ্ছে ছিল—বুঝলে না, যা শত্রু পবে পরে—কিন্তু আমি বাজী হই নি, বলি, আমাব তো একটা বিবেচনা আছে। সেখানে সে মেয়েটা কতকগুলো এণ্ডা বাচ্ছা নিযে নাটা-ঝাপ্‌টা খাচ্ছে, তার মধ্যে গিয়ে উৎপাত বাড়ানো। আমি বাজী হই নি।'

তার পর নিবস্ত হুঁকোতেই গোটা দুই টান দিযে একটা হাক দেয, 'বৈ গো গিন্নী, কোথায গেলে গো, একটা আসন টাসন দাও—এঁবা সব দাডিযে বইলেন যে। দেখছেন তো, দেখছেন তো মাগীব বিবেচনা, চিরকাল এই ক'বে আমার হাডমাস জ্বালিয়ে খেলে। বিবেচনা বলতে কিছু নেই। আপনাবা এসে দাঁড়িযে বইলেন—একটা আসন দেবে কি কিছু—। তা ববং এখানে বসতে পারেন, বিলিতী মাটিব মেঝে, দিব্যি পোস্কার।'

'ও মা, আমাকে আবাব আপনি আজ্ঞে কবছ কি গো। বললুম না আমি মহা—।'

'হ্যাঁ হ্যা—তা কি আব আমি বুঝি নি। বলি আমাব তো আব ভীমবতি হয় নি। কবতে হয, ছেলেমেযেকেও আপনি-আজ্ঞে করতে হয। ছোটটি থাকে যখন তখন তুইতোকারি চড চাপড—বড হলে একটা অন্য ব্যবস্থা—। বোস বোস, এই তোরা বোস না সব ?'

ছেলে দুটো কোনমতে আড়ষ্ট হয়ে বসে সামনে। মহাশ্বেতা কিন্তু এক দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। শ্যামা তখন রান্নাঘরেব দাওযায বসে নারকোল পাতা চাঁচছে—সেখানে গিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'ও গো মাগো, বাবার যে পুরো ভীমবতি গো—আমাকে বলে আপনি, বলে বসুন—বাবা আর বাঁচবে না এ যাত্রা।'

বলেই ভ্যাক্ ক'রে কেঁদে ফেলে মহাশ্বেতা।

নিজের মনের আশঙ্কাটা মেয়ের মনে প্রতিধ্বনিত হতে দেখে শ্যামার বুকটাও ঝক ক'রে ওঠে হয়তো—কিন্তু সে বিরক্ত মুখেই বলে, 'ও আবার কি, এখন থেকেই প্যান প্যান করছিস কেন।…খেলে যা। এরকম অসুখ বিসুখ করলে মাথার একটু গোলমাল হয়ই। আর যদিই বা তাই হয়, তাতেই বা এখন থেকে কান্নাকাটির কী হয়েছে। যা গুণের মানুষ। দুঃখে শ্যাল-কুকুর কাঁদবে।'

'ও মা—তা বলে—বাপ তো। কী যে বল। মানুষের জীবনে—পিতা স্বর্গ।'

'হয়েছে, হয়েছে—থাম। তোকে আর শাস্তর থগবগাতে হবে না।'

মহাশ্বেতাকে বেশী বলতে হয় না, সব বিষয়েই তার শিশুর মত কৌতূহল। সে আবার এক ছুটেই বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় নরেনের কাছে—

'এই যে, কোথায় গিছ্‌লি আবার। বোস বোস—এখানেই বোস। পোল্কার জায়গা—সকালেই মুছে দিয়েছে, তোর গর্ভধারিণী। তাই বলছিলুম এই শালাদের, দাদামশাইকে দেখতে এসেছিস—কী নিয়ে এসেছিস বল। · এবার যখন আসবি—মোড়ের দোকান থেকে খাস্তার গজা আর বাজার থেকে ঝাল ফুলুরি নিয়ে আসিস। বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাস নি, সাত শো রাক্ষুসীর খপ্পরে গিয়ে পড়লে আর আমি পাব না, গোরবেটার-জাতদের নুনতেল দিয়ে খাওয়াবে সব। আমাকে এইখানে চুপিচুপি দিয়ে যাস, আমি ঐ পাতার গাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখব।'

মহাশ্বেতার চোখ কপালে ওঠে প্রায়, 'ও কি গো। তুমি তেলে-ভাজা ফুলুরি খাবে কি গো। আর ঐ বাজারের খাস্তার গজা। তোমার যে শোথ রোগ হয়েছে।'

'চুপ চুপ, গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন। মাগী শুনতে পাবে যে। মিছে কথা, ওসব মিছে কথা। বুঝলি? ডাক্তারদের বাজে কথা যত সব। আমাকে না খেতে দিয়ে মারবার ফন্দি। মাগীর সঙ্গে ষড় করেছে গোরবেটারা। কিন্তু না, একটু হাঁপানির মত হয়েছে তাই, আর অনেক দিন তো পোষ্টাই কিছু খাই নি—হাত-পাগুলো একটু ফুলেছে। শুনেছি ভালমন্দ খেলে সেরে যায়। মাগীর গাঁদালঝোল খেয়ে খেয়ে পাইখানাটা একটু ধরেছে, বুঝলি না, এখন এই হাঁপানিটা সারলেই—তোর বাড়ি চলে যাব। জামাই তো বলেইছেন—।'

এই বলে খানিকটা আবার বসে বসে হাঁপায়। হুঁকোটায় টান দেয়—কিন্তু সেখানে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেটা দরজার কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বসে বসেই মেয়ের কাছে এগিয়ে আসে খানিকটা। চুপি চুপি বলে, 'ওঃ, কত কাল যে যজ্ঞিবাড়ির খ্যাঁট জোটে নি। ভেবেছিলুম হেমচন্দরের বিয়েতে পাঁচটা দিনের খ্যাঁট জুটবে—এই তো ধর না দু দিন পাকা দেখা—দু বাড়িতে দু দিন, তার

পর এক দিন বে আর এক দিন বৌভাত আর পরের দিন বাসি-যজ্ঞি। আজকাল ঠাণ্ডার দিন, কিচ্ছু খারাপ হয় না। গরম ক'রে ক'রে রাখলে তিন দিন থাকে।··· আপনাদের তো অনেক জানাশুনো—দিন না একটা, ভাল বংশের মেয়ে দেখে। ও আমার রূপ চাই নি। রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব! সোন্দর মেয়েদের বরাত ভাল হয় না। এই যে আমার ব্রাহ্মণী, বললে বিশ্বাস করবেন না—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত রূপ ছিল—কী বরাত কি বলব। আমার সাজানো সংসার—কুবেরের ঐশ্বর্য, মাগীর পয়ে সব যেন ফুস্‌মন্তরে উড়ে গেল। বংশ দেখে মেয়ে আনতে হয়, বংশ আর চালচলন দেখে। মানে একটু লক্ষ্মীছিরি থাকে এই আর কি! তা তেমন মহৎ-বংশের মেয়ে হলে লক্ষ্মীছিরি একটু থাকবেই। তবে পাওনা-থোওনা—তা অবিশ্যি কিছু দিতে হবে—হেমের গর্ভধারিণী যে শুধু হাত মুখে তুলবেন, তা মনে হয় না। দিন না একটু ভাল দেখে মেয়ে—আমি এই মাসেই দিয়ে দিই—'

'ও হরি! তুমি খ্যাঁট খাবে কি গো বাবা, তোমার যে পুরোদস্তুর ভীমরতি হয়েছে। তুমি আবারও আমাকে আপনি বলছ! এ তো মনে হচ্ছে তোমার আর বেশী দিন নয়—বুঝতে পারছ না!'

'আ গেল যা। গোরবেটার জাত হারামজাদী মেয়ে আমার কল্যেণ আওড়াতে এলেন! আমার মরণ টাকছেন বসে বসে। যা দূর হ—আমার সামনে থেকে, এ শোরের পাল সরিয়ে নিয়ে যা! হবে না, কেমন বংশের বৌ! আবাগী সব্বনাশী আমার ভীমরতি দেখছেন। তোর ভীমরতি হোক, তোর সোয়ামীর হোক, তোর গুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের হোক। আমার কেন হতে যাবে!'

'ওমা—এ যে একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে যে! আমি ভাবছি ভীমরতি। চলে আয় চলে আয়। পালিয়ে আয়।'

ছেলে দুটোর হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে চলে যায় মহাশ্বেতা।

মাকে গিয়ে বসে, 'কী সব কবিরাজী তেল পাওয়া যায় তাই বাবাকে লাগাও গে, এ যে একেবারে পাগলের অবস্থা!'

শ্যামা সন্ত-চাঁচা কাঠিগুলো গোছ ক'রে নারকেল পাতারই একটা সরু ছোটা দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে গম্ভীর মুখে বলে, 'তোমার এত টান থাকে আর পয়সার জোর থাকে তুমি মাখাও গে মা—আমার এত ক্ষ্যামতা নেই। আর ইচ্ছেও নেই—সত্যি কথা বলতে কি। ঐ মুখে ভাত যে বেড়ে দিচ্ছি এই ঢের!'

মহাশ্বেতা অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'না—ও একটা কথার কথা বললুম। বলছি যে পুরোদস্তুর ভীমরতি দেখছি বাবার।'

'তা হবে। কী আর করব বল। যতটুকু যা সাধ্যে কুলোচ্ছে করছি। করবার কথা নয়—তবু করছি।'

'তা বলছ কেন', হাত-পা নেড়ে বলে মহাশ্বেতা, 'করা উচিতও তো। হাজার হোক তোমার সোয়ামী, আমাদের বাবা। বলি এ তো ফেলবার সম্পর্ক নয় গো!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। তোমার কাছ থেকে আর এই মরবার কালে উচিত অনুচিত শিখতে চাই না। আয় রে তোরা—দুটো নাড়ু খেয়ে যা।'

আগের দিন ক্ষুদভাজা গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে নাড়ু ক'রে রেখেছিল, তাই বার ক'রে দেয় শ্যামা নাতিদের।...

মায়ের তিরস্কার মহাশ্বেতা কোন দিনই গায়ে মাখে না, আজও মাখলে না। তা ছাড়া তার তখন কৌতূহলও প্রবল। সে আবারও বাইরে এসে দাঁড়াল। তবে খুব কাছে নয় এবার—একটু দূরে দাঁড়িয়েই বাপের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগল। শিশুর মতই তার কৌতুক আর কৌতূহল।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নরেনের দৃষ্টি এড়ায় নি।

সে একটু এগিয়ে রকের ধারে এসে বসল।

'ও কে? মা মহা, এদিকে এস মা, কাছে এস। ও কখন কি বলে ফেলি—শোকাতাপা মানুষ, অত ঠিক থাকে না। ওসব গায়ে মাখতে নেই। মরুক গে যাক্—বুঝছ না মা—পরের সঙ্গেই তো জীবনটা কাটল, আপনি বলে বলেই অব্যেস। পরদারেষু মাতৃবৎ—বুঝলে না, হাজার হোক আমরা গুরুবংশের ছেলে, এসব শিক্ষা যে বলতে গেলে আমাদের মাতৃগব্ভ থেকে পাওয়া। আপনি শব্দটাই আগে বেরোয়। তা ও কিছু নয়—বলছিলুম কি, মেয়ে একটা দেখতে। তোমাদের তো রাবণের বংশ, আর ও কলমির দল, একটা ডগায় টান দিলেই দেখবে সেই কত দূর থেকে আসছে। সদ্‌বংশের একটি মেয়ে এনে দাও আমাকে, আমার জ্যেষ্ঠপুত্তুরের জন্যে।'

'ও মা—তা মেয়ে মেয়ে ক'রে তো হেদিয়ে গেলে, ছেলে তোমার যে পিঁড়েয় বসতে চায় না। ওর ভগ্নিপোত পঞ্জন্ত বলেছিল, মা তো কত ক'রে বলে—ওর একেবারে ধনুকভাঙ্গা গোঁ—আর যা বল বল, বে করতে বলো নি।'

নরেন একটা অশ্রাব্য কটূক্তি ক'রে ওঠে।

'রেখে দে দিকি তোর গোঁ। তুই মেয়ে দেখ্—মেয়ে পছন্দ হলে ওর ঘাড়কে দিয়ে বে করাব—ও তো ছেলেমানুষ। ও কেন, ওর চোদ্দপুরুষ যে করবে। ছঁঃ!

ধনুকভাঙ্গা পণ। গোরবেটার জাতের ঘাড় ধরব—পিঁড়েয় নিয়ে গে বসাব। মিলিটিরী মেজাজ, ওসব মিলিটিরী মেজাজ আমি ঢের দেখেছি। আমার মেজাজও কম নয়। ভাল আছি তো আছি—রাগলুম তো বাপের কুপুত্তুর। আমাকে চেনে নি এখনও! আপনি মেয়ে দেখুন। তার পর আমি আছি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় নরেন, দু পা এগিয়েও আসে। কিন্তু তার পরই পা দুটো অতিরিক্ত দুর্বল বোধ হওয়ায় রকের সিঁড়ির ওপরই বসে পড়ে ধপ ক'রে।

॥ ৪ ॥

হাসপাতালের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও নরেনের অসুখ ক্রমাগত বেড়েই যেতে লাগল। বার বার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাধ্য—তবু পর পর দুটো রবিবার হেম পাল্কি ক'রেই নিয়ে গেল, শ্যামার নিষেধ সত্ত্বেও। কিন্তু তাতেও সুস্থ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আর বেশী পয়সা খরচ করা ওদের ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া নরেনকে নিয়ে যাওয়ার বিপদও আছে। সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হলেই হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেয়—তখন যদি বা ধমক দিয়ে চুপ করায় হেম, ডাক্তাররা দেখার সময় তাদের মুখের উপরই গালাগাল দিতে শুরু করে। লজ্জার শেষ থাকে না। তা ছাড়া নরেনের ও ওষুধের ওপর খুব আস্থাও নেই। অগত্যা ওরা টোটকার ওপরই সমস্তটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। যে যা বলে—নরেনের নিজেরও অনেক রকম জানা ছিল—এটা ওটা ওষুধ এবং পথ্য পরীক্ষা চলে।

এর মধ্যে দু-একবার বিয়ের কথা তুলেছিল নরেন—হেম বেশির ভাগ সময় জবাবই দেয় নি, দিলেও মৃদু ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। 'মিলিটারী মেজাজ', 'রোজগেরে বাবুর মেজাজ' ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও তার বেশী কিছু বলতে সাহস করে নি আর। কিন্তু সেই ঝালটা এবং তম্বিটা গিয়ে পড়তে শুরু হ'ল শ্যামার ওপর। শ্যামা ছেলে মানুষ করতে পারে নি, সভ্যতা সহবৎ শেখাতে পারে নি, গুরুজনদের কাছে কি রকম নম্র ও বিনত হয়ে থাকতে হয়—তা একটুও শিক্ষা পায় নি ছেলেমেয়েরা—বিয়ের কথায় ছেলেমেয়ের নিজস্ব মত থাকা এবং প্রকাশ করাটা নাকি সর্বপ্রকার শিক্ষা-সভ্যতার বাইরে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

শ্যামা অনাবশ্যক বোধেই এ সবের জবাব নেয় না। তার অসংখ্য কাজ, দিনেরাতে কাজ করার সময় আঠারো ঘণ্টার বেশী নয়—এটা সে হিসেব ক'রে দেখেছে। সুতরাং এই সামান্য সময়ের মধ্যে পাগলের সঙ্গে বাজে বকে যদি দুটো

মনিটও নষ্ট হয় তো সেটা গায়ে লাগে। কিন্তু সে গায়ে না মাখলেও এক দিন এই ধরনের তম্বি হেমের কানে যেতে সে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠল; রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বসে বকছিল নরেন, সেখান থেকে একটা কনুই ধরে হিড হিড করে টানতে টানতে একেবারে বাইরের ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'ফের যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাজে বকতে থাক কি ঐ সব কথা তোল তো একেবারে এমনি টেনে নিয়ে গিয়ে সরস্বতীর ধারে ফেলে দিয়ে আসব জ্যান্তে। এ বাড়িতে আর তোমার জায়গা হবে না—মনে রেখো।'

তার পর থেকেই—যেন নিজের শারীরিক দৈন্য এবং একান্ত পরনির্ভরতা উপলব্ধি ক'রেই একেবারে চুপ ক'রে গেল নরেন। হেমের আড়ালেও এ প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করত না আর।

মাঘ মাস নাগাদ একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ল সে। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে অন্তত হামাগুড়ি দিয়ে দিয়েও বাইরে যাচ্ছিল—আর সেটুকু ক্ষমতাও রইল না। ফলে শ্যামার ঝঞ্চাট আরও বাড়ল। অসংখ্য কাজের মধ্যে দিনেরাতে বহুবার গিয়ে পুকুরে ডুবে আসতে হয়। মাথার সে একঢাল চুলের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তার—সামনে তো প্রায় টাক পড়বার মতই হয়েছে—তবু যা আছে—দিনরাত ভিজে ভিজে দুর্গন্ধ ছাড়ে, শরীর খারাপ হয়।

এ সবই লক্ষ্য করে হেম—কিন্তু কী যে করবে তা ভেবে পায় না। ঐন্দ্রিলা এর মধ্যে কয়েক দিনই এসেছিল। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখেই সরে এসেছে—বাপের কাছেও যায় নি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শ্যামা বলতে গিয়েছিল, 'দু-চার দিন এসে থাক্ না—আমি যে আর পারছি না।' তার জবাবে সটান বলে দিয়েছে সে, 'হ্যাঁ, এখন আসি আর ঐ বুড়োর-গু-মুত ছিষ্টি সেবার ভার আমার ঘাড়ে ফেলে দাও। ওখানে আছি ঐ এক কড়ারে। রান্নাবান্না যা দাও করব—কিন্তু শাশুড়ীর সেবা আমার দ্বারা পোষাবে না। সেবা যা একজনের করেছি সে-ই ঢের, আর করার সাধ নেই!'

হেমকে কিছু বলে না শ্যামা। তার ভয় হয়—বলতে গেলে হয়তো জবাব দেবে, 'তুমি করছ কেন? ওর ওপর আমাদের কিসের এত কর্তব্য? যেখানে ছিল এত কাল সেখানে যাক না!'...

শ্যামা কিন্তু এখনও—এত কালের এত দুর্ব্যবহারের পরও—কেমন একটা মমতা অনুভব করে লোকটা সম্বন্ধে, এখন যদি সে না দেখে তা হলে সত্যিই হয়তো কোন্ পাঁদাড়ে গিয়ে পড়ে থাকবে, জ্যান্তেই শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে! ...

এরই মধ্যে অকস্মাৎ একদিন—ররিবার সেটা, সকালে বসে হেম দাড়ি কামাচ্ছে —নরেন ডাকলে, 'বাবা হেম, হেমচন্দর। একবারটি এখানে আসবে বাবা?'

কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন। হেম একটু ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

'একটু কাছে এসো বাবা হ্যাঁ —এইখানটায়।'

একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একেবারে বিছানার ধারে গিয়ে বসতে হয়। শ্যামা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে—ক্ষার কাচার তার বিরাম-বিশ্রাম নেই—তবুও রোগশয্যার কেমন একটা গন্ধ আছেই, একটা অস্বস্তি বোধ করে হেম।

নরেন কনুইতে ভর দিয়ে আধ-বসা ক'রে উঠে সহসা ওর হাত দুটো দু হাতে চেপে ধরে, তার পর হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে—কতকটা ডাক ছেড়েই।

'কী হ'ল কী হ'ল।' ব্যস্ত হয়ে ওঠে হেম। শ্যামাও ছুটে আসে।

'বাবা হেম, আমি তোমার অক্ষ্যাম পিতা, আমি পশু, পশুরও অধম। তবু আমি তোমার জন্মদাতা, গুরুজন। তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি বাবা, তুমি একটি বিবাহ কর। মরবার আগে বৌমার মুখখানি দেখে যাব—জল পিণ্ডের ব্যবস্থা হ'ল জেনে নিশ্চিন্তি হয়ে যাব—এ আমার বড় সাধ। এ না হলে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছি না যে বাবা। আমাকে এই ভিক্ষেটি তুমি দাও।'

আবারও হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে নরেন। দু হাতে চেপে ধরা হেমের হাতের ওপর নিজের কপালটা ঠোকে।

'আরে, আরে। এ কী বিপদ! আচ্ছ, আচ্ছা, সে হবে, চুপ কর। চুপ কর। মাথা খারাপ হযে গেল নাকি। চুপ চুপ।'

বিব্রত হেম কী বলবে যেন ভেবে পায় না।

কোনমতে হাত দুটো টেনে ছাড়িয়ে নিযে বাইরে চলে আসে সে। হাত দুটো কেমন একটা চিনচিন করছে যেন—বিশেষ ক'রে বাপের চোখের জল লেগে আছে যেখানে—সেইখানটায়।

শ্যামা তাকিয়ে দেখে ছেলেরও চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, ছলছল করছে। ওর সঙ্গে চোখোচোখি হতে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নেয়, দাড়ি কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্যামা লক্ষ্য করে, তখনও সে ভাল ক'রে ক্ষুরটা ধরতে পারছে না—হাত দুটো কাঁপছে তখনও।...

সেই দিনই সে পাড়ার ফটিকের ভাইকে দিয়ে মহাকে ডেকে পাঠায়। ছেলের মত হয়েছে—এবার উঠে পড়ে পাত্রীর খোঁজ করুক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ব্যাপারটা ঘটে গেল হঠাৎই। সে-ও একটা রবিবার, রবিবার হলেই হেম একটু সেজেগুজে কলকাতায় যেত—অফিস যাওয়ার কাপড়জামা সেদিন ক্ষারে কাচা হ'ত—কাজেই ওর সেই দেশী কাপড়, আর পাম্পশু জুতো পরা ছাড়া উপায় থাকত না। শীতকাল হলে তার সঙ্গে সেই জার্মানির শাল। সেদিনও সেই বেশেই বেরিয়েছিল। বড় মাসীমার বাড়িতে এসে দেখলে এক গাদা লোক, ছোট দুখানা ঘরে থৈ থৈ করছে, রাণীবৌদির বাপের বাড়ি থেকে এসেছে সব। সুতরাং সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। ছোট মাসীর কাছেও ঠিক যেতে ইচ্ছা হ'ল না—মার সেই কাণ্ডর পর থেকে একটু লজ্জাও করে বটে—তা ছাড়া সেখানে গেলে যেন বড় তাড়াতাড়ি কথা ফুরিয়ে যায়। একটু পরে বলবার মত আর কথা থাকে না। আর কোথায় যাওয়া যায়—ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল অনেক দিন থিয়েটারের পাড়ায় যাওয়া হয় নি—গেলে কেমন হয়? গেট-কীপাররা সব বন্ধু, ওকে গিয়ে পাস লেখাতেও হবে না; তা ছাড়া থিয়েটার না দেখলেও—অনেক রকম গল্পগুজব আছে—একটা ভাল রকম আড্ডা জমানো যেতে পারে।

মনে হ'ল বটে—সেই ভেবেই বড় মাসীমার বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে ওদিকের রাস্তা ধরলে—তবু একটা সংকোচ থেকেই গেল মনে মনে। আবার ঐ সংসর্গ, ঐ মেয়েমানুষটার প্রসঙ্গও হয়তো উঠবে, হয়তো তাকে দেখতেও হবে—সবটা ঠিক রুচিকর হবে কিনা এই রকম একটা দ্বন্দ্ব চলতে লাগল মনে মনে। তাই গতিটা হয়ে গেল মন্থর, কতকটা বেড়াতে বেড়াতে যাবার মতই আস্তে আস্তে পথ চলতে লাগল। তবু, যত আস্তেই চলুক, এক সময় সেই বিশেষ রাস্তাটায় এসে পৌঁছল। এবার পা-টা যেন আরও ধীরে পড়তে লাগল, যা-হয় এখনই মন স্থির করতে হবে—যাবে না ফিরবে—আর সেই ভাবেই অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বিয়েবাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

প্রচণ্ড চারতলা বাড়ি, ফুটপাথের ওপর পর্যন্ত লাল ভেলভেটের কানাত দিয়ে ঘেরা, ওপরে রসুনচৌকির ঘর, লোকজন, সমারোহ—সবটা গমগম করছে। ফুটপাথ ধরে চলছিল, কানাত-ঘেরা জায়গাটায় বাধা পেতে চেয়ে দেখতে হ'ল—বিয়েবাড়ি তাও বুঝল—এবং রাস্তায় নেমে ঘুরেও আসতে হ'ল। কিন্তু

গতিটা বাড়ল না। সেই ভাবেই অতি ধীরে ধীরে—মানুষ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা অনিচ্ছায় যখন কোথাও যায় তখন যেভাবে চলে সেই ভাবেই বিয়েবাড়ির পর্দায় তৈরী ফটকটার সামনে এসে পড়ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় কর্মচারী গোছের দু-চারজন, তাঁরাই হঠাৎ 'আসুন আসুন' বলে যেন কলরব ক'রে উঠলেন, কোথা থেকে একটা একহালি বেল ফুলের মালা গলায় এসে পড়ল, একটি ছেলে গোলাপজলের পিচকিরি দিয়ে মাথাটা প্রায় ভিজিয়ে দিলে এবং তারই মধ্যে একজন হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলেন ভিতর দিকে। সবটা এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল—এমন অতর্কিতে যে—ঘটনাটা কী ঘটছে ভাল ক'রে বোঝবারও সময় হ'ল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দু-তিনটে বড় বড় গাড়ি এসে থামল, সম্ভবত তা থেকে নামলেন সম্মানিত বরযাত্রীর দল, 'আসুন আসুন' 'আসতাজ্ঞে হোক' রব উঠল চারিদিকে, বাড়ির মধ্যে থেকে মোটা মোটা কর্মকর্তারা বেরিয়ে এলেন এবার অভ্যর্থনার জন্য, আর সেই গোলমাল গণ্ডগোল ভিড়ের মধ্যে কতকটা ঘটনার স্বাভাবিক স্রোতেই হেম গিয়ে পড়ল ভেতরের উঠানে—যেখানে চক-মেলানো ক'রে চেয়ার পাতা—আরও বহু নিমন্ত্রিত অভ্যাগত যেখানে বসে আছেন—সেইখানে। কতকটা অভিভূতের মতই, তারই একখানাতে গিয়ে বসল সে।

যখন এই অনিবার্য গতি বন্ধ হ'ল – অর্থাৎ থিতিয়ে বসতে পারল তখনই প্রথম ব্যাপারটা কী ঘটল একটু ভেবে দেখবার অবসর মিলল ওর।

প্রথম যে অনুভূতিটা হল ওর, সেটা কৌতুকের—মনে হ'ল এতো মজা মন্দ হল না—কোথায় যাচ্ছিল, কোথায় এসে পড়ল, এ যেন কোথা দিয়ে কী একটা হয়ে গেল। তার পর ভয় করতে লাগল। যদি কেউ চিনতে পারে, যদি কেউ এসে প্রশ্ন করে, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে?' যদি তাই নিয়ে কোন শোরগোল ওঠে, তখন সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইবে, সবাই দেবে ধিক্কার – সে বড় অপমান। অনেক সময় বিয়েবাড়িতে অনেক চুরিও হয়, তখন সবাইকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলে—সেই সময়ই ধরা পড়ে যায়, কারা রবাহূত অথবা অনাহূত। যে অনিমন্ত্রিত এসেছে বলে ধরা পড়ে, তাকেই সবাই সেক্ষেত্রে চোর ভাবে – চোর না হ'লেও।

এই সেদিনই গোবিন্দ গল্প করছিল—ওর এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে এক ছাদ লোক খেতে বসেছে, তার মধ্যে বন্ধুর মামা, দেখেই মন হয় খুব দুঁদে লোক—এসে একজনকে ধরলেন, 'আপনি কে মশাই, আপনাকে তো চিনলুম না! আপনি বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী? ও বেয়াই মশাই, এদিকে আসুন তো—ইনি কি

আপনাদের নিমন্ত্রিত কেউ ? দেখুন তো ভাল ক'রে !' তার পর বরপক্ষের তিন-চারজনকে দিয়ে সনাক্ত করানো হয়ে গেলে তিনি কন্যাপক্ষকে ডাকলেন, 'ওহে ও ভবতারণ, এসো দিকি এদিকে—এঁকে কে নিমন্ত্রণ করেছে ? চেনো নাকি এঁকে ? অরুণ কোথায় গেল—অরুণ তোমরা এঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলে ? দেখ তো ভাল করে—' ইত্যাদি। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। তবে নাকি যে খেতে এসেছিল সে খুব চতুর—সে আসবার আগে সেই রাস্তাতেই আর একটা বিয়েবাড়ি দেখে এসেছিল—সে এক ডাক্তারের বাড়ি, দোরের বাইরে মার্বেলে নাম লেখা আছে—সুতরাং নাম জানবার কোন অসুবিধা নেই—সে বললে, 'কেন, এটা ডাঃ সামন্তর বাড়ি নয় ? ডাকুন না তাদের কাউকে—' এই বলে অব্যাহতি পেয়ে গেল। তাও সে চলে যাবার সময় তাকে শুনিয়েই মামা বললেন, 'ভাগ্যিস দোরের বাইরে নামটা দেখে এসেছিল—খুব পার পেয়ে গেল। তাও ভজাভজি করতে পারতুম, কে আবার অত কাণ্ড করে—তাই ছেড়ে দিলুম। তা ব্যাটা চালাক খুব, দেখেছ ভবতারণ, ফাঁদে পা দিলে না। ডাক্তারের নাম করলে না—তা হলেই চেপে ধরতুম, ডাক্তার তো মারা গিয়েছে—অনেকে আবার ঐ রকম ভুল ক'রে বসে কিনা—ঠিক জানে না বলেই বললে তাদের কাউকে ডাকুন না! যা ব্যাটা যা—খুব বেচে গেলি !'

কন্যার বাবা ভবতারণবাবু নাকি বলেছিলেন মৃদু কণ্ঠে, 'কেন দাদা, এত কাণ্ড করলেন, বেচারী এক পেট খেতেই তো এসেছিল। আমি বুঝেছিলুম, কিছু বলি নি।'

তাতে মামা জবাব দিয়েছিলেন, 'না হে বোঝ না—এদের মধ্যেই এমনি করেই সব চোর আসে। একবাড়ি লোক, চারদিকে জিনিস, যদি কিছু খোয়া যায় ? তখন তো হায় হায় করবে !···না, না, ওসব মায়া করা কাজের কথা নয়। আর বুঝলেন প্রসাদবাবু, আমি যেন এই করতেই আছি। এই অপ্রিয় কাজটি আমাকেই করতে হয় চিরকাল। আর আমার চোখে কি ঠিক ধরাও পড়বে। মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি যে—!'

কথাগুলো সব পর পর যেন বইয়ের পাতায় পড়বার মত ক'রে মনে পড়ে যায় হেমের। নিমেষে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘেমে ওঠে সে। সব কর্ম-বাড়িতেই ঐ রকম চৌকশ দু-চারজন লোক থাকে, এ তো বড়লোকের বাড়ি, বৃহৎ আয়োজন, বহু লোক—তার মধ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞ লোকও হয়তো অনেক।···শেষে কি দারোয়ানের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে বেরোতে হবে এখান থেকে ?···তার চেয়ে সরে পড়াই ভাল এই বেলা, মানে মানে। কী করবে, 'একটু ঘুরে আসছি' বলে

বেরিয়ে যাবে?···'না, আমাদের আর সব কই?' বলে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবে—না সোজাসুজি 'ভুল হয়েছে, অন্য বাড়ি মনে করে এসেছিলুম' বলে চলে যাবে সহমানে? তখন যদি আবার প্রশ্ন করে, 'কোন্ বাড়ি, মনে করেছিলে'—তখন? এ পাড়ায় আর কোন বাড়িতে বিয়ে আছে কিনা তাও তো জানে না, বহুকাল পরে এ রাস্তায় পা দিয়েছে—তখন কী উত্তর দেবে?

কী করবে ভাবছে এমন সময় কে যেন এসে বললে, 'আপনারা দয়া ক'রে গা তুলুন, পাতা হয়েছে।' সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠে পড়ল। হেমও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে আর বাইরের দিকে যেতে পারল না, চারিদিকের লোক যেন অপ্রতিহত বলে তাকে ভেতর দিকে ঠেলতে লাগল।

সকলেরই আগ্রহ ঐ দিকে। কে একজন যেন বললেন ওরই মধ্যে, 'সে কি হে—বর এসে পৌঁছবার আগেই বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যাব?' তাকে সবাই মিলে থামিয়ে দিল, 'নিন, নিন—এদের তো ছুটি দিতে হবে, বর যখন আসবে তখন থই থই করবে লোক, কজনকে বসাবে? না না, ও কাজ সেরে ফেলাই ভাল।' কে একজন বললে, 'ওহে এখনও যে ভাল ক'রে ক্ষিদেই হয় নি, রবিবারের বাজার—বেলায় খাওয়া হয়েছে।' তাকেও আবার কে থামিয়ে দিলে, 'নে নে—দুই খাওয়াই এক সঙ্গে হজম হয়ে যাবে, শীতের বুড়ো রাত!'

এরই মধ্যে, প্রায় অনিচ্ছায়, হেম এক সময় ছাদে গিয়ে পৌঁছয়। সিঁড়ির মুখে কে যেন বললে, 'ব্রাহ্মণরা দয়া ক'রে ঐ দিকটায় যাবেন—।' সে কতকটা ভিড়ের চাপেই সেই দিকে ঘুরে গেল। ভিড় বেশ, তারই মধ্যে যত দূর সম্ভব আলসে ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের দিকটায় গিয়ে বসল। লুচি বেগুন-ভাজা ছক্কা ডাল পাতে দেওয়াই ছিল, ওরা গিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় করে পরিবেশকের দল বেরিয়ে পড়ল। তখন আর ইতস্তত করার বা পিছিয়ে যাবার সময় রইল না। অগত্যা লুচির গ্রাস মুখে তুলতে হ'ল। ঘাড় হেঁট ক'রে একমনে খেয়েই যেতে লাগল, তখন কতকটা মরীয়াও হয়ে উঠেছে—যদি অপমান হতেই হয় তে খেয়ে নিয়ে হওয়া ভাল, ঘাড়ধাক্কা খাবার আগে আশ মিটিয়ে খেয়ে নেওয়া থাক!

খেলও প্রচুর। বহুদিনের মরা পেট, তবু প্রাণপণে আকণ্ঠ খেল। পেটের অসুখ হয় হবে, না হয় কাল আর কিছু খাবেই না সারা দিন, তবু এসব সে ছাড়তে পারবে না! বড়লোকের বাড়ি, আয়োজনও সেই মাপে হয়েছে। এত রকমের খাবার এর আগে সে চোখে দেখে নি, অর্ধেকের ওপর খাবারের নামও জানে না। কেউ কেউ বলছে, 'ওহে এটা দাও', 'ওটা নিয়ে এস'—তখন দেখে দেখে চিনছে

কিন্তু মনে যে থাকবে না এসব নাম—সে বিষয়েও সে নিশ্চিত। মিষ্টিও হরেক রকমের, সন্দেশই তিন-চার রকম। কড়াপাক, আবারখাব, কাঁচাগোল্লা। দই ক্ষীর রাবড়ি। কিন্তু তখন আর একটি বোঁদের দানার স্থানও নেই পেটে—এ সব আছে জানলে কি আর আগে অতগুলো কুমড়ো কপি এঁচোড আলু পটলের ডালনা মাছ মাংস খেত। নতুন এঁচোড় আর নতুন পটল—তাই মনে হয়েছে অমৃত। মায় খাস্তা কচুরি হালুয়া পর্যন্ত খেয়েছে একটু আগেই। এখন অনুশোচনায় ক্ষোভে চোখে জল আসতে লাগল। কে একজন তদ্‌বিরকারক এলেন শেষের দিকে, বিরাট জামিয়ার গায়ে দিয়ে, আঙ্গুলে হীরের আংটি এবং বুকে হীরের বোতাম—তাঁকে দেখেই হেমের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে পড়তে লাগল গোবিন্দর গল্পের সেই মামার কথা—কিন্তু তিনি সেসব দিক দিয়ে গেলেন না, 'কৈ হে কী রকম খাওয়ালে সব—এঁরা যে কিছুই খেলেন না। কী রকম রেঁধেছে ঠাকুররা—সব যে পাতে পড়ে রইল।…কোন রকমে পেটটা ভরিয়ে নিন আপনারা …এ হে, কিছুই যে খেলে না তুমি ভাই!'—শেষেরটা সোজা হেমকেই। কিন্তু ঘর্মাক্ত রুদ্ধনিঃশ্বাস হেম কোন জবাব দেবার আগেই কে একজন বলে উঠল, 'আর কত খাব বলুন হেঁ-হেঁ—কত রকম করেছেন…হেঁ হেঁ একটু একটু চাখতেই…হেঁ-হেঁ। না, ঠাকুররা আপনার রেঁধেছে খুব ভাল, কোন জিনিসটাই খারাপ হয় নি।'

'দই কেমন খেলে, দই? কাঁসারিপাড়ার সরের দই? বলেছি ব্যাটাকে, খেয়ে সব ভাল বললে দাম দেব—'

'ফার্স্ট ক্লাস স্যার, ফার্স্ট ক্লাস দই! বহুকাল এমন দই খাই নি।'

'খাবে কোত্থেকে। এসব যে উঠেই গেল ক্রমশ। কে-ই বা এর কদর বোঝে, কে-ই বা এর দাম দেয়!' আর একজন বলে উঠলেন কৃতার্থভাবে।

কর্মকর্তা যথারীতি আরও দু-একবার হাত জোড় করে কোনমতে পেটটা ভরিয়ে নিতে অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন সেদিক থেকে। হেম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এক ছাদ লোক—বোধ হয় দু মহলের দুটো ছাদ বোঝাই লোক বসেছে—কে কাকে চেনে, কেই বা কার হিসেব রাখে! দাদার বন্ধুর বাড়ি আয়োজন সামান্য বলেই ধরতে পেরেছিলেন মামা।

এর পর এল সোনালী তবক দেওয়া পান। সবাই উঠে পড়ল হৈ হৈ ক'রে। আঁচাবার জায়গায় ভিড় দেখে দু-একজন রুমালে হাত মুছে বেরিয়ে এলেন। হেমও সেই পন্থা অনুসরণ করলে। রুমালখানায় বাড়ি গিয়ে সাবান দিলেই চলবে। তাড়াতাড়ি ভিড়ে গা ভাসিয়ে একেবারে বাইরে বেরোতে পারলে বাঁচে সে!

॥ ২ ॥

বুক ঢিপঢিপিনিটা বাড়ি এসেও ছিল। মাকে বলতে মা-ও প্রথমটা বললে, 'কাজটা ভাল করিস নি—কী দরকার বাপু, শেষে বে-ইজ্জৎ হওয়া একটা!' কিন্তু তার পরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা ক'রে বার বার শুনতে লাগল কী কী হয়েছিল এবং কোন্‌টা কেমন হযেছিল। প্রতিটি সুখাদ্যে যেন তার রসনা মানসস্বাদ গ্রহণ করতে লাগল সেই বার বার পুনরাবৃত্তিতে। শেষকালে অনেকক্ষণ ধরে শোনবার পর বললে, 'তা যা হোক্‌ বাপু, যা হয় ক'রে বিপদটা কেটে তো গেল। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। বেশ হযেছে। এমনি তো খাওয়া হ'ত না। আর এ তো বলতে গেলে ভগবান হাতে ধরে টেনে নিযে গেলেন। এতে আর কী হয়েছে।'

তবু—তখনও পর্যন্ত, এমন কি বিছানাতে শুয়ে শুযেও বার বার প্রতিজ্ঞা করলে হেম যে—এই নাক-কান মলা, এ কাজ আর নয়। কিন্তু পরের দিন, তার পরের দিন মনে মনে কথাটা যতই সে ভাবে, নানা সুঘ্রাণ-আহার্যের রসনাসুখকর স্মৃতির রোমন্থন করতে থাকে, ততই আবার লুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষে দিনতিনেক যাবার পর মন স্থির ক'রে ফেলে—এই শনি-রবিবারও একবার বরাত ঠুকে দেখবে আর কোন এমনি বড়লোকের বাড়ি পাওয়া যায় কি না। বরং একটু দূর থেকে দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—যখন ভিড় বেশী হবে, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মাথামাখি—তখনই এক ফাঁকে ঢুকে পড়বে। বরযাত্রী মনে করবে কন্যাযাত্রী আর কন্যাযাত্রী মনে করবে বরযাত্রী। সেদিন বড় সকাল সকাল হয়ে গিয়েছিল।

মন স্থির করতে যা দেরি—তার পরই আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল। আজকাল প্রায় প্রত্যহই অফিসের ফেরত বড় মাসীর বাড়ি ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়ে যায়—সেখানে এত কাল থেকে গেছে—তাই সেটা কিছু অশোভন বা অস্বাভাবিকও দেখায় না। বড় মাসীর কাছ থেকে পাঁজিটা চেয়ে নিয়ে দেখলে রবিবার কোন 'বিয়ের দিন নেই। শুক্রবার আর শনিবার আছে। প্রথমটা একটু দমে গিয়েছিল কিন্তু তার পরই মনে পড়ে গেল—বিয়ে না থাক রবিবার বৌভাত পড়বে অনেকগুলো।

এই ভাবেই চলতে লাগল—সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এক একটা রাস্তা ধরে চলে—যেটা বড়লোকের বাড়ি মনে হয়, দূর থেকে সামিয়ানা, বাড়ি ও অন্যান্য আয়োজন দেখে—ঢুকে পড়ে। ক্রমশঃ ভয় ভেঙে গেল, সাহস বাড়ল। দু-চার

দিন যাবার পর সবার অলক্ষ্যে এক-আধটা সন্দেশ বা দরবেশ পকেটেও ফেলতে শুরু করল। সেজন্য বাড়তি রুমাল বা কাচা ন্যাকড়াও বাঁদিকের পকেটে রাখত, পকেটটা যাতে নষ্ট না হয়। সেগুলো মাকে এনে দিত ছোট ভাইয়ের নাম ক'রে। ভাল সন্দেশ বুঝলে শ্যামা তা থেকে একটু-আধটু নরেনকেও ভেঙে ভেঙে দিত।

একদিন এমনি এক রবিবারে একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলছিল বিয়েবাড়ির খোঁজে—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শরতের সঙ্গে। হেম আস্তে আস্তেই হাঁটছিল —বেড়াতে বেড়াতে দেখতে দেখতে যাবার মত করে—জোরে হেঁটে গলদ্ঘর্ম হয়ে বিয়েবাড়িতে যাওয়া যায় না—কিন্তু শরৎ আগে আগে আরও আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছিল—তাই পিছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে করতে এক সময় তাকে ধরে ফেলল।

এগিয়ে ঘুরে গিয়ে প্রণাম করতেই শরৎ থতমত খেয়ে দু পা পিছিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে রইল ওর দিকে। প্রায় মিনিটখানেক সময় লাগল ওকে চিনতে। তার পরই খুশী হয়ে বললে, 'এই যে, এসো, এসো। ভাল তো?'

ওকে যে চিনতে দেরি লাগল তার কারণ ঠিক বিস্মৃতি নয়—হেম ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে—অন্যমনস্কতা! কোথায় যেন কোন্ সুদূরে ওর মন নিবদ্ধ ছিল এতক্ষণ। এই পথ ধরে চললেও—এই পথ কেন, এর ধারে কাছে এমন কি এ জগতে ছিল কি না সন্দেহ। বহু দূর থেকে ছড়ানো মনকে যেন কুড়িয়ে গুটিয়ে টেনে আনল সে।

আবারও বলল একবার—একটু থেমে, 'তার পর, সব ভাল তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?'

'আমি?' একটু ম্লান হাসল শরৎ। উদাস করুণ এক রকমের হাসি।

তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী আজকাল কোথায় থাকেন? কেমন আছেন? যাও মধ্যে মধ্যে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বৈকি! এই তো কাছেই আছেন—এই রামধন ঘোষের গলি। যাবেন নাকি? চলুন না।'

'ন্-না। থাক গে।'

একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলে শরৎ, অনিচ্ছার চেয়ে সংকোচই বেশী।

হেম চেপে ধরে, 'না কেন—এই তো। চলুন না একটু ঘুরে আসবেন। আমিও যাই নি অনেক দিন, আমারও খবর নেওয়া হবে।'

'কী আর হবে, খবর পেলাম—এই তো···অসুখ-বিসুখ করলে খবর দিও। তা ছাড়া হয়তো এখনও বাড়ি ফেরেন নি !'

'আজ তো রবিবার, ছোট মাসী আজ বাড়িতেই আছে।'

'কেন—কোথাও যান না ? তোমার বড় মাসীমা—হ্যাঁ তোমার বড় মাসীমা কেমন ? গোবিন্দর কি ছেলেপুলে ? সবাই এক সঙ্গেই আছেন তো ?'

'না—সে তো অনেকদিন ছাড়াছাড়ি।'

'কেন ? ছাড়াছাড়ি কেন ?'

'সে অনেক কাণ্ড। দাদার প্রথম পক্ষের বৌকে ছোট মাসীই এক রকম জোর ক'রে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল—সেখান থেকে ফেরার পথে ট্রেনেই কলেরা হয়।···তার পরই—মানে অল্পদিনের মধ্যেই দাদা আবার বিয়ে করে কি না—তাইতে ছোট মাসীর কী হ'ল, মানে সে বৌয়ের জন্যে—মোট কথা ঐ বিয়ে নিয়েই ছাড়াছাড়ি। দাদা যায়, বড় মাসীমাও যান—কিন্তু ছোট মাসী বিশেষ এ বাড়িতে আসে না। কখনও-সখনও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে—'

'ও। তোমার ছোট মাসী তা হলে একাই আছেন ? তা চল না হয় যাই একবার। আমার নিজে নিজে হয়তো কোন দিনই যাওয়া হবে না।'

'চলুন।'

নিমন্ত্রণের খোঁজ আর করা হয় না। কিন্তু হেমের কেমন যেন মনে হয়, এটা ঢের ভাল হ'ল। যথার্থ একটা ভাল কাজ। ছোট মাসী বড় একা পড়ে গেছে আজকাল, বড় নিঃসঙ্গ—জীবনে বেচারীর কিছুই নেই আর, শুধু প্রাণধারণ আর প্রাণধারণের জন্য পরিশ্রম। যদি—আশা করতেও অবশ্য ভরসা হয় না আর—যদি এই উপলক্ষে এরা দুজনে একটু কাছাকাছি আসে, ঘনিষ্ঠ না হোক, মেসোমশাই যদি আসা-যাওয়াও করে মধ্যে মধ্যে—তবু দুটো কথা কইবার লোক পায় ছোট মাসী।

'তা কোথায়...মানে কার সঙ্গে আছেন তোমার ছোট মাসী ?' যেতে যেতেই প্রশ্ন করে শরৎ।

'ওঁরই এক ছাত্রীর বাড়ি। তার অবশ্য বিয়ে-থা হয়ে গেছে—তবে সেই জানাশুনোতেই এঁদের এখানে ঘর পেয়েছেন। এঁরাও ব্রাহ্মণ—'

'ও। তা আমরা গেলে—মানে আমি গেলে কেহ কিছু বলবে না তো ?' অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে, কেমন এক রকম ছেলেমানুষের মতই প্রশ্ন করে শরৎ।

'সে কি ! কে আবার কি বলবে ? আপনারই তো—'

'আপনারই তো সবচেয়ে বেশী অধিকার সেখানে যাবার'—বোধ হয় এইটেই বলতে চাইল হেম—লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারল না।

সামান্য একটু হেঁটেই উমার বাড়ি পৌঁছল ওরা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বহুক্ষণ, উমা আহ্নিক সেরে মারই পুরনো বড় মহাভারতখানা খুলে বসেছে সবে। বহুবারের পড়া—তবু আর কোন ভাল বইয়ের অভাবে তা-ই পড়ে মধ্যে মধ্যে। সপ্তাহের ছটা দিন মনে হয় বড় বেশী পরিশ্রম, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না, একটু বিশ্রাম পেলে ভাল হয়—অথচ রবিবারটাও বড় বেশী মন্থর, বড় বেশী কর্মহীন—দুঃসহ ঠেকে।

হেমের গলা পেয়ে খুশী হয়েই উঠল উমা। ছোড়দির সম্বন্ধে যা-ই মনোভাব থাক, বোন্‌পো বোনঝিদের সে পছন্দ করে। বিশেষ ক'রে হেম—দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছে।

শুধু হেম মনে ক'রে সাগ্রহে হলেও সহজভাবেই দোর খুলে দিয়েছিল উমা—কিন্তু হেমের পিছনে নতমুখে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে চমকে উঠল সে। বরং বলা চলে ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। কারণ বহুকাল—বহু দীর্ঘকাল আসে নি শরৎ, পথেঘাটেও দেখা হয় নি।

আরও চমকে উঠল ওরা ঘরে ঢুকতে।

হ্যারিকেনের আলো, তবু তাতেই যা চোখে পড়ল তা-ই ঢের।

এ কী চেহারা হয়েছে শরতের! এ কি তার সেই স্বামী—শুধু যার চেহারার কথা শুনেই অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবতে দেয় নি দিদি, কিছু খোঁজ করতে দেয় নি মাকে! সেই রূপবান কান্তিমান স্বামী তার!

উমার বিস্মিত, স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ করে হেমও ভাল ক'রে—যেন নতুন ক'রে চেয়ে দেখল মেসোমশাইয়ের দিকে। সত্যি, এ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওঁর! চুলগুলো প্রায় সব পেকে গেছে, গায়ের বিশেষত গলার চামড়া শুধু কুঁচকে যায় নি, রীতিমত ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও হয়ে উঠছে কেমন যেন ঘোলাটে বিবর্ণ!

বোধ হয় ওদের দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল, শরৎ একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'কেমন আছ?'

ওর সেই প্রশ্নেই মনে হয় সংবিৎ ফিরে এল উমার, একটা হাসির ভঙ্গী ক'রে বলল, 'আমি আর খারাপ থাকব কেমন ক'রে। যমের অরুচি তো! কিন্তু তুমি তো বেশ কাজ সেরে এসেছ বলেই মনে হচ্ছে—এখন পা-পা ক'রে ঐ ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেই তো হয়!

'তা আর হচ্ছে কৈ ? তা হলে তো বেঁচেই যাই। সরকারী আইন না থাকলে সত্যিই পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতুম। আর-বাঁচার শখ নেই—দরকারও নেই কিছু !'

একটু ম্লান হাসল শরৎ। তার পর বলল, 'একটা আসন-টাসন দাও—আর দাঁড়াতে পারছি না। আজকাল একটু হাঁটলেই হাঁটু দুটো কেমন ভেঙে আসে।'

'এই যে দিই—। তা তুমি ঐ বিছানাতেই বসো না।'

'না না। পথের কাপড় ! মিছিমিছি তোমার পরিষ্কার বিছানাটা—।'

'তা বটে।' হেম ছিল বলে বাকী কথাটা মুখে এসেও আটকে গেল। 'কোন দিনই তো আমার বিছানাটা ছুঁলে না। পরিষ্কার শুদ্ধই রইল চিরকাল! ঐটের সম্বন্ধেই তোমার যত বিবেচনা!' এমনি অনেক কথাই গলার কাছ পর্যন্ত এসেছিল, বলা হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি নিজে যে মাদুরটায় বসেছিল, সেইটেই এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসো না, দুজনেই বসতে পারবে।'

শরৎ বসল। মনে হ'ল যেন পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল, যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। কে জানে কেন, ওর অবস্থা দেখে উমার আজ এই মুহূর্তে একটা অপরিসীম মমতা বোধ হ'ল। বড় বেচারা—বড় হতভাগা লোকটা। সে বিছানা থেকে নিজের বালিশটা নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এইটেয় ঠেস দিয়ে ভাল ক'রে বসো।' তার পর গলার কাছে ঠেলে-ওঠা একটা কি অবাধ্য বস্তুকে দমন করতে করতেই হেমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'তার পর ? তোদের খবর কি ? তরুরা কেমন আছে ? পাঠিয়েছিল ওরা এর মধ্যে একবারও ? খেঁদি কোথায় ?'

'খেঁদি তরু সব শ্বশুরবাড়ি। সেই তো মুশ্‌কিল হয়েছে। বাবা যে ফিরে এসেছেন !'

'ফিরে এসেছেন—তার মানে ? তিনি তো আসেনই মধ্যে মধ্যে।'

'না। তা নয়। একেবারে পাকাপাকি। এখানেই আছেন। শরীর একেবারে গেছে তো। বোধ হয় এবার—। মা'র খুবই কষ্ট হচ্ছে, সংসারের সব কাজ—মা'র আবার আরও কতক বাড়তি কাজ আছে—সে তো তুমি জানই—তার ওপর বাবার সেবা। দিনের মধ্যে চোদ্দবার পুকুরে ডুব দিতে হচ্ছে !'

'বাবা, এমন ! একেবারে অশক্ত হয়ে পড়ে তবে বুঝি স্ত্রীপুত্রের কথা, বাড়ির কথা মনে পড়েছে ! তা হলে ছোড়দির তো খুব চলছে। তা তুই এবার একটা বিয়ে-থা কর—বয়স তো পেরিয়ে গেল !'

উমা কথাটা শেষ করার আগেই—এর খোঁচাটা যে অন্যত্রও লাগতে পারে মনে পড়ায়—শরতের মুখের দিকে চাইল। সে তখন বালিশটা টেনে একটা হাঁটু

উঁচু ক'রে আর একটা পা সেই উরুর ওপর তুলে আধশোযা ক'বে বসেছে, দুটি চোখই তাব বোজা—মুখেও কোন বেদনা বা আঘাতেব চিহ্ন নেই, যেমন ভাবহীন থাকে সাধারণত প্রায তেমনিই, শুধু লক্ষ্য ক'রে দেখে উমা—কপালে ওর বড বেশী রেখা পডেছে, যা পডা উচিত তাব চেযে যেন ঢের বেশী।

হেম ওদেব দিকে অত লক্ষ্য কবে নি—তার মনে নিজের ভবিষ্যতের প্রশ্নটাই সবচেযে বড— সে হ্যাবিকেনের দিকে চেয়ে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললে, 'হুঁ। মা তো দিনরাত খ্যাচ্-খ্যাচ্ করছে, কিন্তু মাইনে তো ঐ, তার ওপর আবার খরচা বাডানো—। বড ভয় কবে। মাথাব ওপর অসুমব দেনা, মা যে কোথা থেকে কবে কি শোধ করবে তা জানি না।'

'মা তো তোর ঐ ক'বেই করছে সব, যখন তোর মাইনে বলতে কিছু ছিল না, তখনও তো চালিয়েছে। তিনটে মেযের বিযেও দিলে। তা ছাডা দুটো পেট তো কমেও গেছে। তরু নেই, খেঁদি নেই—'

'তেমনি বাবা আছেন। তা নয়—। ভাবছি তাই।'

শরৎ কি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'ল নাকি?

উমা গলাটা অকারণেই ঈষৎ একটু উঁচু ক'রে বলে, 'কতক্ষণ বেরিয়েছিস বাডি থেকে? খাবি কিছু? ঘরে অবশ্য নারকোল নাড়ু আছে, কিন্তু—। খাবার আনাব?'

প্রশ্নটা যথাস্থানেই পৌঁছয। শরৎ এবাব নডেচডে বসে। বলে, 'আমার জন্যে কিছু আনিও না।'

'কিছুই খাবে না? একটু মিষ্টি?'

'না। মিষ্টি সহ্য হয় না। বড অম্বল হয়। চা নেই তো ঘরে—না?'

'ঘরে নেই—তবে বাড়িওয়ালাদের কাছে আছে। ওদের একটা উনুন জ্বলছেই দিনরাত, শুধু চায়েব জন্যে। ক'রে দিচ্ছি আমি।'

'না, না। থাক গে—আবার অত হাঙ্গামা করতে হবে না। পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে—'

'তাতে কোন হাঙ্গামা নেই। ওরা চোদ্দবার চিনি চেয়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। ওরাই ক'রে দেবে এখন—'

উমা ভেতরে যায়। দু কাপ চা চাই, আর ওদের কোন লোক যদি কখানা হিঙের কচুরি এনে দিতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হেমের মাথা খুলে যায়। সে হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, 'আমি

চট ক'রে একটু ঘুরে আসছি মেসোমশাই—যাব আর আসব। এই পাড়াতেই একটু কাজ আছে। এলুম যখন—'

শরৎ যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একলা উমার সঙ্গে মুখোমুখি এই নির্জন ঘরে বসতে বোধ করি ভয়ই করে ওর। বলে, 'আরে ও কি, কোথায় যাবে? বসো না। আমিও তো উঠব—। তোমার মাসী হয়তো তোমার জন্যে খাবার আনতে গেল—'

'যাব আর আসব মেসোমশাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

শরৎ আর কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে যায় সে।

উমা যখন খাবার আর চা নিয়ে ফিরে আসে, তখন হেম নেই। শরৎ একা তেমনি চোখ বুজে বসে আছে।

'ও কি—হেম কোথা গেল?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি বলে কোথায় গেল। এই পাড়াতেই নাকি ওর কী কাজ আছে!'

'ছাখ দিকি, দুষ্টু ছেলে। চাটা নষ্ট হবে।' উমা এই বয়সেও রাঙা হয়ে ওঠে কি?

'দুষ্টু—? ও!' শরৎও মুখ টিপে হাসে। লজ্জিত হাসি। তার পর বলে, 'নষ্ট হবে কেন, তুমি খাও না!'

'না। ও আমার সহ্য হয় না। খাই না যে একেবারে তা নয়, এদের পাল্লায় পড়ে সর্দি-কাশি হলে খেয়েছি—কিন্তু রাত্রে ঘুম হতে চায় না!'

'তা হোক। খাও একটু। একা খাব!'

শরৎ বাকী কাপটা ওর দিকে ঠেলে দেয়, হাতে তুলে দিতে বুঝি সংকোচে বাধে।

উমা অগত্যা কাপটা টেনে নেয়। হেমের জলখাবারের রেকাবিটা তক্তপোশের নীচে সরিয়ে রেখে শরতেরটা সামনে একটু ঠেলে দেয়। বলে, 'খাও। মিষ্টি নয়, হিঙের কচুরি। নারকোল নাড়ু একটা দিয়েছি, না খেতে চাও খেও না। ঘরে তৈরী ছিল, তাই—'

শরৎ নীরবে কচুরির থালা টেনে নেয়; চিবোতেও থাকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

উমা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে, 'তোমার কী হয়েছে? শরীর খারাপ? অসুখ ধরিয়েছ নাকি?'

'অসুখ? না—তেমন কিছু নয়, মোটামুটি ভালই আছে শরীর। তবে খাওয়া-দাওযার অনিয়ম হচ্ছে তো। হোটেলের খাওয়া কোনকালে সয় না আমার, অথচ তাই খেতে হচ্ছে—দু বেলাই।'

'কেন?—তার—তার মানে? হোটেলে কেন?'

কণ্ঠটা বড বেশী যেন তীক্ষ্ণ শোনায উমার। সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। যে প্রদেশে সে গিযে পডছে সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শরৎ চায়েব পেযালায় একটু চুমুক দিয়ে, বেশ সহজ কণ্ঠেই বলে, 'গোলাপী মরে গেছে। ছেলেমেয়ে দুটো সুদ্ধ। এক রাত্তিরে তিনজনই গেল কলেরায়, শুধু আমারই কিছু হ'ল না। তার পব আর কি—এই!'

উমা উত্তর দিলে না। ওর বুকে যে তুমুল আলোডন উঠেছে, তাতে সহজ ভাবে কথা বলা আর সম্ভব নয়। রক্তের সে উত্তাল গতির শব্দ বাইরে থেকেও যেন কান পেতে শোনা যায়। সহস্র প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করে মনের মধ্যে, সহস্র অভিমান, সহস্র অনুযোগ। কিন্তু কিছুই বলে না সে, বলতে পাবে না। শুধু—হাত দুটো বড় বেশী কাঁপতে শুরু হয় বলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে।

চা-টা শেষ ক'রে শরৎও কাপটা নামিয়ে রাখে। দুখানা কচুরি খেয়েছে, আর নারকোল নাডুটা। আরও দুখানা কচুরি পড়ে রইল, কিন্তু এখন আর ওর পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই উমা অনুরোধ করল না। তা ছাড়া সেদিকে ওর দৃষ্টিও ঠিক পুরোটা ছিল না, মনও নয়। মন বহুদিনের ফেলে আসা দীর্ঘ মরু-দিনগুলিতে বিচরণ করছিল, বহু নালিশ, বহু হাহাকার, বহু ব্যর্থতা সেখানে।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইতে পারল উমা। একটা ডেয়ো পিঁপড়ে ক্রমাগত চক্রাকারে আলোটাব পাশে ঘুরছে, সেইদিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তা আর কোথাও—মানে আর কোন আত্মীয়—'

'নাঃ! তেমন আর কে আছে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তো বহুকালই ছাড়াছাড়ি, কে কোথায় আছে তাও জানি না। তেমন পয়সা থাকলে তারাই হয়তো খবর পেয়ে এসে জুটত, তাও তো নেই। এখন আমার বোঝা বইবার মজুরি পোষাবে না!'

একটু হাসল সে। তার পর বলল, 'আরও কত দিন বাঁচতে হবে তাও তো বুঝতে পারছি না—নইলে সব বেচে কিনে দিয়ে কোন তীর্থে চলে যেতুম।... ছোট প্রেস, বেচতে গেলে তিন-চার হাজারের বেশি উঠবে না—সে টাকা সম্বল ক'রে কোথাও যাওয়া যায় না, ভরসা হয় না!'

আবারও কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

যে কথাটা গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে সেই থেকে—সেটা কিছুতেই বলতে পারে না, সে অনুরোধ করতে পারে না। অথচ লোকটাব জন্য এ কী প্রবল অনুকম্পা বোধ করছে ও, এ কী অকারণ মমতা। এমন কি—সেই স্ত্রীলোকটার মৃত্যুসংবাদও, এর দিকে চেয়ে যেন দুঃসংবাদ বলেই মনে হচ্ছে।

শরৎ আবারও যেন চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হযে পডেছিল, হঠাৎ উঠে বসে বলে, 'হেম তো এল না আমি তা হলে উঠি আজ—কী বল।'

আর না বললেই নয়। এ সুযোগ এবং সুবিধা কবে আসবে আবাব কে জানে, আবার কত কাল পরে দেখা হবে।

মরীয়া হযেই বলে ওঠে উমা, 'তা তোমাব প্রেস তো এমন খুব বেশী দূরে নয, এখান থেকে খেয়ে গেলেই তো হয।'

'তোমাব এখান থেকে?'

'হ্যাঁ? তাতে দোষ কি?'

'না, দোষ কিছু নেই। তবে তুমি একাব মত যা হয় দুটি রাঁধ চুড়ুর-বুড়ুর —তার মধ্যে আমি আবার—'... মিছিমিছি তোমার ঝঞ্ঝাট বাডানো। থাক, আর কটা দিন দেখি। তার পব একেবাবে শরীর ভেঙে গেলে তাই হয়তো এসে উঠতে হবে তোমার ছোডদির ববেব মত। বোনে বোনে তোমাদের বরাত কিন্তু বেশ।' হেসে বলল শেষের কথাগুলো, একটু ঠাট্টার সুরেই।

'না। তার বরাত আমাব চেয়ে ঢেব ভাল। সে ছেলেমেয়ে পেযেছে, সংসাব পেয়েছে, নিজের বাডিঘর করতে পেরেছে। তার স্বামী পশু হোক, সে পশুকেও সে পেয়েছে, অন্তত কিছুদিনেব জন্যে। আমি কি পেলুম?'

এতক্ষণের সমস্ত সংযমের ও সংকোচের বাঁধ বুঝি ভাঙে। চেষ্টা কবেও কথাগুলোকে বুঝি আটকাতে পাবে না উমা।

শরতের মুখেব হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়, লজ্জায় অপমানে এবং হযতো বা বেদনাতেও মুখ বিবর্ণ হযে ওঠে। কযেক মুহূর্ত চুপ ক'বে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'মাপ কর। সত্যিই আমার অপরাধের সীমা নেই। কথাগুলো আমার আরও ভেবে বলা উচিত ছিল।'

সে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে পাযে জুতোটা গলিয়ে এক সময় বাড়িরও বাইরে বেরিয়ে যায়।

উমা আর কিছুই বলতে পারে না। আটকাতেও পারে না ওকে।

ব্যাকুলভাবে একবার ঘরের বাইবে এসে দাঁড়ায, কিন্তু বাড়িতে আরও বহু লোক। ওদেব কাছে অপবিচিত একটা পুরুষেব পিছু পিছু গিয়ে হাত ধবে বা মিনতি ক'বে টেনে আনা সম্ভব নয়।

এ কী কবল ও, এ কী বলল। যা বলতে গিয়েছিল তাব উল্‌টোটাই বলে বসল। এই সময এক্‌টু সেবা, এক্‌টু সান্ত্বনা, এক্‌টু সাহচয দেবার জন্যই বুঝি মনটা উন্মুখ হয়ে ছিল, সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল মন—কিন্তু সে বার্তা তো ওর কথায় প্রকাশ পেল না, কঠোব নির্ঘাত আঘাতে সে তো সরিয়েই দিল আরও দূবে—

এ সময যদি হেমটাও থাকত।

সব লজ্জা ত্যাগ ক'বে সে হেমকে দিয়ে ডেকে পাঠাত।

কিন্তু হেম আর এল না। তখনও নয—তাব পবেও নয। সে বাতেই আর ফিরল না সে।

ওদের দীর্ঘ নিভৃত অবসব দিয়েই চলে গিয়েছিল—কিন্তু উমা সে অবসরকে কোন কাজেই লাগাতে পারল না। এত দিন ছিল আত্ম-অনুকম্পা আর দুর্জয় অভিমানের মধ্যে একটা আশ্রয়—অদৃষ্টেব পবিহাসে সেটুকুও ঘুচে গিয়ে সে জায়গায় দেখা দিল অনুশোচনা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হেম বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, কথাটা মহাশ্বেতা ও বাড়ি-থেকে ফেরবাব পর আর কারুবই জানতে বাকী রইল না। বাকী থাকবার কথাও নয়—আনন্দের কথা, উল্লাসের কথা। গোপন কববাবও কোন কাবণ মনে পড়ে নি মহাশ্বেতার।

কিন্তু সে-রাত পোহাবাব আগেই, কথাটা এত 'গাব্‌জাবার' জন্যে—তার অনুতাপের শেষ থাকে না। কে জানত যে মেজবৌয়ের একটি বোন হাতের কাছে যোগানো ছিল!

প্রমীলা সোজাসুজি বলে নি মহাকে, সাহসে কুলোয় নি বোধ হয়। কারণ মহাশ্বেতার মুখ আজকাল একটু একটু খুলছে, ইদানীং সে ওকে শুনিয়েই নানা কথা বলে, ওর প্রতি মনোভাব যে মহাশ্বেতার ভাল নয় সেটা কারুর কাছেই আর গোপন নেই। বিশেষত বড় আর ছোট হয়েছে এক জোট। প্রমীলার প্রতি

এতদিনের সমস্ত বিদ্বেষ তরলার প্রতি সহানুভূতি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ওকে উপলক্ষ ক'রে সে বিষ উদ্গার করার সুবিধা হয়েছে খুব—আর তরলাও যেন একমাত্র আশ্রয় হিসেবেই, তার বড় জাকে অবলম্বন করেছে।

সুতরাং সন্ধ্যাবেলা পুরুষরা অফিস 'থেকে ফিরতেই প্রমীলা কথাটা বলেছে অম্বিকাকে, অম্বিকা বলেছে দাদাকে।

অভয়পদ অবশ্য শুনে বলেছিল, 'তাই নাকি? তা তুমিই বলো না তোমার বৌদিকে।'

'না দাদা—তুমিই বলো। মেজ বৌ অতি-অবিশ্যি ক'রে বলে দিয়েছে।'

'বলছ, তা বলব ওকে। কিন্তু এ তো তোমার বা মেজবৌমারই বলবার কথা।'

আর কিছু বলে নি সে। শুধু ঈষৎ একটু ভ্রূ কুঁচকে—অভয়পদর পক্ষে সেইটাই অবশ্য যথেষ্টব বেশী—ভাইযের মুখের দিকে চেযেছিল। অম্বিকা সে দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হযে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকেছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে অভয়পদ স্ত্রীর ঘরে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর ঘবই বলতে হয়—কারণ অভয় কোন দিনই সে ঘরে শোয় না। চলনে তার সেই অদ্বিতীয় কাঠের বেঞ্চিটিই এ জগতে বোধ হয তার একমাত্র বাসা।

'কী গো, কি সমাচার। আজ যে এ ঘরে?' চিমটি কেটে বললে মহা।

অভয়পদ সে কথাব জবাব না দিযে বললে, 'হেম নাকি বিয়ে করতে রাজী হযেছে? মা নাকি তোমায মেয়ে দেখতে বলেছেন।'

'বাব্‌বা, এবই মধ্যে তোমার কাছে পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে! আমিই তো বলব ভাবছিলুম। তা বেশ তো, ছ্যাখ না—একটা ভাল-দেখে মেয়ে। বাবা বলে দিয়েছেন বেশ সদ্‌বংশের একটি মেয়ে দেখতে—'

অভয়পদ মুহূর্তকাল মৌন থেকে বললে, 'অম্বিকে বলছিল মেজ বৌমার নাকি একটি বোন আছে, আপন খুড়তুতো না জাঠতুতো বোন—তাকে একবার দেখবার কথা!'

'কে! কার কথা!' চাপা গলায় যত দূর ফেটে পড়া সম্ভব তাই পড়ে মহাশ্বেতা, 'মেজ বোয়ের বোন! এই কথা পেড়েছে ওরা? সাহস বটে, বলিহারি যাই! আস্পদ্দা!'

অভয়পদর মুখে কোন বিস্ময় ফোটে না; বরং বেশ যেন প্রশান্ত মুখেই প্রশ্ন করে, 'কেন এতে আর সাহসের কী আছে! তোমরা মেয়ে খুঁজছ—তাদের ঘরে আছে, এই তো!'

'হ্যাঁ—জেনেশুনে ঐ ঝাড়ের বাঁশ আমি বাপের বাড়িতে ঢোকাই! আমার কি হায়া-পিত্তি সব ঘুচে গেছে? ও বেউড় বাঁশের ঝাড়, ও রক্ত যেখানে আছে সেখানে কোন কাজ করব না আমি, করতে দেব না। এই আমার পষ্ট কথা। তা তুমি রাগই কর আর গোসাই কর!'

অভয়পদ মুচ্‌কি হাসে একটু, বলে, 'তুমি যেখান থেকে মেয়ে আনবে সে কোন ঝাড়ের হবে তা কী ক'রে জানছ? বাইরে থেকে কার কতটুকু বোঝ?'

'সে বরাতে যা আছে তা হবে। তাই বলে জেনেশুনে ঐ ডাকাত মেয়ের বোনকে—না সে আমি পারব না!'

'তা হলে এই কথাই আমি ব'লে দেব তো?' একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে অভয়পদ।

'দাও না। তাতে কি হয়েছে? আমি কি ভয় করি নাকি? অত ভয় কিসের? তোমার কাছে তোমার মেজ ভাই গুরু গোবিন্দ আর মেজ ভাজ মা গোসাঁই হতে পারে, আমার কাছে নয়!'

কথাটা সম্ভবত যথাযথই জানিয়েছিল অভয়পদ। ফলে মেজবৌ যাকে বলে 'নিজমূর্তি-ধরা' তাই ধরলে। ঠিক মুখের ওপর বা স্পষ্ট ক'রে না বললেও, কারুরই আর বুঝতে বাকী রইল না যে এ সব শব্দভেদী বাণ কার উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে।

ভোরবেলা হয়তো উঠোন ঝাট দিতে দিতে দুর্গাপদকে উপলক্ষ ক'রে বলে, 'লোকে কথায় কথায় বলে বংশ। ভাল বংশ দেখে কাজ করতে হয়। ওসব আমি মানি না। এই যে আমার বড় জা, লোকে বলে বোকা—তা বোকাই বলুক আর যা-ই বলুক অমন নিপাট ভালমানুষ তো কই বড় একটা দেখা যায় না। মনে যা এল মুখে বলে ফেললে, কখনও রেখে-ঢেকে কথা কইতে জানে না। মন গঙ্গাজল। আর ছ্যাখ কাজে কর্মে আহারে ব্যাভারে বাড়ির বড় বৌয়ের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি—নয় কি? কিন্তু বংশ দেখতে গেলে কি ও মেয়ে আনা চলত? তুমিই বল না ছোট্‌-ঠাকুরপো, গুরুজন—বলা অবিশ্যি উচিত নয়, পেন্নাম করি এইখান থেকেই—কী মানুষ বল তো ওর বাবা? ঐ বাপের এই মেয়ে—ভাবাই যায় না। না, ওসব কিছু নয়, যাকে যেমন তৈরী করেছেন ভগবান!'

সে কথা কানে যাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কারণ বড় বৌ হয়তো তখন রান্নাঘরে ডাল সাঁত্‌লাচ্ছে। সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'আমার বংশ! আমার বংশের কথা কেউ যেন না মুখে আনে। বাবা যা-ই হোক, কত বড় গুরুবংশ

আমাদের, দু শো আড়াই শো ঘর শিষ্যি-যজমান ছিল ঠাকুরদার। কত লোক নিত্যি তাঁর পাদোকজল খেত। একজনকে দেখে বংশ বিচার করা যায় না।'

'আমিও তো তাই বলি ছোট্ ঠাকুরপো—একজনকে দেখে বংশ-বিচার করা ঠিক নয়। কে কেমন তাও কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। ন্যাবা হলে মানুষ সব হলদে দেখে শুনেছি, কারুর ওপর কারুর রীষ থাকলে তার সব খারাপ দেখে। কিন্তু যথাধর্ম কার মনে কী আছে কেউ কি বলতে পারে? ওপরটা দেখে বিচার করা চলে না।'

মহাশ্বেতা নিজের ফাঁদে নিজে আটকে পড়ে গজরায় শুধু—লাগসই জবাব একটাও খুঁজে পায় না।

কোন দিন হয়তো আঘাতটা একেবারে সোজা এসে লাগে—বজ্রের আঘাতের মত।

'বলি আমি কার ঘরে কী আগুন লাগিয়েছি—কার ভাতারপুতকে ছিনিয়ে নিয়েছি যে আমার ঝাড়ে-বংশে সব খারাপ হয়ে গেল? আমি কি কাউকে ভাঙিয়ে নিয়েছি কলিয়ে সলিয়ে? আমি কারুর পেছনে ঘুরি? আর কারুর পেছনে না ঘুরে যদি আমার পেছনেই কেউ ঘুরে মরে—সে কি আমার দোষ?… তোরা ভোলাতে পারিস না কেন? আমি কি চেষ্টা ক'রে কাউকে ভোলাই?… এটি মনে রেখো পুরুষ রূপেও ভোলে না বয়সেও ভোলে না—ভোলে গুণে। নিজেদের দোষ কেউ দেখতে পায় না—শুধু শুধু নিজের খামতি পরের দোষ বলে চালাতে চেষ্টা করে।'

এ আঘাত অবশ্য বড় বৌয়ের চেয়ে ছোট বৌকেই লাগে বেশী। সে এসে কান্নাকাটি করে বড় জায়ের কাছে, 'দিদি আপনারা তো দেখেশুনেই কালো বৌ আনলেন অমন সুন্দর পুরুষের জন্য—এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন? এ তো ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা!'

আঘাত আসে তরলার ওপর অন্য দিক দিয়েও।

এর পর যেন আরও বাড়ায় প্রমীলা। ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে দুর্গাপদর সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব বাড়িয়ে দেয়। আজকাল সন্ধ্যে থেকেই দুজনে ছাদে বসে থাকে,—রাত্রের রান্না মেজবৌ ছেড়েই দিয়েছে দীর্ঘকাল—একবার শুধু খেতে নামে, আবার উঠে যায়, রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত বসে বসে গল্প করে।

'কিসের এত কথা ওদের, কিসের এত গল্প বলতে পারিস না ছোট বৌ? কুসমন্তর ঝাড়ে বসে বসে—না কি? নাকি গুণজ্ঞান ক'রে পাথর ক'রে বসিয়ে

রাখে। আর তুক-গুণের কথা বলবই বা কি, বাড়িসুদ্ধ লোককেই তো গুণ ক'রে রেখে দিয়েছে। নইলে ভাসুর সোয়ামী শাশুড়ী সব বিদ্যমান থাকতে এমন বেলেল্লাগিরি ক'রে পার পেয়ে যায়—এ কখনও শুনি নি বাপু। তা ছাড়া শরীরেও তো কুলোয়! মেজবৌ না হয় সারা দুপুর ঠেসে ঘুমোয়—ওর এক রকম পুষিয়ে যায়—কিন্তু ছোট কর্তাকে তো সাতটায় ভাত খেতে বসতে হয়, ওর চলে কী ক'রে?'

ইদানীং—মহাশ্বেতা শিখিয়ে দেওয়াতেই—কিছু দিন ধরে দুর্গাপদ গিয়ে শোবার পর তরলা নেমে এসে ওর বিছানাতে বসে পা টিপে দিচ্ছিল। প্রথম প্রথম দু-চার দিন নিষেধ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল বাধা কিছু দেয় নি। দু-চার দিন পরে নিষেধও করত না। ব্যাপারটা বেশ সহজেই মেনে নিয়েছিল। প্রত্যহই তরলা এসে নিঃশব্দে পা টিপতে বসত, পা টেপার মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ত দুর্গাপদ—ওর নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম গাঢ় হয়েছে বুঝতে পেরে তরলা ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুত—এবং আরও বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাত।

কিন্তু মহাশ্বেতার সঙ্গে মেজবৌয়ের এই প্রত্যক্ষ বিরোধের পর দুর্গাপদ বহুরাত্রে ফেরে, তখন—সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে—তরলার চোখের পাতা ভেরে আসে ঘুমে, এক-এক দিন টেরও পায় না কখন এসে শোয়। যদি বা ঘুম ভেঙে উঠে যায় অথবা জোর ক'রে চোখে জল দিয়ে জেগে থাকে—দুর্গা আর ওকে ছুঁতে দেয় না পা। বলে, 'ঢের হয়েছে, জুতো মেরে গরু দানে আর কাজ নেই। হেন কুকথা নেই যা আমার নামে তোমরা বটাচ্ছ না—আবার এ লোক দেখানো পতিভক্তি কেন? যাও শুয়ে পড় গে।'

তাতে তরলা হয়তো জবাব দেয়, 'আমি কি বলেছি কিছু, আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন?

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কে বলছে আর কে কার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে সব আমি জানি, থাক্। খবরদার আমার পায়ে হাত দিতে এলে এবার এমন কটু দিব্যি দেব যে টের পাবে মজা। দূর ক'রে দেব ঘর থেকে।'

লজ্জায় অপমানে ভয়ে কাঠ হযে যায় তরলা।

পরের দিন বড় জায়ের কাছে বলে, 'গত জন্মে কত পাপ করেছিলুম, কোন্ সতীলক্ষ্মীকে কী বঞ্চিত করে এসেছিলুম তাই এ জন্মে সব পেয়েও বঞ্চিত হলুম। এমন ঘর বর গয়না কাপড়—এমন আপনার মত জা, নির্বিরোধী শাশুড়ী—কটা মেয়ে পায়? সব পেয়েও আমি আজ কাঙ্গাল। শুধু এই ভেবেই নিজের হাতে

প্রাণটা বার করতে পারি না দিদি, নইলে উপায় সব জানি। বলে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে জন্মের পাপের ফলে এই ভুগছি আবার মহাপাপ বাড়বে! শুধু সেই জন্যে পিছিয়ে আসি—ভাবি থাক, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন এই জন্মেই হয়ে যায়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না। আর পারছি না মাথার ঠিক রাখতে।'

'তা দিন কতক বাপের বাড়ি ঘুরে আয় না ছোট বৌ!'

'ছিঃ! তারা তো সবাই জানে—আমি না বললে কী হবে, জানতে কিছু কি বাকী আছে?…সে বাড়িতে পা দেব কোন্ মুখে। সবাই আহা-উহু করবে, দয়ার চোখে দেখবে—সে আরও বেশী অসহ্য। তা ছাড়া তারা তো কিছু কম করে নি—যথাসাধ্য খরচ ক'রেই বিয়ে দিয়েছে—তার ওপর তাদের ঘাড়ে চাপব! বাপ-মা'র জ্বালার ওপর জ্বালা! আর বিয়ের পর বাপের বাড়ি পড়ে থাকা মানেই ঝি হয়ে থাকা। শ্বশুরবাড়িতে সব সহ্য করা যায়—এত কাল আদরের পর বাপের বাড়িতে হেনস্তা হলে বড় অসহ্য লাগে দিদি। না, যদি বেরোতে হয় তো মরাই বেরোব।'

'বাপ রে! অমন কথা বলিস নি। আমি বলছি,—তুই সতীলক্ষ্মী মেয়ে, তোর হক্ তুই এক দিন ফিরে পাবিই! দুটো দিন সবুর কর!'

কথাগুলো যখন বলেছিল মহাশ্বেতা তখন তা যে এত শিগ্‌গির ফলে যাবে, তা বোধ হয় সে নিজেও আশা করে নি।

আর এমন মর্মান্তিক ভাবেই ফলল!

মর্মান্তিক বৈ কি। মেজ বৌ অন্য সব ব্যাপারে যতই মহার ওপরে টেক্কা দিক, একটা ব্যাপারে মহাই তাকে টেক্কা দিয়েছে। সন্তান বলতে এ বাড়িতে যা কিছু মহাশ্বেতারই। প্রমীলার একটি মেয়ে হয়ে বহু দিন আগে মরে গিয়েছিল—আর কিছুই হয় নি। হবেও না আর—তাই সকলে জানত। মহাশ্বেতা সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলত সবাইকে, 'মন্দর মত গাছে চড়লে কী জলে ঝাঁপাই-ঝুড়লে মন্দই হয়ে যায়—বুঝলি! সব তাইতে হামবড়া, কত্তামি। তাই ভগবান বললে কত্তামি নিয়েই থাক, তোকে আর গিন্নেমো করতে হবে না। ওর তো আগাগোড়া বাঁজা মেয়েমানুষের লক্ষণ, একটা হয়েছিল কি ক'রে তাই ভাবি।…সে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আর নয়, এটি জেনে রেখো!'

কিন্তু নজর পড়ল মহাশ্বেতারই।

কিছু দিন ধরেই খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে চলে যায় মেজবৌ। কেন যায় অত কেউই মাথা ঘামায় নি, হঠাৎ এক দিন মহার বড় ছেলেটা বললে, 'মা জান—মেজকাকী রোজ খেয়ে উঠেই বমি করে।'

'তাই নাকি, কে বললে রে।'

'আমি দেখেছি, যা খায় বমি ক'রে আসে। সকালে আজকাল কিছু খেতে চায় না দেখ না? খেয়েই বমি করতে হয় যে।···মেজকাকী বাঁচবে—হ্যাঁ মা?'

মহাশ্বেতা এখন আর এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নেই।

সেদিন দুপুরে রান্নাঘরে তিন জায়ে খেতে বসেছে, ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে মেজবৌ—হঠাৎ মহার মনে পড়ে যায় কথাটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মেজবৌয়ের মুখের দিকে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখের চেহারাটাও যেন কেমন কেমন।

'হ্যালা মেজবৌ—তোর রকম-সকম তো ভাল বোধ হচ্ছে না।'

'সে তো তোমার কোন দিনই ভাল বোধ হয় না দিদি।'

'নে রঙ্গ রাখ।·· দেখি জামাটা খোল তো—'

এবার মেজবৌও লজ্জিত হয়, 'কী যে বল দিদি তার ঠিক নেই।'

'ওমা তা এখানে আবার লজ্জা কি, পুরুষ তো কেউ নেই। আর তোর কি এখনও লজ্জার বয়স আছে?'

'যাও। দেখবেই বা কি। তোমার বুঝি এখন জ্ঞানবুদ্ধি খুব হয়েছে? নিজে তো এককালে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিলে মরে যাচ্ছি বলে—'

'ও। তাই বল। তা হলে মেজকর্তার অ্যাদ্দিন পরে জলপিণ্ডির ব্যবস্থা হচ্ছে! আজ আসুক মেজকর্তা বাড়িতে—সন্দেশ আদায় না ক'রে ছাড়ছি না। ভোঁদা গয়লার দোকানে অর্ডার দেওয়া রাজভোগ খাওয়াতে হবে।'

'নাও। নাও। ওসব বলো না খবরদার। বুড়ো বয়সে—লজ্জা করে।'

'লজ্জা আবার কি লা। তোর যেমন কথা। এ তো আনন্দের খবর।'

কথাটা বলতে বলতেই কিন্তু যেন মহাশ্বেতা গম্ভীর হয়ে ওঠে। পরাজয় তো বটেই—সেই সঙ্গে যেন কতকটা আশাভঙ্গও। স্বামী যে যথাসর্বস্ব মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে তার তবু একটা সান্ত্বনা এত দিন ছিল যে—হয়তো এ যা-কিছু এক দিন তার ছেলেরাই পাবে।

তবু—মনে মনে যতই পরাজয়ের গ্লানি এবং আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করুক, শিশু-সুলভ কৌতুকবোধ ওকে বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে দেয় না। কথাটা

বিকেলের মধ্যেই শাশুড়ীর কানে ওঠে, তিনি বলেন, 'ওমা তাই নাকি? ষাট ষাট। আজ বাপু তা হলে বড বৌমা পাঁচ পয়সার বাতাসা আনিও, সন্ধ্যেবেলা হরির নোট দিতে হবে। খবরটা যখন আজই কানে পৌঁছল—'

'কী যে বলেন মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা কি! এমন একটা শুভ খবর! অন্তত সওয়া পাঁচ আনা বলুন। উচিত তো পাঁচ সিকের দেওয়া।'

'তা না হয় সওয়া পাঁচ আনাই আনিও। কে জানে বাপু, পাঁচ পয়সার বাতাসাই তো জানি ঢের। বরাবর আমাদের হরির নোট হলে—'

'বরাবর কজন লোক ছিল মা! এখন ষেটের বাড়িতেই কত জন লোক।'

'তা ছ্যাখ বাপু যা ভাল বোঝ!'

মেজকর্তা আসতেও আর এক চোট চেঁচামেচি হয়। বডবৌ ছু হাতে পথ আগলে দাঁড়ায়, 'উঁহু—তা হবে না! আজ সটে-পটে ধরেছি—সন্দেশ আর রাজভোগ নিয়ে এলে তবে বাড়ি ঢুকতে পারবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া—ভাবো যে শিবের বাবাও টের পাবে না—না?'

'নাও, আজ আবার এ কী মূর্তি! বলি—হ'ল কি এত সন্দেশ খাওয়াবার মত?'

'কী আবার হবে—জলগণ্ডুষের স্থল! উঃ, কী চাপতেই পার বাইরি! সত্যি সত্যি আমি ছাডব না বলে দিলুম, আমাকে চেনো নি!'

অম্বিকাপদর মুখেও সলজ্জ হাসি ফোটে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। আজ এখনই কি ক'রে হয়। মাস-কাবার হোক। কোথায় কি তার ঠিক নেই—'

'তা শুনছি না বাপু। নিদেন এখন যা আছে পকেটে বার কর তো।'

সত্যি-সত্যিই পকেট ঘেঁটে সাড়ে তেরো আনা পয়সা বার করে নেয় মহাশ্বেতা। বড ছেলেকে খটির বাজারে পাঠায় গরম রসগোল্লা কিনে আনতে।

এত চেঁচামেচি ছুর্গাপদর কানে না পৌঁছানোর কথা নয়।

সে যেন একটু অবাকই হয়ে যায়।

বার বার তাকায় মেজ বৌযের দিকে। কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করতে চায়। কিন্তু একবারও চোখে চোখ পড়ে না ছুজনের। মেজবৌ যেন সযত্নেই এড়িয়ে চলে ছুর্গাপদর চোখ।

অন্য দিন সন্ধ্যার পরই ছাদে যায় ছুজন। আজ প্রমীলা গিয়ে দেখে তখনও ছুর্গাপদর দেখা নেই। তার ওপর নীচে থেকে বড় বৌ হেঁকে বলে, 'ওলো ও

মেজ বৌ, খোঁপায় খড়কে কাঠি গুঁজেছিস তো? তোদের তো ভয়ডর নেই—আমরা মরি যে বুক কেঁপে। তা ছাড়া, এখনই তো তোর ভাসুর হরির নোট দেবে—সেরে একেবারে টং-এ উঠলে হ'ত না!'

প্রমীলা তরতর করে নেমে আসে।

'ও কী হচ্ছে দিদি! বট্‌ঠাকুর বাড়ি এসেছেন, ও কী চেঁচামেচি হচ্ছে! কী মনে করছেন বল তো!'

'কী আবার মনে করবেন। ভাইয়ের বংশরক্ষে হচ্ছে এই মনে করছেন!'

গলা কিছুমাত্র চাপবার চেষ্টা না ক'রেই হাসতে হাসতে জবাব দেয় সে। বেগতিক দেখে প্রমীলা আর বেশী ঘাঁটায় না, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

দুজনে দেখা হয় একেবারে রাত্রে খাওয়ার পর।

দুর্গাপদ একটু দেরি ক'রেই দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ছাদে ওঠে।

'কি ব্যাপার গো, ছোটবাবুর আজ যে দেখাই নেই!'

দুর্গাপদ তখনই কোন জবাব দেয় না। ধীরে সুস্থে, দাঁতে খড়কে দেওয়া শেষ হ'লে খড়কেটা ফেলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'কৈ, এসব কথা আমাকে বল নি তো এক দিনও—'

'কী কথা? ও, নাও! এ আবার কি একটা বলবার মত কথা! বুড়ো বয়সে—'

'বুড়ো বয়সে হতে পারে—বলতেই যত লজ্জা!'

'আর কীই বা বলব! বা রে, এসব কথা বুঝি মুখ ফুটে বলে কেউ নিজে নিজে! জানি—জানতে তো পারবেই—'

'হু!' দুর্গাপদ ট্যাঁক থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে।

'কী হ'ল—আজ যে মনটা ভার-ভার? এই খবরেই নাকি?'

'হওয়া তো উচিত।'

'কেন? বা রে। এর সঙ্গে তোমার কি?'

'না—তাই ভাবছি!'

'কী ভাবছ তাই তো শুনতে চাইছি।'

'শুনে লাভ কি!'

'তবু—'

'ভাবছি সবাই তো দিন কিনে নিলে। আমিই বোকা—চিরদিন থাক্কার বাইরেই রইলুম, আসরে ঢোকা আর হ'ল না।'

'থাকছ কেন! আসরে ঢুকতে কে বারণ করেছে? দিন কিনে নিতেই বা কে আটকে রেখেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রমীলা।

দুর্গাপদ নীরবে বসে নস্যি নেয়।

'কী, উত্তর দিলে না যে?'

'উঠি। ঘুম পাচ্ছে।' দুর্গাপদ সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

'ও আবার কী। সে কি কথা? এরই মধ্যে?' প্রমীলা ওর কোঁচাটা চেপে ধরে।

কোঁচাটা এক রকম জোর ক'রেই ছাড়িয়ে নেয় দুর্গাপদ। ধীর ও নিস্পৃহকণ্ঠে বলে, 'বড় বৌদি ঠিকই বলছিল—এ অবস্থায় এত রাত্রে ছাদে ওঠা তোমার ঠিক নয়। পেটে যেটা এসেছে—নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তুমি আর এসো না রাত্তির বেলা—'

'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ছোট বৌয়ের আঁচলের তলায় ঢোক গে যাও।' রাগ ক'রে বলে ওঠে প্রমীলা।

দুর্গাপদ এ আক্রমণেও বিচলিত হয় না। বরং ধীরে সুস্থে ছাদ থেকে নামবারই উদ্যোগ করে।

এবার প্রমীলা এসে দু হাত দু দিকের কাঠে দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়ায়।

'ও কী হচ্ছে ছেলেমানুষি! বসবে চল। এরই মধ্যে নামতে হবে না!'

অন্ধকার—তবু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোতে মোটামুটি নজর চলে একটা। বড় সাংঘাতিক কটাক্ষ মেজবৌয়ের চোখে। অগত্যা দুর্গাপদকে ফিরে গিয়ে বসতে হয়।

কিন্তু প্রমীলা বুঝতে পারে যে তার এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী। ওদের আড্ডা আর জমবে না আজ। একথা সেকথার পর— এবং সে কথাও বড় শুষ্ক, বড় প্রাণহীন, বড়ই জোর করে বলা—গোটাকতক হাই তুলে দুর্গাপদ আবারও উঠে পড়ে হঠাৎ এক সময়।

'শরীরটা ভাল নেই, বড় ঘুম পাচ্ছে আজ!' কৈফিয়ত স্বরূপ বলে সে।

কিন্তু প্রমীলা সে কৈফিয়তের জবাব দেয় না। বাধাও দেয় না আর। কাঠ হয়ে বসে থাকে শুধু।

দুর্গাপদ যখন নিজের ঘরে এল তখন তরলা বসে হ্যারিকেনের আলোতে—ওদের বাড়ির অদ্বিতীয় বই—পুরনো রামায়ণটা পড়ছে। অসময়ে এত সকাল সকাল স্বামীকে ফিরতে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয় সে। স্থানকালপাত্র সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

সে দৃষ্টির সামনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে দুর্গাপদ। আপন মনেই 'শরীরটা ভাল নেই' বলে মাদুরের দিকে হাত বাড়ায়। তরলা তাড়াতাড়ি উঠে এসে নির্দিষ্ট স্থানে মাদুরটা পেতে দেয়, বালিশ এনে সাজিয়ে দেয়—তার পর তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে নিজের বিছানায় এসে শোয়।

বার বার 'ঘুম পেয়েছে' বলে নেমে আসা সত্ত্বেও দুর্গাপদর চোখে কিন্তু ঘুম নামে না। বার বারই এপাশ ওপাশ করে। 'উ-আঁ'ও করে মধ্যে মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত তরলার আর স্থির থাকা সম্ভব হয় না। নেমে এসে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'পা টিপে দেব?'

এত কাল পরে 'দাও' বলতে সংকোচে বাধে। কিন্তু নিষেধও করে না। সেইটেই সম্মতি বলে ধরে নিয়ে তরলা পা টিপতে বসে।

অনেকক্ষণ পরে স্থির হয়ে আসে দুর্গাপদ, সেই নিথর ভাবটাকেই ঘুম বলে ধরে নিয়ে তরলা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়। বহুদিন পরে এইটুকু সাহচর্য লাভ ক'রেই তার তৃপ্তি হয় বুঝি খানিকটা। আজ তারও তন্দ্রা আসে তাড়াতাড়ি।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ কার একটা হাত গায়ে লাগতেই ভয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে চমকে উঠে বসে।

ভয় নেই, ভয় নেই, আমি!' চাপা গলায় বলে দুর্গাপদ। সে বিছানার এক পাশে এসে বসেই বোধ করি ওকে ঠেলেছে।

শুধু চাপা নয়, অস্বাভাবিক কোমলও শোনায় ওর কণ্ঠস্বর।

'শরীরটা বড্ড ভার-ভার লাগছে, গা-হাত-পা কামড়াচ্ছেও খুব। মেঝেয় শুতে সাহস হচ্ছে না ঠিক। ভাবছি এখানেই—'

'না, না। আপনি এখানেই শুয়ে পড়ুন। আমি বালিশ এনে দিচ্ছি।'

সে উঠে তাড়াতাড়ি দুর্গাপদর বালিশ দুটো এনে দেয়। তার পর নিজের বালিশটা টেনে নিয়ে মেঝেয় শোবার উপক্রম করতেই দুর্গাপদ খপ্ ক'রে ওর একটা হাত ধরে ফেলে।

'না, না। তুমি মেঝেয় শুচ্ছ কেন। এখানেই তো ঢের জায়গা রয়েছে, শোও না।'

থর থর করে কেঁপে ওঠে তরলা। সেই হাতটা যেন অবশ হয়ে আসে।

'না না। আপনার অসুবিধা হবে হয়তো—' অতি কষ্টে বলে শেষ পর্যন্ত।

'কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। এ তো দুজনের মতই বিছানা।...তা ছাড়া তোমার অভ্যেস নেই, মেঝেয় শুলে তোমার শরীর খারাপ হবে। এখানেই শোও।'

শেষের দুটি কথা আদেশের মতই শোনায়।

অগত্যা বালিশটা যথাস্থানে রেখে কোনমতে গুটিসুটি মেরে একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে শোয় তরলা—মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।

শোয়—কিন্তু আর তন্দ্রা আসে না চোখে, এইটুকু অধিকার লাভকেই অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্য বলে মনে হয়। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকার জন্মেই বোধ হয়—ঘেমে নেয়ে ওঠে।

মনে হয় দুর্গাপদও জেগে আছে। বিঘতখানেক মাত্র ব্যবধান সুতরাং নিশ্বাসের শব্দ তো বোঝা যাযই—সামান্য মাত্র নড়াচড়াও অনুভব করা যায়।

খানিক পরে—বোধ হয় মিনিট-পনেরো পরে হঠাৎ দুর্গাপদর একটা হাত ওর গায়ে এসে পড়ে।

'এত জায়গা থাকতে অমন গুটিসুটি মেরে শুয়েছ কেন ?···অমন ক'রে শুয়ে কেউ ঘুমোতে পারে ? ভাল হয়ে শোও, নইলে আমার মনে হবে যে আমি তোমার অসুবিধে করলুম—আমার জন্মেই তোমার ঘুম হচ্ছে না।'

আজ কি তরলার মাথা খারাপ হয়ে গেল ? না সে অসুস্থ হয়ে প্রলাপের ঘোরে এসব শুনছে ?

অদ্ভুত বিচিত্র ওর মনের গতি। সে এখন প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করে আজ সকালে উঠে কার মুখ দেখেছিল। দিদির—না তার ছোট ছেলেটার ? না বোধ হয় স্বামীরই—কিন্তু সে তো ঘুমন্ত মুখ

দুর্গাপদর হাত ওকে সামান্য আকর্ষণ করে নিজের দিকে।

সে হাত ক্রমে যেন ওর দেহের অত্যন্ত নিভৃত, অত্যন্ত কোমল প্রদেশে পৌছয়।

'ইস, কী ঘেমেছ ! ছাখ দিকি—এই গরমে এমন ক'রে গায়ে কাপড় জড়িয়ে এতটুকু হয়ে শুলে ঘামবে না। এদিকে এসো এদিকে এসো—ভাল ক'রে শোও।'

এবার আর তরলা স্থির থাকতে পারে না।

তার এতকালের সমস্ত বেদনা ক্ষোভ অভিমান অশ্রুর বন্যায় বেরিয়ে আসতে চায়। দুর্গাপদর সবল আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে এসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'নাও। এ আবার কী কাণ্ড ! কান্নাটান্না থামাও বাপু। আমি আবার এসব ছিঁচ-কাঁদুনেপনা দেখতে পারি না। কান্নার হয়েছে কি ?'

তার পর একটু বিব্রত, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বাতাস করব ? খুব গরম হচ্ছে ?'

ততক্ষণে ওর হাত তরলার সুপুষ্ট, সুগঠিত, যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহ যেন লেহন

করতে থাকে। সে স্পর্শে ও আকর্ষণে তরলা অর্ধমূর্ছিতের মত পড়ে থাকে। এইটুকুর জন্যই হয়তো সে সেই বিবাহের দিন থেকে বা সে-সম্ভাবনা থেকেই বুভুক্ষু ছিল—কিন্তু বিধাতা সে সাধনার বস্তু যখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই দিলেন, তখন তা উপলব্ধি করারও যেন অবস্থা রইল না। বহু পরস্পর-বিরোধী আবেগের সংঘাতে শুধু দেহ নয়, মনটাও যেন অনড় অবশ হয়ে রইল।

দুর্গাপদ তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। আরও নিবিড় হয়ে ওঠে তার বাহুবন্ধন—

পরের দিন ভোর বেলা দোর খুলে বেরোতেই প্রথম যার সঙ্গে তরলার চোখোচোখি হ'ল—সে প্রমীলা।

দোতলায় দালানের কোণে নীচের সিঁড়িতে নামবার মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই দিকেই চেয়ে। তরলা আর একটু কাছে আসতে যেন সাপের মত হিস্ হিস্ ক'রে ওঠে, 'তোকে এমন ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে কেন লা ছুট্‌কী—রাত্তিরে ঘুম হয় নি বুঝি ?'

তরলাও মেয়েরই জাত। সাধারণত এদের কাছে মাথা হেঁট ক'রেই থাকে সে, কথার ঘা দেওয়া অভ্যাস নেই তার, কিন্তু আজ বোধ করি বহু দিনের বহু বেদনাই তার কণ্ঠে বিষ যোগায়। সে শান্তভাবেই জবাব দেয়, 'না মেজদি, আমার ঘুম যেমন হওয়া উচিত তেমনিই হয়েছে, কিন্তু আপনি এত সকালে উঠেছেন যে ? আপনার রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো ? না কি সারারাত আমার ভাবনা ভেবেই কাটিয়ে দিলেন ?'

এবার আর প্রমীলা কণ্ঠের বিষ ঢাকবারও চেষ্টা করে না। বলে, 'বাঃ, কথা ফুটেছে যে। তাই তো বলি পাখি কিসের টানে দাঁড়ে ফিরল। ভাল মানুষ ছোটবোয়েরও বাড়ির হাওয়া লেগেছে তা হলে।'

তরলা কিন্তু আর কথা বাড়ায় না। তার মন তখন—পরিপূর্ণ না হোক অনেকখানি তৃপ্তিতে ভরে আছে। পাওনার মাধুর্যটা যে পুরোপুরি মধুর হতে পারে নি তার কারণ এই স্ত্রীলোকটারই বিষস্মৃতি তার সঙ্গে মিশিয়ে ছিল বলে। তবু—যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুই সে আপন মনে রোমন্থন ক'রে ভোগ করতে চায় আজ—যে প্রসন্নতার আমেজ থাকলে তা সম্ভব, সেটা এখন এর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করলে থাকবে না, বিষ উঠবে আকণ্ঠ ফেনিয়ে।

সে প্রমীলার পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অবশেষে মহাশ্বেতাই একটি পাত্রী খুঁজে বার করে। ওর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কেই —জাঠতুতো ভাসুরের মেয়ের ননদ। জানাশুনো ঘর, মেয়েটিও নাকি ভাল। ভাসুরঝি লীলা তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে—কাজে কর্মে বিবেচনায় ব্যবহারে —সব দিক দিয়েই নাকি ঘরে আনবার মত। খুব নাকি বড় বংশও ওদের ; উলুবেড়ের কাছে যে গ্রামে ওদের বাড়ি—ওরা এক কালে সেই গ্রামেরই জমিদার ছিল। এখন বহু সরিকে ভাগ হয়ে গিয়ে পড়ন্ত অবস্থা। লীলার শ্বশুর কোন্ এক বাঙালীর বাড়ি চাকরি করেন—সামান্য কিছু জমিজমাও আছে, যোগেযাগে চলে যায়। লীলার বর অবশ্য রেলে কাজ করে—তেমনি তার নিজেরও বেশ একটি সংসার হয়ে গেছে বলতে গেলে। পাঁচটি ননদ ওর—এইটি মেজ। বড়র বিয়ের দেনাই নাকি এখনও শোধ হয় নি, সুতরাং পাওনা-থোওনা বিশেষ হবে না, সে আভাসও দিয়েছে লীলা।

সব খবর নিয়ে মহা ছুটল মায়ের কাছে। মেয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল, 'মেয়ে দেখতেও কুচ্ছিত নয়, রংটা নাকি শুনছি খুবই ওজ্জ্বল! একেবারে যাকে বলে ফিট্ গৌরবন্ন। মোদ্দা ঐ কথা—টাকার কামড় কর তো হবে না। তবে তাও বলি—গোচ্ছার টাকা দিয়ে যে সোন্দর মেয়ের বে দেবে—সে তোমার ঘরে দেবে না। কী আছে তোমার বল? ছেলে একটা পাস করে নি—চাকরিও বেশী দিনের নয়। সম্পত্তি বলতে তো এইটুকু এক বাড়ি—বাঁশের কেল্লা।...কেন দেবে বল্‌তে পার? টাকা চাইলে কুচ্ছিত মেয়ে নিতে হবে—এই পষ্ট কথা বলে দিলুম। কী করবে ভেবে ছাখ।'

শ্যামার জবাব আসতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। সে বলে, 'তবে মা শুধু গরাসও মুখে তুলতে পারব না—আমারও এই সাফ কথা। মেয়ের বের দেনা শোধ করতে না পারি সে আলাদা কথা, কিন্তু তাই বলে দেনা ক'রে ছেলের বিয়ে দেব সে বান্দা আমি নই। কথা পেড়ে ছাখ—একেবারে যদি ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তোলাতে চায় তো মেয়ে দেখে কাজ নেই।'

মহাশ্বেতা যতটা উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছিল ঠিক ততটাই নিরুৎসাহ হয়ে ফিরল। কিন্তু দেখা গেল লীলার সাংসারিক জ্ঞান ওর চেয়ে অনেক বেশী। সে বললে, 'এখন থেকে ওসব কথা বলে তেতো ক'রে দরকার নেই কাকীমা, মেয়েটা আগে দেখিয়ে দাও, যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো দিদ্মাও অনেক নরম হয়ে আসবে—

আর ওরাও—সামান্যর জন্যে তখন তৈরী সম্বন্ধ ভাঙতে চাইবে না। দু পক্ষই তখন অন্য স্বর ধরবে দেখো।'

যুক্তিটা সকলেরই মনে ধরে। সবাই সায় দেয় ওব কথায়।

মেয়ে-দেখানোব ব্যবস্থাও লীলাই ঠিক করে একটা। শ্যামা হবু কুটুমবাড়িতে মেয়ে দেখতে যাবে না, অথচ সে ছাড়া কে-ই বা মেয়ে দেখবে। বায দেবার মালিক যখন সে-ই, তাবই দেখা দবকাব। আবার মেয়ে এনে দেখানোও বড অপমানের কথা—পাত্রীপক্ষ যত গবিবই হোক, এক কালেব জমিদারী রক্ত এখনও গায়ে আছে, তাবা রাজী হবে না। অগত্যা ঠিক হ'ল যে, শ্যামাদেবই পাডায় মেয়েব এক কাকীর বাপেব বাড়ি—মেয়ের কাকীব সঙ্গে সেখানে বেডাতে আসবে, শ্যামা সেইখানে গিয়েই দেখবে।

মেয়ে এক কথাতেই পছন্দ হ'ল শ্যামাব।

রংটা--বাণী বৌয়েব মত অত গোলাপী নয়, হলুদেব ওপব উজ্জ্বল, কতকটা দুর্গাপ্রতিমাব মত। প্রতিমাব মতই একটু ওপর-দিকে-টানা চোখ, ভুরু তো যেন কে বসে বসে এঁকেছে মনে হয়। থাই-মুখটিও চমৎকার। দোষের মধ্যে কপালটা একটু উঁচু—আর গডনটাও খুব পুবন্ত গোছের নয়, একটু যেন বোগাটে। তা হোক -এতটাও আশা কবে নি শ্যামা। আশা বেশী থাকলে মানুষেব মন খুঁত-খুঁত করে—প্রত্যাশাই যেখানে অনেক কম সেখানে একটু বেশী পেলেই খুশী হয়ে ওঠে সে। শ্যামাও দুটো একটা কথা কয়ে, হাত-পাগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বললে, 'তা এধাবে তো মন্দ নয়—তা মেয়ে, মেয়েই বলি, লীলার সম্পর্কে তুমি তো আমার মেয়ের বেযান হলে গো—চুলটা বেঁধে রেখেছ বাছা, ওটা তো দেখবাব উপায রাখ নি।'

'ওমা তাব আব কি হযেছে—দেখুন না।'

মেয়ের কাকী খোঁপা এলিযে বিনুনি খুলে চুল ছডিযে দেন। ঘন কালো চুলে সারা পিঠ ঢেকে যায়। চুলেব রাশ। শ্যামা আরও খুশী হয়—খুব লম্বা নয় চুল। শাস্ত্রে নাকি লেখে পায়ের গোছ পর্যন্ত চুলের কথা – কিন্তু শ্যামা দেখেছে যে খুব লম্বা চুল হলে মেয়েব ভাগ্য ভাল হয় না।

'না—তা চুলও তো দিব্যি! তা হ্যাঁগা বাছা—কা যেন নাম বললে, কনকরেণু? বড্ড গালভরা নাম বাপু, কনকই বলি শুধু, তা ত্যাখ আমার ঘর করতে পারবে তো? গরীবের সংসার, পাতার জালে রান্না, ঝি-চাকর নেই—ঘরের পাট, বাসন মাজা সবই নিজেদের করতে হয়– গিয়ে নাক তুলবে না তো?'

মেয়ের হয়ে কাকীই জবাব দেয়, 'কী যে বলেন আঁবুই মা! আমাদের সংসারেই কি ঝি-চাকর আছে? সে ক্ষ্যামতা কৈ? তবু তো আপনাদের বাড়ি ধান সেদ্ধ করতে হয় না, গোরুর পাট নেই। আমাদের তো পরিপুন্ন ষোল আনাই সব বজায় রাখতে হয়। এর ওপর আউতি-যাউতি নোক-নৌকতা কুটুম্বিতে—সে সবও তো আছে গো।'

'তা বটে। সে সব আমার কিছু নেই। মহাদের মত ঠাকুরও নেই একটা। সে সব পাট অনেক দিন চুকে গেছে। যা কিছু নিজেদেরই পেট-পুজোর ধান্দা। তা গ্যাখ। লীলাকে বল অভয়ের সঙ্গেই কথা-বার্তা কইতে। যা করবেন জামাই-ই করবেন। মেয়ে আমার অপচন্দ নয়—এইটুকু বলতে পারি।'

লীলার খুড়শাশুড়ী তখনই পাঁচ পয়সার বাতাসা কিনতে পাঠান—খাড়াখাড়া হরির লুট দিতে হবে।

দিন তিনেক পরে একটা শনিবার দেখে অভয়পদ এল। এ তিন দিন সে বৃথা ব্যয় করে নি—ও-পক্ষের সঙ্গে কথা কয়েই এসেছে—তা শ্যামা জানে। তাই সে পরনের খাটো কাপড়খানাকে টানাটানি ক'রে ঘোমটা দেবার একটা বৃথা চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে এল একটু উৎসুক হয়েই। সহজ ভাবে এখন কথা কয় বটে—কিন্তু জামাইয়ের সামনে ঘোমটা না দিয়ে বসে না সে আজও।

বিনা আমন্ত্রণে বসা এবং বিনা ভূমিকায় কথা বলা চিরদিনের অভ্যাস অভয়পদর। সে শাশুড়ীর পেতে-দেওয়া পিঁড়িটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজের অদ্বিতীয় ছাতিটি পেতেই রান্নাঘরের রকের ধারে বসল। তারপর একেবারেই আসল কথাটা পাড়ল। কাঁটাল গাছটার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে আর এর মধ্যে জড়ালেন কেন—হাজার হোক আমাদের কুটুমের মেয়ে।'

'তুমি ছাড়া আর আমার কোন্ কাজটা হচ্ছে বাবা, চিরদিন তো সবই তুমি করে এলে। তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এখন এর বেলা আর কার কাছে যাব বল? তা ছাড়া তুমি কি আর জ্ঞাতি ভাইয়ের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিক টেনে আমার লোকসান করাবে!'

মিনিটখানেক মৌন থেকে অভয়পদ জবাব দিলে, 'লোকসান যাতে হয় তার ব্যবস্থা আপনিই খানিকটা করে এসেছেন! একেবারে এক কথায় কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে এলেন যে তাদের মেয়ে আপনার পছন্দ হয়েছে—তারা খানিকটা

জো পেয়ে তো যাবেই। এসব ক্ষেত্রে একটু রেখে ঢেকে মনের কথাটা জানাতে হয়!'

শ্যামা ঘোমটার মধ্যেই এতখানি জিভ কাটে। কথাটা তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। সত্যিই মেয়ে দেখে অমন ক'রে গলে যাওয়া তার উচিত হয় নি!

অভয়পদ আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'দু শ এক টাকা নগদ, চুড়ি হার কানের মাকড়ি—আর যেমন দানসামিগ্‌গিরি দিতে হয় তা দেবে—বরের আংটি জোড়। নমস্কারী থান-আষ্টেক পর্যন্ত। এর বেশী বাড়ানো গেল না!'

'মোটে দু'শ এক। কী হবে বাবা তাতে? তা ছাড়া বরের ঘড়ি-বোতাম—কিছু দেবে না? না না—অত কমে আমি পারব না!'

অভয়পদর প্রশান্ত মুখ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সে শুধু বলে, 'তা হলে ওদের না বলে দিই?'

শ্যামা এবার বিষম বিব্রত বোধ করে। এই এক মানুষ, দুটো পরামর্শ করার উপায় নেই! মাঝামাঝি কোন কথা বোঝে না—একেবারে হ্যাঁ, কি না—বলে দাও!

সে বেশ খানিকটা বিপন্ন কণ্ঠেই বলে, 'একেবারে না-ই বা বলবে কেন? মানে একটু বেগ দিয়ে দেখলে হয় না। ওদের কি একেবারে ধনুর্ভঙ্গ-পণ? বিয়ে ভেঙে যাবার মত দেখলে আবার খানিকটা বাড়বে হয় তো!'

অভয়পদ ঘাড় নেড়ে বললে, 'যতটা টানবার তা আমি টেনেছি—ওরা আর বাড়াতে রাজী নয়। অবশ্য অবস্থাও ওদের খারাপ। এর ওপর যে খুব বাড়াতে পারত তাও মনে হয় না। এক উপায় আছে, তত্ত্ব—গায়েহলুদ, ফুলশয্যে—যদি গায়ে গায়ে কাটান দেন। তাতে আপনার খরচটা কমে একটু!'

'তেমনি ঘরে আসরে না তো কিছু! প্রথম ছেলের বিয়ে—ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে না—সেটাই বা কেমন কথা! তা ছাড়া একটা ভাল কাপড়, হলুদ মাখার একখানা আটপৌরে কাপড়, একটু দইমাছ—এগুলো তো পাঠাতেই হবে। লক্ষণ-অলক্ষণের কথা তো আছে! তার ওপর আর কটা টাকা খরচ করলেই আমার তত্ত্ব সাজানো হবে। ওদেরও ধর—ক্ষীর-মুড়কির বাটি, ফুলের রেকাব, মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় এগুলো তো বাদ দিতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শ্যামা। বেশ একটু সাগ্রহেই জামাইয়ের মুখের দিকে চায়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর কী করা যেতে পারে—কিছু একটা সদ্যুক্তি চায় সে।

কিন্তু অভয়পদ সেদিক দিয়ে যায় না। শুধু নিস্পৃহভাবে বলে, 'বেশ, তা হলে আপনার যা শেষ কথা বলে দিন। আর কতটা পর্যন্ত আপনি তা থেকে নামবেন তাও বলে দিন—আমি সেই মত বুঝে না ক'রে দেব!

শ্যামা অসহায় ভাবে চারদিকে চায়। এসব সে করে নি কখনও। ভেবেও রাখে নি। কিন্তু এই এক মনিষ্যি—এর সঙ্গে কথা বলাও যা দেওয়ালকে বলাও তাই।

সে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে কতকটা প্রশ্ন করার ভঙ্গীতেই বলে, 'যদি নগদটা চার শ এক করতে বলি—আর বোতাম ঘড়ি, রাজী করাতে পারবে না?'

'মনে তো হয় না। আমি খানিকটা চেষ্টা করেছিলুম বৈকি! যা বলেছে তার ওপর আর সামান্য কিছু বাড়ানো যায়! অত বেশী বাড়বে না।'

শ্যামা চুপ ক'রে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না কিছুতেই।

অভয়পদও উত্তরের অপেক্ষা করে খানিকটা। তার পর বলে, 'তা হলে ঐ কথাই বলি আপনি যা বললেন। রাজী না হয়, আবার অন্য মেয়ে খুঁজতে হবে।'

টাকাটা বড়ই কম। যা আশা করেছিল তার থেকে বেশ খানিকটা কম। দেনা শোধ তো হবেই না, বিয়ের খরচটা চালানোও মুশকিল। কিন্তু মেয়েটাও বড় ভাল। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, লাজুক ধরনের মেয়ে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে হয়েছে বেহায়া-বাচাল, পুরুষের-ঘাড়ে-পড়া মেয়ে—তেমন নয়। ঠিক হাতছাড়া করতেও মন চায় না।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই মনস্থির ক'রে ফেলে সে।

বলে, 'অন্তত যদি বোতামটাও দেয়, আর একশটা টাকা নগদ বেশী তা হলেও হয়। সেইটাই বলে দ্যাখ-না।'

'যে আজ্ঞে। তাই বলব।'

কার বিবাহোপলক্ষে কুণ্ডুদের বাড়ি থেকে পাওয়া বাসি লুচি আর মোণ্ডা ছিল—জামাইকে জল খেতে দিল শ্যামা। কিন্তু আজ অভয়পদ কিছু খেলে না। বললে 'আজকাল প্রায়ই বিকেলের দিকে একটু ক'রে অম্বল হচ্ছে। বাসি লুচিটা আর খাব না। আচ্ছা, তা হ'লে আসি।'

ছাতাটি বগলে ক'রে বেরিয়ে গেল সে।

॥ ২ ॥

পরের দিন অভয়পদ এল একেবারে মেয়ের বাপ পূর্ণ মুখুজ্জে মশাইকে সঙ্গে ক'রে। নইলে নাকি উপায় ছিল না—উনি কাল থেকে এসে তাঁর বেয়াইবাড়ি অর্থাৎ অভয়পদর জ্ঞাতিদাদার বাড়ি বসে আছেন—একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে যাবেন

না। তা ছাড়া যাকে মেয়ে দেবেন তাকে এবং তার বাড়ি-ঘর দেখারও একটা কৌতূহল আছে বৈকি। একেবারেই সব পাট চুকিয়ে দিতে চায় অভয়পদ।

শ্যামা একটু বিব্রত বোধ করে। প্রথমত এসব কথা কওয়া তার অভ্যাস নেই। এতকাল কন্যাপক্ষের হয়ে দয়া ভিক্ষাই ক'রে এসেছে—পাত্রপক্ষের হয়ে সে ভিক্ষা কী ক'রে ফিরিয়ে দিতে হয় শেখে নি। তা ছাড়া ছেলের বাবা যখন রয়েছে তখন উচিত তার কাছেই নিয়ে যাওয়া—নইলে ওরাই বা কি ভাববে? অথচ যা ছিরির মানুষ—

কিন্তু অভয়পদ দেখা গেল আট-ঘাট বেঁধেই এসেছে।

তার শ্বশুরমশাইয়ের শয্যাশায়ী অবস্থা, দীর্ঘকাল গ্রহণীতে ভুগে মাথাটারও একটু গোলমাল হয়েছে—এ সব কথাই পূর্ণবাবু জানেন। তাঁকে বাইরের ঘরের দিকেও নিয়ে যায় নি অভয়—রান্নাঘরের দাওয়াতেই এনে বসিয়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে চিন্তা করবার কিছু নেই।

অগত্যা শ্যামাকে খাটো কাপড়টা পাল্‌টে একমাত্র পোশাকী শাড়ি পরে বেরোতে হয় হবু বেয়াইয়ের সামনে। অভয়পদকে মধ্যস্থ রেখে ঘোমটার মধ্য দিয়েই কথা বলে সে। কিন্তু তবু দেখা গেল দরদস্তুর টানাটানিতে সে সত্যিই অনেক বেশী পটু অভয়পদর চেয়ে। কন্যাপক্ষের যথারীতি অনুনয়-বিনয়, হাত জোড় করা, এমন কি কান্নাকাটির মধ্যেও কথার পিঠে কথার প্যাঁচ লাগিয়ে তিন শ এক টাকায় রাজী করাল সে। তার সঙ্গে সোনার বোতামটাও।

তবে একটা কথা নিয়ে যান পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই—গায়ে-হলুদের তত্ত্বে বাহুল্য কিছু করবে না শ্যামা, কারণ ও পক্ষ থেকে তার যোগ্য ফুলশয্যা পাঠাবার ক্ষমতা নেই।

'এমনিতেই এত দিন যা করি নি তাই করতে হবে—খানিকটা ধানজমি ছাড়তে হবে। সম্বচ্ছরের চালটা আসত—তা আর আসবে না। কিন্তু উপায়ও তো আর নেই। ধার করবার যত জায়গা ছিল তা বড় মেয়ের বিয়েতে শেষ করেছি—আর কেউ ধার দেবে না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই।

অবশ্য এ প্রতিশ্রুতি প্রসন্ন মনেই দেয় শ্যামা। বাহুল্য করবার ক্ষমতা কই তার? তারও তো ঐ তিন শ' এক টাকা পুঁজি। দেনা এমনিতেই যথেষ্ট আছে—ছেলের বিয়েতে দেনা করতে রাজী নয় সে। আর করবেই বা কোথা থেকে? ধার দিতে তো ঐ এক জামাই—তাকে কত দোহন করবে?

অতঃপর ছেলে দেখে জলখাবার খেয়ে প্রসন্নমনেই বিদায় নেন পূর্ণবাবু। ছেলে দেখে ভারি খুশি প্রকাশ্যেই স্বীকার ক'রে গেলেন যে এমন রূপবান জামাই তাঁর বংশে জাঠতুতো খুড়তুতো জ্ঞাতি জড়িয়ে আর একটিও হয় নি।

শ্যামারও মনটা অনেকদিন পরে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। নতুন কুটুমকে জলখাবার খাওয়াতে নগদ ছ' আনা পয়সা বেরিয়ে গেল—কারণ তাঁর সামনেই জামাইকেও দিতে হ'ল, সেখানে কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় না—তবু তাতেও দুঃখিত নয় শ্যামা। তার হেমের বিয়ে হবে, বৌ আসবে—এ স্বপ্ন সেই যেদিন হেম ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই দিন থেকেই মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে। শুধু ইদানীং চারিদিক থেকে যখন দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরেছিল তখন যেন আর কল্পনা করতেও সাহসে কুলোত না। একান্ত দুরাশা বলে মনে হ'ত। কিন্তু আজ আর তা দুরাশা নেই, আজ তা বাস্তব—আজ তা হাতের মধ্যে এসে গেছে। এত দিনে তার সত্যিকারের সংসার হতে চলেছে—এই মুহূর্তে আরও কিছু বেশী খরচ হলেও বোধ করি দুঃখিত হ'ত না সে।

ওরা চলে গেলে শ্যামা নরেনের কাছে এসে বসল। মনটা বড়ই খুশী আছে, আজ আর এটাকে সময় নষ্ট বলে মনে হ'ল না।

নরেন বিস্মিত হল। স্ত্রীর দর্শন প্রয়োজনের সময় ছাড়া দুর্লভ। বললে, 'আজ যে এমন অকালে-সকাল বামনী—ব্যাপার কি?'

'খোকার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল যে। সামনের মাসের দোসরাই দিন ঠিক হ'ল।' শ্যামা হাসি হাসি মুখে বলে।

'কী হ'ল? বে ঠিক হয়ে গেল? কার বে? খোকা—মানে আমাদের হেমচন্দরের?'

বলতে বলতেই বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—আবার এলিয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

'হ্যাঁ—তা নইলে খোকা আবার কে!'

'কী রকম? আমার ছেলের বে আমি জানলুম না—আমার সঙ্গে কথা হ'ল না—বে ঠিক হয়ে গেল! বলি ঠিকটা করলে কে? কার এত বড় হেকমত! আমি গার্জেন থাকতে আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমার ছেলের বে ঠিক করে! বলি কে—কে ঠিক করলে তাই শুনি? সেই গোয়বেটার জাত হারামজাদা জামাই নাকি? অ্যাঁ?'

'ত্যাখ—খবরদার জামাইকে গাল দিও না বলে দিলুম। সাতজন্ম অমন জামাইয়ের পাদোক জল খেলে তবে যদি মানুষ হতে পার। অমন জামাই পেয়েছিলে তাই সাতগুষ্টি তরে গেল। তাও কি তুমি করেছ—নিহাত আমার বাপ-মা'র পুণ্যের জোর ছিল তাই ঐ পাত্তরে মেয়ে দিতে পেরেছি!'

'থাম্, থাম্—অত আর লম্বা লম্বা লেকচাব ঝাড়তে হবে না। মোদ্দা ও বিয়ে হবে না। নেই মাংতা বিয়ে—নেই মাংতা বৌ!…ঠিক করেছেন। ঠিক অমনি করলেই হ'ল। তুই কি জানিস—এর সব নেম-কানুন! বংশ দেখতে হবে, গাঁই-গোত্তর মিলোতে হবে—দেনা পাওনা আছে—তবে তো বে ঠিক হবে। কথায় বলে লাখ কথা না হলে বে হয় না। উনি অমনি এক কথায় বে ঠিক ক'রে ফেললেন। নে যা—এখনই খবর পাঠা, ওসব চলবে না, বে দিতে হয় মেয়ের বাপ এসে আমার কাছে হাত জোড ক'রে বসুক।'

'হুঁ। কত বড গার্জেন অমার এলেন রে, ওঁর কাছে হাত জোড় ক'রে বসবে! তুমি কে যে তোমার কাছে মেয়ের বাপ আসবে? সে সম্পর্ক রেখেছ? না বাপের কোন কাজ করেছ? ••আমিই তার বাপ মা দুজনের কর্তব্য ক'রে এসেছি চিরকাল—আমিই কথা দিয়েছি। আমারই ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে খবর দিতে আসা। তুমি কি মানুষ—যে মানুষের মত কথা বুঝবে!'

'কী কী বললি! যত বড মুখ নয় তত বড় কথা! এত বড কথা বললি আমাকে! কী বলব ভগবান মেরে রেখেছেন তাই—এত অঙ্গ থাকতে পা দুটোই নিয়ে নিয়েছেন—নইলে নোড়া দিয়ে তোর ঐ বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে চোপ্‌রা করা বার ক'রে দিতুম।…আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেহি, এয়সা দিন নেহি রহেগা—একবার কি উঠব না! তখন এর সুদসুদ্ধ যদি আদায় না করি তো—'

বলতে বলতে—বোধ করি নিঃশ্বাসের অভাবেই চুপ করতে হয়। আবার যখন বলতে শুরু করে তখন কণ্ঠস্বর অনেকটা কোমল শোনায়, 'হাতি যখন দঁকে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট্ মারে। কী বলব নিহাত নাতোয়ান হয়ে পড়েছি তাই। এমন করিস নি বামনী, ভাল হবে না। ধম্মে সইবে না। একটা অনাথ পঙ্গ লোককে এমন ক'রে দু পায়ে থ্যাংলাতে নেই—'

বলতে বলতেই বোধ হয় একটা অসীম আত্মকরুণা বোধ করে সে। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে আপন মনেই। কিন্তু সে কান্না শ্যামার কানে যায় না। তার অনেক আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দামী কাপড়টা ছেড়ে আবার গুছিয়ে

তুলে রাখা দরকার। পাতার আণ্ডিল পড়ে আছে। সামনে এত বড় কাজ—তার আগে বাড়ি পরিষ্কার করতে হবে, ত্বটো পয়সাও দরকার।

পাকা দেখা চুকে গেলে ফর্দ করতে বসতে হয়। বাজারের ফর্দ নিমন্ত্রণের ফর্দ সবই করতে হবে। লোক বলতে তো মা আর বেটা ঐ ত্বটি প্রাণী। কারুর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবে এমন কেউ নেই। অভয়পদ এ সবে আসতে চায় না. মহার তো মাথারই ঠিক নেই। লোক-খাওয়ানোর ফর্দ—ঘি ময়দা আনাজ মাছ দই—এ ফর্দ কত লোক হবে বললে অম্বিকাপদ করে দেবে। নিখুঁত হিসেব তার, কম-বেশি কখনও হয় না। কিন্তু তার আগে কাকে কাকে এবং মোট কজনকে বলা হবে তার ফর্দটা করা দরকার।

মোটামুটি হেমের ভাষায় 'লিস্টি'টা সহজেই হয় যায়। তিন এব কুটুমবাড়ি পাড়াঘরে একটি একটি, সরকার বাড়ি সব। কলকাতায় গোবিন্দ, গোবিন্দর বৌ ওদের বাড়িওলাদের একজন। এতকাল ঐ বাড়িতে ছিল হেম, খুবই জানাশুনো দহরম মহরম। না বললে খারাপ দেখায়। সবাইকে বলাই উচিত, অন্ততঃ একজনকে বলতেই হবে।

'এ ছাড়া', ছেলের মুখের দিকে চেয়ে শ্যামা বলে, 'তোমার বন্ধুবান্ধব কাকে কাকে বলবে, কে আছে ভেবে ছাখ। তার পর বরযাত্তর কাকে বলা হবে—সেটাও লিখে নাও। ওদের বলেছি জনকুড়ি-পঁচিশের বেশী হবে না। আর বরযাত্তর নিয়ে যাওয়া তো নয় -ফুলেশয্যেয় অতটি লোকই নিয়ে আসবে ওরা।'

শেষের কথাগুলো হেমের কানে যায় না। তার বন্ধুবান্ধব কে আছে—যাকে বিয়েতে বলা যায়, তাই ভাবতে থাকে সে। বন্ধুই বা কৈ তার? পুরনো রং-কলে ত্ব-একজনের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার পর বহুকাল তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, বাদ দিলেও চলবে। এ অফিসে এখনও পর্যন্ত এমন কেউ হয় নি, যাকে বন্ধু বলা যায়। বললে পুরো সেকশনটাকেই বলতে হয়। তার দরকার নেই। সে ক্ষমতাও নেই ওর। এক আছে থিয়েটারের কজন। কানাই নন্দ, ওদের কাউকে না বললেও দক্ষিণাদাকে বলা দরকার। সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তার।...থিয়েটারে না হয় যাবেই না, বা উর ঠিকানা জানে, সেখানে গিয়ে বৌয়ের কাছে বলে আসবে। তা হলেই খবর পৌঁছবে তার কাছে।

দক্ষিণাদার নামটা লেখে হেম।

'তার পর? আর—?' শ্যামা প্রশ্ন করে।

'কান্তিকে তো আনতে হবে। কেন তাও জানাতে হবে। রতনদিকে বলা উচিত নয়?' জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হেম চায় মায়ের দিকে।

'ওমা, তাকে তো বলতেই হবে। ভাল ক'রে বলে আসবি তাকে। সে তো আসবেই না, মিছিমিছি পাওনাটা ছাড়ি কেন!'

'যদি আসে? কান্তিকে অত ভালবাসে—আসতেও পারে হয় তো!'

একটু যেন উৎসুক, সতৃষ্ণ নয়নে মা'র দিকে চায় সে।

'আসে তো আসুক না। ভয়টাই বা কিসের! আজকালকার দিনে কে কার অত খবর রাখে! আর রাখলেও—এখন আর সেদিন নেই যে লোকে মুখের ওপর কিছু বলবে কিংবা না খেয়ে চলে যাবে সবাই।'

এইটেই শুনতে চাইছিল হেম। কারণ তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জেগেছে কদিনই—বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে যাবার সময় থেকেই—নলিনীকে নিমন্ত্রণ করলে কী হয়?

ভালবাসা? না, ভালবাসা আর নেই। বিদ্বেষ তো নেই-ই। সে সব ছেলেমানুষি অনেকদিন চলে গেছে। এখন নলিনীর স্মৃতির সঙ্গে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্যই জড়িয়ে আছে মনের মধ্যে। আর কৃতজ্ঞতা। অনেক দিয়েছে সে। কাঙালকে নিয়ে গিয়ে—সত্যি সত্যিই হাত ধরে নিয়ে গিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। যা পেয়েছে তার জন্যই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, আরও কী পায় নি, কী পেতে পারত সে হিসেব করার কোন অধিকার ওর নেই।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ল্যাম্পোর আলোতে ফর্দ তৈরি হচ্ছিল। ল্যাম্পোর সেই কম্পিত ধূমমলিন শিখাটার দিকে চেয়ে কত কি ভাবতে লাগল হেম। কত ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথা—কত অকিঞ্চিৎকর ঘটনার স্মৃতি। নলিনীকে ঘিরে ওর প্রথম-যৌবন-স্বপ্নের সহস্র ইতিহাস।...

প্রচণ্ড হাই তুলে শ্যামা এক সময় প্রশ্ন করে, 'কী হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? কাজটা শেষ ক'রে ফেল্ না বাপু।'

সত্যিই যেন চমকে জেগে ওঠে হেম, একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'দেখি, এখন আর মাথায় কিছু ঢুকছে না, বড্ড ঘুম পেয়েছে—কাল সকালে তখন আর একবার ভেবে দেখব কারুর নাম বাদ পড়ল কিনা!'

সে আর শ্যামার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই একেবারে উঠে দাঁড়ায়। যদিও—বিছানাতে শুয়ে বহুক্ষণ, বহুরাত্রি পর্যন্ত তার চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামে না।

॥ ৩ ॥

আর সব নিমন্ত্রণই সন্ধ্যার পর করা সম্ভব কিন্তু নলিনীকে বলতে গেলে দুপুরে যেতে হবে। সুতরাং যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—হেম পুরোপুরি অফিস থেকে ডুব মারল। কামাই তার বড় একটা হয় না, এক দিন 'সিকরিপোর্টে' কোন ক্ষতি হবে না।

অবশ্য মাকে সে কথা জানানো চলবে না। তা হলেই হাজার গণ্ডা কৈফিয়ত। নলিনীর কথাটা এখন বলতে চায় না সে। সেদিন গোলেমালে চলে যাবে—কে আর তখন খুঁটিয়ে কৈফিয়ত নিচ্ছে? সুতরাং যথারীতি ভোরবেলা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল এবং সোজা গোবিন্দর বাড়ি উঠে—সারা সকাল আড্ডা দিয়ে, গোবিন্দর অফিসের বেলা করিয়ে আর একবার বড় মাসী আর রাণী বৌদির সঙ্গে ভাত খেতে বসল। ওদের কাছেও ভাঙলে না কথাটা, শুধু বললে, 'এমনিই শরীরটা ভাল লাগল না, তাই ডুব মারলুম। বারো মাসেই তো ঠিক ঠিক হাজরে দিচ্ছি—এক দিন না গেলে আর কী হবে?'

তবু কমলা সন্দিগ্ধস্বরে বলে, 'দেখিস, চাকরি-বাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো?'

'পাগল হয়েছ তুমি! এ কি মার্চেণ্ট অফিস? রেল আপিসে অত সহজে চাকরি যায় না।'

গোবিন্দ ও গোবিন্দর বৌ বিয়েতে যাবে। রাণী বৌদির ইচ্ছা দু দিন আগেই যায়—মেসোমশাইকে দেখবার আর তাঁর সঙ্গে গল্প করবার জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট করছে ওর—কিন্তু 'এই এক পোড়া মেয়ে, পেটে এসে ইস্তক শত্রুতা করছে!' তখন কমলা যেতে দেয় নি—ভরা পোয়াতি বলে। এখনও আগে যেতে দিতে তার আপত্তি—কোলে কচি মেয়ে, সেখানে গেলে সবাইকে বিব্রত করবে, নিজেও বিব্রত হবে। ঠিক হ'ল যে বিয়ের দিন ভোরবেলা ওরা চলে যাবে—গায়ে হলুদের পালা চুকিয়ে ওখানেই দুটি মাছভাত খেয়ে ফিরে আসবে—গোবিন্দ ওকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আবার বরযাত্রী বেরোবে। ওরা যে ট্রেনে রওনা হবে সেই ট্রেনেই গোবিন্দ কলকাতা থেকে উঠবে—ঠিক রইল। বৌভাতের দিন ওরা যাবে একেবারে বিকেলে—সেদিনটা কোনমতে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরবে। সেদিন কমলাও যাবে কথা আছে। উমা কোনমতেই যাবে না—তা হেমও জানে। তবুও সে বলেছিল একবার, উমা তারই হাতে তার আইবুড়ো ভাতের কাপড় একখানা আর মিষ্টি বাবদ একটা টাকা দিয়ে দিয়েছে।

গোবিন্দদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণাদার বাড়ি হয়ে যখন কম্বুলেটোলার সেই বিশেষ পরিচিত বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল তখন বেলা দুটো বাজে। সময়টা হিসেব করাই ছিল, কিন্তু তবু একেবারে বাড়ির সামনে এসে পড়ে থমকে দাঁড়াল। কড়াটা নাড়তে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলে। এতক্ষণ একটা আবেগের বশে সে ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে—সব কথা থিতিয়ে ভাবতে পারে নি। যদি নলিনী কথা না কয়? যদি এড়িয়ে চলে সেদিনের মত? অনেক দিন পরে এসেছে সে সত্যি কথা—কিন্তু তাতেই যে নলিনীর মত পরিবর্তন হবে তার ঠিক কি? কিংবা যদি কড়া নাড়তেই কিরণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? 'তুমি আবার কী মনে ক'রে এদিকে এসেছ বাছা, তোমার লজ্জা নেই? আভি নিকালো হিঁয়াসে!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে? না, থাক বরং। একবারের অপমানই যথেষ্ট। সেধে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবার দরকার কি! যে জীবন থেকে চলে গেছে চিরকালের মত—তাকে আর টানাটানি করতে গিয়ে লাভ নেই।

হেম ফিরে দাঁড়াল। ফিরেই যাবে সে। ডাকবে না। তবু আর একবার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে না চেয়ে পারল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুট ক'রে দরজাটা খুলে গিরিধারী বেরিয়ে এল।

'আসুন আসুন দাদাবাবু। ভেতরে আসুন। ফিরে যাচ্ছেন কেন? দিদিবাব বোলাচ্ছেন আপনাকে।'

'দিদিবাবু কেমন ক'রে জানলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে হেম।

'জানলা দিয়ে দেখল যে।'

অগত্যা ফিরতে হয়।

সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল নলিনী, আগের মত। কাছে আসতে একটু এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ঢিপ ক'রে এক প্রণাম করে সে।

'ওকি, ওকি—ও আবার কি?' বিব্রত হেম দু পা পিছিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। হাতটা ধরে ফেলে আটকানো উচিত ছিল কিনা ভাবতে ভাবতে আর কিছু করা হয় না।

'তা হোক, ব্রাহ্মণ মানুষ। একে তো কত অন্যায় করেছি। সেদিন থেকে কী জ্বালায় জ্বলছি মনে মনে তা কি বলব। এই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রে ছিলুম। বলি আর কোন দিন কি একটু নিরিবিলি দেখা হবে না! মা কালীর কাছে কত মানত করেছি।...যেদিন শুনলুম চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছ—সেদিন থেকে কেঁদে বাঁচি না। বলি আমার জন্যেই বামুনের ছেলের ভাত-ভিক্ষে নষ্ট হ'ল —এ মহাপাপ রাখব কোথায়?'

দুপুরবেলা ভাড়াটেরা দোর বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে। তবু গলা নামিয়ে ফিসফিস ক'রেই বলছিল নলিনী। তার সেই প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের অস্ফুট কথায় হেমের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

'চল চল —ওপরে চল। আমার কপাল— এইখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে বকছি।'

হাত ধরে নিয়ে যায় ওপরে, আগের মতই। সেই ঘর, সেই শয্যা।

যেন বহুদিন-আগে স্বপ্নে-দেখা কোন্ এক রাজ্যে ফিরে এল সে। নেশা লাগে হেমের। কত দিন কত রাত কী ঐকান্তিক কামনাতেই এই ঘরে আবার ফিরতে চেয়েছে সে, অন্তত একটিবারের জন্যও।

একেবারে নিচের ঢালা বিছানাটাতে বসিয়ে অভ্যাস মত জামাটা খুলে নেয় নলিনী, গেঞ্জিটাও। তার পর ঠিক গা ঘেঁষে না হলেও কাছে এসে হাওয়া করতে বসে।

'তার পর? এখন কি করছ?'

'রেলে কাজ করছি।' গলায় একটু জোর দিয়েই বলে সে।

'ওমা, তবে তো ভালই হয়েছে। শাপে বর। রেলের কাজে শুনেছি বেশ পয়সা।'

'সে সব কাজে নয়। আমাদের আপিসের চাকরি। এখানে পয়সা নেই।'

'তা হোক, বাঁধা কাজ তো। মাসকাবারে মাইনেটা হাতে পাবে। এ যা ছিরির কাজ ছিল। ঝ্যাঁটা মারো!'

'তা তুমি সেদিন অমন ক'রে আমাকে এড়িয়ে গেলে কেন?' ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন ক'রে বসে হেম। বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিমানে গলাটা কেঁপে যায় ওর।

'সেদিন'টা যে কোন্ দিন তা বুঝিয়ে দিতে হয় না। সেদিনের জ্বালা না হোক, ব্যথা বুঝি নলিনীরও কম ছিল না। উত্তর দিতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় তারও। মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলে, 'যদি তোমার চোখ থাকত তো দেখতে পেতে— আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে। সে দিন তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে বুঝি আমার খুব সুখ হয়েছিল! কী শাসনে যে ছিলুম তা তো জান না। বুড়ো বয়সে সেদিন মা আমাকে ধরে মেরেছে পর্যন্ত। তার ওপর ভয় দেখিয়েছিল থিয়েটারে এসে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে। বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তাই।...সারা রাত সেদিন শুধু কেঁদেছি তোমার জন্যে। তাই কি ছাই—প্রাণ খুলে কাঁদবার জো আছে। সে মিন্‌সে তো পাশে শুয়ে—টের পেলেই হাজারো জবাবদিহি।'

চোখে বুঝি জল এসে যায় হেমেরও। নলিনীর মুখখানা তুলে ধরে কোঁচার খুঁট মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার চোখ দুটো। নলিনী আর সামলাতে পারে নি:

নিজেকে টপটপ ক'রে জল ঝরে পড়ছে তার গাল বেয়ে। কিন্তু সাহস হ'ল না হেমের, নিজেরও ভেঙে পড়বার ভয়ে।

সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্‌টে দিলে।

'তা আজ তোমার মা কোথায়?'

আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে—ধরা গলাতেই হাসির আভাস এনে বললে, 'ওমা, তা জান না বুঝি? আমি বলি খবর নিয়েই এসেছ। মা যে আজ তিন মাস আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাশী গিয়ে আছে!'

'কেন—ঝগড়া কেন?'

'সে অনেক কথা!'

'কি শুনি শুনি—' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে হেম।

একটু একটু ক'রে নলিনী খুলে বলে ইতিহাসটা। দীর্ঘ কাহিনী—তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে—যে, রমণীবাবু আর নলিনীর ঘরে আসেন না। কালো বলে যে নতুন মেয়েটা এসেছিল সখীর ব্যাচে—ঢ্যাঙা, ফরসা মত—হেম যখন ছিল সে তখন সবে এসেছে—দর্জিপাড়ায় বাড়ি, ওর মা খুব নামকরা বাড়িউলী, সেই মেয়েটাকে নিয়েই আছেন। অনেকদিন ধরেই ঝুকেছিলেন, নলিনী লক্ষ্য করেছিল ঠিকই—কিন্তু বকাবকি করলে কান্নাকাটি করলে দিব্যি গালতেন, মিছে কথা বলতেন—দু দিন হয়তো আসতেনও ঠিক—আবার ডুব মারতেন। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে নলিনীই হাল ছেড়ে দিলে! এক দিন স্পষ্ট বলে দিলে রমণীবাবুকে যে তাঁর আর আসবার দরকার নেই।

এই নিয়েই ঝগড়া কিরণের সঙ্গে। কিরণ হাল ছাড়তে রাজী নয়। সে অনেক কিছু মতলব এঁটেছিল—মাদুলি কবচও মেয়েকে পরিয়েছিল গোচ্ছার। শেষে প্রস্তাব করেছিল তারকেশ্বরে নিয়ে যাবার, সেখানে নাকি ধন্না দিতে হবে। প্রকাসী মাসী নাকি ঐখানে ধন্না দিয়ে সত্যেনবাবুকে চিরকালের মত বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু নলিনী কিছুতেই রাজী হয় নি। সে বড় অপমান। তা ছাড়া তারকনাথের কাছে ধন্না দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এমন কিছু তালেবর নয় রমণীবাবু। এদানে বড্ড কঞ্জুস হয়ে গেছে যেন আরও, হাত দিয়ে জল গলে না। আর দরকারই বা কি, নলিনীরও তো মুখ বদল করতে ইচ্ছে হয়। না হয় থিয়েটারের চাকরি আর করতে পারবে না—চোখের সামনে সতীন রাণীগিরি করবে, সে দেখা বড় কঠিন—কিন্তু বাড়িটা তো আছে, যা ভাড়া পায় তাতে টেক্স-খাজনা দিয়ে নুনভাতও তো জুটবে। সেটা তো আর রমণীবাবু কেড়ে নিতে পারবে না। কিরণের সেকথা

পছন্দ হয় নি, আসলে এমন ভাবে হাল ছেড়ে দেওয়াটাই পছন্দ নয় তার—এক কথা দু কথায় ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গিয়েছিল, নলিনীও আর রাগ সামলাতে পারে নি—বলেছিল, 'বেশ করব, আমার যা খুশি তাই করব, তোমার কি? আমি তোমার খাই, না তুমি আমার খাও?' তাইতেই অভিমান হয়েছে, কাশী চলে গেছে। বলে গেছে 'ভিক্ষে করে খাব, ছত্তরে খাব—অন্নপূর্ণার গলিতে আঁচল পেতে বসব তবু তোর অন্ন আর খাব না।'

'তা'—একটু হেসে বলে নলিনী, 'সেখানে আমাদের জানাশোনা অনেকে তো আছে, দশ টাকা করে পাঠাচ্ছি—নিচ্ছে তো শুনছি। না নিয়ে আর কি করবে? ফিরেও আসবে তা জানি, রাগ ক'রে কত দিন থাকবে!'

'এখন তা হলে কার কাছে আছ?' প্রশ্ন করে হেম, 'থিয়েটারে আর যাও না বুঝি?'

'না, সেই দিন থেকে আর যাই নি। বাবু মাসকাবারে মাইনেটা পাঠিয়ে দিয়েছিল—ফিরিয়ে দিয়েছি!...এখন আসেন আমাদের মুখুজ্জে মশাই—ওঁরই, মানে রমণীবাবুরই বন্ধু, ওঁর সঙ্গেই আসতেন-টাসতেন। অনেকদিন ধরেই ছোঁক ছোঁক করছিলেন—নিহাত বন্ধুর ব্যাপার বলেই কথাটা পাড়েন নি। বাবুকে ছেড়েছি শুনেই ছুটে এসেছেন। মাইনে ও-ই আছে, এধারেও দেয় থোয় মন্দ না। কামায় তো ভাল, খুব নাকি বড চাকরি, বছর-খানেকের মধ্যেই নাকি আরও উঁচুতে উঠবে, তখন এক খাস বডসাহেব ছাড়া ওর মাথার ওপর কেউ থাকবে না...এ আমি ভালই আছি ভাই, থিয়েটারের মেহনতটা তো বেঁচে গেছে!'

তার পরই কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমের দিকে চেয়ে বলে, 'তা তুমি এসব জানতে না—তো আজ হঠাৎ কী মনে ক'রে এসে পড়লে?'

হেম রাঙা হয়ে ওঠে একেবারে। সলজ্জ হেসে বলে, 'আমার যে বিয়ে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি!'

'বিয়ে? তোমার? ওমা কী হবে!' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে নলিনী, 'তা এতক্ষণ একটা কথাও বল নি! কী চাপা লোক রে বাবা!...তা বেশ, ভালই হয়েছে। সত্যি, বয়স তো হয়েছে—এবার ঘরবাসী হওয়া দরকার। না, বড় আনন্দ হ'ল শুনে...কোথায় বিয়ে? কত পাচ্ছ? মেয়েটি কেমন? কত বয়স তার—মানাবে তো?' একসঙ্গে একশোটা প্রশ্ন করে সে।

'রোস রোস—এক এক ক'রে বল। তুমি যে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলে!'

সংক্ষেপে পাত্রী, তার বয়স, বাড়ি ঘর, এবং সম্ভাব্য রূপের একটা বিবরণ দেয় হেম।

নলিনী সত্যিই খুশী হয়েছে মনে হ'ল ওর বিয়ের কথা শুনে। ছুটে চলে গেল বাইরে—গিরিধারীকে পাঁচ রাস্তার মোড় থেকে রাজভোগ আনতে পাঠালে। ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করতে লাগল যেন।

'চা খাবে? খাও আজকাল? এখন মুখুজ্জে সাহেবের জন্যে চায়ের পাট হয়েছে বাড়িতে। ওঁর মুহুর্মুহু চা চাই।'

তার পর আতিথেয়তা সারা হলে বলে, 'তা সত্যিই নেমন্তন্ন করছ তো? যাব? কোন কথা উঠবে না? মানে কোন আবার ফ্যাসাদে পড়বে না তো আমার জন্যে? কি বলবে?'

'কিছুই বলব না। বলব আলাপী লোক। বলব আমার আগের মনিবের বৌ। গায়ে কি তোমার কিছু লেবেল মারা আছে?'

'না থাকলে ভালই। আমি কিন্তু বাপু সত্যিই যাব। গিরিধারীকে সঙ্গে ক'রে বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঠিক চলে যাব।'

'নিশ্চয়ই যেও। ইস্টিশানে নেমে একটা পাল্কি নিয়ো—ব'লো যে নতুন বামুনদের বাড়ি—ঠিক নিয়ে যাবে। তুমি কী বলবে বাবুকে?' হেম মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করে।

নলিনী হেসে জবাব দেয়, 'বলব তোমার সতীনের বে। এ তো সুবিধে গো। বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছি আমোদ করতে—অন্য রকম সম্পক্ক হলে কি কেউ যায় না যেতে পারে? কিছু খারাপ ভাববে না। বলব থিয়েটারের চেনাশুনো নেমন্তন্ন করেছে—অনেক ক'রে যেতে বলেছে। আর কিছু বলবে না। সে রকম লোক নয়—সন্দ-বাই নেই।'

'এবার উঠি তা হলে, আরও দু এক জায়গায় যেতে হবে।'

মুখে বলে হেম, কিন্তু তখনই ওঠে না। কী যেন একটা অপূর্ণ রয়ে যায়, কিসের জন্য যেন মনটা সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। যে মোহ তার আর নেই বলে কিছু দিন আগেই মনকে আশ্বাস দিয়েছে, সেই পুরাতন মোহই আচ্ছন্ন করেছে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে। পরিচিত পরিবেশ প্রাক্তন অভিজ্ঞতার মধুস্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। সেই স্মৃতির রসে মন আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। বুকের মধ্যেটা কাঁপছে একটু একটু।

নলিনী কিন্তু ওর কথাটাকে সহজভাবেই নিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে আলনা থেকে ওর জামা আর গেঞ্জিটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

'কি হ'ল—উঠবে বললে যে? না কি একটু বসবে?'

হেম সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ওর একটা হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে। মৃদু আকর্ষণ – সুতরাং প্রস্তুত না থাকলেও হুমড়ি খেয়ে পড়বার মত কিছু নয়, নলিনী অল্প চেষ্টাতেই সামলে নিলে নিজেকে। এ আকর্ষণের অর্থ তার অজানা নয়। সে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। ও বিহ্বল দৃষ্টিও সে চেনে। পুরুষের এ আকর্ষণ আর ঐ বিহ্বল দৃষ্টির অর্থ তার কাছে পরিষ্কার।

সে প্রবলবেগে-ঘাড় নাড়লে, 'না না, ছি! বিয়ে করতে যাচ্ছ, একটা ভদ্দর-লোকের মেয়েকে হাত ধবে ঘরে আনছ—কত শিবপুজো ক'রে কত আশা নিয়ে সে আসছে বল দিকি!...আর এসব করো না, যা করেছ করেছ—তখন কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এখন আর নয়। আমারও বহু জন্মের পাপ এ জন্মে ভোগ করছি—আবার সতীলক্ষ্মী বামুনের মেয়ের কাছে জেনেশুনে পাপের ভাগী হতে পারব না। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি, তুমি আজ বাড়ি যাও!'

ওর হাত থেকে জামা দুটো নিয়ে কোনমতে গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসে হেম। আজও সেইদিনকার মত নিষ্ফল আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—আজও অপমানে না হোক—লজ্জায় পা দুটো তেমনি টলছে, প্রায় সেদিনের মতই স্খলিত পদে বেরোতে হ'ল এ বাড়ি থেকে—তেমনি বলতে গেলে হাত্ড়ে হাত্ড়ে। তবে সেদিন অপমানটা বাইরে, সহস্র চক্ষুর সামনে—আজ সবটাই ভেতরে। আজ আত্মগ্লানি ও আত্মধিক্কারই প্রবল।...

ছি ছি, নলিনী কী ভাবলে তাকে! কী ছোটই হয়ে গেল ওর কাছে!

আর কি কোন দিন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে?

নলিনী সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল, সে পেছন থেকে চুপি চুপি বললে, 'আমার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ না তো লক্ষ্মীটি, আমার অপরাধ নিও না। কথাগুলো ভেবে দেখো।'

হেম সে কথার জবাব দিলে না। ফিরে তাকালেও না আর। তবে সে রাগে নয়, লজ্জায়।

॥ ৪ ॥

হেমের বৌভাত উপলক্ষে শ্যামাকে আর একটি যা কাজ করতে হ'ল, তা তার চিরকাল মনে থাকবে। এত নিচে যে সে নামতে পারে, তা এত দিনের এত জীবনযুদ্ধের পরেও ধারণা ছিল না তার। আর বুদ্ধি বটে বড় জামাইয়ের—এ বুদ্ধি সাত বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেও তার মাথাতে আসত না।

কম করতে করতেও প্রায় সওয়া শ লোক হয়ে গেল বৌভাতে। তিন মেয়ের বাড়ি, সরকারদের বাড়ি—তার ওপর কুটুম বাড়ি, এই তো পুরো একশো-র ধাক্কা। তা ছাড়া পাড়াঘরে একটি একটি বলতে হয়েছে। প্রথম ছেলের বিয়ে—ভিন্ন পাড়ার লোকও দু-একজন সে বলেছে, একটু মাতব্বর দেখে দেখে।

এসেছিল অনেকেই। নলিনীও সত্যি-সত্যিই এসেছিল। তবে তাকে চেনবার জো ছিল না, ভোল পাল্‌টে এসেছিল একেবারে। সাদা গরদের শাড়ি পরে ঘোম্‌টা দিয়ে যখন পাল্‌কি থেকে এসে নামল, তখন হেমও প্রথমটা চিনতে পারে নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌কির পেছনে গিরিধারীর দিকে নজর গিয়েছিল তাই রক্ষা—নইলে হয়তো বোকার মত প্রশ্ন ক'রে বসত, 'কোথা থেকে আসছ গা পাল্‌কিওলারা?'

অবশ্য নলিনীর আসল পরিচয় কেউ সন্দেহ না করলেও ওর ঐ অতিরিক্ত সম্ভ্রান্ত বেশভূষা ও ধরণধারণের জন্যেই বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল কিছু কিছু—অনেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়েছিল হেমকে। বিশেষ ক'রে সোনার মাকড়ি দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখার ফলে আরও চাঞ্চল্য।

'ইটি কে গা হেম—ঠিক চিনতে পারলুম না তো—'

'হ্যাঁ হে হেমচন্দ্র,—উনি, মানে—তোমার কুটুমবাড়ির কেউ নাকি?'

এক-একজন এক-একবার ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন।

সকলকেই এক উত্তর দিয়েছিল হেম, 'আমার পুরনো মনিবের স্ত্রী। তিনি আসতে পারেন নি, উনি একাই চলে এসেছেন। আমাকে খুব স্নেহ করেন কিনা—'

কিন্তু প্রত্যেকবারই কান-মাথা গরম হয়ে উঠেছে তার, লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করেছে মাথার মধ্যে।

সবচেয়ে বিপদে পড়েছিল প্রমীলাকে নিয়ে। তার চোখ যেন অন্তর্ভেদী—মুচ্‌কি হেসে প্রশ্ন করেছিল, 'তা হ্যাঁ দাদা, তোমার মনিবগিন্নীর তো নোয়া একগাছা আছে দেখছি সোনা বাঁধানো—কিন্তু সিঁথির সিঁদুর কী হ'ল!'

এক মুহূর্তে ঘেমে উঠেছিল হেম। ঠিক কোন উত্তর যোগায় নি। ভাগ্যে সেখানে মহা দাঁড়িয়ে ছিল—সে বোকার মত জবাব দিলে, 'পরতে নেই হয়তো ক'দিন—মাথা ময়লা হয়েছে!'

বেঁচে গেল হেম। বললে, 'সত্যি, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন মেজদি? মেয়েলী ব্যাপারের আমি কি জানি?'

কিন্তু প্রমীলাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সোজা হেমের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করব নাকি ?'

'করো না।'

'কিছু দোষের হবে না ?'

'তা জানি না। বুঝে দেখ।' সেখান থেকে সরে পড়েছিল হেম। কে জানে যা মেয়ে—হয়তো কী অপমানই বা ক'রে বসবে। হয়তো জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রমীলা আর একটু বাঁকা হেসেছিল শুধু।

এক ফাঁকে একটু নিভৃতে দেখা হতে হেমই বলেছিল, 'একজন জিজ্ঞেস করছে সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ?'

নলিনী প্রস্তুত হয়েই এসেছে। বললে, 'ওমা, সিঁদুর বাঁধা রেখেছি যে—ওঁর অসুখের মানসিক।' বলে হাসল সে। একটু অপ্রতিভ হাসি।

'সে তো শুনেছি লোহা-সিঁদুর দুই-ই বাঁধা রাখতে হয় !'

'তা কেন—যার যা মানসিক।' প্রশান্তকণ্ঠে বলে নলিনী।

রতন আসে নি। নিমন্ত্রণ করতে যাবার সময়ই বলে দিয়েছিল, 'না ভাই, আমি কোথাও যাই না—জানেনই তো। থিয়েটারে বায়স্কোপেই যাই না। একেবারে মরে এ বাড়ি থেকে বেরুব—এই ইচ্ছে। কান্তি যাবে বৈকি। তবে বেশী দিন আগে পাঠাব না, একজন মাস্টার রেখেছি ওর জন্যে, মিছিমিছি পড়ার কামাই হবে। এবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে উঠল দেখে মাস্টারমশাই একজন ব্যবস্থা করেছি। সামনের বারেই তো ম্যাট্রিক দেবে—যদি একটা জলপানি পায় তো আর কারুর দ্বারস্থ হতে হবে না—নিজেই নিজের পড়ার খরচ যোগাতে পারবে !'

মাস্টার রাখার খবরটা এরা কেউ জানত না। শুনে শ্যামার মন খারাপও হয়ে গেল যেমনি—তেমনি নতুন একটা আশাও মনের সঙ্গোপনে উঁকি মারতে লাগল। ছেলে যেন বড্ড পর হয়ে যাচ্ছে। বড়লোক-ঘেঁষাও হয়ে যাচ্ছে হয়তো। এর পর কি আর ওদের ঘরে বাস করতে পারবে ? শাক ডাঁটা ডুমুর-সস্‌সড়ি ভাত কি মুখে রুচবে ! তা ছাড়া জলপানি পেয়ে যদি আরও পড়ে তো—চাকরি-বাকরিই বা করবে কি করবে। শ্যামা কি চিরকাল এই দুঃখের পেছনে দাড় দিয়ে বেড়াবে ? অথচ সেই সঙ্গে একটা অত্যন্ত গোপন দুরাশা, একটা সুদূর কল্পনাও মনে জাগছে। এত যখন করেছে তখন নিশ্চয়ই ভালবাসে কান্তিকে,

ওর তো ছেলেপুলে নেই, অগাধ ঐশ্বর্য লোকে বলে। কে জানে, মা সিদ্ধেশ্বরী যদি মুখ তুলে চান, ওকেও দিয়ে যেতে পারে হয়তো !

বিয়ের দিন সকালে দারোয়ান এসে কান্তিকে পৌঁছে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে একখানা দামী দেশী ধুতি, একথালা গোলাপছাপ সন্দেশ আর একটা সোনাবাঁধানো চিরুনি বৌয়ের জন্য। কিন্তু সেটাও তত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারল না—যতটা করল কান্তি নিজে। ছেলেকে দেখে সবাই অবাক। কেউ যেন চিনতেই পারে না। যেমন ঢ্যাঙা হয়েছে, তেমনি সুন্দর। শুভ্র গৌর বর্ণ, আয়ত চোখ, দীর্ঘ পক্ষ্ম—গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁটের ওপরে সামান্য একটু গোঁফের আভাস—কচি কিশলয়ের মত। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আর বেশ-ভূষাই বা কি। চুনট্ করা দেশী কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি, পাম্পশু জুতো, আঙুলে একটা নীল আংটি। ফুলবাবু একেবারে।

সকলের সপ্রশ্ন ও সবিস্ময় মিলিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে ওঠে কান্তি। তার যেন কেমন লজ্জা করতে থাকে। হেম পর্যন্ত একটা স-স্ শব্দ ক'রে ওঠে, মাকে বলে, 'কী সুন্দর চেহারা হয়েছে মা কান্তিটার--যেন রাজপুত্তুর, না ?'

এই উপমাটাই বার বার মনে হচ্ছিল শ্যামার। রাজপুত্র ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না কান্তিকে দেখলে। রূপকথার রাজপুত্র একেবারে। আনন্দে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার গর্ভের কোন সন্তানই তো ফেল্না নয় – সবাই সুন্দর। ঐন্দ্রিলা আর কান্তির তো কথাই নেই। ওদের বাপও ঐ বয়সে—। রংটাই যা খুব উজ্জ্বল ছিল না, কিন্তু মুখচোখ ঐ কান্তির মতই ছিল ঠিক। আজও সেই প্রথম চার চোখে চাওয়ার কথা মনে হলে কী রকম করতে থাকে বুকের মধ্যে। সেই মানুষ বদস্বভাবের গুণে ঘুরে ঘুরে আর অত্যাচার ক'রে ক'রে কী পোড়া কাঠই হয়ে গেল। আর সে নিজেও, তার রূপটাই কি সোজা ছিল ! সেই রূপ, সেই রংই তো পেয়েছে ওরা। আজ আর কিছুই নেই তার—একেবারে ঘুঁটেকুড়ুনী কাকতাড়ানী হয়ে গেছে। আজ কান্তির মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় তার। কে জানে, ওদের লজ্জা হয় কি না।

কান্তি ওদের চোখ এড়াতেই বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেনও ওকে চিনতে পারে নি। অনেকটা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে বাবাজী তুমি, চিনতে পারলুম না তো ? তুমি বুঝি আমার হেমচন্দরের শালা ?'

লজ্জার ওপর লজ্জা। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'বা রে ? আমি তো কান্তি। একবারে উঠে বসতে পারবেন ? পায়ের ধুলো নেব !'

'কে? কা-। ও আমাদের কান্তি। আরে, এ যে নবকার্ত্তিক একেবারে। ময়ূরে গিয়ে চড়ে বসলেই তো হয়। বাঃ, এমন সাজালে কে? সেই কসবী মাগী বুঝি? আর কি—নজরে পড়ে গিয়েছিস দেখছি। চেপেচুপে থাক্—দিন কিনে নিতে পারবি। উঃ—আবার রুমালে খোসবো। বাবুয়ানার কিছু বাকী নেই। হবে হবে—ও বয়সে ঐ—এ বয়সে এই। আমিও বাবু ছিলুম বৈকি এক কালে। তবে এমন মাল দার কারুর নজরে পড়তে পারি নি এই যা—আমার কপালে জুটেছিল যত খোলার ঘরের মাগী—।'

কান্তির প্রণাম করা হয় না, সেখান থেকে ছুটে পালায়। লজ্জায় আঙার হয়ে উঠেছে তার কানের ডগাগুলো, মুখে কে যেন মুঠো মুঠো আবীর ঢেলে দিয়েছে।

ঝকমারি হয়েছিল তার বাবাকে ঘাঁটাতে আসা। জেনে-শুনেও আসাটা তার উচিত হয় নি।

অবশেষে রান্নাঘরে গিয়ে দাড়াতে শ্যামা একটু অবসর পায় প্রশ্নটা করবার।

'হ্যাঁ রে, তোর রতনদি তোকে খুব ভালবাসে, না? এসব করে কিনে দিলে রে?'

'কী সব—এই কাপড়জামা? দাদা যেদিন বলে এসেছিল সেই দিনই দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে জামার মাপ দিয়েছে।'

'ভাল হয়ে থাকিস বাপু, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস। কত খরচ করছে বল দিকি। আবার তো শুনছি মাস্টার রেখে দিয়েছে একজন—?'

'হ্যাঁ। বারণ করলুম অত ক'রে, শুনলে না। এত লজ্জা করে—তাই কি কম, পনেরো টাকা মাইনে নেন মাস্টার মশাই। অন্য কোন ইস্কুলের মাস্টার একজন। কী জেদ চাপল—খরচার ভূতে পেয়েছে যেন।'

'ভালই তো। এর আর ভূতে পাওয়া-পাওয়ি কি। ভগবানের ইচ্ছেয় আছে ঢের—তোকে ভালবাসে- খরচ করছে। মানুষ হয়ে যদি উঠিস কোন দিন—ওকে দেখিস। এই কথাটা ভুলিস নে।'

তার পরই আর একবার ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শ্যামা বলে, 'তা তুই তো সেজেছিসও খুব ভাল। একেবারে বাবুদের মতই। এমন কাপড়-পরতে শিখলি কোথায়?'

'এ তো রতনদি নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন আসবার সময়।'

বলতে বলতেই কান্তির সুগৌর মুখ আবারও আবীর-রাঙা হয়ে ওঠে।

শ্যামা বলে, 'তাই নাকি—তা হলে তোর মায়ায় খুব জড়িয়ে পড়েছে বল্— আহা নিজের একটা নেই তো—ছেলের মতই দেখে আর কি!'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে, সেটা তৃপ্তির কি ঈর্ষার—তা বোধ হয় নিজেও বোঝে না।

কিন্তু সে সব কথা কান্তির কানে যায় না। তার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়। কাপড পরিয়ে দেওয়াটা আজ নতুন নয় অবশ্য—আজকাল প্রায়ই ইস্কুলে যাবার সময় রতন ওকে কাপড জামা পরিয়ে চুল আঁচডে বইখাতা গুছিয়ে দেয়— মোক্ষদাদির আবার তাতে একটু রাগ হয় তা এমন কি কান্তিও বোঝে—মুখে যদিও বলে, 'ভাল তোমাকে বরাবরই বাসে দিদি—কিন্তু এদান্তে যেন বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। তা তুমিও বাবু যে বড্ড নিপাট ভালমানুষ—ভালবাসা আদায় করবার ঐ তো কৈশল কিনা। এমনিধারা ছেলের ওপরই মায়া পড়ে যে!'

তার জন্যে নয়—আজ আসবার সময় যা কাণ্ড করলে রতনদি—কাপড জামা পরিয়ে মাথা আঁচড়ে নিজের আঁচল দিয়ে মুখের তেল-তেল ভাবটা মুছিয়ে দিয়ে দুটো কাঁধ ধরে যেন খানিকটা দূরে দাঁড করিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর দিকে, তার পর আবার একটু কাছে টেনে দাড়ির কাছে দুটো আঙুল দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বললে, 'সত্যিই তোকে যেন মনে হচ্ছে কোন্ রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে কোন্ রাজকন্যাকে আনতে যাচ্ছিস্। আমার কিন্তু ছাডতে ইচ্ছে করছে না।'

তার পর—যা কোন দিন করে না রতনদি সুগভীর স্নেহে ওকে একটি চুমো খেয়েই যেন শিউরে উঠে ঠেলে সরিয়ে দেয় খানিকটা—কতকটা আপন মনেই বলে ওঠে, 'না না—গরীব বামুনের ছেলে তুই, তোকে যে মানুষ হতে হবে। রাজকন্যের ফাঁদ ভাল নয়। আর এমন সাজিস নি তুই। এসব ভাল নয়, ভাল নয়।'

বা রে। যেন কান্তিই সাজবার কথা বলেছে, ভাল জামার আব্দার ধরেছে! আর কোন দিন সাজবে না সে, রতনদি বললেও সাজবে না।

ঐন্দ্রিলা বিয়ের খবর পেয়েই চলে এসেছিল। ওখানে যে সে আর টিকতে পারছে না তা অন্য লোকের মুখে আগেই শুনেছে শ্যামা। সে জানতো যে এবার এক দিন মান খুইয়ে নিজেকেই ফিরতে হবে। ওখানে হরিনাথের মা একটু সেরে উঠেছেন, বাইরে বেরোতেও পারছেন দেওয়াল ধরে ধরে, বসে বসে যা কাজ তা তো অনেকটাই করে দিচ্ছেন - সুতরাং তাঁরও প্রয়োজন কমেছে, এরও স্বভাব

নিজের উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। আগে সকলে গরজে সহ্য করত ওর মেজাজ— এখন করে না। ফলে খিটিমিটি বাধতে বাধতে এখন একেবারে ডাকাত-পড়া ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দু দিন পরে অপমান হয়েই বেরোতে হ'ত হয়তো—হেম গিয়ে পড়তে বেঁচে গেল দু পক্ষই। ঐন্দ্রিলা পরের দিনই চলে এল। ওরাও আর ধরে রাখবার চেষ্টা করলে না। কিংবা কবে ফিরবে তাও প্রশ্ন করলে না।

যাই হোক—এখানে এসে, বোধ হয় অনেক দিন পরে, কতকটা নতুনের মত বলেই সে খাটছিল খুব। বলতে গেলে বেঁচে গিয়েছিল শ্যামা ওকে পেয়ে। ঘরদোর সাফ্ করা, কাচাকুচি—এতগুলি লোকের রান্না—চার চালের ভার তুলে নিয়েছিল মাথায়। বৌ আসবার পর থেকেই আবার কোথায় কি মাথার মধ্যে গোলমাল বেধেছে। রাগ-রাগ ভাব। বৌভাতের দিন সকালে সেটাই চরমে উঠল—একেবারে অসহযোগ। শ্যামা চোখে অন্ধকার দেখলে। হালুইকর বামুন এসেছে মোটে একজন, অভয়পদ যথারীতি তাকে যোগাড় দিচ্ছে, তার দ্বারা বাড়ির রান্নার কোন সুসার হবে না। অথচ এদিকেও তো লোক কম নয়। এসব করে কে? 'পাঁচ-ব্যান্নন' ভাত বোয়ের হাতেও তুলে দিবে হবে। তার একটু নেমরক্ষে পায়েস চাই, কলার বড়া চাই। তরুকে সে কখনও করতে দেয় নি এসব কাজ—অভ্যস্ত নয়। মহার রান্না অভ্যাস আছে খুব—কিন্তু তার কোলের ছেলেটা ক'দিন ধরে ভুগছে—তাকেই বা কে দেখে! ছেলেটাকে কেউ নিলে সে করতে পারত। নেয় কে?

অগত্যা শ্যামা যুদ্ধের দিকে না গিয়ে সন্ধির দিকে গেল। হাতে পায়ে ধরে, অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কোনমতে কাজে লাগাল তাকে আবার। কিন্তু সে আগুন একেবারে নেভে নি—ছাই-চাপা পড়েছিল মাত্র। হঠাৎ আবার সন্ধ্যার দিকে ধূমায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু তখন কুটুমসাক্ষাৎ এসে পড়েছে, ঐটুকু বাড়িতে লোক গিসগিস করছে—তখন আর ওর মান ভাঙাবার সময় নেই। সে চেষ্টাও করলে না শ্যামা, শুধু সবাইকে টিপে দিলে, ওকে কেউ না ঘাঁটায়। কর্মবাড়িতে কেলেঙ্কার হওয়া ঠিক নয়।

সেই মেজাজেই ছিল সে—কিন্তু এক সময় বোধ হয় আবিষ্কার করলে যে সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে। আর যাই হোক—বোকা নয় ঐন্দ্রিলা। এমন একঘরে হয়ে থাকার অর্থটা সকলের চোখে পড়বে—হয়তো নতুন কুটুমদেরও। কী মনে করবে তারা—ঝগড়াটি বদনাম তো আছেই, সেটা এবার হয়তো সেখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে আর সে বড় অপমানের কথা হবে—তাই বুঝেই হঠাৎ যেন আবার

সক্রিয় হযে উঠল সে এবং নিজে যেচে সেধে কাজকর্ম হাতে তুলে নিতে লাগল। কন্যাপক্ষের মেযেদেব আদর আপ্যায়ন রসিকতা কোনটাই বাদ গেল না। শুধু তাই নয়, মেযেদের খাওযানোর সময় পরিবেশন করার ভারও একার ওপরই তুলে নিল। আর সেই অতিসক্রিয়তার দরুনই ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল দাওযার নিচেটায—যেখানে মাটির গেলাসগুলো ধুযে উপুড় ক'রে রাখা হয়েছিল—একেবারে তার ওপর। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত গেলাসগুলোই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হযে গেল। ভাগ্যে তখন পরিবেশন ক'রে খালি একটা গামলা হাতে ফিরছিল, নইলে তরকারি কম পড়ে যেত। কারণ সবটাই মাপা ওদের। কিন্তু লোকসান যা হ'ল তাও কম নয। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, এখানে আর এ বস্তু পাওযার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ তখনও কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক বাকী। যার-পর নাই কুটুমবাড়ির পুরুষরাই বাকি। স্থান সংকীর্ণতার জন্যে অল্প অল্প করে লোক বসানো হচ্ছিল।

শব্দ পেয়ে ছুটে এল অনেকেই। হেমই এসে হাত ধরে তুললে। হেমের হাঙ্গতেই লোকসানটার কথা কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। ঐন্দ্রিলা এমনিতেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হযেছে। কিন্তু ক্ষতিটা নিযে বেশী আলোচনা করলে হযতো এখনই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবে। কুটুমরা থাকতে থাকতে অন্তত চেঁচামেচি হওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া লেগেছেও খুব। সোজা হযে দাঁড়াতে পারছে না সে, হযতো কেটেকুটেও গেছে। এখন কিছু বলা আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া সমান।

রাণী এসে ঐন্দ্রিলাকে ধরে নিযে গিযে এক জাযগায় শুইয়ে জল দিয়ে চুঁচে দিতে লাগল। শ্যামা তখন বসে পড়েছে। এত পেতল কাঁসার গেলাস নেই যে মান রক্ষা হয়।

শব্দ পেয়ে অভয়পদও ছুটে এসেছিল। শ্যামা আজ মাথায কাপড় দিতেও ভুলে গেল তার সামনে। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'এখন উপায় ?'

'উপায় আছে বৈকি। গেলাস আনিযে দিচ্ছি। ব্যস্ত হবেন না।'

হেম বিস্মিত দৃষ্টিতে ভগ্নিপত্তির দিকে চেয়ে বললে, 'এখন কোথা থেকে আনাবেন ? সব তো দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে।'

'সে যা হয় হয়েই যাবে।'

অভয়পদ সরে যায় সেখান থেকে। একটু পরেই শ্যামা ঘাটের দিকে যেতে—পাশ থেকে ডেকে বলে, 'শুনুন একটু।'

অভয় তাকে নিভৃতে কথা কইবার জন্য ডাকবে—এ একেবারে অভাবনীয়। শ্যামা বুঝল গুরুতর কোন কথা আছে।

'কী বাবা ?' বলে এগিয়ে গেল সে।

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। পাতা গেলাসগুলো ঐ ওধারে বাঁশ-ঝাড়ের গোড়ায় ফেলা হচ্ছে তো—ওদিকটা অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না। আগের গেলাসগুলো সব ভাঙে নি নিশ্চয়, বেছে নিয়ে গোটাকতক ঐ ধারের ঘাট থেকেই ধুয়ে নিন ভাল করে।'

কথাটা বোধগম্য হতে সময় লাগল শ্যামার।

তার পর অস্ফুট-কণ্ঠে দুটি শব্দ শুধু উচ্চারণ করলে, 'ঐ এঁটো গেলাস ?'

'অত ভাবতে গেলে আর চলবে না। কাঁসার গেলাস তো মেজে নেন—তাই নিন। বেশ করে মাটি দিয়ে রগড়ে মেজে নিন। তেলটাও উঠে যাবে তাতে, গন্ধও থাকবে না। মাটি তো শুদ্ধ—হাতে মাটি করে শুচি হন— মাটি দিয়ে মেজে এঁটো বাসন শুদ্ধ করেন। মাটির গেলাসে দোষ কি…নইলে কি বে-ইজ্জৎ হবেন ?'

তা বটে। আবার আগের যুক্তিগুলো তেমন নয়। শেষের যুক্তিটাই প্রবল। শ্যামাকে বেশী বলতে হয় না। সে 'আচ্ছা' বলে সরে পড়ে। তার পর একটা গামছা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঐ দিকের ঘাটে যায়। পাড়ে কাপড়টা ছেড়ে রেখে হাতড়ে হাতড়েই আবার যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। সেখান থেকে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে আস্ত গেলাস তুলে নেয় ত্রিশ-চল্লিশটা—তার পর সেগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে নেয় মাটি বুলিয়ে। সেগুলো আবার পাড়ে তুলে রেখে একটা ডুব দিয়ে আসে একেবারে।

ওদিকে কারবাইডের উজ্জ্বল আলো, লোকের ভিড়, কোলাহল। এদিকের অন্ধকার পুকুরপাড়ে কারুর নজর চলবার কথা নয়—চললও না। শুধু সতর্ক ও সজাগ ছিল অভয়পদই, তাকে ইঙ্গিতও করতে হল না, শাশুড়ীকে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে দেখেই সে-ও অন্ধকারে চলে গেল।

একটু পরে গেলাসগুলো এনে দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে সহজভাবেই হেমকে বললে, 'এই নাও গেলাস। এতেই হবে বোধ হয়, না হয় বাড়ির লোক যা হয় করে চালিয়ে নেবে। একেবারে ধুয়েই এনেছি—বসিয়ে দাও গে পাতে পাতে।'

এই ভগ্নিপতিটিকে বহুবার অসাধ্য-সাধন করতে দেখেছে সে—সুতরাং হেম আর খুব একটা বিস্ময়বোধ করল না। কোন প্রশ্নও করল না। পাতা পড়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি গিয়ে গেলাসগুলো সাজিয়ে দিলে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ভাল ক'রে আলাপ পরিচয় হবার আগেই নতুন বৌ কনক আর হেমের মনের মাঝখানে কোথায় একটা প্রায়-অদৃশ্য পাঁচিল উঠল।

কনক হেমকে ঠিক বুঝতে পারল না। হেমও তাই। অথচ সে ভুল-বোঝা-বুঝিটা এতই সামান্য, এতই অকিঞ্চিৎকর যে ব্যাপারটা অপরেরও অনুমান করা সম্ভব নয়।

ফুলশয্যাটা হয়েছিল ওদের রান্নাঘরে। তক্তপোশ একটা আগেই কোথা থেকে আধ-পুরনো কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল অভয়পদ, সেটা স্থানাভাবে তখনকার মত রান্নাঘরেই রাখা হয়। এখন এক বাড়ি লোক থৈ থৈ করছে—বড় ঘর ওদের ছেড়ে দিলে এরা শোয় কোথায়? তাই শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা করতে হ'ল। আর ফুলশয্যা নামেই। রাত তো কাবার হয়েই এসেছে। কতটুকুই বা শোওয়া—নিয়মরক্ষা বই তো নয়।

কিন্তু তার পরের দিনও হেম যখন হুকুম করলে রান্নাঘরে ওদের বিছানা করতে, তখনই সকলেই অবাক হয়ে গেল। রান্নাঘর অবশ্য বড়ই—তবে মেটে ঘর, গোলাপাতার চাল। জানালাগুলো নিতান্ত খুপরি খুপরি। শ্যামা আপত্তি করলে, এমনও তার মনে হ'ল একবার যে, গতকাল ওখানে ফুলশয্যার ব্যবস্থা হওয়াতে একটু অভিমানই হয়েছে ছেলের। মহা ছিল সেদিনও—সে বললে, 'ওমা, কী খিটকেল! লোকে বলবে যে আমাদের জন্যেই—। সে ভারি মন্দ কথা হবে বাপু।' তরু, ঐন্দ্রিলা সকলেই কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগল। শ্যামা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'কাল সব গোবিন্দর বৌ-টৌ ছিল, সে একরকম কথা। আজ আর দরকার কি বাপু। আমাকে তো বাইরের ঘরে শুতেই হবে, ঐ রুগী একা তো আর ফেলে রাখা যায় না। নিয়ে দিয়ে থাকবে তো খোকা, ধৈঁদি আর তার মেয়ে। তরু আর মহা একটা রাত থাকবে—কালই চলে যাবে ওরা। একটা দিন কোনমতে দালানেই বেশ থাকবে'খন। নয়তো মহাই না হয় ছেলে নিয়ে রান্নাঘরে শুক। কি বাইরের ঘরেও থাকতে পারে—'

হেম একটু অসহিষ্ণুভাবেই তাকে থামিয়ে দিলে, 'আমি ওখানেই শোব। যদি কোন রাজনন্দিনীর মেটে ঘরে শুতে অসুবিধে হয়—সে যেন বড় ঘরে শোয়!'

এবার শ্যামা একটু আশ্বস্ত হ'ল। হাসলও মনে মনে। জানালার বাইরেই বোন-ভাগ্নী থাকলে ছেলে-বোয়ের সারারাত বকর বকর করার অসুবিধা হবে।

হেসেছিল কনকও। একে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে—তায়, তার বাবা যা-ই বলুন না কেন, আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে তার। সে অনেক কিছুই বোঝে। তার অবশ্য মেটে ঘরে শুতে আপত্তি নেই—অভ্যাসও আসে, তার বাপের বাড়িও পাকাঘর মেটেঘর মিলিয়েই—কিন্তু রান্নাঘর আলাদা। ধোঁয়া ঝুল কালি—মনে করলেই কেমন হয়। অবশ্য পাতার জালে রান্না বলে শ্যামা আজকাল প্রায় দাওয়াতে বাইরের উনুনেই রান্না করে, নিতান্ত বর্ষাবাদল না হলে আর ঘরের উনুন জ্বালে না, তবে তাতেও ধোঁয়া ঢোকে বৈকি! তবু—এসব অসুবিধা সত্ত্বেও—খুশীও হয়েছিল কনক বরের বিবেচনা দেখে। ফুলশয্যা হতে হতে কাল রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল—ক্লান্তিতে ঘুমতে দুজনের অবস্থাই শোচনীয়, তা ছাড়া ওরা দুজনেই জানত যে এই শেষরাত্রেও অনেক জোড়া কান পুকুরের দিক থেকে ঘুরে এসে জানালার গোড়ায় আড়ি পেতেছে—রাণীদির মিষ্টি হাসির শব্দ তো স্পষ্ট শুনেছে কনক—সুতরাং কথাবার্তা কইবার কেউ চেষ্টাও করে নি ওরা। ওদের আসল ফুলশয্যাটা বলতে গেলে আজকেই হবে—প্রথম আলাপ ও পরিচয়টা। সেদিক থেকে একটু নিভৃত অবসর মন্দ নয়।

কিন্তু সেইখানেই কোথায় একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বৌ বলতে দুটি বৌকেই হেম ভাল ক'রে কাছ থেকে দেখেছিল। গোবিন্দরই দুই বৌ, তারা ও রাণী। দুজনেই সপ্রতিভ। তারার বয়স হয়েছিল, তা ছাড়া সে বাইরের মেয়ে, লজ্জা করতে শেখার অবসর পায় নি। আর রাণী বয়সের তুলনায় একটু বেশী সপ্রতিভ, বরং প্রগল্‌ভও বলা যায়। কিন্তু সে প্রগল্‌ভতা মুগ্ধই করে মানুষকে। এ দুজন ছাড়া দেখেছিল সে মহাদের বাড়ির প্রমীলাকেও, কাছ থেকে না হলেও যাতায়াতে অনেকবারই দেখেছে। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা কইবার সময় সে বুদ্ধির দ্যুতি তার চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হয়। কথাতে তার ক্ষুরের ধার। বেঁধে, তবু ভাল লাগে। আর দেখেছে নলিনীকে—প্রগল্‌ভও নয়, বুদ্ধিমতীও নয়—তবু বেশ কথা বলে। সহজ ভাবেই বলে।

এদের দেখেই অভ্যস্ত সে - তাই মেয়েদের যে কথা বলাতে হয়, লজ্জা ভাঙাতে হয়—তা জানে না। জোর করবার কথা তো কল্পনারই বাইরে, তাই সে সাধারণ ভাবে সহজ ভাবেই কথা কইতে গেল কনকের সঙ্গে। কিন্তু কনক এটা আশা করে নি। একে সে একটু বেশী লাজুক, তায় জ্ঞান হওয়া থেকে অর্থাৎ কৈশোরে

পা দেওয়া থেকে অপর বিবাহিত মেয়েদের কাছ থেকে শুনে আসছে যে বরেরা অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে কনে বৌদের কথা বলায়। আর সে সাধ্য-সাধনার আগে ওদের কাছে ধরা দিতে নেই, তাতে খেলো হয়ে যেতে হয়।

সুতরাং কনক থতমত খেয়ে গেল। অবাকও হয়ে গেল বেশ খানিকটা। আদৌ কথার উত্তর দিতে পারলে না অনেকক্ষণ। তার পর যখন হেম প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তখন দু-একটা উত্তর দিলে বটে—সে উত্তর বা সে কথার ধরন হেমের ভাল লাগল না। সে সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে কনকের বিস্ময়-বিহ্বলতা, এত দিনের স্বপ্নে রূঢ় আঘাত লাগার বিমূঢ়তা এবং কিছুটা আশা-ভঙ্গের বেদনা অনুভব করার মত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হেমের ছিল না। অপর কোন নববিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে এই ধরনের সরস আলোচনা করা তার ভাগ্যে কোন দিনই হয়ে ওঠে নি। সুতরাং কনকের সহজভাবে কথা বলার সাময়িক অক্ষমতাকে স্থায়ী অক্ষমতা মনে করলে সে। তারও মন বিগড়ে গেল।

ওদের সে প্রথম পরিচয়ের ধরনটা একটু নমুনা থেকেই বোঝা যাবে :

হঠাৎ এক সময় হেম জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বয়স কত ?'

কনক নির্বাক্‌।

'কী হল—বয়সটাও জান না নাকি ?'

অনেকগুলো উত্তর মনের মধ্যে গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল।

বলতে পারত যে, 'জানব না কেন, কী বললে তুমি খুশী হবে সেইটেই যে জানি না।'

অথবা পাল্‌টা প্রশ্ন করতে পারত যে, 'কেন বল দিকি, বয়স জেনে তবে ভালবাসবে ?' বলতে পারত যে, কোন্‌ বয়সটা তোমার পছন্দ বলে দাও—আমি সেই বয়সেরই।'

কিন্তু হেমের ঐ কাঠ-কাঠ প্রশ্নের ধরনে কিছুই বলা হ'ল না। বলা হ'ল না কনকের রসের অভাবে নয়—সে রসের উৎসে পৌছতে পারার অক্ষমতার জন্য। ভাল পারুসির হাতের আঘাত না খেলে খেজুরগাছ রস দেয় না—বাছুরে না ঢুঁ মারলে গোরুরও দুধ বেরোয় না। সুতরাং অসহিষ্ণু ধমকে কনকের কথা কণ্ঠেই রয়ে গেল। কোন মতে শুধু ঢোঁক গিলে বললে, 'সতেরো পূর্ণ হয়েছে।'

'তবে তোমার বাবা কমিয়ে বললেন কেন ? তিনি কি মনে করলেন কনের বয়স কম জানলে আমি আহ্লাদে আটখানা হব ?'

এ কথার জবাব নেই। কিন্তু হেম আরও খোঁচায়।

'কী, বাক্যি হরে গেল যে! আমি কি কচি খোকা—যে কম বয়স না হলে বিয়ে হ'ত না? আমার ঢের বয়স হয়ে গেছে। আরও বুড়ো মেয়ে হলেও আমার চলত!'

কনক শুনেই যায়। এর উত্তর কি দেবে?

কিন্তু হেমই আবাব খুঁচিয়ে তোলে কথাটা, 'কী, বাপের নিন্দে শুনেই রাগ হয়ে গেল বুঝি? যার মেয়ের এত আত্মসম্মান জ্ঞান তার অমন জলজ্যান্ত মিছে কথা বলাটা ঠিক হয় নি।'

অগত্যা মুখ খুলতে হয় কনককে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলে, 'বাবা কেন কিসের জন্যে কি বলেছেন—কি কী করেছেন তা আমি কেমন ক'রে জানব!'

'অ। জান না। তবু ভাল।'

তার পর হয়তো কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

খানিক পরে আবার হয়তো হেম বলে, 'তা আমার কত বয়স তা তো তুমি জানতে চাইলে না।'

উত্তরটা ঠোঁটের ডগাতেই এসেছিল কনকের, 'জেনেই বা লাভ কি, বুড়ো বর জানলেও তো আর বিয়ে ফেরত নিতে পারব না। শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই।' এও মনে হয়েছিল বলে যে, 'শিব যত বুড়োই হোন গৌরীর কাছে তিনি চিরযুবো।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। এর কাছে এসব কথা বলতে যেন ইচ্ছা করল না।. তার ওপর সংকোচও একটা ছিল বৈকি। ছেলেবেলা থেকে মা কাকী জেঠী মাসীর দল কেবল ভয় দেখিয়েছেন—'দেখিস জিভ সামলে থাকিস, শ্বশুর-বাড়িতে যেন বেহায়া নাম কিনিস নি। বরের সঙ্গে কথা কইবিও বুঝে-সমঝে, বৎ বাচাল ভাবলে মনে মনে ঘেন্না করবে।'

শুধু বললে, 'কী দরকার?'

'জানতে ইচ্ছে ক'রে না?'

'না।'

এরই মধ্যে একবার হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল হেম, 'রাণী বৌ—মানে আমাদের বড় বৌদিকে কেমন দেখলে বল তো?'

তার পর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই, একটু যেন বেশী আগ্রহেই বলে ওঠে, 'কেমন কথাবার্তা বলেন শুনেছ? লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ওঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না!'

হঠাৎ যেন কনকের মুখের ওপর এক ঘা চাবুক মারলে কে!

এতক্ষণের সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নের যে তফাত আছে—এতক্ষণকার প্রশ্নের ধরনে যে নিস্পৃহতা ঔদাসীন্য এমন কি বিতৃষ্ণার ভাব ছিল—এই প্রশ্নে যে তার কিছুই নেই, বরং আগ্রহে আকুলতায় এই কিছুক্ষণ আগেকার কঠিন কণ্ঠস্বরও যেন কী এক জাদুমন্ত্রে মধুর হয়ে উঠেছে—সেটা তার মনের নজর এড়াল না। কতকগুলো আত্মরক্ষার বর্ম মেয়েরা নিয়ে জন্মায়, কর্ণের সহজাত কবচের মত—সেগুলো ওদের স্বাভাবিক বৃত্তিও বটে। বিশেষ ক'রে যে মেয়ে পল্লীগ্রামে বহু পরিজনের সংসারে মানুষ হয়েছে তার এ বৃত্তিগুলো শাণিত হয়ে থাকে। কনকও সঙ্গে সঙ্গে অনুমান ক'রে নিল—ঐ সূর্য চোখের সামনে থেকে চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে বলেই প্রদীপের আলো চোখে ধরছে না। দামী বিলিতী চন্দ্রমল্লিকার কাছে কুন্দ হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে।

সে শুষ্ক কণ্ঠে একটা 'বেশ' বলে পাশ ফিরে শুল—তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম স্মরণীয় প্রণয়-রজনীর বিশ্রম্ভালাপে যবনিকা টেনে দিয়ে।

হেমও আর কথা বাড়াল না। বোধ করি রাণী বৌদির কথা মনে হতেই তার মনও সেই মাধুর্য-রসে নিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই রসেই ডুবে থাকতে চাইল সে

কিন্তু তবু, একটু বিরক্তও হ'ল। মনে হ'ল বিধাতা বেছে বেছে তার অদৃষ্টে এক বোদা মেয়ে রেখে দিয়েছিলেন। প্রাণহীন কাঠের পুতুল। সংসারে হয়তো কাজে লাগতে পারে, তার কাজে লাগবে না।

সে বুঝতে পারল না যে, যে মেয়েই আসুক, তার আশাভঙ্গ হ'তই। আসলে তার আশাটা যে কত দূর গড়ে উঠেছে—সেই খবরটাই জানত না সে। চোখের সামনে রাণী বৌদি নিত্য নূতন রূপে উদ্ভাসিত, বিলাতী হীরের অসংখ্য পলে বিদ্যুতের আলো পড়লে যেমন চারিদিক থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কতকটা তেমনি। আর তাইতে চোখ ধেঁধেই গেছে তার, অন্য কোন আলো আর চোখে লাগবার কথা নয়।

সুতরাং মনের অগোচরে যে আশা, যে ইচ্ছা গড়ে উঠেছিল, সেইখানে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আশাটার খবর জানত না, আঘাতটা জানল। মনটা বিরূপ হয়ে উঠল তার ফলে। সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়েও নিল নিজেকে। পরের দিন থেকে আর আলাপের চেষ্টাও করল না। তা ছাড়া তার এমন দরকারও নেই, বিয়ে তো করেছে সে মা আর বাবার পীড়াপীড়িতে—তারাই ঘর করুক বৌ নিয়ে। তাদের কাজে লাগলেই হ'ল।

তার প্রয়োজন ?

না। তার কোন প্রয়োজন নেই। মনের প্রয়োজন এ মেয়ে মেটাতে পারবে না। সে আর একজন মেটাচ্ছে—প্রয়োজনের বেশী। পাত্র উপ্‌চে উঠেছে সে মাধুর্যের সুরায়। দৈহিক ?—না, যত দূর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়—সে তাগিদও খুব নেই। ও জিনিসটাতেই তেমন যেন প্রবল আসক্তি আর নেই। নলিনী একটা অভ্যাসের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন তার কাছে গিয়ে সেই অভ্যাসটাই তাকে টেনেছিল—নইলে মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই ঐটে আগে মনে হবে, সে রকম মানসিক গঠন ওর নয়। রাণী বৌদিকে দেখে তার মন ভরে আছে সত্য কথা—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, দেহের দিক দিয়ে কখনই ভাবে না সে। তার দীপ্তিতে সে মুগ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। শুধু দেখতে চায় তাকে। কাছে বসতে চায়। তার নিত্য নূতন রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, নিত্য নব-নব বিস্ময়কর কথা শুনে মন ভরে যাবে। আর কিছু চায় না।

॥ ২ ॥

নক এত কথা জানে না। জানা সম্ভবও নয় কোন সাধারণ মেয়ের পক্ষে। হমেব ঔদাসীন্যে সে যেন কাঠ হয়ে উঠল। একটা চাপা অভিমানও বোধ করল বটে—কিন্তু সে অভিমান ত্যাগ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না, যদি কোন্ পথে কী ভাবে ত্যাগ করলে তাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠবে বুঝতে পারত। এখন কী করা উচিত, তার দিক থেকে কী করবার আছে, তাও যে সে ভেবে পেল না।

এই ভাবতে ভাবতেই সপ্তাহ কেটে গেল। বাপের বাড়ি যাবার ছুটি মিলল মাত্র পনেরো দিন। শ্যামা বললে, 'আমি একা আর পেরে উঠি না—বড্ড নাচাঝামটা খেতে হয়। আরও আমার সেই জন্যে সাত-তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেওয়া। বৌমাকে কিন্তু বেশী দিন ফেলে রাখতে পারব না বেই মশাই!'

পূর্ণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন একেবারে, 'সে কি কথা, ও তো এখন আপনারই মেয়ে, আপনাদের সম্পত্তি। তা ছাড়া আমরাই বা রাখতে চাইব কেন? ঢের দিন তো পুষলুম, আবারও ?'

সুতরাং পনেরো দিন পরেই ফিরে আসতে হ'ল।

অবশ্য পনেরো দিন কম নয়—যদি সেটুকু সময়েরও সদ্ব্যবহার করতে পারত। দেবার লোক কম ছিল না, নিজের ও জেঠতুতো খুড়তুতো মিলিয়ে বোনই

ওরা অনেক, ওপরে নিচে কাছাকাছি বয়সেরই পাঁচ-ছজন—তা ছাড়া পাড়ার সমবয়সী বন্ধুরা তো ছিলই। কিন্তু কনক কারুর কাছেই মন খুলতে পারল না—পরামর্শ চাওয়াও হ'ল না। কোথায় একটা আত্মসম্মানবোধে বাধল। কেমন ক'রে যেন আপনা থেকেই অনুভব করলে যে এ বড় অপমানের কথা। আর সকলের জন্যেই তাদের বর পাগল, তবু তো তারা কেউই তার মত সুন্দর নয়—অথচ তার বরই তার সম্বন্ধে উদাসীন—একথা কি ওদের বলা যায়? বললে তারা আহা উহু করবে, সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু সে তো করুণা। এই বয়সে সকলের, বিশেষত সমবয়সীদের কৃপার পাত্রী হয়ে লাভ নাই। সকলে যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল তাকে—তার দাম্পত্যপ্রণয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার ইতিহাস শোনবার জন্য, তখন সে যতটা পারল পূর্বশ্রুত বহু কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা কাল্পনিক চমৎকার প্রথম প্রণয়ের ইতিহাস খাড়া করল। শ্রোত্রীরা যে তখনকার মত একটু ঈর্ষিত হয়েই বিদায় নিল—সেইটেই বড় লাভ।

তার পর এখানে ফিরে আবার যথাপূর্বং।

বরং আগের চেয়েও খারাপ।

হেম যেন আরও সুদূর—আরও কঠিন হয়ে গেছে।

কথা যে একেবারে কয় না—তা নয়। হুকুম ফরমাশ—'এটা দাও, ওটা তুলে রাখ, জামাটায় সাবান দিও'—সহজেই করে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আসেও সে প্রত্যহই বহু রাত ক'রে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে সে—সংকোচে কথাটা শাশুড়ীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে না—ভাববেন হয়তো যে এরই মধ্যে বৌ ছেলের ওপর খবরদারি করছে। হেমকে তো জিজ্ঞাসা করা সম্ভবই নয়। তবে অনুমান করতে পারে সে। খেতে বসে এক-এক দিন মা-ছেলে বা দাদা-বোনে যে টুকরো টুকরো কথা হয়—তা থেকে বোঝে যে সে অনুমান ওর মিথ্যাও নয়। প্রায় প্রত্যহই বড় মাসীমার বাড়ি যায় হেম। এ ছাড়া থিয়েটারেও যায় শনি-রবিবার ক'রে। 'বিয়ের নেমন্তন্নেও যায় হামেশা, প্রায় প্রত্যেক বিয়ের দিনেই যায়। ওকে এত লোক কী সূত্রে নেমন্তন্ন করে তা ভেবে পায় না কনক। শুধু খেয়েই আসে না, মধ্যে মধ্যে ছাঁদাও নিয়ে আসে।

বহু কথাই বলতে ইচ্ছা ক'রে তার স্বামীকে। বহু অনুযোগ, বহু প্রশ্ন। কিন্তু কাকে বলবে ভেবে পায় না। রাত দশটায় এসে খেয়েই শুয়ে পড়ে—ওঠে ভোর পাঁচটায়। ছটার মধ্যে স্নান ক'রে খেয়ে বেরিয়ে যায়। এ মানুষ যদি নিজে থেকে কথা না বলে তো ওর পক্ষে বলা কঠিন। তা ছাড়া সংকোচ করতে করতে বাধায়

একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে -- নিজে থেকে যেচে মান ভাঙাতে যাওয়া—ভাবি লজ্জা করে ওর। তা ছাড়া মান ভাঙাবেই বা কী করে? যে অপরাধ ও ক'রে নি সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে?

অবশ্য কথা কয় না—মানে গল্প করে না বলে যে সেবাও নেয় না—তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সেবা ছাড়া অসাধারণও কিছু কিছু নেয় বৈকি। এবার আসবার সময় মা বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন, 'খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বসবি, তিনি শুতে যাও বললে তবে যাবি। আর রোজ জামাইয়ের পা টিপে দিবি—পুরুষ মানুষ, খেটে-খুটে ঘুরে-ঘারে আসে—ওটুকু ওদের দরকার। দেখিস—যেন শ্বশুরবাড়িতে আমাদের মুখ নষ্ট করিস নি—কেউ না বলতে পারে যে মা মাগী কোন সহবৎ শেখায় নি মেয়েকে!'

মা'র প্রথম উপদেশ মানা কঠিন নয়। কারণ শাশুড়ীই ওর জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেন। হেমের খাওয়া হলে সেই পাতে ওকে খেতে দিয়ে শাশুড়ী ননদও খেতে বসে যায়—খাওয়া একসঙ্গেই চোকে—ঐন্দ্রিলা রাত্রে মুড়ি খায় বেশির ভাগই, কোন দিন জুটলে এক-আধখানা রুটি—সে তো আগেই উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে—শাশুড়ী জেগে বসে থাকেন, কখন তার সকড়ি মুক্ত করা, বাসন মাজা শেষ হবে সেই জন্য। সে যখন ঘাটে যায়—শ্যামাও আলো হাতে ক'রে গিয়ে দাঁড়ায়। সোমত্থ বউ, এত রাত্রে বাইরের ঘাটে যাওয়া ঠিক নয়। সে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে সদর বন্ধ ক'রে শ্যামা চলে যায় বাইরের ঘরে, সুতরাং কনকের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় উপদেশটা নিয়েই একটু বিপদে পড়েছিল সে। প্রথম দিন অযাচিত অনিমন্ত্রিত ভাবে স্বামীর পায়ে হাত দিতে বেধেছিল তার। সব চেয়ে ভয়, এটাকে না সে প্রণয়-ভিক্ষা বলে মনে করে। অবশ্য মনে ক'রে যদি সদয় হয় তো বেঁচে যায় কনক—কিন্তু তবু পায়ে ধরে ভালবাসানো—ছিঃ! মনে হলেই কেমন হয়। আরও ভয় যদি পা সরিয়ে নেয়, যদি রূঢ় ভাবে সেবা প্রত্যাখ্যান করে? যদি পা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয়?

কিন্তু কোন আশা বা কোন আশঙ্কাই তার ফলল না। হেম নির্বিবাদে চুপ ক'রে শুয়ে রইল। বাধাও দিলে না নিষেধও করলে না—কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটা মিষ্টি কথাও বললে না। সব চেয়ে বিপদ থামতেও বললে না—সে কি সারারাত টিপে যাবে নাকি—এমনি? কী মনে করে হেম—তার রাজপ্রাপ্য? অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামল কনক। তাতেও কোন সাড়া এল না।

ও তরফ থেকে। একটু পরে পাশে শুয়ে বুঝল সাড়া দেবার অবস্থাও নেই—হেম গাঢ় ঘুমে অচেতন। হয়তো অনেকক্ষণই এই ভাবে ঘুমোচ্ছে সে। ক্ষোভে অপমানে কনকের চোখে জল এসে যায়। কান্নাটা আরও লজ্জার বুঝেই কোন-মতে আত্মসংবরণ করে।

কিন্তু তার চেয়েও লজ্জাকর আর একটা ঘটনা ঘটল দিনকতক পরে। যেটার জন্য এত আকিঞ্চন, এত সাধনা—সব মেয়েরই যা কাম্য—তা যখন এল তখন সেটা পাওয়ার লজ্জাতেই যেন মরে যেতে ইচ্ছা করল কনকের।

রোজই পা টেপে সে। নীরবে নিঃশব্দে সেবা ক'রে যায়, আর অম্লানবদনে সে সেবা গ্রহণ করে হেম। থামতে বলে না কোন দিনই, প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে সে সেবা নিতে নিতেই। কনক আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছে, সে দশ-বারো মিনিট পা টিপেই শুয়ে পড়ে, ওঁর রাজনিদ্রার জন্য অপেক্ষা করে না।

এরই মধ্যে এক দিন—এই পা টেপার সময়ই হেম ওর একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সত্য কথা—তবুও নারীর সেই স্বাভাবিক অনুভূতি, সহজাত বৃত্তিই তাকে যেন সতর্ক ক'রে দিলে। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর—একটা অজ্ঞাত আশা ও আশঙ্কায়। তবু ঠিক কি ব্যাপারটা তা তখনও বুঝতে পারে নি বলে বাধা দিতেও পারলে না—একটু কঠিন হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হেমের সবলতর আকর্ষণে একেবারে তার পাশে এসে পড়ল।

সে আকর্ষণের পূর্ণ অর্থ বুঝতে দেরি হ'ল না অবশ্য।

সেদিন আর ঘরে শুয়ে থাকতে পারে নি কনক, হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে বাইরের দাওয়ায় পড়েছিল। সারারাত ধরে কেঁদেছিল সে—প্রণয়হীন সম্ভাষণহীন চুম্বনহীন দাম্পত্য মিলনের এই অপমানে। একবার পুকুরে গিয়ে গা ঢেলে দেবার কথাও যে মনে জাগে নি তা নয়—কিন্তু নিহাত প্রথম বয়স, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা বহু স্বপ্ন তার মানস-ভবিষ্যতে, সেই আশা ও স্বপ্নই তাকে এইভাবে সর্বনাশের দিকে যেতে বাধা দিল। ভোর বেলা শাশুড়ীর দোরখোলার শব্দে আবার ধীরে ধীরে সে ঘরেই ফিরে এল—সেই অভিশপ্ত শয্যার দিকে।

হেম তখন অগাধে ঘুমোচ্ছে।

কাজটা ক'রে ফেলে হয়তো সে একটু অনুতপ্ত হয়েছিল কিন্তু একটা মনগড়া সান্ত্বনা ঠিক ক'রে নিতেও বেশী বিলম্ব হয় নি তার। নিজের একটা অকারণ অহঙ্কার, মিথ্যা আত্মমূল্যবোধই তাকে সে সান্ত্বনা যোগাল। যেন রাণী বৌদির

'মত মেয়ে, প্রমীলার মত মেয়েই তার প্রাপ্য ছিল ! কনকের মত জড় প্রাণহীন মেয়ে দিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছে। সে মেয়েকে যা দিয়েছে এই ঢের—তাকে অনুগ্রহই করা হয়েছে।

আর একটা সূক্ষ্ম অহঙ্কার তার চূর্ণ হয়েছে। জৈবিক প্রয়োজন তার নেই বলে সে ভেবেছিল মনে মনে—সে ভাবনা মিথ্যা হয়ে গেছে। এখন একটা মিথ্যা অহঙ্কারকে আর একটা মিথ্যা অহঙ্কার দিয়ে ঢাকা ছাড়া উপায় কি ?

॥ ৩ ॥

চুরি ক'রে নেমন্তন্ন খাওয়াটা যেন হেমকে এক নেশায় পেয়ে বসেছে এটা ঠিক খাওয়ার লোভ নয়, হয়তো সেটা প্রথম প্রথম একটু ছিল কিন্তু এখন আর নেই, তা সে হলপ ক'রে বলতে পারে। খাওয়ার সময় যেটা ছিল সে সময়ই খেতে পায় নি—ফলে খাওয়ার শক্তিটাও গেছে কমে। জলখাবার খাওয়া ওর কোনকালে অভ্যাস নেই, ছুটির দিনেও সেই একেবারে বেলা বারোটা-একটা নাগাদ ভাতে-জলে বসে। কমলার বাড়িতে যখন থাকত ছুটির দিন সকালে সেখানে হাজির থাকলে গোবিন্দ জোর ক'রে কিছু খাওয়াত—এখানে সে বালাই নেই। শ্যামার মনেও পড়ে না সে কথা। এখন বৌ আসার পর ছেলের ভাতের সঙ্গে একমুঠো চাল বেশী নেয়—সেই ভাতই একগাল ক'রে কনক ও সীতা খায় সকালবেলা। সেই তাদের জলখাবার। ছুটির দিনে ওদের জন্যে দুটি মুড়ি ব্যবস্থা। তাও অনেক দিন ভুলে যায় শ্যামা। নিহাত সীতা কান্নাকাটি করে তাই ঐন্দ্রিলা বার ক'রে দেয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে বৌদিকেও দিতে হয়। নইলে কনক কিছুতেই মুখ ফুটে চাইতে পারত না। হেম তার দু বেলা দু মুঠো ভাত—যে কোনও উপকরণ দিয়ে হোক—এই পেলেই খুশী। তাও উপকরণের দিকে ভাল ক'রে চেয়েও দেখে না কোন দিন। প্রথম বয়সে লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল বলেই—এখন পেটে ক্ষিদে এবং খাবারের দোকানে থরে থরে সুস্বাদু মিষ্টান্ন সাজানো থাকলেও, সে খাবার খাওয়ার কথা মনে পড়ে না ওর। এমন কি পকেটে পয়সা থাকলেও না।

না, লোভটা বড় কথা নয়। এর মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে। ঠকাবার আনন্দ। নিজের চতুরতার সাফল্যের আনন্দ, কৃতিত্বের আনন্দ। ভয় আছে, এখনও মাঝে মাঝে খুবই ভয় করে—যখন কোন কোন কর্মবাড়িতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দু-একজন লোকের সামনে পড়ে যায়, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে দেখে তারা, ফিস-ফিসও

করে তাকে নিয়ে—তখন বুকের মধ্যে দুর-দুর করে বৈকি? একবার একটা জায়গায় অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। না খেয়েই বাড়ি ফিরতে হ'ত—যদি না আর একটা বাড়িতে ঠিক সেই সময় বরযাত্রীর নামবার সময় হ'ত। সে বরকর্তা কেমন এক রকম অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ—পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর কনুইটা ধরে ফেলে, 'ও কি বাবা, তুমি যাচ্ছ কোথায়? এসো এসো। এই ছাখ ছেলেমানুষ, পালাবার ফিকিবে ছিলে বুঝি?' বলে ঠেলে দিলেন ভেতব দিকে। সে বাড়িটাও ছোট, বসবাব জায়গা কম, কন্যাকর্তা সেইখান থেকেই কতক ববযাত্রীকে একেবারে পাচার করলেন ছাদে। নির্বিঘ্নে খেয়ে নেমে এল।

অবশ্য এ বিপদে খুব কমই পড়তে হয়েছে তাকে। কারণ বড় বিয়েবাড়ি ছাড়া সে ঢোকে না, ছোট মাপের কাজে ধরা পড়বার ভয় বেশী। তবে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক দু-একজন থাকে সব জায়গাতেই, যাদের নজর এড়ানো শক্ত, যারা অতিথির মুখ দেখলেই রবাহুত বা অনাহুত বুঝতে পারে।

তবু বিপদ আছে বলেই উত্তেজনাও আছে। আর সেই উত্তেজনাটাই হল আসল নেশা। সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে তাকে।

আগে ছিল হেম সম্পূর্ণ একা, তাতে বেশী ভয়, ভয় করত—এখন ওর এই কারবারে একজন অংশীদার জুটে গেছে। সে হ'ল দুর্গাপদ—মহার দেওর।

এক দিন, কী একটা ছুটির দিনে লগন্সা পড়েছে। হেম সেজেগুজে এসে শ্যামবাজারের দিকের একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে বিয়েবাড়িগুলোর আয়তন এবং সমারোহ দেখে অভ্যাগতের একটা আনুমানিক সংখ্যা হিসাব করছে মনে মনে—এমন সময় প্রায় সামনাসামনি ধাক্কা লেগে গেল দুর্গাপদর সঙ্গে।

'আরে, তুমি এখানে কী করছ! এত সাজগোজ? বিয়ের নেমন্তন্ন নাকি?'

'হ্যাঁ। তা তুমিই বা এখানে কোথায়?'

'গিছলুম একটু এক বন্ধুর বাড়ি। অনেক দিন ধরেই বলছে আসতে—সময় আর হয় না। আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লুম—তা ছাখ না—ভাবলুম এত পয়সা খরচা ক'রে এলুম, রাত্তিরের খ্যাঁটটা সেরে যাব—ব্যাস, আজই বাবু উধাও, তিনি আবার কোন্ তালে গেছেন কে জানে! অবিশ্যি আমি আসব বলে রাখি নি—খুব দোষ দেওয়াও যায় না। যাক্—তুমি যাও, আমিও চলি—'

তার পর ঈষৎ ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে আর একবার তার সাজ-পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি তো দিব্যি চললে এখন কালিয়া পোলাও খেতে, আমি

এখন যাই, দেখি কী জোটে—যদি জল দেওয়া ভাত চাট্টি থাকে তো রক্ষে, নইলে আবার চাপাতে বলতে হবে। এক কেলেঙ্কারি আর কি!·· তা বলে তো সারা রাত পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকা যায় না—কী বল? আমি আবার মরতে কেন যে আমার ভাত রাখতে বারণ ক'রে এলুম তাও জানি না।'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে এগোয়।

হেম ওর একটা হাত ধরে ফেলে, 'তা তুমিও চল না।'

'আমি? আমি কোথায় যাব?'

'কালিয়া পোলাও খেতে!'

'হ্যাঁ, তোমার নেমন্তন্ন তুমি সেজেগুজে এসেছ—আমি সেখানে যাব কি?'

'কেন—তোমারও তো দিব্যি ধোপদস্ত কাপড়জামা দেখছি।'

'হ্যাঁ তা অবশ্য আছে। আজই তো ভাঙবার দিন। তা ছাড়া কলকাতায় বন্ধুর বাড়ি আসছি—তোমাদের ওখানে যে বেশে যাওয়া চলে তা তো আর এখানে চলবে না।'

'তবে আর কি—চল চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।' সে দুর্গাপদর হাত ধরে টানে সত্যিই।

'আরে—আরে—টানছ কোথায়। এমন ভাবে বিনা নেমন্তন্নে—'

'আমাকেই বা কে গলায় কাপড় দিয়ে হাত-জোড় ক'রে নেমন্তন্ন করেছে!'

'তার মানে?' দুর্গাপদর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'যেখানে ভাল ব্যবস্থা পাব সেখানেই।'

ওর বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে হেম হাসে। তার পর সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলে। প্রথম দিনকার আকস্মিক ব্যাপারটা থেকে কী করে এটা পেশায় দাঁড়িয়ে গেল

'তাই নাকি। ওঃ, চালাক বলে আমাদের খুব অহঙ্কার ছিল। যা হোক দেখালে বটে। খুব দুর্জয় সাহস তো তোমার!'

'নাও—যাবে তো চল! এখনও না কোথাও ঢুকে পড়তে পারলে ভিড় কমে যাবে, মওকা পাব না।'

'যাব? অনেকদিন ভাল মন্দ কিছু খাই নি বটে। সেই যা তোমার বিয়েতে —তা সে আবার আমার দাদার ম্যানেজমেণ্ট তো, জুত হয় নি।'

উৎকৃষ্ট ভোজ্যের কল্পনাতেই তার দু চোখ লুব্ধ হয়ে ওঠে। দুর্গাপদ চিরদিনই খেতে ভালবাসে

হেম আর কথা না বাড়িয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাকে।

সেই সূত্রপাত। এখন দুর্গাপদ ওর এই অভিযানে নিত্যসঙ্গী। আগে থেকে পাঁজিপুঁথি দেখে ঠিক ক'রে রাখে—কোন্ দিন কোন্ ট্রেনে আসবে, কারুর সে ট্রেন হঠাৎ ফেল হয়ে গেলে অপর জন কোথায় অপেক্ষা করবে, ইত্যাদি। দুর্গাপদ অবশ্য আর একটা ভাল ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে ইতিমধ্যে। হাওড়া স্টেশনের চায়ের স্টলে একটি ছেলে কাজ করে—তার দাদা দুর্গাপদর অফিসের বেয়ারা। সেই হিসেবেই জানাশুনো। অফিসের দিনেও ভারী লগনসা পেলে ছাড়ে না ওরা, সকালবেলাই ধোয়া জামাকাপড় এনে তার কাছে জিম্মা ক'রে দিয়ে যায়, অফিসের ফেরত স্টেশনে এসে ওয়েটিংরুমে মুখহাত ধুয়ে কাপড় পাল্টে 'নিমন্ত্রণ রক্ষা' করতে বেরোয়। রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে আবার সেই ছোকরার কাছ থেকেই ময়লা কাপড়জামা নিয়ে নেয়।

এক দিন এই বিয়েবাড়ির সন্ধানেই গিয়ে পড়েছিল ও অঞ্চলে। সকাল সকাল লগ্ন সেদিন—ওদেরও সেটা শনিবার, কোন অসুবিধাই হয় নি—তাড়াতাড়ি খাওয়া চুকে গিয়েছিল বরং, সেইটেই সুবিধা। অনেকটা সময় হাতে আছে বলে আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে ফিরছিল। অন্যমনস্ক হয়েই হাঁটছিল, তবু এক সময় কেমন যেন মনে হ'ল জায়গাটা ওর খুব অচেনা নয়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল—সামনেই শরতের ছাপাখানা।

দুর্গাপদকে একটু দাঁড়াতে বলে হেম এগিয়ে গেল ওদিকে। ঘরে আলো জ্বলছে যখন—প্রেস খোলা আছে নিশ্চয়। আর মালিকও তা হলে আছেন। অনেক দিন শরতের সঙ্গে দেখা হয় নি। বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, তখনও দেখা পায় নি—জমাদারের কাছে লিখে রেখে গিয়েছিল। শরৎ যেতে পারে নি। আইবুড়ো ভাতের কাপড় ও মিষ্টি বলে চারটে টাকা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়েছিল। সেই কুপনেই লিখে দিয়েছিল, 'শরীর খুব খারাপ যাইতেছে, আবার হাঁপানির মত হইয়াছে—যাইতে পারিলাম না সেজন্য খুব দুঃখিত, আর এক দিন গিয়া বধূমাতাকে দেখিয়া আসিব' ইত্যাদি।

শরীর খারাপ জেনেও এত কালের মধ্যে খবর নেওয়ার কথা মনে পড়ে নি, সেজন্য বড়ই লজ্জিত বোধ করতে লাগল হেম। অনেক আগেই এক দিন আসা উচিত ছিল।

কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে শরৎ নেই।

সে জায়গায়—ওরই চেয়ারে বসে আছে আর একজন লোক। শরতের কর্মচারীদের চেনে হেম, তারা কেউ নয়। কর্মচারী শ্রেণীর বলে মনেও হ'ল না।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে হেম ওপরে উঠে গেল, 'শরৎবাবু নেই?'

যে বসে ছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী একটি লোক, সে একটু অবাক হয়েই তাকাল ওর দিকে, 'তিনি তো আর বসেন না এখানে—বহু দিন হ'ল বসছেন না।

'বসছেন না? আর এখানে আসেনই না?'

'না। তিনি প্রেস ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? মানে বেচে দিয়েছেন?'

'না বেচে ঠিক দেন নি। লীজ দিয়েছেন, আমিই লীজ নিয়েছি। মাসিক ভাড়া বন্দোবস্ত। মালপত্র টাইপ মেশিন সব তাঁর অবশ্য, তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু হস্তান্তর করতে পারব না। আমার শুধু নেড়েচেড়ে চালানো। তাঁর তো আর নিজে দেখা সম্ভব নয়!'

'কেন—তাঁর কি খুব অসুখ?'

'দেখুন', ছেলেটি বিজ্ঞভাবে বলে, 'খুব যে একটা অসুখ তা বলতে পারি না। হাঁপানির মত হয়েছে, হজমের গোলমাল—আছে আরও এটা ওটা—তবে আসলে মনটাইগেছে ভেঙে আর কি। এসব আর পেরে ওঠেন না। যোঝবার শক্তিটা চলে গেছে।'

তার পরই কী মনে ক'রে যেন সচেতন হয়ে উঠল নতুন মালিক।

'কাজ-কর্ম কিছু আছে নাকি? থাকলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে পারেন।... সেই সবই—কম্পোজিটার জমাদার সব ঠিকই আছে- আমি কাউকে ছাড়াই নি। শরৎবাবু নেই বলে কাজের কোয়ালিটি কিছু খারাপ হবে না!'

'না, আমি কাজ দিতে আসি নি—আমি তাঁর আত্মীয়।'

'আত্মীয়—অথচ কোন খবর রাখেন না!' লোকটির কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের সুর। বোধ হয় আশাভঙ্গ-জনিত ক্ষোভের ফল সেটা।

'না, দূরে থাকি কি না। তা সেই বাসাতেই আছেন কি না জানেন?'

'না না, থাকেন এইকাছেই। নতুনবাজারের পাশে একটা মেসেতে। খুব কষ্টেই আছেন ভদ্রলোক। যান না, দেখেই যান একবার। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।'

সে একটা চিরকুটে বাড়ির নম্বর ও গলির নাম লিখে দেয়।

হেম আবার রাস্তায় ফিরে এসে দুর্গাপদকে বলে, 'তুমি যাও ভাই দুর্গা, আমার একটু ফিরতে দেরি হবে।'

'কেন বল দেখি—কী ব্যাপার এখানে ?'

'এ আমার মেসোমশাইয়ের প্রেস। খবর নিতে গিয়েছিলুম, শুনলুম খুব অসুখ। মনে করছি একবার দেখেই যাই—। আবার অন্য এক দিন এত দূর উজোন ঠেলে আসা—।'

দুর্গাপদকে বিদায় দিয়ে খুঁজে খুঁজে অতি কষ্টে মেস-বাড়িটা বার করলে হেম। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলি থেকে একটা কানাগলি বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা অতি পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ি। সদরের কাছ থেকেই ভিজে-ভিজে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। কেরানীর মেস নয়, নতুন বাজারের যত দোকানদারদের কর্মচারীর মেস। দোকানদারেরা অনেকে বাসায় বা বাজারের ওপর ঘর ভাড়া ক'রে থাকে। কর্মচারীদের আরও সস্তায় থাকা দরকার। আঠারো, কুড়ি, বাইশ, এই সব মাইনে বেচারীদের। বাড়িটাও সেই মাপেরই। তবু খরচ কমাবার জন্য একটা ঘরে ছটা পর্যন্ত বিছানা ফেলতে হয়েছে। ওপরতলায় সম্ভবত চৌকির বালাই নেই, নিচের ঘরে তবু একটা করে আমকাঠেরচৌকি ফেলা আছে।

সদরের পাশে গলির দিকে যে ঘর—সেই ঘরেই শরৎ থাকে, একতলাতে। স্যাঁতসেঁতে করছে ভিজে ঘর—সেইখানেই চৌকির ওপর বসে হাঁপাচ্ছে সে। অন্ধকারেই বসেছিল, এখানে এত আলোর সুবিধে নেই—'গেস্ট্ এসেছে' ঠাকুর হেকে বলায় চাকর এসে একটা হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে গেল মেঝের ওপর। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী, দেখতে দেখতে কেরোসিনের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল।

হোক্ ক্ষীণ আলো—তবু কঙ্কালসার দেহটা দেখতে কষ্ট হয় না। সেই রূপের এই পরিণতি। হেমের চোখে জল এসে যায় যেন।

'এসো এসো বাবা, বসো। এখানে এলে কী করে? ঠিকানা—? ও, প্রেসে গিছলে বুঝি?...তার পর, খবর সব ভাল তো? বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে—? বৌমা কেমন হলেন? তোমার মা'র সঙ্গে বনছে তো?'

কষ্ট ক'রে ক'রে হলেও অনেকগুলো কথাই বলে শরৎ। একা একা মুখ বুজে থাকা সারা দিনরাত। দোকানীর মেস, সবাই ভোরে উঠে চলে যায়—মাঝে একবার খেতে আসে—তা তখনও কথা কইবার মত যথেষ্ট ফুরসত থাকে না তাদের—পাত্রে ফেরে এগারোটা বারোটায়, ক্লান্তিতে মড়ার মতই এলিয়ে পড়ে। অনেক দিন পরে পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে যেন বেঁচে যায় সে।

হেম কতকটা স্তম্ভিত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, সে এবার বললে, 'কিন্তু এ কী হাল হয়েছে আপনার? আপনি ডাক্তার-টাক্তারও দেখান না বুঝি?'

'ডাক্তার আর কি করবে? বয়স হলে এসব অমন হয়। আর ডাক্তার দেখিয়ে বেঁচেই বা লাভ কি বেশী দিন, তাড়াতাড়ি সরে পড়তেই তো চাই!'

'তাই বলে এই ঘরে—এমনি ভাবে? একে আপনার হাঁপানির মত হয়েছে, তার ওপর এই ভিজে ঘরে বাস করছেন? সে বাসা ছাড়লেন কেন? মেসে আসবার কী দরকার পড়ল?'

'না বাবা, সে যেন টিকতে পারলুম না কিছুতেই। একা একা—। তা ছাড়া এক জায়গায় থাকা এক জায়গায় খাওয়া—এ আর পোষাল না।'

'তা এই মেস ছাড়া কি আর মেসও জোটে নি আপনার? কলকাতায় কী আর এর চেয়ে ভাল মেস ছিল না?'

একটু অপ্রতিত ভাবে হাসল শরৎ।

'তা ঢের ছিল বৈকি। তবে কি জান—আমার যেন আর কিছুতেই কোন হাঙ্গাম করতে ইচ্ছে করে না। আমারই এক কম্পোজিটার এই মেসে থাকত—সে সন্ধান দিলে, চলে এলুম। কে আবার ঘোরে, খোঁজ করে—অত মেহনত পোষায় না। তা ছাড়া এর কতকগুলো সুবিধেও আছে—ছাপাখানাটা কাছে, ওদের কোন দরকার হলেই ছুটে আসে, জেনে যায়। গঙ্গাটাও বেশী দূর নয়—টানটা একটু কমলেই মনে করেছি রোজ গঙ্গাস্নান ধরব—তোমার মাসীর মত। আর কী জান, সস্তাও খুব—সাত টাকায় খাওয়া থাকা!'

'কিন্তু এত সস্তার আপনার দরকারই বা কি? এত কি টাকার অভাব আপনার পড়ল যে দশ-বারো টাকার একটা মেসেও থাকতে পারেন না! কত দেয় আপনাকে ওরা প্রেসের ভাড়া?'

'ও, তাও জেনে এসেছ! আচ্ছা বটে অনাদি ছোকরা, সকলের সঙ্গে হাটিপাটি পেড়ে ঘরের কথা বলা চাই। তা ভাড়া মন্দ দেয় না। চল্লিশ টাকাই দেয় মাসে। তেমনি খরচও তো দেবার—কাপড় আছে জামা আছে—ডাক্তার বদ্যি আছে—কী নেই বল? তবু দশ-বারো টাকা কি আর খরচ করতে পারি না—তা পারি। অন্য একটা মতলব আছে। কখনও তো টাকা জমাতে পারলুম না, রোজগার কম কার নি—কিন্তু থাকল না একটা পয়সাও। কত কর্তব্যেই তো ত্রুটি রয়ে গেল—মধ্যে মধ্যে বড্ড গ্লানি বোধ হয় বাবা মনটার মধ্যে। তাই বাসার পাট উঠিয়ে মালপত্তরগুলো বেচে যখন থোক্ টাকা খানিকটা হাতে পাওয়া গেল, তখনই এই মতলবটা মাথায় এল। মরবার আগে যদি আর কিছু জমাতে পারি, দুটো টাকা মিলিয়ে—। যাক্ সে কথা, তোমার আর শুনে

কাজ নেই।...ও হরি তুমি এখনই উঠে দাঁড়ালে যে—বসো বসো। কিছু একটু আনাই খেয়ে যাও।'

'না না—এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল, আপনার ওই ছাপাখানার পাড়াতেই —এক পেট খেয়ে আসছি। ওসব দরকার নেই। আর এক দিন তখন—। আজকের মত উঠি।'

'উঠবে? তা ওঠ।' একটু যেন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই বলে শরৎ, 'তোমার তো আবার সেই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরা। রাতও হয়ে যাচ্ছে বটে। আচ্ছা, এসো তা হলে। মোদ্দা মধ্যে মধ্যে—যদি এদিকে কাজকর্ম কিছু থাকে একটু খবর নিয়ে যেয়ো বাবা।'

তার পর আরও খানিকটা ইতস্তত ক'রে—প্রথম থেকে যে প্রশ্নটা ঠোঁটের কাছে ঠেলাঠেলি করছিল, হেম ঘরের বাইরে পা দিতেই যেন হঠাৎ সেটা ক'রে ফেলে, 'তোমার—তোমার ছোট মাসী ভাল আছেন? গিয়েছিলেন নাকি তোমার বিয়েতে?

'না, উনি তো কোথাও যান না। তবে ভালই আছেন—যত দূর জানি। কদিন আগেও বড়দার সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছিল।'

'বড়দা—? মানে গোবিন্দ?...অ। ভাল থাকলেই ভাল। আচ্ছা এসো।'

॥ ৪ ॥

হেম কিন্তু তখনই বাড়ির দিকে গেল না বরং উল্টো দিকেই হাঁটতে শুরু করল। এখনই উমার বাড়িতে যাবে সে। আজই এর একটা বিহিত ক'রে ফিরবে—তা সে যত রাতই হোক।

উমা তখন সবে পড়িয়ে ফিরে কাপড় কেচে পুজোয় বসতে যাচ্ছে। হেমের গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলে দিলে।

'কী রে, এত রাত্রে হঠাৎ? খবর সব ভাল তো?' উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করে উমা।

'আমাদের খবর সব ভাল। আজ এদিকে এসে পড়েছিলুম—খবর নিতে মেসোমশাইয়ের ছাপাখানায় গিয়েছিলুম—তাই।'

বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ঢিব্ ক'রে ওঠে উমার। সে কোন প্রশ্নও করতে পারে না। অসহায়ভাবে হেমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। হঠাৎ যেন পায়ের জোরটাও কমে যায় অনেকখানি। একটু কাঁপুনির ভাব টের পায় নিচের দিকটায়। তাড়াতাড়ি কপাটটা ধরে ফেলে সে।

'না—না। সে রকম কিছু নয়। বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।' উমার অবস্থাটা হ্যারিকেনের আলোতেও লক্ষ্য করে হেম।

উমা আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে এসে ওকে পথ ছেড়ে দেয়। মাতুরটা বিছিয়ে বসতেও দেয়।

একটু হাসিও পায় নিজের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে। স্বামী বলে যাকে ডাকবার কোন অধিকারই নেই—এক বিয়ের রাতের কটা মন্ত্র ছাড়া—তার জন্যই তার এ কী উৎকণ্ঠা! এ কী শুধু নিজের এই এয়োস্ত্রী অবস্থার সুবিধার জন্যই? মাছ খাওয়া তো সে ছেড়েই দিয়েছে বহুকাল। শুধু এই লালপাড় শাড়ি, এই লোহা-গাছটা আর শাঁখা দু গাছা! ব্রত-পার্বণে ছাত্রীদের বাড়ি থেকে কিছু পাওনা হয় —এই তো!

হেম মাদুরে বসে বলে, 'মেসোমশাই প্রেস লীজ দিয়ে দিয়েছে—মানে ভাড়া আর কি। প্রেসে আসেও না, বসেও না, দেখাশুনোও করে না। শরীরে আর কিছু নেই—দেখলে চিনতে পারবে না তুমি—কঙ্কালসার হয়ে গেছে একেবারে—ঐ বাহারে চোখদুটো তেমনি না থাকলে চিনতে পারতুম না সত্যিই। হাঁপানির মত হয়েছে নাকি—বসে বসে হাঁপাচ্ছে। তার ওপর সে বাসা-টাসা সব উঠিয়ে দিয়ে —বললে বিশ্বাস করবে না—নতুন বাজারের পেছনে এক এঁদো গলির ভাঙা পুরনো ড্যাম্প বাড়ির এক মেসে একতলার ঘরে আছে। এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? কলকাতায় যে অমন বাড়ি আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না আমার!'

'কেন? আর মেস পায় নি? বাড়িই বা ছাড়লে কেন? না কি পয়সা নেই?'

কণ্ঠস্বরটা যেন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ শোনায়। উমা নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ে নিজের গলার আওয়াজে। আসলে কঠিন করবার প্রাণপণ চেষ্টাটাকেই অন্তরের ব্যাকুলতা যে বিদ্রূপ করে গেল—এ তীক্ষ্ণতা যে ব্যগ্রতারই নামান্তর তা কি হেমের বুঝতে বাকী থাকবে।

হেম অবশ্য কী বোঝে তা সে-ই জানে। সে একটু বোধ হয় ভয় পেয়েই যায়। সামান্য একটু হাসবার মত ভঙ্গী ক'রে বলে, 'সে বাড়িতে একা একা নাকি থাকতে পারছিল না তাই মালপত্র সব বেচে কিনে সে বাড়ি একেবারে ছেড়ে দিয়ে ঐ মেসে এসে উঠেছে। ছাপাখানার দরুন ভাড়াই পায় মাসে চল্লিশ টাকা—তবু বেছে বেছে ঐ সাত টাকার মেসে এসে না উঠলে চলছিল না।···আসলে ওঁর কথার ভাবে যা বুঝলুম—এখন টাকা জমিয়ে যাচ্ছে—বোধ হয় তোমাকে দিয়ে যাবে বলে।'

শেষের কথাগুলো একটু ভয়ে ভয়েই বলে হেম।

আর ভয়ের কারণও যে ছিল—তা বোঝা গেল বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

উমার সে তপ্তকাঞ্চন বর্ণের কিছুই আর নেই সত্য কথা—রোদে পুড়ে জলে ভিজে বাইরে ঘুরে ঘুরে মুখটা তামাটে হয়ে গেছে একেবারে—তবু অপমানের এবং উমার গাঢ় লাল রংটা হেমের চোখে পড়ে। আগুনের মতই জ্বলে ওঠে উমা। বলে, 'হ্যাঁ, অনেক তো দিয়েছে—ঐ উপকারটাই বাকী আছে শুধু। মরবার সময় টাকা দিয়ে স্বামীর কর্তব্য ক'রে যাবে—না। আস্পদ্দা।'

হেম চুপ করে বসে থাকে। সে যা বলতে এসেছিল—এ যেন উল্‌টোটা হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে উমাই শান্ত হয়ে আসে। হেমের কথাগুলো—আগের কথাগুলো যেন মনে মনে একবার উচ্চারণ করে। 'কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে।' 'দেখলে চেনা যায় না।' 'একা সেই ভিজে ঘরে বসে বসে হাঁপাচ্ছে।' 'এ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি।'

ওর মনে পড়ে যায় সেদিনের কথাগুলো। শরতের সেই বিবর্ণমুখে বেরিয়ে যাওয়া। সেই অসহায় দীন ভঙ্গীটা। সে চলে যাবার পর অনুতাপের শেষ ছিল না উমার। কে জানে সেদিনের সেই আঘাতের ফলেই লোকটা এমন ভাবে নিজেকে শেষ ক'রে দিচ্ছে কিনা।

হঠাৎ যেন ছট্‌ফট করে ওঠে সে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু প্রাণপণে সে আকুলতা দমন ক'রে মুখে শুধু বলে, 'তা এ কথা এত রাত্তিরে আমাকে বলতে এলি কেন?'

হেম তবুও চুপ ক'রে থাকে। কেন এসেছে সেটা যেন বলতে আর ভরসা পায় না। তার উত্তরে আবার জ্বলে উঠবে কিনা কে জানে।

'এখানে—মানে আমার কাছে এনে রাখতে চাস?' যতদূর সম্ভব শান্ত কণ্ঠে সহজভাবে প্রশ্ন করে উমা। হঠাৎ এ আশ্চর্য শক্তি কোথা থেকে পেল ও আত্ম-দমন করবার, নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যায়।

'নইলে মেসোমশাই আর বাঁচবে না।'

এতক্ষণে কথাটা বলে ফেলে যেন বাঁচল হেম।

এবার উমার চুপ ক'রে থাকার পালা।

কত কী মনে হচ্ছে তার। কত বিস্মৃত স্মৃতি ভিড় ক'রে আসছে চিন্তায়। কত ভুলে যাওয়া আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠছে। যে সব চিত্তবৃত্তি ম বিলয় হয় ভেবেছিল—সেইগুলোই জেগে উঠছে আবার—এক সঙ্গে। ।-কাটাকাটি

মনের ঝড় কান পেতে কি বাইরে থেকে শোনা যায়? চার কড়ি

কার বুকে উঠেছে ও ঝড় ? কার মনে বেধেছে লড়াই ?

উমা যেন বহু দূর থেকে নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে থাকবার চেষ্টা করে। যেন অনেকখানি ব্যবধান থেকে শোনার চেষ্টা করে সে ভয়ঙ্কর কোলাহল।

তার পর—তেমনি যেন অনেক দূর থেকেই ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, 'সে কি আসবে মনে করিস ?'

'তুমি—তুমি বললেই আসবে। তুমি একবার যেতে পার না ?'

'আ.ম যাব—সেই মেসে ? লোকে বলবে কি ?'

'তুমি বাইরে গাড়িতে বসে থেকো। সে গলিতে তো গাড়ি যাবে না। দূরেই থাকতে হবে। তুমি চল লক্ষীটি !'

'আমার এত করার গরজ ?'

আবারও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে উমা। কিন্তু এবার হেমও বুঝতে পারে—এ প্রশ্ন হেমকে নয় তার—নিজেকে।

সুতরাং সে চুপ ক'রেই থাকে। উমাই একবার অসহায় ভাবে চারিদিকে চায়। এই ঘরে মার'ই আসবাব বোঝাই। সেদিকে চেয়ে মাকে মনে করবার চেষ্টা করে সে। বোধ হয় মা'র এই স্মৃতির মধ্যে থেকে তাঁর একটা নির্দেশ পাবারও আশা করে।

সেদিকে চেয়েই মনে হয়—কে যেন মনের মধ্যে বলছে, 'তুমি বড় ছোট হয়ে যাচ্ছ উমা। এখনও এই অভিমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পার নি ?'

সত্যি—অভিমান কি কখনও মরে না ?

তার পর কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে—'এই তো ঘর। বাড়িওলাই কি রাজী হবে ? আর সে যে বড় লজ্জার কথা—এখন এ কথা বলতে যাওয়া ?'

'আমি - আমি একবার বলে দেখব ?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে হেম।

'না না—সে আরও লজ্জার কথা। তুই একটা কাজ করতে পারবি বাবা ? কাল তো রবিবার, সকাল করে খেয়ে-দেয়ে চলে আসবি একবার ?'

'নিশ্চয় আসব। আমি ন'টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি।'

যায়। 'না না খেয়ে-দেয়ে দশটা-এগারোটায় আসিস তা হলেই হবে।'

থাকতে প্রহ্লম খুশী হয়ে চলে যায়।

ঐ মেসে এসে আর একবার অসহায় ভাবে তাকায় ঘরটার দিকে। যেন মনে হচ্ছে

বেছে বেছে ঐখানকার বাতাস কমে গেছে একেবারেই। শ্বাস নেওয়া যাবে না একটু

ভাবে যা বুকযেন অদৃশ্য এক শক্তি তার গলা টিপে ধরছে।

বলে।' ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে ভেতরের খোলা উঠোনটায় দাঁড়ায়।

পরের দিন হেম যখন এল—তখনও উমার চোখ লাল, হয়তো রাত্রিজাগরণের ফলেই। সম্ভবত সারারাতই ঘুমোতে পারে নি বেচারী। তার দিকে তাকিয়ে হেমের কষ্টই হতে লাগল। কেনই বা এর মধ্যে জড়াতে গেল ওকে। সত্যিই যার কাছ থেকে এতটুকু কিছু পেলে না—তার প্রতিই বা কর্তব্যপালনের কী এত গরজ! উমা কিন্তু কথা কইল খুব সহজ ভাবেই।

'বাড়িওলাদের বলে মত করিয়েছি। বুড়োমানুষ থাকবেন, বাইরের পাইখানা আর কলতলা ব্যবহার করবেন—ওঁদের আপত্তি হবে না। শুধু তাই নয়, ওঁরা এই সিন্দুক আর দেরাজটা আপাতত ওঁদের ঘরে রাখতে রাজী হয়েছেন। যদি ওঁরা পাশের ছোট ঘরটা খালি ক'রে সরিয়ে দিতে পারেন তো চার পাঁচ টাকা ভাড়া বেশী দেব তাও বলেছি।··সে থাক গে, তোকে একটা কাজ করতে হবে—কোথায় তক্তপোশ পাওয়া যায় আমি তো জানি না।– খোঁজ ক'রে একটা কিনে আনতে হবে।···টাকা নিয়ে যা—একজনের মত ছোট তক্তপোশ, নইলে ধরবে না। আর দ্যাখ একটা পাশবালিশ চাই। ভাল বড় তৈরী পাশবালিশ ওয়াড় সুদ্ধ কিনে আনিস। যে মুটেতে তক্তপোশ আনবে তাদের দিয়েই এই দেরাজ সিন্দুক ওপরে ওদের ঘরে বই করতে হবে।'

হেম এতটা আশা করে নি। সে মহা উৎসাহে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

মুটে দিয়ে মাল সরিয়ে চৌকি পেতে যখন ঘর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে স্নান ক'রে এল উমা—তখন বেলা তিনটে।

এতক্ষণে খেয়াল হল হেমের।

'তুমি কিছু খেলে না তো মাসী?'

'সকালে পুজো সেরে একটু জল খেয়ে নিয়েছিলুম। আর কিছু লাগবে না। চল, বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যের সময় একেবারে রাঁধব।'

'দাঁড়াও। তোমার না হোক আমার খিদে পেয়ে গেছে ছুটোছুটি ক'রে। আগে একটু খাবার আনি।'

হেম ছুটে গিয়ে খানকতক কচুরি আর দুটো কি মিষ্টি নিয়ে আসে।

উমা ম্লান হাসে। এ ক্ষিদে যে ছেলের কিসের তা বুঝতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না তার। সে প্রতিবাদও করে না, অনাবশ্যক বুঝেই। মিছিমিছি কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই—সেই ধরপাকড়, পীড়াপীড়ি। কোন তর্ক-বিতর্কেই তার রুচি

নেই আর। যা করতেই হবে বুঝছে তার জন্ত দেরি করতেও ইচ্ছে করে না। আসলে সে ক্লান্ত। করছে, সবই করছে ও—কিন্তু ভেতরে ভেতরে এ যে কী প্রচণ্ড অবসাদ আর সীমাহীন ক্লান্তি—তা শুধু সেই বুঝছে।

হেম ছুটেই ফিরল খাবার নিয়ে—নিজেই পাতা খুলে দু ভাগ ক'রে সাজাল। এক ভাগ এগিয়ে দিল মাসীর দিকে। হয়তো প্রচণ্ড একটা প্রতিবাদ আসবে ভেবেছিল কিন্তু কিছুই করল না উমা। শুধু বলল, দাঁড়া, জল গড়াই একটু।'

তার পর নিঃশব্দেই খেতে শুরু করল।

ছোট মাসীর বড়ই খিদে পেয়েছিল—মনে মনে ভাবে হেম।

শরতের দিক থেকেও যতটা প্রবল আপত্তি উঠবে—যতটা বেগ পেতে হবে রাজী করাতে--বলে আশঙ্কা করেছিল হেম, ততটা কিছুই হ'ল না। শুধু যখন সে গিয়ে বললে, 'ছোট মাসী বাইরে গাড়িতে বসে আছে, আপনাকে ডাকছে', তখন প্রথমটা শরতের একটু দেরি হয়েছিল কথাটা বুঝতে। মুহূর্তকয়েক তাকিয়ে ছিল হাঁ ক'রে হেমের মুখের দিকে। তার পরই বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, 'কে, কে ডাকছে বললে—তোমার ছোট মাসী? কেন বল, তো? কোন বিপদ-আপদ নাকি?...চল চল আমি যাচ্ছি!'

ব্যস্ত হয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। রোগা মানুষ, দুর্বল শরীর—পাছে আবার ছুটে যাবার চেষ্টা করে বলে হেমই তাড়াতাড়ি ওর হাতটা ধরে ফেলে, 'না না। তেমন কিছু নয়, ব্যস্ত হবেন না আপনি। আস্তে আস্তে চলুন।'

সে-ই হাত ধরে নিয়ে চলল গাড়ি পর্যন্ত।

'কী ব্যাপার—তুমি এমন হঠাৎ?'

গাড়ির সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে শরৎ।

সত্যিই তার দিকে চেয়ে প্রথমটা যেন চিনতে পারে না উমা। এই কি সেই মানুষ! তার চোখে যেন অকারণেই জল এসে যায়। সে তাড়াতাড়ি মুখটা নিচু ক'রে বলে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। উঠে এসো।'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। শরতের আবারও খানিকটা সময় লাগে বুঝতে।

'নিয়ে যেতে মানে—? তোমার কাছে? বাস করব?'

'আমার কাছে না হলে আর নিয়ে যাবার কথা তুলব কেন?'

'ও, হেম সেদিন দেখে গিয়ে বলেছে বুঝি? তা এই ঘাটের মড়াকে আবার সেধে কেন ঘাড়ে চাপাচ্ছ মিছিমিছি?'

'ঘাটের মড়া বলেই তো ঘাড়ে চাপাচ্ছি। এই সময়ই তো আমার দরকার।'

আরও একটা কথা মুখে এসেছিল। মনে হয়েছিল বলে, স্ত্রীর প্রয়োজন দুর্দিনে—রক্ষিতা সুখের দিনের সঙ্গিনী। কিন্তু দুর্বার বলে মনকে শাসন করে ও। কটু কথা আর বলবে না। তা ছাড়া সে স্ত্রীলোকটা মৃত। সেও ভালবাসত নিশ্চয়। থাক।

শরৎ একটু হাসে। বলে, 'তা বটে। মলেও—খবর পেলে তোমাকেই যা কিছু শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে হবে। এমনিই শাস্তরের আইন। তা আজই যাব? এখনই? জিনিসপত্রগুলোর কিছু করা হ'ল না যে—।'

'তুমি উঠে এসে বসো, তোমার পা কাঁপছে। জিনিস—হেমকে বলে দাও, মোটামুটি যা আছে নিয়ে আসুক। বাকী যা আর একটা রবিবার এসে হেমই নিয়ে যাবে। টাকাকড়ি যদি ওদের পাওনা থাকে তো তাও চুকিয়ে দাও।'

'না, টাকা আগাম দেওয়া আছে। আর সে কীই বা টাকা।...আচ্ছা, হেম তুমি চাকরটাকে ডাক তো, রঘু ওর নাম। ওকে বলে দিই—বিছানা-বাক্সগুলো তোমাকে দিয়ে দেবে।'

সে ক্লান্তভাবেই গাড়িতে উঠে সামনের দিকটায় বসে পড়ে।

বাড়িতে এসে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে প্রশ্ন করে উমা, 'রাত্রে কী খাও?'

'রাত্রে? কী খাই?' আবারও হাসে শরৎ, 'ভাল থাকলে দু-একখানা রুটি খাই, ভাতও খাই এক-আধ দিন—নইলে দুধসাবু। মানে খেতুম। তবে এখানে মেসে তো ঢালা ব্যবস্থা। অত তোয়াজ করে কে! ভাল থাকলে যা পারি খাই—নইলে একটা মিষ্টি আনিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকি। দুধসাবু খেলেই ভাল থাকি!'

'তবে তো আমারও সুবিধে। আমার তো ঐ খাদ্য।'

সে ছোট উনুনটায় গুল ধরিয়ে সাগু চাপিয়ে দেয়।

তার পর নতুন চৌকিটাতে পরিপাটি ক'রে বিছানা করতে থাকে।

বিছানা ক'রে সদ্য কেনা পাশবালিশটা যখন সাজিয়ে রাখছে—শরতের মনে পড়ে গেল কথাটা।

ভোলে নি উমা। কথাটা ভোলে নি। এ বোধ হয় কোন মেয়েই ভুলতে পারে না।

নিজের অন্যায়ের বিপুল আয়তনটা এই প্রথম যেন উপলব্ধি করে শরৎ।

ওদের ফুলশয্যার রাত্রে শরৎই পাশবালিশটা আড়াল দিয়েছিল—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে, পাছে ছোঁয়া লাগে। রক্ষিতার প্রতি একনিষ্ঠা বজায় রাখতে স্ত্রীর স্পর্শদোষ বাঁচিয়েছিল।

সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল শরতের মুখে। প্রায় চুপি চুপি বললে, 'পাশবালিশটা ভোল নি দেখছি!'

'না। কিছুই ভুলি নি। ও কি ভোলবার!' প্রায় সহজ কণ্ঠেই বললে উমা, তবু তখনই তাডাতাডি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর সামনে না চোখের জল পড়ে, গলা না কেঁপে যায়। বড় বেশী দৈন্য প্রকাশ পাবে তা হলে।...

নতুন শয্যা, নতুন মানুষ।

এই প্রথম স্বামী তাব ঘরে শয্যা গ্রহণ করছেন। তবু কত দূর। কত ব্যবধান!

আলোটা নিভিয়ে নিজের বিছানায এসে শুতে শুতে সেই কথাটাই মনে হ'ল উমাব।

এ কি এই কযেক হাতেব ব্যবধান মাত্র? দুটো বিছানার মাঝখানে এই সামান্য দূরত্ব? এ যেন ওদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের যুগযুগান্তরের সুবিপুল ব্যবধান। সে ব্যবধান আব ঘুচবে না। ঘুচবে না বলেই সে নিজে এই ছোট্ট ব্যবধানটির ব্যবস্থা করেছে। বিবাট অন্তরালেব প্রতীক স্বরূপ, সেদিনেব সেই অন্তরালের স্মৃতি স্বরূপ—পাশবালিশটা কিনে আনিয়েছে।

যত দিন স্বামীকে সে কাছে পায় নি—যখন কাছে পাওয়াব কোন আশাও ছিল না—তত দিন তখনও কোথায় যেন একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষীণ আশা বেঁচে ছিল। আজ স্বামী তার কাছে ফিরে এসেছেন, হয়তো অবশিষ্ট চিরদিনের জন্যই ফিরে এসেছেন—তবু আজ সে নিজে হাতেই সে আশার সমাধি রচনা করল—ঐ পৃথক শয্যাটি পরিপাটী ক'রে পেতে দিয়ে।

আজ আর সম্ভব নয়। আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আজ এক শয্যায় শুতে গেলে বিপুল পবিহাস হয়ে দাঁড়াত। ভাগ্যের বহু পদাঘাত সহ্য করেছে সে—আব নয়।

অন্ধকার ঘরে, অন্ধকার শয্যায হাতডে হাতড়ে এসে শুয়ে পডল সে। অনেক—অনেক দিন পরে প্রায় মরুভূমি-হয়ে-যাওয়া শুষ্ক চোখে কোথা থেকে অশ্রুর উৎস জেগেছে। দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। আলোর একটা ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত না।

কত দিন পরে মাকে মনে পডছে তাঁর।

'মাগো এবার আমাকে নাও।আমাকে নাও। কত দিন ভুলে থাকবে আর?'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এ বাড়িতে কনকের পক্ষে একমাত্র বৈচিত্র্য—এবং বোধ হয় কিছুটা আনন্দ ও সান্ত্বনার স্থলও হ'ল নরেন। বস্তুত নরেন যদি না থাকত তো সে টিকতে পারত না। হয়তো পাগল হয়ে যেত এত দিনে। স্বামী উদাসীন, প্রায় গৃহত্যাগী—ছুটির দিন সকালে মাত্র ক'ঘণ্টা সময় সে জেগে এ বাড়িতে থাকে -কিন্তু সেও ভোর থেকে স্নানাহারের সময় পর্যন্ত তার বাগানেই কাটে। ননদ বিদ্বিষ্ট—দিনরাতই কলহের সহস্র ফাঁদ পাতছে—অতি কৌশলে সে ফাঁদ এড়াতে হয়। কনকের অপরিসীম ধৈর্য তাই, নইলে প্রতি মুহূর্তেই দারুণ ঝগড়া বাধত। তার বিবাদের ফাঁদ এড়াতে হয় মানে তাকেও এড়াতে হয়। সামনে পড়লেই বাক্যবাণ ছুটতে থাকে—কাঁহাতক সহ্য হয় মানুষের! তার ভয়ে ভাগ্না সীতাটার সঙ্গেও কথা কইতে পারে না। আড়ালেআবডালে কথা কয়ে দেখেছে—সে মেয়ে আবার এমন, কার সঙ্গে কী কথা হ'ল প্রত্যেকটি মা'র কাছে গিয়ে গল্প করে। তা থেকে বহু দিন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে। কনক প্রাণপণে মুখ বুজে (এবং কানও সম্ভবত, নইলে সে কথা হজম করা শক্ত) থেকে তা এড়িয়েছে। শাশুড়ীই সাবধান ক'রে দিয়েছেন, 'কেন মা ওদের সঙ্গে কথা কইতে যাও, খুব দরকার না থাকলে কর্য়ো না। ও ঝাড়বংশই পাজী, বুঝছ না?'

এ তিনজনকে আর শিশু দেওরকে বাদ দিলে আর যে সুস্থ লোক এ বাড়িতে আছে—শ্যামা, সেও তার ওপর ঠিক যেন প্রসন্ন নয়। অথচ কেন যে নয়, তা কনক ভেবে পায় না। সে তার কাকী-জেঠীমার সমস্ত উপদেশ পালন ক'রে আদর্শ বধূ হবারই চেষ্টা করে। তার বাড়িবও আর কোন মেয়ে কিন্তু এতটা পারত না। কাজও একা এক-হাতে যতটা করা সম্ভব ততটাই করে—একটি কাজও ফেলে রাখে না। শ্বশুরের নোংরা কাজগুলো শাশুড়ী তাকে করতে দেন না বার বার স্নান করতে হয় বলে। ওর এক ঢাল চুল, ভিজে থাকলে অসুখ করবে। শ্যামার চুল অসম্ভব পাতলা হয়ে গেছে, সামনেটা—মানে সিঁথির কাছটা তো চক্‌চকে টাকের মতই হয়ে উঠেছে—সুতরাং তার দশবার স্নান করলেও ক্ষতি হয় না। এ ছাড়া ভোরের রান্নাটা তার—সেও গরজে। বাসিপাট সারতে হয় কনককে। শুধু বাসিপাট কেন—ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা,

রান্নাঘর দাওয়া উঠোন নিকোনো, ক্ষার কাচা, বিছানা তোলা-পাড়া, বাসন মাজা—কী নয়? ঐন্দ্রিলার যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সেদিন সে-ই রাঁধে— কিন্তু সে আর কদিন? তার অসহযোগের দিনই তো বেশী। সে সব দিনে কনককেই রান্না করতে হয়। এ ছাড়া শাশুড়ীর ব্যক্তিগত সেবাও করতে প্রস্তুত ছিল—যদি তাঁকে একদণ্ড স্থির দেখতে পেত! শ্যামা তার স্বামী-সেবার মুহূর্ত-গুলি ছাড়া অষ্টপ্রহরই থাকে তার পাতা-গাবড়া গাছপালার ঠেকো এবং নারকেল সুপুরি ও সুদের হিসেব নিয়ে। রাত্রে অন্ধকারেও হাত থামে না— তখন চলে পাতা চাঁচা। (অন্ধকারে হাতও কাটে না তো -অবাক হয়ে কনক ভাবে এক-এক দিন। '…তাও শ্বশুরের খাওয়ানো নাওয়ানো ইত্যাদি বড় কাজগুলোর ভার তার ওপরই। তবু শাশুড়ীর মন পায় না কেন? ছেলে খুব বেশী ভালবাসলে অনেক সময় শাশুড়ীদের হিংসে হয় বৌদের ওপর। তার ঠাকুমা বলেন, 'ও হ'ল গে সতীনের হিংসে' মাগো কী নোংরা কথাই বলতে পারেন ঠাকুমা! কিন্তু এক্ষেত্রে তো সে কারণও নেই। সেটা নিশ্চয়ই এত দিনে লক্ষ্য করেছেন শাশুড়ী। তবে? সে কি এত ভাল, এত নির্বিবাদী, এত ঠাণ্ডা বলেই তাঁর রাগ? কোন খুঁত ধরে কি দোষ ধরে তাকে তিরস্কার করতে পারেন না বলেই? এক-এক সময় সেইটেই মনে হয় কনকের।

সুতরাং শ্বশুর ছাড়া এ বাড়িতে কোন আশ্রয় নেই তার।

নরেনও অষ্টপ্রহরই তার খোঁজ করে,—'কৈ গো, আমার মা-লক্ষ্মী কোথায় গেলে গো মা, আমার মা-জননী? এসো মা এসো।…একটু বোস্ না মা কাছে, আমার কাছে বসলে তবু দু দণ্ড জিরোতে পারবি। নইলে ঐ মাগী ও কি কম হারামজাদা-মেয়েমানুষ—ও তোর মুখে রক্ত উঠিয়ে ছাড়বে, এই বলে দিলুম। খাটিয়ে খাটিয়ে মারবার জন্যেই তোকে এনেছে। জানিস না ওকে। ওদের ঝাড়ে-বংশে খচ্চর।…নিজে শুধু বসে বসে পাতা চাঁচবে আর পাতা কুড়োবে! ঐ পাতা ওর সঙ্গে স্বগ্‌গে যাবে। ঐ পাতায় ওর মুখে নুড়ো জ্বালা হবে। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।'

তার পরই গলাটা নামিয়ে বলে, 'দিস না মা, আজ যখন কাঁচকলা সেদ্ধটা দিবি—তার সঙ্গে ঐ যে তোদের উঠোনে ধানিলঙ্কা আছে—ঐ একটু টিপে আর অমনি এক ফোঁটা তেল। শুধু শুধু ঐ কাঁচকলা সেদ্ধ যে আর খেতে পারি না—মুখে চড়া পড়ে গেল। আর কীই বা হচ্ছে! ওতেই কি আমি সেরে উঠছি?…দিবি মা? জিভটায় তবু একটু ছড়াঝাঁট পড়ে— ?'

করুণ কণ্ঠে মিনতি করে।

মায়াও হয় কনকের, মন কেমন করে। সে নরেনের পূর্ব ইতিহাস কিছুই জানে না—ক'দিনে শাশুড়ী আর ননদের কথাবার্তার ফাঁকে আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু জেনেছে—তাতে এমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—সুতরাং তার মন-কেমন করার অনেক সঙ্গত কারণ আছে। তবু সে হেসে ঘাড় নাড়ে, 'না বাবা, সে আমি পারব না। মা আমাকে জ্যান্তে পুঁতবেন তা হলে। আপনার শরীর তাতে বড্ড খারাপ হবে। আর তা ছাড়া মরিচের গুঁড়ো তো একটু দেওয়া হয়—'

'হয়েছে? বিষমন্তর কানে ঢুকিয়েছে? দলে টেনে নিয়েছে মাগী? বাঁচলুম বাছা। জানি, মেয়েছেলে মাত্তরেই বেইমানের ঝাড়—। এ বাড়ির মাটির দোষ যে। এসেই অমনি গোড়ে গোড় পড়েছে।...যা দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে – ছোটলোকের মেয়ে গোরবেটী হারামজাদী—যা!'

কনক হাসতে হাসতে উঠে যায়। রাগ হয় না তার। এ গালাগাল গায়ে লাগে না। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষিই মনে হয়।

আবার দু দণ্ড বাদেই ওদিক দিয়ে যেতে দেখলে ডাক পাড়বে, 'কৈ গো, আমার বৌমা কোথায় গেলেন! সন্তানকে একেবারেই ভুলে রইলেন যে!'

কিংবা বলবে, 'আর কবে কি করবি বেটী, আমার দিন যে ফুরিয়ে আসছে। এই বেলা আয়, দুটো-চারটে শলা দিয়ে যাই। আমার কথা শুনে রাখ্—নইলে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি কেন? দেখছিস ঐ মাগীর পাল্লায় পড়ে আমারই হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল।'

আপন মনেই এসব কথা বকে যায় সে, কনক আসুক বা না আসুক।

শ্যামা এক-এক দিন হাসে, আবার এক-এক দিন অন্য মেজাজে থাকলে দাঁত কিড়মিড় করে, 'মুখে আগুন তোমার! আগুন পড়েও কাজ নেই। মুখখানি পচুক তোমার। লোকে বলে সর্ব অঙ্গ থাকতে মুখটি পুড়ুক--আমি তাও বলি না! পচুক, পচুক, ও বেইমানের জিব পচে খসে পড়ে যাক। দিনরাত গু-মুত ঘাঁটছি তবু সেই এখনও আমার পেছনে না লাগলে আমাকে না গাল দিলে পেটের ভাত হজম হয় না!'

কনক হেসে বলে, 'কার ওপর রাগ করছেন মা? ওঁর কি জ্ঞান আছে কী বলছেন?'

'তুমি জান না মা, জ্ঞান নেই তাতেই। 'ধনাশ কম্মল অষ্টপ্রহর আমার চোদ্দপুরুষকে চোদ্দবার নরকে ডোবাত।' ...কম ছিল মা, বলে...

আবার মধ্যে মধ্যে নরেন চিনতেও পারে না কনককে। এসে দাঁড়ালে বলে, 'কে-ও—কে ? ও মল্লিকদের বাড়ি থেকে এসেছেন বুঝি। বসুন, বসুন, আর কী দেখতে এসেচেন ? কিছু কি আর আছে ? ওরে কে কোথায় গেলি রে, একটা আসন দিয়ে যা না - মাগীর চিরদিন সমান গেল, ভদ্দরলোকদের আদর অভ্যর্থনা কিছু শিখলে না কোন দিন। আমাদের গা ইস্‌পিস্ করে এসব অসৈরন দেখলে, বুঝলেন না ? আমরা কত বড গুরুবংশের ছেলে – এসব যে নিয়ে জন্মেছি আমরা। তা বসুন, ঐখানেই বসুন। ময়লা নোংরা যা দেখছেন আমার বিছানায়—মেঝে দিব্যি পোস্কার বৌমা আমার চোদ্দবার মুছে নিচ্ছেন। যাব, যাব একটু ভাল হয়ে উঠি, আপনাদের বাড়ি যাব। আর এই তো এখানেই রইলুম ব্রতে কম্মে যখন ডাকবেন যাব।'

উঠোন থেকে শ্যামা শুনতে পেয়ে বলে, 'এ যে একেবারে সপষ্ট ভীমরতি ধরল দেখছি। কাকে কি বলছ, ও তো তোমার ব্যাটার বৌ।'

'ভীমরতি তোর ধরুক, তোর ছেলেমেয়েদের ধরুক। তোর চোদ্দগুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের ধরুক। আমি চিনতে পারছি না। আসুন মা বসুন। ভাববেন না আমার সত্যি-সত্যিই মাথার গোলমাল হয়েছে—ওদিক থেকে আলোটা এসে পড়েছে কি না তাইতেই—'

তার পর বলে 'বসুন মা, বসুন।'

কনক হাসি চাপতে পারে না বহু চেষ্টাতেও। বলে, 'ওকি আমাকে বসুন বলছেন কেন ?'

'দোষ নেই। কিচ্ছু দোষ নেই। বৌমা তো—মা যখন বলেছি তখন আর কথা কি। কখনও আপনি বলব কখনও তুই বলব। এ যে আপনার জিনিস—মনের মত জিনিস। কখনও মাথায় কখনও পায়ে। সংসারের দস্তুরই যে এই। আর আপনাকে আপনি বলব না তো কাকে বলব মা—কত বড বংশের মেয়ে আপনি। বলি আমার তো এ তল্লাটের কোন বামুন-বাড়ি জানতে বাকি নেই। পূর্ণ মুখুজ্জেদের কত বড বংশ ছিল, আজই না হয় দেখছেন অমনি ট্যানাপরা ছাতি-বগলে মুখ শুকিয়ে ঘুরছে—নইলে ওরাই তো ছিল ওখানকার জমিদার। তবে কী জানেন মা—এসব বুঝবে কে আজকাল ? ইজ্জৎ বলুন, মর্যাদা বলুন—এ বোঝে সমানে সমানে।' আমরাই কি একটা সাধারণ লোক।'

তার পর আবার [illegible] পড়ে গেল। [illegible]ভাবিক নেমে আসে।

'দে না [illegible] ?...দিবি মা ? জিভটায় [illegible]ভাজা একটু অম্ল ক'রে তেল হাত বুলিয়ে ?

বলি শরীরটাই না হয় পড়েছে—দাঁত তো দেখছিস, বত্রিশপাটি বজায় আছে ঠিকঠিক। যার যা ধম্ম, দাঁতের কিছু চিবোবার না দিলে চলে? গলা ভাত আর চিড়ের মণ্ড খেয়ে খেয়ে দাঁতে জং ধরে গেল যে।…আচ্ছা চাল-কড়াই ভাজা না দিতে চাস্—নিদেন দুটো কাঁটালবীচি পুড়িয়ে দে।'

কনক নেতিসূচক ঘাড নাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার পিতৃবংশ সম্বন্ধে মত পাল্টে যায়, 'তা দেবে কেন? তা দিলে যে তবু সদ্‌বংশের পরিচয় দেওয়া হবে। গোরবেটি হারামজাদী মেয়ে আমার যেমন—খুঁজে খুঁজে কনে ঠিক করলেন। মাথা কিনলেন আমার। ছোট লোকেব ঝাড ওরা—ওদের চিনি না! ওদের সাত পুরুষ ডাকসাইটে ছোটলোক। মেয়ে আমার বেছে বেছে সেই ছোট লোকের ঝাড় ঘরে এনে পুরলেন।.. একের নম্বর মামলাবাজ কুচক্কুরে লোক সব —মামলা ক'রে ক'রে সব্বস্বান্ত হয়ে গেল, তবু মামলা ছাড়তে পারলে না। ছোট লোকের বেটী ছোটলোক!'

আবার এক-এক দিন কী হয়—হঠাৎ কনকের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, 'এসো মা এসো। দেক দিকি—এসে দাঁড়ালে ঘর যেন জ্বলে উঠল। মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। ত হ্যাঁ মা, একটা কথা বলছি—মনে কিছু ক'রো না—আমার ঐ মিলিটারী মেজাজের ছেলে, ঐ হেমচন্দরের কথা বলছি গো—উনি রোজ রোজ অত রাত ক'রে ফেরেন কেন মা? কী এমন ওঁর রাজকার্য চলে রাত তেরোটা অব্‌দি?'

কনকের হাসি হাসি মুখে যেন একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে। মাথা হেঁট করে বলে, 'তা আমি কেমন ক'রে জানব বলুন!'

'সে কি কথা! জানি না বললে চলবে কেন? জান, খোঁজ নাও। জিজ্ঞেস কর, কৈফেত চাও। এত রাত অব্‌দি কোথায় কী ভাবে থাকে জানা দরকার। এ যে অতিশয় মন্দ কথা, যৎপরোনাস্তি খারাপ কথা। ঘরে এমন রূপের ঢাল বৌ, সে কোথায় আপিস কামাই ক'রে পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করবে, না—রাত দুপুর ক'রে বাড়ি ঢোকে। আমি যে সব টের পাই। না মা, খবরদার অত ঢিল দিও না। রক্ত বড় খারাপ ওর, ভারি বদ্‌ বীর্যে জন্ম। রাশ এতটুকু আলগা দিয়েছ কি মরেছ, দেখছ না ঐ ক'রে তোমার শাশুড়ী মাগীর হাড়ীর হাল হ'ল। বাপ কি বেটা সিপাই কি ঘোড়া—কুছ না হয় তো থোড়া থোড়া! আমি ঐ ক'রে ওর মা'র সব্বনাশ করলুম, আবার ও ধরেছে তোমাকে। তোমার শাশুড়ীর রূপটাই কি কম ছিল মা, বললে বিশ্বাস করবে না

ঐ পোড়া চেলাকাঠের রং এক কালে ছিল ঠিক বসরাই গোলাপ। আর তেমনি দুগ্‌গোপ্রতিমের মত মুখ। এখন যা দেখছ তা দেখে বুঝতে পারবে না সে চেহারা। আমার হাতে পড়ে সেই চেহাবা এই হয়েছে। না মা, এখন থেকে যদি বাশ না টেনে ধর, শতেক-খোয়ার ক'রে ছাড়বে। আমার বংশ আমি ভাল রকম চিনি!'

শ্যামা দোরের বাইরে থেকে খরখর ক'রে ওঠে, 'হ্যাঁ তোমার বংশ শুধু হলে তাই দাঁড়াত বটে, তবে রক্তটা যে আমার। অমন ছেলে লোকে তপস্যা ক'রে পায় না…কেন মিছিমিছি বিষমন্তর ঢোকাচ্ছ ওর কানে তাই শুনি। অমন কুমন্ত্রণা যদি দাও, বৌকে আর এ ঘরে আসতে দেব না।'

'না না বামনী, রাগ করিস নি। ভালর জন্যেই বলছি, তোর বরাত দেখেই আক্কেল হয়ে গেছে যে। সেই জন্যেই ভয় হয়!'

'ওঃ, কত দরদ রে। এত দরদ তো কখনও বুঝি নি। আক্কেল হ'ল এই মরবার কালে—বলতে গেলে শয়ে উঠে? দু দিন আগে হলে যে তবু কাজ দিত—তুমিও জুড়োতে আমিও জুড়োতুম।'

'বরাত, বুঝলি বামনী, তোরও বরাত আমারও বরাত। নইলে এমন হবে কেন?…কৈ গো বৌমা, অমন হাঁ ক'রে সঙের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—একটু তামাক সাজ না।'

॥ ২ ॥

বর্ষাটাকেই ভয় ছিল সব চেয়ে বেশী—সেই বর্ষা পার হয়ে যখন পুজো পর্যন্ত কেটে গেল তখন যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হল শ্যামা। হয়তো আর একটা বর্ষা পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে। খুবই কষ্টকর—এই শয্যাগত রোগীকে সামলানো - বিশেষ সে যা ছেলেমানুষের মতই অবুঝ—তবু শ্যামা তার মৃত্যু কামনা করে না: 'আহা, বাঁচুক—আমি যত দিন আছি, আমার ওপর দিয়েই যাক—আর কাউকে তো জ্বালাচ্ছে না!'

হেমও যে ঠিক ওর মৃত্যু চায় তা নয়। একটু জ্বালাতন বোধ হয় এটা ঠিকই—তবু মানুষ তো। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন মানুষই বোধ হয় কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করে না।

মহা তো মহাখুশী। একটা গর্ব করার মত কথা পেয়েছে সে। রান্নাঘর থেকে শুরু ক'রে পথেঘাটে সর্বত্র গলা চড়িয়ে খবরটা দেয়, 'হবে না? বলি মা'র এয়োতির

জোর নেই?…মা কি একটা যে সে সতী? ঐ পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে তবু কখনও একবার উঁচু পানে চেয়ে দেখে নি। দেখছ না এখনও মা'র সিঁথির সিঁদুর কী রকম ডগডগ করছে লাল। আর শাঁখারই বা কী জেল্লা। ঐ জোরেই বাবা আবার ঠেলে উঠবে ঠিক—দেখো তোমরা!'

শুধু অভয়পদই ঘাড় নাড়ে, 'বলা যায় না ঠিক। অনেক সময় পচা বর্ষাও কাটে কিন্তু নতুন হিমের সময়টা কাটতে চায় না। পুরনো রুগী বেশী কাবু হয় শীতের মুখটায়।'

দেখা গেল অভয়পদর কথাটাই ফলে যায় শেষ পর্যন্ত। মহার আশা ব্যর্থ ক'রে এবং তার স্বামীর আশঙ্কা সত্য ক'রে অঘ্রানের শেষের দিকটায় একেবারে ফুলে পড়ে নরেন। দিনরাত পড়ে পড়ে হাঁপায়—জল পর্যন্ত সহ্য হয় না, এমন অবস্থা।

শ্যামার মুখ শুকিয়ে ওঠে। দু-তিন দিন দেখে হেমকে ডেকে বলে, 'আর একবার না হয় বড় ডাক্তার বাবুকেই ডাক। বাঁচবে না হয়তো, তবু লোকে বলবে যে একেবারে বিনাচিকিচ্ছেয় লোকটাকে মেরে ফেললে, সে বদ্নামটা তো বাঁচবে। তুই রবিবার সকালেই বরং নিয়ে আয় ডাক্তারবাবুকে—'

হেম বোঝে যে লোকে যত না বলুক—মা'র মনই বলছে কথাটা। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শনিবার সকাল ক'রে বাড়ি ফিরে বড় ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনে।

তিনি এসে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন।

বাইরে গিয়ে বলেন, 'এ আমাদের ক্ষমতার বাইরে। হার্ট খুব ড্যামেজ্‌ড্‌—লিভারে আর কিছু নেই। আমার তো মনে হয় আর ওষুধ-বিষুধে পয়সা খরচ ক'রে লাভ নেই। অবিশ্যি কলকাতা থেকে নীলরতন সরকার টরকারকে আনলে কী হবে জানি না—ওঁরা কিছু করতে পারবেন কিনা। আমার আর কিছু করবার নেই। বরং টোট্‌কা-টুট্‌কি করা ভাল—অনেক সময় তাতে খুব ভাল রেজাল্ট্‌ পাওয়া যায়!'

হেম বলে, 'কিন্তু আগে কথাবার্তা সব গোলমাল হয়ে যেত—এখন সেগুলো বেশ পরিষ্কার।'

'ও অমন হয়। এসব রোগীর মরবার আগে মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। লোকে বলে না হেগো রুগী মুখে দড়। ওটা তাই—'

অর্থাৎ যাকে বলে 'এলে দিয়ে যাওয়া' তাই গেলেন।

খবর পেয়ে মল্লিকদের বড় গিন্নী দেখতে এলেন। ক্ষীরোদাও অতিকষ্টে পাল্‌কি ক'রে এক দিন দেখে গেলেন।

সবাই উপদেশ দিয়ে গেলেন শ্যামাকে, 'করছ কি, একটা প্রাচিত্তির - চান্দ্রায়ণ করিয়ে দাও। আর কেন?'

শ্যামা আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে চোখ রগড়ে মুছে স্বামীর কাছে এসে বসে। গলাটাকে নিয়েই যেন মুশকিলে পড়ে। সহজ স্বাভাবিক আওয়াজ যেন আর বেরোতে চায় না।

অনেক কষ্টে, খানিকটা একথা সেকথার পর কথাটা পাড়ে, 'সবাই বলছে, বড় বেয়ানও বলে গেলেন, একটা চান্দ্রায়ণ করিয়ে দিতে--আর ঐ সঙ্গে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির। ওতে নাকি কষ্টটা কমে, অনেক সময় পরমায়ুও ফিরে পায়!'

নরেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়েই যেন ঝেঁজে ওঠে, 'কে, কোন্ গুয়োটা বলেছে তাই শুনি! গাঁজা গাঁজা, বুঝলি—স্রেফ গাঁজা। ছাই হয়। কী হবে প্রাচিত্তির ক'রে তাই শুনি——পয়সা বড় সস্তা হয়েছে তোর, না?'

'পয়সা সস্তা হবে কেন—কী কষ্টের পয়সা তা তো দেখতেই পাচ্ছ।··· লোকে ব'লে—তাই! বলে মহাপাতক কেটে যায়, শরীরটা ঝরঝরে হাল্‌কা হয়ে ওঠে—'

'তুই থাম দিকি। ওসব আমার মত বামুনদের পয়সা আদায়ের ফিকির! যদি পাপ ধরতে হয়—এ জীবনে এত পাপ করেছি যে তা তোর ও এক হন্দর প্রাচিত্তিরেও কাটবে না! আবার এধারে তো তোদের শাস্তরেই বলেছে—একবার রামনামে যত পাপ হরে—মানবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে।···তা একবার না হয় রামনামই ক'রে নিচ্ছি। আমার ওপর বিশ্বাস না হয়, তুই-ই না হয় দিনে দশবার করে কানের কাছে রামনাম শুনিয়ে যাস্। চান্দ্রায়ণ! এক দিন উপোস ক'রে খানিক ভেজাল ঘি খেলেই যদি সেরে উঠত আর ড্যাং ড্যাং করে স্বগ্‌গে যেত তা হলে আর ভাবনা ছিল না!'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে বোধ হয় খুব কষ্ট হয়, খানিকটা মড়ার মত পড়ে হাঁপাতে থাকে।

খানিক পরে আবার চোখ খুলে বলে, 'ওসব বুজরুকি—বুঝলি বামনী—বুজরুকি। ভড়ং। ও আমিও ঢের করেছি। মন্তর যা পড়িয়েছি তা আমিই জানি—তাইতেই তারা সব নিশ্চিন্তি হয়ে স্বগ্‌গে চলে গেছে।'

'হ্যাঁ—সবাই তোমার মত বামুন কি না!' শ্যামা রাগ ক'রে বলে।

'সব সমান, সব সমান। কী জানিস, গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ! শোন্, তোকে এই বেলা চুপি চুপি একটা কথা বলে যাই—মাছ আর তোকে কে কত খাওয়াচ্ছে তা নয়—আমি থাকতেই তো মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে আছে বলতে

গেলে। তবে—নিজে পুকুর করেছিস, মাছ-টাছ যদি ভাল ওঠে কোন দিন—মানে আমি যাবার পর বলছি—এদিক ওদিক দেখে দুখানা খেয়ে ফেলিস। কিচ্ছু দোষ হবে না। আমি বলে গেলুম। দোষ হয় আমার হবে। আমার ও তো পাপের ভারা পুর্ণ আছেই—তাতে আর একটু-আধটু চাপলে টেরও পাব না। কিছুতে কিছু হয় না বুঝলি। হবেই বা কি - মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চাল্‌তা খেলে বাকড় হয়—শুনিস নি ছেলেবেলা? তাই! চোখ বুজলেই সব ফক্কিকার। অনেক দেখলুম, অনেক পুণ্যাত্মাও দেখলুম! কিছু না, কিছু না!'

শ্যামা আর বসতে পারে না। চোখের জল যে এই লোকটার জন্যেই তার এমন অবাধ্য হয়ে উঠবে তা কে জানত!

মহা শুনে কান্নাকাটি করে। স্বামীকে বলে, 'একখানা ভাল লালপাড় শাড়ি আনিয়ে দাও, আর মাছের মুড়ো—মাকে খাইয়ে আসি গিয়ে।'

অভয়পদ বলে, 'বল এনে দিচ্ছি। কিন্তু দু দিন আগে খাওয়াতে পারতে, এখন কি আর মুখে উঠবে! এখন মাছের মুড়ো খাওয়াতে যাবার মানে কি আর তিনি বুঝবেন না!'

'তবু এসব করতে হয়। তুমি বড় সব তাইতে খুঁত কাট বাপু! তুমি বারণ করছ, এর পর লোকে বলবে অত বড় মেয়েটা ছিল, কিছু করলে না—'

'না, না—তুমি কর গে। আমি বারণ করি নি। দুগ্‌গোকে বল—ও ভাল মাছ আনিয়ে দেবে।'

নরেন স্বয়ং ছেলেকে ডেকে পাঠায়। কাছে এলে বলে, 'বসো বাবা, বসো। দুটো কথা বলে নিই। দু দিন পরে তো আর বলা হবে না। তুমি আমার সুপুত্তুর—আমিই কু-পিতা, কখনও কিছু করতে পারলুম না, তা বলছি কি—সবই তো বুঝছ, তোমার গর্ভধারিণীর খাওয়া-পরা তো সব ঘুচতে চলল। এই বেলা এক দিন একটু ভাল করে মাছভাত খাইয়ে দাও। বৌমাকে বল, রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে।'

তার পর একটু থেমে বোধ করি বা হেমের উত্তরেরই আশা করে।

কোন জবাব না পেয়ে আবার বলে, 'আর আমাকেও—যদি কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করে তো এই বেলা খাইয়ে দাও। আর ধরাকাঠ ক'রে কী হবে—বুঝতেই তো পারছ ধরাকাঠের বাবা করলেও বাঁচাতে পারবে না। বিবেচনা কর, মাগী তো চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির করবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল, তাতে তো এক কাঁড়ি টাকা খরচ হত—সেটা বাঁচিয়ে দিলুম। ছেরাদ্দ শান্তিতে বেশী খরচ করো না—মরা গরু ঘাস

খায় না। তা ছাড়া ও কত ছেরাদ্দ তো করালুম আমি, ভুজ্জিই বল পিণ্ডিই বল। সব বামুনকে দেওয়া। কুশের বামুন খাড়া ক'রে তাকে তেল জল অন্নবস্ত্র দেওয়া। কেন রে বাপু? বলে জ্যান্তে দিলে না মুখে তুলে, মলে দেবে বেনার মূলে। তার চেয়ে তুমি আমাকেই যা হয় ভাল মন্দ খাইয়ে দাও। যদি সেই বামুনকেই খাওয়াতে হয়—আমাকে খাওয়াতে দোষ কি? আমিও ধর গিয়ে তো বামুন। বামুন তায় বয়োজ্যেষ্ঠ তায় গুরুজন। যার পর নাই তোমার পিতা।'

হেম চুপ করেই থাকে। তারই বা মনটা কদিন এত খারাপ লাগছে কেন তা বোঝে না।

অনেকক্ষণ পরে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'তা তোমার কি খেতে-টেতে ইচ্ছে হয়?'

'আমার? আমি বাবা সর্বভুক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার খাওয়ার ইচ্ছে। যা পার খাইয়ে দাও।'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খাওয়াবার তো আমার ক্ষমতা নেই। খুব বেশী যা খেতে ইচ্ছে হয় তাই বল।'

'খুব বেশী—?' খানিকটা ভেবে নেয় নরেন, তার পর বলে, 'কদিন ধরে পাতক্ষীরে বোঁদে ফেলে খেতে ইচ্ছে করছে খুব। তা পাতক্ষীর না পাও—একটু রাবড়ির ঝোল? আর একটু মাংস। করার অসুবিধে হয় কলকাতার কোন হোটেল থেকে একটু কিনেও আনতে পার। চার পয়সা—দু আনা? দেয় দেয়,—অমন ভাঁড়ে ক'রেও দেয়।'

হেম সেই দিনই খুঁজে খুঁজে একটু ক্ষীর আর বোঁদে কিনে আনে। মাংস বাড়িতেই রাঁধাবার ব্যবস্থা করে। মাছ মাংস তো হয়ই না কোন দিন, হলে তবু বৌটাও খেতে পারবে একটু। জলের মত ডাল আর ডুমুর থোড় কাঁচকলা খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেছে। একেই পাত্‌লা পাত্‌লা গড়ন—তার ওপর এই খেয়ে রোগা ও হয়ে গেছে খুব—সেটা এমন কি তারও চোখে পড়ছে কিছু কাল থেকে।

অভয়পদ প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

একদিন কাছে এসে বসতে নরেন গলাটা নামিয়ে বললে, 'বাবা অভয়, তোমাকে তোমাকে আর কী বলব, তুমিই বলতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—চিরদিন এ সংসারটা তো তুমিই ঠেললে। তা রইল সব, দেখো শুনো।...হ্যাঁ, বলছিলুম কি, বলতেও লজ্জা করে, কখনও তো এক পয়সার বাতাসা কোন দিন এনে দিতে পারি নি—তোমার কাছে এ সব বলাও ঠিক নয়—'

বাধা দিয়ে অভয়পদ প্রশ্ন করে, 'খাবেন কিছু—বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে?'

'ঠিক ধরেছ বাবা, মনের কথা টেনে নিয়ে বলেছ!' মহাখুশী হয়ে ওঠে নরেন—"বিশেষ কিছু নয়, খরচ-অন্তর করাতেই চাই নে তোমায়, শুধু একখানা প্যাঁজের বড়া আর একটা ঝাল-ফুলুরি।'

অভয়পদ তখনই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনে বাজার থেকে।

শ্যামা'যেন শিউরে ওঠে, 'ঐ রুগীকে দেবে আবার, বাজারের তেলেভাজা?'

'কি হবে মা না দিয়েই বা? বুঝতেই তো পাচ্ছেন—! আত্মা খেতে চাইছে যখন এত ক'রে—দিয়েই দিন। এর পরে নইলে বড় আপসোস হবে। আর আমি এনেছিও একখানা ক'রেই ঠিক। বেশী দেব না!'

সে দুটো খুব তৃপ্তি ক'রে খায়। ক্ষীর বোঁদেও চেটে খেয়েছিল—কিন্তু মাংস মুখে দিতে পারলে না। মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলে। কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'এইবার সত্যিসত্যিই শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে মা চিত্রগুপ্তের পেয়াদা। নইলে মাংস আমার মুখে তেতো লাগে ' না, আর দেরি নেই!'

দেরি যে আর নেই তা সকলেই বোঝে এবার।

হেম কৌশল ক'রে বাপের মাংসর সঙ্গে একটু মাছ কিনে এনেছিল—সঙ্গে বসে খেলে—অত টের পায় নি শ্যামা। কিন্তু মহাশ্বেতা যেদিন তিন-চার রকম মাছ নিয়ে এসে রাঁধতে বসল সেদিন আর তার আসল অর্থটা শ্যামার বুঝতে বাকী রইল না। অভয়ের আশঙ্কাটাই আর একবার সত্য হ'ল। মেয়ে আর বৌ জোর ক'রে শ্যামাকে ধরে এনে পাতের কাছে বসাল বটে কিন্তু সেই সুস্বাদু মাছের একটা টুকরোও মুখে দিতে পারল না সে। ভাত ভেঙে মুখে দিতে গিয়ে পাতের পাশেই হাহাকার ক'রে আছড়ে পড়ল।

'কেন এনেছ এসব মা, এ তো আমি খেতে চাই নি। যেদিন থেকে আমার হরিনাথ গেছে সেইদিন থেকেই তো আমি পারতপক্ষে মুখে তুলি নি এসব। এতে ক'রে কি আমার লোহা-সিঁদুর বাঁচবে মা?...সেই তো আমার আসল, সে-ই তো আমার সব।...ভগবান সব দিক দিয়ে মেরেছেন আমাকে চিরকাল, এইটুকু শুধু দিয়ে রেখেছিলেন—তাও কেড়ে নিচ্ছেন এবার। ওরে, ওর কি এই মরবার বয়স হয়েছিল—না বুড়ো হয়েছিল ও? কেন এল এত কাল পরে আমার কাছে—এ কি এই দাগা দেবে বলে? তার চেয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, কোথায় থাকত কী খেত তা খবরও রাখতুম না, সেই তো ভাল ছিল। তেমনি করেই ওকে বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন ভগবান।'

সেদিন আর খাওয়াই হ'ল না কারুর।

মহা তবু জোর করতে যাচ্ছিল, কনক ইঙ্গিতে নিষেধ করলে। তার বয়স কম কিন্তু নারীহৃদয়ের সহজাত সহানুভূতি দিয়ে এটা বুঝেছিল যে, এ খাওয়ার চেয়ে শাস্তি মেয়েমানুষের আর কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

এমনি ক'রে প্রায় একুশ-বাইশ দিন এখন-তখন হয়ে কাটবার পর নরেনের ফুলোগুলো আবার একটু কমতে শুরু হল। এই কদিন যে টনটনে জ্ঞান ছিল সেটাও চলে গেল, আবার সেই আগেকার আধো-আচ্ছন্ন ভাবে ফিরে গেল। কথাবার্তায় গোলমাল হতে লাগল।

সকলে ভাবল, এ টালটাও সামলে গেল—আবার কটা দিন অন্তত যুঝবে।

পর পর তিন শনি-রবিবার কোথাও ঘোরা হয় নি হেমের, সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। রাণীবৌদি এর মধ্যে দুবার এসে দেখে গেছে। নতুনগুড়ের সন্দেশ এনে নিজের হাতে খাইয়ে এক রাশ আশীর্বাদ নিয়ে গেছে নরেনের—কিন্তু তাতে মন ভরে না। আড্ডার আলাদা সুখ। সুতরাং সে-শনিবার হেম প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছিল যে অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা না দিয়ে সেদিন সে বাড়ি ফিরবে না। তার ওপর অফিসে গিয়েই শুনলে ওদের এক প্রাক্তন সাহেব বিলেতে মারা গেছেন, কাল খবর পৌঁছেছে—আজ সেই শোকে দু ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই বারোটাতে ছুটি সেদিন, তার দু ঘণ্টা আগে—অর্থাৎ দশটাতেই সেদিন বেরিয়ে পড়তে পারবে। এটাকে সে ঈশ্বরেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করল।

কলকাতায় নেমে প্রথমেই সিমলের রাস্তা ধরল। কমলারা তখন খেতে বসেছে। গিয়েই তো কেড়ে বিগড়ে রাণীবৌদির পাত থেকে খানিক ভাত তুলে খেয়ে নিলে, বড়মাসীর কাছ থেকে খানিকটা আমড়ার অম্বল। তার পর গোবিন্দর মেয়েটাকে নিয়ে লোফালুফি করল কিছুক্ষণ—এক কথায় অনেক দিন পরে অনেকটা হৈ-হৈ ক'রে যেন বাঁচল সে।

বেশ হাসি-খুশিতেই কাটছিল, কিন্তু খানিকটা গল্প করার পর নাতনী ও ঠাকুমা দুজনেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রাণী। ইঙ্গিতে হেমকে পাশের—অর্থাৎ নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেসা করব ঠাকুরপো, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?'

হেম রীতিমত ঘাবড়ে গেল ওর কথা বলার ভঙ্গীতে। এ যেন নতুন এক রাণীবৌদি। এ মূর্তির সঙ্গে তো সে পরিচিত নয়! সে একটু ভয়ে ভয়েই বললে, 'কী ব্যাপার বল তো? কিসের কথা?'

'তুমি বৌকে নাও না কেন?'

ঠিক এই প্রশ্ন এবং এত স্পষ্টভাবে—শোনবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না হেম। সে চমকে উঠল।

'কে বললে তোমাকে? যে বলেছে সে—সে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছে!'

'ভয় নেই, কনক বলে নি। সে মেয়েই সে নয়। তার বুক ফাটে তো মুখ ফাটবে না। ওসব মেয়েদের আমি ভাল করেই চিনি। বিষম আত্মসম্মান জ্ঞান কনকের!'

'তবে?'

'ওগো মশাই, আমাদের চোখ আছে, আমরা ঘাস খাই না। আমাকে তো চেন, পেটের কথা তোমারও জানতে কিছু বাকী নেই আমার। বল না কবে কোথায় কী ক'রে এসেছ সব বলে দিচ্ছি। ওকি, মুখ শুকিয়ে উঠল যে। ভয় নেই—জানলেই বলতে হয় না। কিন্তু এ আলাদা কথা। বড্ড ভুল করছ ঠাকুরপো। বাইরে বাইরে ঘুরে শুধু এঁটোপাত চাটাই সার হয়—আসল ভোজের স্বাদ তাতে মেলে না। তোমার বাবাও আর এক রকম ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরেছিলেন—জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল তাঁর—অকালে বুড়ো হয়ে কী অবস্থায় মরছেন দেখতে তো পাচ্ছ। কী লাভ এমন এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেরিয়ে আড্ডা দিয়ে বলতে পার?'

'তুমিও এই কথা বলছ? আমি আসি সেটা পছন্দ কর না?' আহত কণ্ঠে বলে হেম।

'ছিঃ! সে কথা বলছি না। কিন্তু তুমি কি পেলে? দুটো মুখের কথা, হাসি, গল্প—এই তো? বুকে হাত দিয়ে বল দিকি! সুখ তোমার অন্যত্র। ঘরে সুখের সরোবর টলমল করছে—তা ফেলে আদাড়ে পাঁদাড়ে খানা-ডোবায় ডুবতে যেও না। অনেক ভাগ্য ক'রে অমন বৌ পেয়েছ। আমার মত রূপ নয়—সে আমিও জানি। এও জানি—তোমাকে বলেই বলছি, লোকে শুনলে অহঙ্কার বলবে—আমার মত রূপ পথেঘাটে পড়ে থাকে না! তা নিয়ে আপসোস ক'রে লাভ নেই! যা পেয়েছ তাও কম না। তা ছাড়া ওর মনটা বড় ভাল, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে ওকে সুখী করো—তার চারগুণ সুখ তোমার লাভ হবে।'

আব্ হাওয়াটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। থমথমে গম্ভীর।

এই জন্যে কি তিন সপ্তাহ পরে ছুটে এল সে আড্ডা দিতে?

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল সে একটা বেজে গেছে। হঠাৎ উঠে পড়ল।

রাণীবৌদি হেসে বললে, 'এখন কোথায় চললে তাও জানি। আমার কথা পছন্দ হ'ল না—কিন্তু এক দিন বুঝবে। সেদিন না হায় হায় করতে হয়! আমি খুব বোকা নই—আমার কথাটা একেবারে উড়িযে না দিয়ে ভেবে দেখো।'

'তুমি বোকা? তোমাকে যে বোকা বলে—শুধু সে-ই বোকা নয় তার ঝাড়েবংশে বোকা। গুপ্তকবিব কবিতা—তুমিই শোনাচ্ছিলে না সেদিন? আচ্ছা এখন আসি—'

হেসে, কথাটাকে হাল্‌কা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে হেম। আর এক মুহূর্তও যেন ওর সামনে থাকতে সাহস হয় না। সাংঘাতিক মেয়ে। ঠিক কতটা জানে আর কতটা ওপব-চাপ—সেটুকু খোঁজ কবতেও সাহসে কুলোয় না ওর।

হেম সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা নলিনীর বাড়িতেই যায়। রাণী ধরেছিল ঠিকই। হয়তো ঘড়িব দিকে তাকানো থেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এ যাওয়াতে দোষ নেই। বিয়েব পর আবও কয়েকবার এসেছে। বসে গল্প ক'বে খেয়ে চলে গেছে। কিরণ ফিরেছে কাশী থেকে—তবে সে কিরণ আর নেই—এখন ঝাঁজ অনেকটা কমে গেছে। হেমকেও সে আর খুব অপছন্দ করে না। বরং এক-এক দিন সেও বসে গল্প ক'রে যায় খানিকটা।

আজ অবশ্য কিরণ ছিল না। নলিনী একাই ছিল। এটা ওটা খুচরো গল্প, কিছু থিয়েটারের গল্প ক'রে—নলিনী এখন আবার থিয়েটারে যাচ্ছে, অন্য থিয়েটার—হঠাৎ হেমের বিয়ের প্রসঙ্গে চলে এল। বললে, 'গ্যাখ হেমবাবু, সেদিন থেকে একটা কথা কইব কইব করে আর বলা হয়ে ওঠে নি। অবিশ্যি বিয়ের কনে দেখেছি সেই এক দিন—কিন্তু বৌ তুমি বাপু ভাল পেয়েছ। তুমিই জিতেছ। আমি তো বলব অমন বৌ পাওয়া তোমার ঠিক হয় নি। তা তুমি এখনও এমন ক'রে এর দোরে ওর দোরে আড্ডা দিয়ে বেড়াও কেন?'

'তবে কি দিনরাত বৌয়ের কাছে ধন্না দিয়ে বসে থাকব?' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেম।

'তা বলি নি, তুমি রাগ ক'রো না। ঘরবাসী তুমি ঠিক হও নি। অনেক দেখলুম, মানুষের মুখ দেখলে বুঝতে পারি। এখনও বাউণ্ডুলে আছ। আর

কেন? ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন, ঘরবাসী হ'ও গে। যেদিন দেখব তাঁর তৃপ্তি তোমার মুখে ফুটেছে—সেদিন বুঝব তুমি যথার্থ ঘরবাসী হয়েছ। সেদিন দু দিন দু রাত আড্ডা দিলেও দোষ হবে না।'

হেম এই প্রসঙ্গটাতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। দু-একটা অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করে কিন্তু আর যেন আলাপটা ঠিক জমে না। শেষে সে সেখান থেকেও উঠে পড়ে।

'ও কি—এরই মধ্যে চললে কোথায়?'

'ঘরে। ঘরবাসী হ'তে!…তুমিই তো উপদেশ দিলে!' ঈষৎ তিক্ততা ফুটে ওঠে ওর গলায়।

খপ ক'রে ওর কনুইটা ধরে ফেলে নলিনী, 'অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে, আর কিছু বলব না, আমার ঘাট হয়েছে, বসে যাও একটু।'

হেম এবার হেসে ফেলে। বলে, 'তা নয়, বাবার অসুখ তো খুব—তিন শনি-রবিবার তো বেরোতেই পারি নি। সকাল ক'রে ফিরতেই হবে। আর এক দিন তখন আসব।'

'অসুখের নাম করলে কী বলব আর! মিথ্যে বলে থাক তো তোমার ধর্ম্ম জানে। এসো তা হলে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা!'

তবু তখনই ঠিক বাড়ির পথ ধরতে পারে না হেম। তখনও বেলা রয়েছে বেশ। শীতের সূর্যও পাটে বসে নি। কী ভেবে সে পায়ে পায়ে তার পুরনো থিয়েটারের আড্ডাতেই গিয়ে ওঠে।

সেদিন শনিবার, সকাল করেই থিয়েটার আরম্ভ হবে। গেট-কীপাররা এসে গেছে সকলে। আর থিয়েটার না থাকলেও এসে এখানেই জড়ো হয় ওরা। হেমকে দেখে সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠল। দক্ষিণাদার মুখে ওরা বিয়ের খবর পেয়েছে। কানাই বললে, 'কী বাবা—সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার শিব্‌স ফাদার ডোন্‌ট্‌ নো!…ওসব চলবে না—এক দিন ভাল ক'রে খাওয়াও! আর এক দিন কেন, আজই হোটেলে বলে দাও—ঢাকাই পরোটা আর কোর্মা!'

নন্দ বাধা দিয়ে বললে, 'দূর! এ হোটেলে তো খাচ্ছিই। একঘেয়ে খাওয়া। টাকা ছাড়ুক, এক দিন কোন চীনে হোটেলে খাওয়া যাক। ওদের ওখানে ভাত-ভাজা নাকি খুব ভাল করে—কুঁচো চিংড়ি ফোড়ন দিয়ে!'

'হ্যস্!' কানাই উড়িয়ে দেয়, 'পয়সা খরচ ক'রে আবার কেউ কুঁচো চিংড়ির ফোড়ন খেতে যায়! ও তো দু বেলাই খাচ্ছি। আর কি জোটে বল—চার পয়সায় কুঁচো চিংড়ি এই তো বাস্তু দেবতা। আর ভাত-ভাজা—সেও হামেশা—ভাত বেশী হলেই বৌদি ঐ কম্ম করে—তেলের ওপর প্যাজ কুচিয়ে দিয়ে ভেজে নেয়। বলে খাও, চীনেবাজারী পোলাও!...না না, আমার এই ঢাকাই পরোটাই ভাল।'

'হবে হবে। এক দিন হবে।' বলে কাটিয়ে দেয় হেম, 'বাবার খুব অসুখ যাচ্ছে—এখন-তখন অবস্থা।'

বলেই ভুলটা বুঝতে পারে হেম। কানাই সঙ্গে সঙ্গে কুট করে বলে ওঠে, 'বাবার এখন-তখন অবস্থা আর তুমি থ্যাটারে বসে আড্ডা দিচ্ছ। ভ্যালা মোর বাপ্ রে।'

'না, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই।'

বলেই সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সরে পড়া হয় না। দক্ষিণাদার সামনে পড়ে যায়। দক্ষিণাদা বলেন, 'কী রে—তোর বাবার অসুখ বলছিলি না? আমার কানে গেছে ঠিক—বাপের অসুখ আর তুমি এখানে শনিবার বজায় দিতে এসেছ?'

'না—না—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—তাই একটু খবর নিতে—'

'হাওড়া থেকে হাওড়ায় ট্রেন ধরবে—এদিক দিয়েই বা যাও কেন?...ছাখ্ আমি তোর সব খবর রাখি, কেন যে একটা মায়া পড়ে গেছে তা জানি না, তুই রাগ করিস তবু না বলে পারি না...তুই এখনও রাত নটা-দশটা অবধি টো-টো ক'রে পথে পথে ঘুরিস প্রত্যহ—বহু লোক তোকে দেখতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। নলিনীর কাছেও মাঝে মাঝে যাস শুনেছি। ওর ভাড়াটে রেণু আমাদের এখানে বেরোচ্ছে তো—সে-ই এসে বলে। কেন রে? বৌ মনে ধরে নি? দিব্যি খাসা বৌ তো দেখে এলুম। ওরে অমন করিস নি—ছেলেবেলায় যা ছোক ছোক করেছিস করেছিস—এ বয়েসে আর ঘুরে বেড়াস নি। আমার কথা শোন, ঠেকে শেখা আমার। ঘরে মন বসা। এখনও যদি ঘরে না আটকে যাস তো চিরকাল আমার মত এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবি—জোয়ারের গুয়ের মত কোন ঘাটে ঠাই হবে না। যতই হোক ঘরের বৌ—দোষ হোক ঘাট হোক সে ফেলতে পারবে না।'

কী বিপদ! আজ কার মুখ দেখে কলকাতায় পা দিয়েছিল কে জানে!

তার ভুরু কোঁচকানো দেখেই দক্ষিণাদা মনের ভাবটা বুঝতে পারেন, 'কী, পছন্দ হ'ল না তো কথাটা! রাগ হয়ে গেল তো!'

'আপনার কথায় কবে রাগ করি দক্ষিণাদা, আপনি যে আমার ভালর জন্যেই বলেন তা এখন অন্তত খুব বুঝি। মনটাই ভাল নেই। চলি এখন!'

তবু ঠিক তখনই হাওড়ায় গেল না। পোস্তা ঘুরে পাঁচ সের আলু কিনে এটা ওটা সওদা ক'রে হাওড়ার মোড়ে কপি দর করে ছটার ট্রেনে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ফিরছিল—হঠাৎ ওদের বাড়ির সামনেব রাস্তায় পড়েই মনে হল বাইরের ঘরে যেন বড় বেশী লোক। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো—তবু বাইরে এত জমাট বাঁধা অন্ধকার যে তাইতেই অত দূর থেকেও অনেকগুলো মাথা নড়বার আভাস পাওয়া গেল।

উদ্বিগ্ন হয়েই জোরে জোরে পা চালাল সে। বাড়িতে ঢুকে বাগানটা পেরোতে পেরোতেই নজরে পড়ল পুকুরের ধারে কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু চমকেই উঠত হয়তো—অমন সাদামত কী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে দেখে—কিন্তু সেই মানুষটাই ওকে চিনতে পেরে প্রায় ছুটে কাছে এল, 'ওগো, আজকেই কি এত দেরি করতে হয়! ছাখ গে, বাবার বোধ হয় শেষ অবস্থা—'

কনক। এর আগে কোন দিন 'তুমি' বলে নি সে। প্রথম দিন আপনি বলেছিল, তার পর আর বিশেষ প্রয়োজনই হয় নি, সামান্য যা কথা হয়েছে তাতে তুমি-আপনি এড়িয়ে গেছে। আজকের এই উদ্বেগের মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করে হেম।

আলুর পুঁটলিটা ছুঁড়ে রকে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে। এসেছে অনেকে। প্রমীলার কোলে কচি ছেলে সে আসতে পারে নি—মহা এসেছে, তরলা এসেছে, তিন ভাই-ই এসেছে অভয়পদরা। অম্বিকাপদ মাথার কাছে বসে চেঁচিয়ে গীতা পাঠ করছে। অর্থাৎ শেষ অবস্থারই আয়োজন যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেম একটু বিহ্বল হয়েই চাইল অভয়পদর দিকে।

'হঠাৎ কী হ'ল এমন—। এই তো আমি দেখে গেলুম—কৈ তেমন তো কিছু—'

অভয়পদ বাইরে গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। এরা কেউই টের পায় নি। আজকাল প্রায়ই ঝিমিয়ে পড়ে থাকত, সেই রকমই ছিল। আজকাল ঘুমোলে

নরেনের একটু নাকডাকার মত আওয়াজ হ'ত। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে আওয়াজটা হচ্ছিল, সেটাকেও ওরা নাকডাকার শব্দই ভেবেছিল। শ্যামা অনেক মৃত্যু দেখেছে কিন্তু সে-ও ধরতে পারে নি। অভয়পদ এসেছে চারটে নাগাদ, সে ঘরে ঢুকেই বুঝেছে শ্বাসের শব্দ এটা। ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছে। তিনিও বলে গেলেন যে তাই—আর খুব বেশী বিলম্ব নেই। তখন যতটা সম্ভব সকলকে খবর দিয়েছে। শুধু কান্তিকে খবর দেওয়া যায় নি। আর তরু পোয়াতি—তার দিদিশাশুড়ী পাঠায় নি।

পাথর হয়ে গিছল হেম।

শোক? ঠিক শোক নয় হয়তো—কেমন একটা বিমূঢ়তা। হাত পায়ের জোরটাই কেমন যেন কমে গেছে।

ভেতর থেকে অম্বিকাপদ ডেকে বলে, 'হেম, এবার তোমার শেষ কাজটা কর মুখে একটু জল দাও আর তারক ব্রহ্ম নামটা—'

'হেম শব্দটা কানে যেতে সহসা মৃত্যু-পথযাত্রী যেন একটু নড়ে ওঠে। ঠোঁটটা কাঁপে তার। একটু চেষ্টার পর চোখটাও খুলে যায়।

আহা রে। ছেলেকে দেখবার জন্যেই প্রাণটা এতক্ষণ ছিল'—কে একজন মহিলা বলে ওঠেন। সম্ভবত পাড়ার কেউ।

গলা জড়িয়ে গেছে। আওয়াজটাও নাকা হয়ে উঠেছে। নাকটা ভেঙে গেছে নিচের দিকটা

'কে, হেম? মানে আমাদের হেমচন্দর? কৈ বাবা? কোথায়?'

হেম ছুটে গিয়ে মুখের কাছে উপুড় হয়ে বসে।

'কিছু বলবে আমায়?'

না, কী আর বলব। তুমি জ্ঞানবান ছেলে। সুপুত্তুর। মাগীকে দেখো—অবিশ্যি ও ভাঙবার মেয়ে নয়। পথের ভিখিরী করেছিলুম—আবার কেমন বাড়ঘর করেছে দেখছ না। ও খুব শক্ত মেয়েমানুষ। তবে কঞ্জুস হয়ে যাচ্ছে, হাড় কঞ্জুষ। বৌমাকে দেখো, আর মেয়েগুলোকে। আমার বলাও হয় বৃথা, না বললেও দেখবে। বৌমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। ওকেই দেখো। মাগ। ওকে জ্বালাবে। আর ঐ খেঁদীটা।'

জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে আবার হঠাৎ চুপ ক'রে যায়।

'তাউই মশাই, তাঁকে ডাকুন। ভগবানকে ভাবুন। হেম নাম কর।' জোরে জোরে বলে।

' হেম নাম করতে থাকে। পাশ থেকে

নরেন যেন একটু বিরক্ত হয়।

'আ মলো, কানের কাছে চেঁচায় দেখ ন

চুপ ক'রে যায় আবার।

এবার কণ্ঠশ্বাস শুরু হয়েছে শুধু নালির কাছটা

আরও আধঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটল। হেম একটু ..

সে জল পুরোটা গলায় গেল না—কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

তার পর আবার একটু প্রাণের লক্ষণ দেখা দিল মুমূর্ষুর

কাঁপতে শুরু করল।

কে একজন বললেন, 'শোন শোন, কী বলছে শোন—'

হেম অভয় দুজনেই ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে।

ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ শব্দ, তবু কথাগুলো বুঝতে পারা যায় শেষ পর্যন্ত।

'ওরে, কে কোথায় আছিস বাবাবা, আমাকে বাড়িটা একটু দেখিয়ে শুনেছি নতুন বাড়ি করেছে, খুব ভাল বাড়ি। দে না বাবা কেউ দেখিয়ে, যে আর ঘুরতে পারছি না।'

আবার চুপ করে যায়।

গলার কাছের নডাটাও বন্ধ হয়ে আসে এবার। শুধু নাকের কাছটা কাঁপতে থাকে।

সেটাও এক সময় স্থির হয়ে গেল।

চির অশ্রান্ত, চির অস্থির, ভবঘুরে পথিকের পায়েও বুঝি শ্রান্তি নেমেছে এবার। এবার সে আশ্রয় খুঁজছে একটু। আশ্রয় আর বিশ্রাম। কে জানে ইহলোকে যা মিলল না—পরলোকে গিয়ে তা মিলবে কিনা। গৃহহারা তার যথার্থ গৃহ খুঁজে পাবে কিনা।

শবযাত্রীরা শব নিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। স্ত্রী-কন্যাদের হাহাকারও শান্ত এসেছে অনেকটা। কাল পাড়ার অনেকেই এসেছিলেন, সকাল হওয়ার সঙ্গে সই তাঁরা ধোওয়া-মোছার কাজে লেগে গেছেন। এক বিধবা মহিলা শ্যামাকে ধরে বাইরের সিঁড়িতে বসে আছেন। ওরা ফিরলে শেষ কাজটুকু তাঁকেই সারতে হবে।

ার কোন কাজ নেই। পাগলকে নিয়ে, রোগীকে নিয়ে আর ব্যস্ত থাকতে া। [illegible] এসে রান্নাঘরের পিছনে জানলাটার কাছে

নরেনের একটু নাকডাকার মত আওয়া / করছে সে। এখনও এদের কা
৺চ্ছিল, সেটাকেও ওরা নাকডাকা য পরিবেশ সে দেখেছে, তার সঙ্গে
দেখেছে কিন্তু সে-ও ধরতে পারে নি। ই—কিন্তু তবু কেউই আজ পর্যন্ত
ঢুকেই বুঝেছে শ্বাসের শব্দ এটা। ছাড় একটু ই যে জোর ক'রে খানিকটা
গেলেন যে তাই—আর খুব এ যে ওর কী একটা মনোভাব—তা ও
খবর দিয়েছে। শুধু কান্তিকে ২ না। যেন। কে জানে এবার সে কাকে নিয়ে জী
দিদিশাশুড়ী পাঠ সে কোথায় খুঁজে পাবে তার বাসা।

পাথর এসে পাশে দাঁড়াল।

শোক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—না ভাই? এক বছর ধরে সেবাশু
জোরটাই —ফাঁকা তো লাগবেই। অসহায় অবুঝ বুড়ো মানুষ—অ
ভেত যতই তো হয়ে যায়। বড্ড মায়া পড়ে কিন্তু—'
মধ্যে এক বটে ছেলেই ছিল তার। কাল সকালে নে নই সে কথা

ঠে কথাটা মনে পড়ে গেল কনকের। কাল সকাল বেলাই—বাি
গিয়েছিল সে, অত্যন্ত ধূর্তের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে নরে
'শোন্ মা একটু—এক মিনিট এদিকে আয়। একটা কথা বলে
বাইরের ঐ পগারধারে নোনা গাছটার গোড়ায় সাড়ে এগারোটা ।
আছে। মাগীকে দিই নি ওর তো রাঘববোয়ালের হাঁ, পেটে
বেরোত না ভেবেছিলুম যদি একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারি, পায়ে
পাই তো ঐ কটা টাকা পুঁজি করেই আবার সরে পড়ব। তা আর হব
কটা টাকা তুইই নিস মা। তোকেই মা বলেছি, তুই আমার যথার্থ
মা। তো কোন দিন হাতে তুলে দিলুম না একটা পয়সাও. চিরজন্ম
সকলের দোহন করে গেলুম উলটে। তবু তুই নিলে একটু শান্তি পাব
—শুধু মরার আগে সব বন্ধন খুলে দিয়ে যেতে হয় নিজের বলে কি
নেই। বল্ আমাকে কথা দে—ওটা তুই খুঁজে বার করে নিবি?'

কথা দিয়েছিল কনক।

নেবেও সে এক সময়। যদি এর মধ্যে বাপের বাড়ি যেতে পারে
সেখানে মনের মত করে দুটি-তিনটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দেবে। সর্বস্ব
দিয়ে দেবে সে।